আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচয়

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল,।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,

১০ নং কৃষ্ণদাস পালের লেন হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। } বৈশাখ ১২৯৮ সাল। { ১ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১৩

অনন্ত আশার স্রোতঃ বহিতেছে অবিরাম,
নাহি জানি আদি তার নাহি জানি পরিণাম!
বহিছে আশার নদী প্লাবিয়া হৃদয়-দেশ,
মৃদুল নীরব কভু একটি তরঙ্গ নাই,
কভু বা তরঙ্গ-ভঙ্গে করি মহা আস্ফালন,
ভীষণ গর্জ্জনে চলে, হেরিলে কাঁপিয়া যাই।
বিপুল-বিক্রম-ভরে রোধিতে সে মহাবেগ,
কত শত ঐরাবত ভীম-কান্তি মহাকায়
সদর্পে গর্জ্জিতেছিল, ঘুচিয়াছে সে বিক্রম।
অই দেখ তারা এবে কোথায় ভাসিয়া যায়!
সুন্দর, সুগন্ধময়, অগন্য স্বর্গীয় ফুল—
পবিত্র সঙ্কল্পচয়—আশার হিল্লোলে ভাসে,
দেবের নির্ম্মাল্য বুঝি সুরলোক পরিহরি,
গন্ধবিতরিয়া চলে অনন্তের সমুদ্দেশে!
অনন্ত আশার স্রোতঃ। কোথা আদি, কোথা শেষ?
দুর্ব্বল বিজ্ঞান দিতে পারিল না সে উত্তর,—
অন্তরে প্রবেশ করি হেরি দিব্য চক্ষুঃ মেলি,
আদি অন্ত এ আশার প্রেমময় প্রাণেশ্বর।

নব-বর্ষ।

১

ফুটেছে আশার ফুল ভারত-কাননে আজ,
ছুটেছে সৌরভ তার পূর্ণ করি মহাকাশ।
উজলিয়া দশদিশ, নিবিড় আঁধার নাশি,
উষার বিমল আভা হইয়াছে পরকাশ,
পরেছে প্রকৃতি আজ বিশ্ব-বিমোহন সাজ।

২

নীল আকাশের তলে তরুলতা গুল্মদল,
ঊর্দ্ধবাহু হয়ে আজ করে মহা সংকীর্ত্তন।
প্রভাতকিরণ মাখি, ভাবে নীমিলিত আঁখি।
মাতোয়ারা সমীরণ মহাভাবে নিমগণ;
ধরিয়াছে মহাধ্যান মহাপ্রাণ হিমাচল।

৩

এস নববর্ষ! আজ নবপ্রাণ কর দান,
মুছাও নয়ন-জল, ঘুচাও বিষাদরাশি;
সীমা হতে সীমান্তরে, আশার মোহনস্বরে,
শুভদিনে শুভক্ষণে প্রাণের নৈরাশ্য নাশি,
জাগাও ভারতবাসী মহাঘুমে অচেতন।

৪

বড় আশা করে আজ করি তব আবাহন;
জুড়াও প্রাণের জ্বালা পূর্ণ কর মনোরথ।
শত দুঃখ লাজ সয়ে, বিষাদে মলিন হয়ে,
রয়েছে জীবন শুধু তব আশা-পথ চেয়ে;
এস নববর্ষ! আজ কর শুভ বর-দান।

সম্পাদকের অভিবাদন।

যিনি হৃদয়ের উৎসাহ, প্রাণের আকাঙ্ক্ষা দেহের বল, এবং আত্মার শক্তি, যিনি পিপাসা রূপে অন্তরে জাগিতেছেন, আবার বহির্জগতে জল-রূপে বিদ্যমান থাকিয়া সে পিপাসা পরিতৃপ্ত করিতেছেন; যিনি কর্ম্ম-বন্ধ-রূপে জগৎকে এক সূত্রে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আবার কৃপা-পরবশ হইয়া কর্ম্ম-বন্ধ-ছেদনের জন্য মানব-সন্তানকে জ্ঞান-ভক্তিরূপ শানিত কুঠার অর্পন-করিতেছেন; যিনি কর্ম্মকেই যোগের মধ্যে প্রধান স্থান দিয়াছেন, এবং কর্ম্মের মধ্য দিয়াই জীবের জন্য মুক্তির পথ খুলিয়া দিয়াছেন; নববর্ষের প্রারম্ভে সেই অনন্ত-শক্তি করুণা-নিধান হরির চরণে প্রণাম করি। অনন্তর মহানুভব গ্রাহক, পাঠক ও সহানুভাবক দিগকে শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে অভিবাদন করিয়া আবার তাঁহাদিগের পরিচর্য্যায় সানন্দে প্রবৃত্ত হই।

দেখিতে দেখিতে আর একটি বৎসর চলিয়া গেল, শিশু-শিক্ষা-পরিচর তৃতীয় বর্ষে পদার্পন করিল। শিশুর জীবন সর্ব্বদা শঙ্কটময়,—সামান্য ঘটনায়, সামান্য অনিয়মে, সামান্য বিপদে, শিশুর জীবনাত্যয় ঘটিতে পারে, এই হেতু শিশুর জীবনের জন্য তাহার পিতা মাতা ও আত্মীয় বন্ধুগণ সর্ব্বদা শঙ্কিত। শিশু পরিচরের পরিচালক ও হিতাকাঙ্ক্ষিগণ আজি ও ইহার জীবন-সম্বন্ধে নিঃশঙ্ক হইতে পারেন নাই, তাই তাঁহারা সাধারণের নিকট শিশুর জন্য আশীর্ব্বাদ চাহিতেছেন।

শিশু কেমন করিয়া হাটিতে শিখে, এই ব্যাপার যাঁহারা নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ করিয়াছেন, নৈরাশ্য তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে পারে না। হস্তপদগুলিকে একবার দাঁড়াইবার অবস্থায় আনিতে, পায়ের উপর ভর করিয়া একবার দাঁড়াইতে, দাঁড়াইয়া এক পা হাটিতে শিশুর কত চেষ্টা, কত উদ্যম; এক একটি চেষ্টায় পুনঃ পুনঃ ভগ্ন মনোরথ হইয়া শিশুর কত যন্ত্রনা, কত ক্রন্দন। কিন্তু এত যন্ত্রনা পাইয়াও শিশু কি হাটিবার চেষ্টা ছাড়িয়া দেয়? পুনঃ পুনঃ অকৃতকার্য্য হইয়াও শিশু অবশেষে হাটিতে শিখে, দৌড়িতে শিখে দেশ বিদেশ বেড়াইতে শিখে।

ব্যবসায়, বাণিজ্য, রাজনীতি এবং সাহিত্য সম্বন্ধে বাঙ্গালায় এখনও সম্পূর্ণ বাল্যাবস্থা। বাণিজ্য ব্যবসায়ে এবং রাজনীতিতে বাঙ্গালী উঠিয়া দাঁড়াইবার জন্য পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতেছে,—উদ্যমের পর উদ্যম ব্যর্থ হইতেছে, তথাপি বাঙ্গালী নিরাশ হইতেছে না, যত্ন ছাড়িতেছে না। এমন এক দিন অবশ্যই আসিবে, যে দিন বাণিজ্য এবং রাজনীতি-বিষয়ে বাঙ্গালার বাল্য-ভাব তিরোহিত হইবে। চরিত্রের দৃঢ়তা এবং ভাবের একতা এই দুই বিষয়ের প্রধান উপাদান; বাঙ্গালী যখন এই দুই উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিবে, তখন সে উঠিয়া দাঁড়াইবেই দাঁড়াইবে।

শিশু-বঙ্গ-সাহিত্যও উঠিয়া দাঁড়াইতে

চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না। শিশু যখন দাঁড়াইবার যত্নে বিফল-প্রয়াস হয়, তখন সে নানা উপায়ে সন্নিহিত লোকের মনোযোগ আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পায়,—কখন হাসে, কখন অর্থহীন ভাষায় কত কি বলে; কিন্তু তাহাতেও কৃতকার্য হইতে না পারিলে অবশেষে কাঁদিয়া সকলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে। বঙ্গ সাহিত্য ও মৌলিক এবং সাময়িক আকারে বঙ্গবাসীর চিত্ত আকর্ষণ করিবার চেষ্টা পাইয়াছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হয় নাই, তাই এখন কদর্য্য হাসি তামাসার ছাই ভস্ম লইয়া বঙ্গবাসীকে ডাকিতেছে। বলা বাহুল্য, সুরুচি সম্পন্ন শিক্ষিত বাঙ্গালীর চিত্তাকর্ষণ করিবার অমোঘ উপায় এ হাসি তামাসা নহে, সুতরাং বঙ্গসাহিত্যকে উপায়ান্তর গ্রহণ করিতে হইবে,—ক্রন্দনের রোলে বঙ্গবাসীর কর্ণ বধির করিতে হইবে। যাঁহারা "বঙ্গভাষার আশ্রয়-ভিক্ষা" পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা বুঝিয়াছেন, বঙ্গ-বাসীর চিত্তাকর্ষণের শেষ উপায়—মাতৃ-ভাষার ক্রন্দন আরম্ভ হইয়াছে।

অপোগণ্ড শিশু শিক্ষা-পরিচরও উঠিয়া দাঁড়াইতে চাহিতেছে, কিন্তু পারিতেছে না,—উপযুক্ত পথ্যাভাবে শিশুর অস্থি পুষ্ট ও দৃঢ় হইতেছে না। পরিচর নানা উপায়ে গ্রাহক মহোদয়দিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে চাহিতেছে, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতেছে না। যদি এখনও কেহ তাহার দুঃখের কথায় কর্ণপাত না করেন, তবে সে এমন ক্রন্দন আরম্ভ করিবে যে, কেহই আর তাহাকে উপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

পরিচর যে এক সময়ে উঠিয়া দাঁড়াইবার শক্তি পাইবে, আমরা নানা দিক্ হইতে সে আশা পাইতেছি। প্রকৃতি বলিতেছে, "ঐ দেখ মানবশিশু কত কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইতেছে, তাল নারিকেল প্রভৃতি বৃক্ষ কতকাল পরে ফল প্রসব করিতেছে; তবে তুমি নিরাশ হইবে কেন?" জগতের ইতিহাস বলিতেছে, "যত্নে সিদ্ধ হয় নাই, মানব-ব্যাপারে যদি এমন একটি দৃষ্টান্ত দেখাইতে পার, তাহা হইলে তোমাকে নিরাশ হইতে বলিব।" হৃদয় বলিতেছে, "যদি তোর সঙ্কল্পে পবিত্রতা এবং নিঃস্বার্থতা থাকে, তবে নিশ্চিন্ত হইয়া খাটিতে থাক্, একদিন উদ্দেশ্যের সফলতা দেখিয়া অবশ্যই কৃতার্থ হইবে।"

নূতন ও পুরাতন।

দেখিতে দেখিতে অতীতের অতল সলিলে চিরদিনের মত আর একটি বৎসর ডুবিয়া গেল। শুধু কি ডুবিয়া গেল—এক বৎসর ধরিয়া যাহা দেখিলাম, যাহা করিলাম, যাহা পাইলাম, যাহা হারাইলাম, সকলই অতীতের সঙ্গে মিশিয়া গেল, কেবল ইতিহাস পরবর্ত্তীয়ের জন্য তাহার অস্পষ্ট বিকৃত ছবিটী সঞ্চয় করিয়া রাখিল। বৎসর গেল—তাহার সঙ্গে কত সুখ, কত আশা ফুরাইল, কে বলিবে?

দেখিতে দেখিতে বৎসর ফুরাইল। মনে

হইতেছে যেন সে দিন নববর্ষ আসিয়াছিল, আর আজই তাড়াতাড়ি করিয়া তাহার সময় ফুরাইতে না ফুরাইতে সে চলিয়া গেল। কিন্তু এই এক বৎসরে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে—যে রাজা ছিল সে হয়ত এই এক বৎসরে পথের কাঙ্গাল হইয়াছে! সে হয়ত আজ পথে পথে ধূলিধূসরিত দেহযষ্টি লইয়া অনাথের মত দারুণ রৌদ্রে গৃহস্থের দ্বারে দ্বারে ফিরিয়া মুষ্টিভিক্ষার পরিবর্ত্তে শত লাঞ্ছনা সহিতেছে! যে পথের কাঙ্গাল ছিল, পৃথিবীর নরনারী যাহার ক্ষুধাক্লিষ্ট মলিন মুখের দিকে ভ্রমেও ফিরিয়া চাহিত না, আজ হয়ত সে ধনমানের উচ্চ সিংহাসনে বসিয়াছে, জগতের নরনারী তাহার একটু কৃপাকটাক্ষের প্রতীক্ষায় তাহার মুখপানে সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া রহিয়াছে!

যে বালক ছিল সে আজ যুবা হইয়াছে, আর ধূলাখেলার অবসর নাই, তথাপি তাহার প্রাণমন বুঝি এখনও বাল্যসঙ্গীদের ধূলাখেলার মহোৎসবের সঙ্গে নাচিতে চাহিতেছে, কিন্তু যৌবন তাহার চঞ্চলচরণে গাম্ভীর্য্যের কঠিনশৃঙ্খল পরাইয়া দিতেছে! যে যুবা ছিল, সে আজ মুখে স্বীকার না করিলেও মনে মনে বুঝিতেছে "তেহি নো দিবসা গতাঃ"—সে দিন আর বুঝি নাই! সেই উন্মত্ত পিপাসা, সেই অপরিতৃপ্ত আশা, সেই নিত্য আস্ফালন কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে, কেবল তাহার স্মৃতি মাত্র এক কোণে মলিন মুখ লুকাইয়া গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিয়া মরিতেছে! আর যে বৃদ্ধ ছিল—সে আজ কোথায়? সসাগরা ধরিত্রীর বিস্তৃত বক্ষ খুঁজিয়া সেই পলিতকেশ গলিত দেহ বুঝি আর চর্ম্মচক্ষে কখনও দেখিতে পাইব না! তাহার গৃহস্থের সংসার তেমনি উন্মত্ত কোলাহলে মগ্ন রহিয়াছে সকলে পড়িয়া আছে, কেবল যে যাইবার সেই চলিয়া গিয়াছে!

যে যায় সে আর ফিরেনা—তাই গত বর্ষ আর এ জগতে ফিরিবে না, তাহার নবীনত্ব ফুরাইয়াছে, সে আজ চিরদিনের জন্য পুরাতনের রাজ্যে চলিয়া গেল! এক দিন, দুই দিন, দশ দিন—তার পর নিতান্ত আত্মীয় ভিন্ন কে তাহার কথা মনে করিয়া রাখিবে? নূতন লইয়া জগৎ এত ব্যস্ত পুরাতনের কথা কে ভাবিবে? কত বর্ষ আসিয়াছে, কত বর্ষ চলিয়া গিয়াছে—কে সকল কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া পুরাতন লইয়া পড়িয়া থাকিতে চায়? হায়! হায়! যাহার জন্য কত যুদ্ধ যুঝিলাম, কত আস্ফালন করিলাম, ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতেই সে পুরাতন হইয়া গেল?

বৎসর গেল—কিন্তু আবারত বৎসর আসিল; পুরাতনের সিংহাসনে আবার ত নূতন বসিল, তবে আর দুঃখ কি? স্রোতঃ কখন ফুরায় না, এক যাইতে না যাইতে আর একটী আসিয়া অপেক্ষা করিতে থাকে। পুরাতন গেল, কিন্তু তাই বলিয়া নূতন আসিতে মুহূর্ত্তেরও বিলম্ব হইল কি? পুরাতন গেল—তার জন্য এক মুহূর্ত্তও প্রাণ খুলিয়া কাঁদিতে সময় পাইলাম না; নূতন আসিয়া হাসিতে হাসিতে দ্বারে আঘাত করিতেছে। ইহাই জগতের নিয়ম। রাত্রি ফুরাইতে না ফুরাইতে উষার আলোক আসিয়া দিনের সিংহাসন উজ্জ্বল ভূষণে সাজাইতে আরম্ভ করে, আবার দিন ভাল করিয়া শেষ হইতে না হইতে প্রদোষ আসিয়া রজনীর তিমিরাব-

গুণ্ঠনে পৃথিবীকে ঢাকিতে আরম্ভ করে। শৈশব না ফুরাইতে যৌবন কটাক্ষ করিতে থাকে। যৌবন না ফুরাইতে বার্দ্ধক্যের নিশাণহস্তে জরা আসিতে আরম্ভ করে—ভাল করিয়া পুরাতনের গলা ধরিয়া কাঁদিতেও দেয় না, সে যে কখন চক্ষের পলকে চির-দিনের মত বিদায় গ্রহণ করে, তাহা ভাবিয়াও বুঝিয়া উঠা ভার হয়। যাহার সঙ্গে এক বৎসর কাটাইলাম, যাহার সঙ্গে কত সুখ দুঃখের কথা কহিলাম, যাহার গলা ধরিয়া রোগে শোকে কাঁদিলাম, উৎসবে আনন্দে নাচিলাম—যাইবার সময়ে ভাল করিয়া এক-বার শেষ দেখাও করিতে পারিলাম না, ইহারই মধ্যে সে পুরাতন হইয়া গেল, আর আজ নববর্ষ উপস্থিত!

নব-বর্ষ! তোমাকে কি বলিয়া সমাদর করিব? আমার মুখে উৎসবের হাসি রেখা, অন্তরে ক্রন্দনের উচ্চরোল। তুমি যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিতে, আমি প্রাণ খুলিয়া কাঁদিয়া লইতাম! যে গেল তাহার জন্য কাঁদিব না—কাঁদিলে সে ত ফিরিবে না—আত্ম জীবনের জন্য কাঁদিব—ইহাতেও তোমার ঈর্ষ্যা!

তোমারই মত কত আশার সঙ্গীত গাহি-তে গাহিতে সে আসিয়াছিল, কিন্তু যে আশায় বুক বাঁধিয়া তাহাকে সমাদর করিয়া প্রাণের মধ্যে বসাইয়া ছিলাম; আজ হবে কাল হবে করিয়া যে আশাকে প্রাণে অতি সংগোপনে পুষিয়াছিলাম, আজ সে আশা কোথায়? কত বর্ষ আসিল, কত বর্ষ চলিয়া গেল—কিন্তু আমি যাহা ছিলাম তাহাই রহিলাম যে! সেই পুরাতন পাপ তাপ, সেই পুরাতন দুঃখ শোক, সেই পুরাতন পরাধীনতা আজও সঙ্গের সঙ্গী হইয়া রহিল যে! সকল পুরাতন অতীতে ডুবিয়া গেল, নূতন আসিয়া পুরা-তনকে তাড়াইয়া দিল, কিন্তু আমার পুরাতন জীবন এখনও পড়িয়া রহিয়াছে, এত সাধি-লাম, এত কাঁদিলাম, দুই হাত দিয়া প্রাণ-পণে এত ঠেলিলাম, সে পদমাত্রও সরিল না যে!

যে গিয়াছে তাহার জন্য কাঁদি না—যে যায় নাই তাহারই জন্য কাঁদিয়া মরিতেছি, না জানি কত কাল এমনই করিয়া কাঁদিতে হইবে। নববর্ষ কত সুখের স্বপ্ন দেখাইয়া-ছিল, কত আশার কাহিনী শুনাইয়াছিল, কত উৎসাহের অগ্নি জ্বালিয়াছিল, কত প্রীতির কুসুম ফুটাইয়াছিল—আজ সে সব কোথায়? সুখের স্বপ্ন ফলিল না, আশার কাহিনী সত্য হইল না, উৎসাহের আগুণ জ্বলিল না, প্রীতির কুসুম দুদিনেই ঝরিয়া পড়িল। আজ আবার তুমি নূতন সুরে সেই পুরাতন আশার সঙ্গীত গাহিতেছ, নূতন ইন্ধনে সেই পুরাতন উৎসাহের অগ্নি জ্বালিতে চাহিতেছ,—কিন্তু তুমি যদি এক মুহূর্ত্তের জন্য অপেক্ষা করিতে পারিতে, তাহা হইলে আমি একবার ভাবিয়া দেখিতাম, তুমি নূতন না পুরাতন!

তুমি পুরাতন—এত পুরাতন যে লোকে তাহা স্মরণ করিয়া রাখিতে পারে না, তাই তোমাকে বর্ষে বর্ষে নূতন বলিয়া আদর অভ্যর্থনা করে। তুমি নূতনের পরিচ্ছদ পরিয়া আসিয়াছ বটে, কিন্তু তোমার মধ্যে নূতনত্বের কিছুই নাই! তুমি যদি নূতন হইতে তোমার স্পর্শে আরও নূতন হইয়া যাইতাম—

পুরাতন জীবনের নিকট চিরবিদায় লইয়া নূতন জীবন লাভ করিতাম!

গত বর্ষে কি করিয়াছি? বড় আশা বড় উৎসাহের সঙ্গে নূতন বৎসরকে অভ্যর্থনা করিয়াছি, কিন্তু আশা পূরে নাই, উৎসাহ বাঁচেনাই; মনে করিয়াছিলাম পুরাতন অভ্যাস ছাড়িব, পুরাতন পাপ বিসর্জ্জন দিব, জগতের নরনারীর মুখের দিকে চাহিয়া সাধু-সঙ্গে মিলিয়া আমিও সাধু হইব—কিন্তু আমি যেমন ছিলাম তেমনই রহিয়াছি। অনেক সংকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহার একটীকেও প্রতিপালন করি নাই, আজ করিব কাল করিব বলিয়া বসিয়া থাকিতে থাকিতেই বৎসর চলিয়া গিয়াছে! নরনারীর সেবা করিব বলিয়া কত উৎসাহে শত সাধুসংকল্প করিয়াছিলাম, কিন্তু স্বার্থপরতায়, বিলাস বাসনায়, আলস্যের ঘোর নিদ্রায় সময় ফুরাইল, সেবা করিতে পারিলাম না। মনে করিয়াছিলাম প্রাণ মন ভগবানের চরণতলে সমর্পণ করিব কতবার মুখে মুখে সজনে বিজনে ভগবানের নাম লইয়া সেই কথা বলিয়াছি, কিন্তু আজ দেখিতেছি প্রাণের সামান্য ভগ্নাংশও তাঁহাকে প্রাণ ধরিয়া সাহস করিয়া দিতে পারি নাই। বুঝিলাম—আমার মুখের কথায়, মুখের সংকল্পে, মুখের সাধুতায় কিছু হয় নাই, হইবেও না। নব-বর্ষ! তুমি কি প্রাণের সংকল্প প্রাণের কথা, প্রাণের সাধুতা আনিতে পারিবে? আমি এমন ঠক, এমন প্রবঞ্চক, যে আমি জগৎকে ঠকাইতে পারি, সাধুতার আবরণ পরিয়া জগতকে ভুলাইতে পারি, কিন্তু তুমি কি আমাকে ঠকাইয়া, আমাকে ভুলাইয়া আমার পুরাতন কাড়িয়া লইতে পারিবে?

আমি পুরাতনকে এত ভালবাসি যে তাহার জন্য কাঁদিতে কাঁদিতে নূতনকে ভাল করিয়া সমাদর করা হয় না, নূতনকে ভাল করিয়া সম্ভোগ করিতে অবসর পাই না। আমি কেবল মৃতভাব লইয়া পড়িয়া রহিয়াছি, নূতনের জীবন্ত ভাব অনুভব করিতে পারি না। নববর্ষ! তুমি কি এই মৃতভাব ঘুচাইয়া জীবন্তভাবে আমার প্রাণ মন মাতাইতে পারিবে? দেখিতে দেখিতে আমিও পুরাতনের দলে পড়িতেছি সময় থাকিতে আমাকে নূতন জীবনে পূর্ণ করিয়া দেও।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

হার্বার্ট স্পেন্সার।

(পূর্ব্বানুস্মৃতি।)

তৃতীয় অধ্যায়ে নৈতিক শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বীয় মত পরিব্যক্ত করিয়াছেন। তিনি বলেন, বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীতে যাহা প্রধান দোষ, লোকে তাহাতে দৃষ্টিপাত করে না। শিক্ষার বিষয় এবং প্রণালী সম্বন্ধে উন্নতি হইতেছে বটে, কিন্তু যাহার প্রয়োজন

সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, তাহাকে লোকে অবহেলা করিতেছে। বালককে জীবনের কর্ত্তব্য পালনের জন্য প্রস্তুত করিতে হইবে বলিয়া অভিভাবক এবং শিক্ষক বুঝিয়াছেন, এবং তদনুসারে তাহাকে শিক্ষা দিবার যত্নও হইতেছে, ইহা সুখের বিষয়। প্রাচীন ভাষার পরিবর্ত্তে প্রচলিত ভাষার আদর বাড়িতেছে, ইহাই তাহার কারণ। অধিক পরিমাণে বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার প্রয়োজনও এই জন্যই অনুভূত হইতেছে। কিন্তু বালককে সামাজিকতা এবং নাগরিকতা শিক্ষা দিবার যেরূপ যত্ন হইতেছে, পিতৃ-কর্ত্তব্য শিক্ষা দিবার সেরূপ যত্ন হইতেছে না। বালককে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপযোগী বিষয় শিক্ষা দিবার যত্ন যদিও হইতেছে, কিন্তু তাহাকে সন্তান-পালন শিক্ষা দিবার প্রয়োজন উপলব্ধি হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বালককে ভদ্রলোক করিবার জন্য এবং বালিকাকে নিমন্ত্রনে যাইবার উপযোগী সাজ সজ্জা শিখাইবার জন্য বহুবৎসর ব্যয় করা হয় বটে, কিন্তু কেমন করিয়া পরিবার চালাইতে হইবে, সে গুরুতর বিষয়ের জন্য মুহূর্ত্তমাত্র সময়ও নষ্ট করা হয় না। ভারতীয় স্ত্রী-শিক্ষায় এ আক্ষেপ করিবার কথা এত দিন তেমন ছিল না বটে, কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা-প্রণালীর গুণে সে সুখের অবস্থা ক্রমে তিরোহিত হইতেছে। পরিবার-পালনের সম্ভাবনা অতি অল্প বলিয়া কি এরূপ অবহেলা? শতকরা নব্বই জনকেই পরিবারের ভার বহন করিতে হয়। তবে কি কাজটা বড়ই সহজ বলিয়া এরূপ তাচ্ছিল্য? তাহা নহে, বরং একাযটা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। [illegible] হয়ে কি তবে পিতৃ-মাতৃ কর্ত্তব্য শিক্ষা হইতে পারে? তাহাও নহে; এ বিষয়ে আত্ম-শিক্ষাদ্বারা অতি অল্প পরিমাণেই কৃতকার্য্য হওয়া যায়। পাঠ্যপুস্তকের যে তালিকায় শিক্ষা-কৌশল স্থান লাভ করে নাই, তাহাকে নির্দোষ বলা যায় না। কি পিতা মাতার সুখ-সন্তোষ, কি ভাবি বংশের দোষ-গুণ, যে দিকেই বিচার করা যাউক, সন্তানের শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক শিক্ষার প্রকৃত প্রণালী অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন। কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই এই বিষয় শিক্ষা হইলে তবে শিক্ষা সমাপন হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। সন্তান উৎপাদন করিবার শক্তি যেমন শারীরিক পরিণতির চিহ্ন, সেইরূপ সন্তান পালন করিবার শক্তি মানসিক পরিণতির চিহ্ন। শিক্ষা-তত্ত্ব এবং শিক্ষা-প্রয়োগের মধ্যে অপর সকল বিষয়ই নিহিত আছে, সুতরাং এই দুই বিষয়ের শিক্ষা যাহাতে চরমোৎকর্ষ লাভ করিতে পারে, তাহাই করা উচিত।

পিতামাতা যথোচিত রূপে প্রস্তুত না হওয়াতে সন্তান-পালন এবং সন্তানের নৈতিক শিক্ষার শোচনীয় অবস্থা ঘটিতেছে। হয় পিতা মাতা এ বিষয় কিছুই চিন্তা করেন না, না হয় এসম্বন্ধে তাঁহাদের মত নিতান্ত ভ্রান্ত। সন্তানের প্রতি জনক-জননীর ব্যবহার প্রায়ই খামখেয়ালী; কিরূপ ব্যবহারে সন্তানের মঙ্গল হইবে, সে বিষয় তাঁহাদের কোন নির্দ্দিষ্ট ধারণা নাই, যখন মনে যেরূপ ভাব হয় সেই রূপই ব্যবহার করেন, এবং মনের মেজাজের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহারেরও পরিবর্ত্তন হয়। যদি কেহ মেজাজ অনুসারে না চলিয়া সন্তান-পালনে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী

অবলম্বন করেন, তাহা হইলে সে প্রণালী হয় পুরাকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, না হয় বাল্য-স্মৃতির সঙ্গে জাগিতেছে, অথবা চাকর-চাকরাণীর নিকট শিক্ষা হইয়াছে,—মোট কথা, সে প্রণালী জ্ঞান হইতে জন্মে নাই, অজ্ঞান হইতেই জন্মিয়াছে। এসম্বন্ধে রিকৃটার বলেন;

"অধিকাংশ পিতা মাতা সন্তান-শিক্ষায় যেরূপ ক্রম অবলম্বন করিয়া থাকেন, তাহা একত্র গুছাইয়া লইলে প্রায় এইরূপ দাঁড়াইবে;—প্রথম ঘণ্টায় অমিশ্র নীতি শিখাইতে হইবে; দ্বিতীয় ঘণ্টায় মিশ্র নীতি, অর্থাৎ যাহাতে নিজের লাভ হইবে; তৃতীয় ঘণ্টার উপদেশ, 'তোমার পিতা কিরূপে চলেন তাহা কি দেখিতেছ না?' চতুর্থ ঘণ্টায়, 'তুমি ছেলে মানুষ, এটা তোমার উপযুক্ত নয়;' পঞ্চম ঘণ্টায়, 'মোট কথা এই, যে কোন রূপে হউক সংসারে উন্নতি করিয়া তোমাকে দেশের মধ্যে গণ্য মান্য হইতে হইবে;' ষষ্ঠ ঘণ্টায়, 'যাহা ক্ষণস্থায়ী, মানুষের পক্ষে তাহা কিছুই নহে, যাহা চিরস্থায়ী, তাহাই মানুষের সর্ব্বস্ব;' সপ্তম ঘণ্টায়, 'অতএব অন্যায় সহ্য করিয়াও দয়াবান্ হও;' অষ্টম ঘণ্টায়, 'কিন্তু কেহ তোমাকে আক্রমণ করিলে সাহসের সহিত আত্মরক্ষা কর;' নবম ঘণ্টায়, 'বাছা, এত গোলমাল করিও না;' দশম ঘণ্টায়, 'ছেলে মানুষের এত চোপ করিয়া বসিয়া থাকা ভাল নয়;' একাদশ ঘণ্টায়, 'পিতা মাতার আরও অধিক বাধ্য হও;' দ্বাদশ ঘণ্টায়, 'তুমি নিজে নিজে শিখ।' পিতা এইরূপ প্রতি ঘণ্টায় মত পরিবর্ত্তন করিয়া স্বমতের অসঙ্গতি এবং একদেশ-দর্শিতা গোপন করেন।"

মাতার অবস্থাও প্রায় তথৈবচ, তবে পিতার ন্যায় এতটা নহে। এই সকল বর্ণনার সঙ্গে ভারতের অবস্থা তুলনা করিলে বোধ হয় অশিক্ষিত পিতা মাতার অবস্থা সর্ব্বত্রই প্রায় একরূপ।

এ অবস্থার পরিবর্ত্তনে বহুকাল লাগিবে। শাসন-প্রণালীর ন্যায় শিক্ষা-প্রণালীও গঠিত হয় না, ইহা আপনা হইতে জন্মে; আর ইহার পরিবর্ত্তন এত মন্দ গতি যে অল্পদিনের মধ্যে তাহার কিছুই দৃষ্টি-গোচর হয় না। সকল প্রকার উন্নতিই মৃদু-গতি এবং উপায়-সাপেক্ষ; এই সকল উপায়ের আলোচনাই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য।

কাহারও মতে শিশু জন্মগ্রহণ করিয়াই সাধু হয়, কেবল সংসারের সংস্রব তাহাদিগকে নষ্ট করে। কেহ মনে করেন যত্নের সহিত শিক্ষা দিলেই শিশুকে দেবতা করিয়া তুলিতে পারা যায়। গ্রন্থকার এ দুই মতের কোনটাতেই সম্পূর্ণ আস্থাবান্ নহেন। তাঁহার মতে শিক্ষাদ্বারা প্রাকৃতিক দোষের খর্ব্বতা হইতে পারে, কিন্তু তাহার তিরোধান হইতে পারে না। সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর শিক্ষা-প্রণালী দ্বারা আদর্শ মানব-সমাজ গঠিত হইতে পারে,—একথা যতদূর সত্য, মানবজাতি চিরাগত কুসংস্কার ও ভ্রান্তিপূর্ণ আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিলে একদিনেই মানব-সমাজের সমস্ত দুর্দ্দশা দূর হইতে পারে, এ কথাও ততদূর সত্য; কিন্তু যাঁহারা ধীরভাবে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা ইহার কোনটাই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করেন না।

যাহা হউক, মানব-জাতির উন্নতি-সম্বন্ধে

যাহাদের আশা অতি প্রবল, আমাদের সহানুভূতি তাঁহাদিগের সঙ্গেই রহিয়াছে। অসাধারণ উৎসাহ সময়ে সময়ে উন্মত্ততায় পরিণত হইলেও তদ্দ্বারা সমাজের বিশেষ উপকার হয়। রাজনৈতিক আন্দোলনকারী নিজের অভিলষিত বিষয়কে নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া যদি বিশ্বাস না করিত, তাহা হইলে এত পরিশ্রম এবং এত স্বার্থ-ত্যাগ সে কখনও করিত না। অন্যান্য ব্যাপারে যেরূপ, লোক-হিতৈষাতেও সেইরূপ শ্রম-বিভাগের প্রয়োজন; যে যে বিভাগ গ্রহণ করিবে, সেই বিভাগের প্রয়োজনীয়তায় তাহার সমধিক বিশ্বাস থাকা প্রয়োজন। অতএব যাহারা বিশুদ্ধ শিক্ষা-প্রণালীকে মানব-দুর্দ্দশার একমাত্র মহৌষধ মনে করে, তাহাদিগের আশা একেবারে বিফল নহে; তাহাদিগের বিশ্বাস যে কিছুতেই টলেনা, বোধ হয় ইহাও প্রকৃতির একটি অতি হিতকর নিয়ম।

কিন্তু কোন প্রকার শাসন-নিয়ম দ্বারা সন্তানকে গঠন করা যদি সম্ভব হইত, এবং প্রত্যেক পিতামাতা যদি সে নিয়ম অবগত থাকিত, তাহা হইলে উদ্দেশ্য-সাধন দূর-পরাহত হইত। এরূপ সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নিয়ম পরিপালন করিতে যে বুদ্ধি, সাধুতা, এবং আত্ম-সংযমের প্রয়োজন, তাহা কাহারও নাই। গৃহে সন্তান শাসনের বিষয় বিচার করিতে যাইয়া যাঁহারা সকল দোষ সন্তানের ঘাড়েই চাপান, তাঁহারা ভ্রান্ত। যেমন প্রজা-শাসনে সেইরূপ সন্তান-শাসনেও লোকে মনে করিয়া লয় যে, শাসকদিগের সকলই গুণ, আর শাসিতদিগের সকলই দোষ। পিতামাতার প্রকৃতি যেরূপ, শিক্ষা-তত্ত্বের আলোচনা-সময়ে আমরা তাহার বিপরীত ভাব গ্রহণ করি। যে সকল লোকের সঙ্গে সর্ব্বদা আমাদিগের কথা কর্ম্ম এবং দেখা সাক্ষাৎ হয়, তাহাদের চরিত্রের অনেক ত্রুটি আমরা জানি। পরস্পর কুৎসা-কীর্ত্তনে, বন্ধু-বিচ্ছেদে, ব্যবসায়-সম্বন্ধীয় নানা রহস্যের উদ্ঘাটনে, মামলা মোকদ্দমার বিবরণে এবং পুলিস-মন্তব্যে আমরা প্রত্যহ মানবের অনুচিত স্বার্থ, প্রতারণা, এবং পশুত্ব দেখিতে পাই। তথাপি বালকের ব্যবহার বিচার করিতে যখন আমরা বসি, তখন এইসকল লোককেই আবার একেবারে নির্দ্দোষ বলিয়া ধরিয়া লই। কিন্তু বাস্তবিক সন্তানের দোষে গৃহে যে সকল বিশৃঙ্খলা ঘটিয়া থাকে, তাহার প্রকৃত মূল পিতামাতারই ত্রুটি। অবশ্য শিক্ষিত এবং আত্ম-সংযমী পাঠকদিগের পক্ষে একথা খাটিবেনা বলিয়াই আমরা আশা করি, কিন্তু যাহা বলা হইল, সাধারণ ইতর লোকের পক্ষে সে কথা ঠিক। সন্তান স্তন্যপান করিতেছেনা দেখিয়া যে মাতা তাহাকে প্রহার করে, কপাটের ফাঁসায় হাত আবদ্ধ হওয়াতে সন্তান কাঁদিতেছে দেখিয়া যে পিতা তাহার হাত ছাড়াইয়া না দিয়া বরং তাহাকে আরও প্রহার করিতে থাকে, তেমন মাতাপিতার শিক্ষা সম্বন্ধে তুমি কি বলিবে? যে বালক খেলাতে উরু ভগ্ন করিয়া গৃহে নীত হইলে পিতা মাতা তাহাকে প্রহার করিতে থাকেন, তাহার নৈতিক শিক্ষার কি আশা আছে? অবশ্য এরূপ পাশব দৃষ্টান্ত অতি অল্প, কিন্তু এরূপ আচরণ অনেক পরিবারেই প্রত্যহ ঘটিতেছে। শারীরিক অসুস্থতা নিবন্ধন

সন্তান চঞ্চল-চিত্ততা প্রকাশ করিলে পিতা-মাতা এবং ধাত্রী যে তাহাকে পুনঃ পুনঃ চড় চাপড় মারেন, ইহাকে না দেখিতে পায়? শিশুটি হটাৎ পড়িয়া কাঁদিতে থাকিলে মাতা তাহাকে যে ভাবে তুলিয়া ভর্ৎসনা করেন, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া বালকের ভবিষ্যৎ শান্তির আশায় কে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? বালকের চঞ্চলতা দেখিলে পিতা যে রুক্ষস্বরে তাহাকে শান্ত হইতে বলেন, সে স্বরে সহানুভূতির সম্পূর্ণ অভাব। স্বভাব-চঞ্চল বালককে যে নিষ্কারণে স্থির-ভাবে থাকিতে বলা হয়, অথবা গাড়িতে চলিবার সময়ে বাহিরে দৃষ্টিপাত করিতে যে নিষেধ করা হয়, তাহা কি ঘোর নৃশংসতা নহে? প্রকৃত কথা এই যে, সন্তান এবং অভিভাবক উভয় পক্ষের প্রকৃতি-গত দোষই নীতি-শিক্ষার অন্তরায়। বিজ্ঞান-বেত্তাদিগের অবধারিত কুল-ক্রমের নিয়ম যদি সত্য হয়, তাহা হইলে পিতামাতার দোষ সন্তানে প্রতিফলিত হয়, একথা স্বীকার করিতে হইবে। সন্তানে যে দোষ দৃষ্ট হয়, পিতামাতায় সে দোষ অবশ্যই আছে, তবে সাধারণের চক্ষে তাহা না পড়িতে পারে, অথবা অন্য গুণ দ্বারা তাহা আবৃত থাকিতে পারে। সুতরাং সন্তানের শাসন এবং পালন সম্বন্ধে সর্ব্বজন-সম্মত কোন প্রণালী উদ্ভাবিত হইতে পারে না, কারণ সে প্রণালী মত কার্য্য করিতে পারেন, পিতামাতা এমন নির্দ্দোষ নহেন।

যদি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর কোন প্রণালী বর্ত্তমান থাকিত, আর পিতা মাতা তদনুরূপ কার্য্য করিতে সম্যক উপযুক্ত হইতেন, তাহা হইলেও তদনুসারে পারিবারিক সংস্কার সাধন করা উচিত হইত কি না, সে বিষয়ে সন্দেহ। এস্থলে আমাদিগের উদ্দেশ্য কি? সন্তান যাহাই শিক্ষা করুক না কেন, সে সদাচার সম্পন্ন হইবে এবং অনায়াসে সংসার-পথে চলিতে পারিবে, ইহাই কি প্রধান উদ্দেশ্য নহে? সংসার-পথে চলার অর্থ বিপুল ধন উপার্জ্জন করা নহে, কিন্তু পরিবার প্রতিপালনে সক্ষম হওয়া। এরূপ হইতে হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী হইতে হইবে। সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন প্রকার শিক্ষা দ্বারা এক জন আদর্শ মনুষ্য গঠন করিতে পারিলে সে কি এ সমাজে থাকিতে পারিত? বরং তাহার সুতীক্ষ্ন ন্যায়-পরতা এবং উন্নত আচার কি তাহার জীবনকে ভারবহ করিয়া তুলিত না? ব্যষ্টিভাবে এ শিক্ষা যতই উপকারী হউক, সমষ্টি ভাবে দেখিতে গেলে বরং ইহার ফল কি বিপরীত হইত না? রাজ্য-শাসন এবং পরিবার-শাসন উভয় স্থানেই দেখা যায়, যে বিধান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক লোককে স্পর্শ করে, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপযোগী হয়। উভয়স্থলেই শাসিতদিগের চরিত্র অনুসারে শাসন ভাল বা মন্দন হয়। উভয়স্থলেই অধিকাংশ শাসিতের অবস্থা উন্নত হইলে শাসন-নীতির অবস্থাও সেই পরিমাণে উন্নত হয়; লোকের নৈতিক অবস্থা উন্নত না করিয়া শাসন-নীতি উন্নত করা যদি সম্ভব হইত, তাহা হইলে মঙ্গলের পরিবর্ত্তে অমঙ্গলই ঘটিত। সন্তানের প্রতি পিতামাতা এবং শিক্ষকের বর্ত্তমান নির্দ্দয় ব্যবহার তাহাকে অধিকতর নির্দ্দয় সংসারের জন্য প্রস্তুত করিতেছে। ইহা বলা যাইতে পারে যে, পিতামাতা এবং

শিক্ষক যদি বালকের প্রতি সম্পূর্ণ সদয় ব্যবহার করেন, তাহা হইলে স্বার্থান্ধ সংসারে তাহাদিগের কষ্টের সীমা থাকিবে না।

কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যদি কোন প্রকার শিক্ষাতেই বালককে মনের মত ভাল করা না যায়, যদি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর প্রণালী আবিষ্কৃত হইলেও পিতামাতার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা কার্য্যকরী না হয়, যদি ঐরূপ প্রণালী কার্য্যে পরিণত হইলে সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় শুভের পরিবর্ত্তে অশুভই উৎপাদন করে, তাহা হইলে বর্ত্তমান প্রণালীর সংশোধন কি সঙ্গত? অবশ্য সঙ্গত। প্রাগুক্ত কথাগুলির ভাব এই যে, অন্যান্য সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে পরিবারে শিক্ষার সংস্কার করিতে হইবে; শিক্ষা-প্রণালী অল্পে অল্পে উন্নত করিতে হইবে, একদিনে ইহা অসম্ভব, মানব-সমাজের বর্ত্তমান অবস্থা,—অর্থাৎ সন্তান, পিতামাতা, এবং সমাজের যে সকল দোষ বর্ত্তমান রহিয়াছে, তাহা মানব-হৃদয়ের পবিত্র আকাঙ্ক্ষাগুলিকে সফল হইতে দেয় না; জন-সাধারণের চরিত্র যে পরিমাণে উন্নত হইবে, এই সকল আকাঙ্ক্ষাও সেই পরিমাণে পূর্ণ হইতে থাকিবে।

আবার এস্থলে প্রশ্ন হইতে পারে, "তাহা হইলে পারিবারিক শিক্ষার কোনরূপ প্রণালী উদ্ভাবন বিড়ম্বনা মাত্র। যাহা সময়ের উপযোগী নহে, এমন প্রণালীর উদ্ভাবন ও সমর্থনে কোন ফল নাই।" আমাদের মত ইহার বিপরীত। কি রাজ্য-শাসনে কি পারিবারিক শাসনে, সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ প্রণালী বর্ত্তমান অবস্থায় যদিও কার্য্যে পরিণত হইতে পারে না, তথাপি বিশুদ্ধ আদর্শ স্থির করিয়া চলাই আমাদিগের উচিত, নতুবা বিপথ গামী হইবার সম্ভাবনা। এরূপ আদর্শের অনুবর্ত্তনে অনিষ্টের কোন আশঙ্কা নাই। মানুষের স্থিতি শীলতা এতই প্রবল যে, অতি সত্বর কোন পরিবর্ত্তন করিতে সে নিতান্ত নারাজ। প্রকৃতির নিয়ম এই যে, মানুষ নিজে উন্নত না হইলে সে কোন উন্নত মতে বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারে না;—হয়ত মুখে বলে বিশ্বাস করে, কিন্তু কাযে তাহা পারে না। এমন কি, কোন মত স্থাপিত হইয়া গেলেও তাহার অনুবর্ত্তনে এত অন্তরায় রহিয়া যায় যে লোক-হিতৈষী পণ্ডিতদিগের তাহাতে ধৈর্য্য থাকে না। অতএব বালকদিগের নীতি-শিক্ষার পথে এতই অন্তরায় রহিয়াছে যে, যত্ন করিলেও তাহা অসঙ্গতরূপে সফল হইবে না, এ বিষয়ে আমরা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি।

এখন দেখা যাউক, নৈতিক শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য এবং প্রকৃষ্ট প্রণালী কি।

যখন বালক আছাড় খাইয়া পড়ে, অথবা যখন গৃহস্থিত কোন পদার্থের সঙ্গে তাহার ঢোঁস লাগে, তখন সে কষ্ট পাইয়া সতর্ক হয়; পুনঃ পুনঃ এইরূপ ঘটিলে তাহার সতর্ক হইয়া চলিবার অভ্যাস হইয়া যায়। একবার আগুনে হাত পোড়াইলে চির দিন তাহা বালকের মনে থাকিয়া যায়, তাহাকে বিশেষ প্রলোভন দেখাইলেও আর কখনও সে তেমন কায করিতে চায় না।

উপরিউক্ত দৃষ্টান্তে প্রকৃতি-দত্ত নীতি-শিক্ষার বিশদ নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে। প্রথমতঃ দেখ, শারীরিক আঘাত এবং তজ্জনিত যন্ত্রণা কুকার্য্যের কুফল-জ্ঞাপক সহজে

বুঝাইয়া দিতেছে। সৎকর্ম্ম এবং অসৎকর্ম্ম বলিতে যদিও সাধারণতঃ শারীরিক সুখ দুঃখের কার্য্যকে বুঝায় না, তথাপি প্রণিধান করিয়া দেখিলে উপলব্ধি হইবে যে, এই সকল কার্য্যও হয় সৎ কর্ম্ম না হয় অসৎ কর্ম্মের অন্তর্নিবিষ্ট। মুখ্য ভাবে হউক আর গৌণ ভাবেই হউক, যাহার ফল-সমষ্টি মঙ্গল-জনক তাহাই সৎকর্ম্ম, আর যাহার ফল-সমষ্টি অমঙ্গল জনক তাহাই অসৎ কর্ম্ম। পরিণামে সুখ কি দুঃখ ঘটিবে, ইহা বিবেচনা করিয়াই লোকে কোন কার্য্যকে সৎ বা অসৎ বলিয়া থাকে। আমরা মদ্যপানকে অসৎ কর্ম্ম বলি কারণ তদ্দারা মদ্যপায়ী এবং তাহার পরিবারের শারীরিক এবং নৈতিক অনিষ্ট হয়। তস্করতায় যদি তস্কর এবং গৃহস্থ উভয়েই সুখী হইত, তাহা হইলে ইহা পাপ বলিয়া গণ্য হইত না। পরোপকারে যদি জগতের অনিষ্ট হইত, তাহা হইলে কেহ পরোপকারের প্রশংসা করিত না। শাসন-বিধান, রাজনৈতিক আন্দোলন, সাধারণের হিতকর কার্য্যানুষ্ঠান, এ সমস্তই সাধারণের ভাবী সুখ বা দুঃখ বিবেচনায় সৎ বা অসৎ বলিয়া অভিহিত হয়। এইরূপে সকল দিক বিবেচনা করিয়া সুখ এবং দুঃখকেই যদি আমরা সৎ এবং অসৎ কর্ম্মের পরিমাপক বলিয়া বুঝিতে পারি, তাহা হইলে যে সকল কর্ম্মে শারীরিক সুখ এবং দুঃখ ঘটে, সে সকল কর্ম্মকে সৎ কর্ম্ম এবং অসৎ কর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত করিতে আমরা কুণ্ঠিত হইব না।

গ্রন্থকার একজন প্রসিদ্ধ হিতবাদী, সুতরাং এস্থলে তাঁহার সেই মতের ছায়া পড়িতেছে। নৈষ্কাম-বাদ এবং হিত-বাদের প্রভেদ অনেক; যে সুখ হিত-বাদের মুখ্য উদ্দেশ্য, তাহা নৈষ্কাম-বাদের একটি অবশ্যম্ভাবী ফল মাত্র। যাহা হউক, নৈষ্কাম-বাদ এতই উচ্চ যে, তাহা সাধারণের বোধাতীত, সুতরাং শিক্ষার প্রথমাবস্থায় হিত-বাদের উপদেশ গ্রহণ করিলে বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা নাই—শাখাকে অবলম্বন করিলে পরিণামে বৃক্ষের মূল-দেশে উপনীত হওয়া যাইতে পারে।

তারপরে দেখ, যে সকল শাস্তিতে শারীরিক অনিষ্ট নিবারিত হইতে পারে, তাহাদের প্রকৃতি কিরূপ। অন্য কোন ভাল কথা নাই বলিয়া আমরা এসকলকে শাস্তি বলিয়া থাকি, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে এসকল শাস্তি নহে; শারীরিক অনিষ্ট-নিবারণের জন্য যদি এসকল শাস্তি বা অন্তরায় না থাকিত, তাহা হইলে নিয়ত শারীরিক অনিষ্ট ভোগ করিয়া শীঘ্রই জীবন বিনষ্ট হইত। আমরা যাহাকে শাস্তি বলিতেছি, তাহা শারীরিক অনিষ্ট-কর কার্য্যের অনিবার্য্য ফল।

অনিষ্টকর কার্য্যের সঙ্গে এই শাস্তির অনুপাত তুল্য। সামান্য নিয়ম লঙ্ঘন কর, সামান্য শাস্তি পাইবে; গুরুতর নিয়ম লঙ্ঘন কর, গুরুতর শাস্তি পাইবে। বালক একবার আছাড় খাইয়া পড়িলে ভবিষ্যতে যাহাতে সাবধান হইতে পারে কেবল সেই পরিমাণ কষ্টই পায়, তদপেক্ষা গুরুতর কষ্ট পায় না। এই সকল অভিজ্ঞতা লাভ করিতে করিতে বালক ভুল ভ্রান্তি পরিহার করিয়া সম্যক্ ব্যবহারে অভ্যস্ত হয়।

আবার বিবেচনা করিয়া দেখ, কুকার্য্যজনিত কষ্ট অনিবার্য্য, বালক কোনরূপে তাহা পরিহার করিতে পারে না। ইহাতে

কোনরূপ ভয়-প্রদর্শন নাই, নীরবে অথচ দৃঢ়তার সহিত প্রকৃতি এই শাস্তি প্রদান করিয়া থাকে। বালকের হাতে একটি পিন বিদ্ধ হইলে বালক যন্ত্রণা পায়; আবার পিন বিদ্ধ হউক, আবার সে যন্ত্রণা পাইবে। বালক দেখিতে পায় যে, জড় প্রকৃতিতে যে কোন নিয়ম লঙ্ঘন করিলেই শাস্তি আছে, কাকুতি মিনতিতে নিষ্কৃতি নাই; প্রকৃতির হাতে এই শিক্ষা করিয়া বালক প্রাকৃতিক নিয়ম-লঙ্ঘন হইতে নিরস্ত হয়।

এই সকল কথা বালকের পক্ষে যেমন, পরিণত বয়স্কের পক্ষেও সেইরূপ সত্য। দুষ্কার্য্যের অনিবার্য্য ফল-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা জন্মে বলিয়াই নর-নারী দুষ্কর্ম্ম হইতে বিরত থাকে। পরিণত বয়সে যখন পিতামাতা এবং শিক্ষকের শাসন বর্ত্তমান থাকে না, তখন প্রকৃতি তাহাকে আত্ম-পরিচালনে শিক্ষা দেয়। যুবক ব্যবসায়ে বা চাকুরীতে প্রবেশ করিয়া যদি স্বকর্ত্তব্য পালনে আলস্য বা ঔদাসীন্য প্রকাশ করে, তাহা হইলে হাতে হাতে তাহার ফল পায়,—পদচ্যুত হইয়া কিছু দিন দরিদ্রতা ভোগ করে। যথা-সময়ে কায করিবার অভ্যাস যাহার নাই, তাহাকে নানাবিধ অসুবিধা এবং ক্ষতি ভোগ করিতে হয়। দোকান-দার অসঙ্গত মূল্য চাহিলে ক্রেতার সংখ্যা কমিয়া যাইবে ভয়ে অর্থ লোভ সংবরণ করে। সাধারণের আগ্রহ কমিতে দেখিলে চিকিৎসক রোগীদিগকে অধিক যত্নের সহিত দেখিতে থাকে। অনভিজ্ঞ মহাজন এবং ব্যবসায়ী পুনঃ পুনঃ ঠকিয়া লোকের সঙ্গে ব্যবহারে সাবধানতা শিক্ষা [illegible] সকলের জীবনেই এইরূপ ঘটে। বালক একবার পুড়িলে আগুনকে ভয় করে, একথা প্রাকৃতিক এবং সামাজিক শিক্ষাতে যেমন খাটে, সেইরূপ ইহার উপাদেয়তা-সম্বন্ধে আমাদের অচল বিশ্বাসও রহিয়াছে। অনেকে স্পষ্টই বলিয়া থাকেন যে, সদুপদেশ শুনিয়া যে সকল কদভ্যাস ছাড়িতে পারেন নাই, প্রকৃতির শিক্ষায় সে সকল কদভ্যাসের ফল ভোগ করিয়া তাহা ছাড়িতে পারিয়াছেন। প্রাকৃতিক প্রণালী যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, মনুষ্যের উদ্ভাবিত কোন প্রণালীই যে তাহার স্থান পূরণ করিতে পারে না, মানব-কল্পিত নানাপ্রকার দণ্ড-নীতির বিফলতাই তাহার প্রমাণ। এপর্য্যন্ত যে সকল দণ্ড-নীতি উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহার কোনটিই আশানুরূপ ফল প্রসব করিতে পারে নাই। কৃত্রিম শাস্তি অপরাধীকে সুংশোধন করিতে পারে নাই, বরং তাহাতে অপরাধের বৃদ্ধিই হইয়াছে। যে সকল সংশোধনাগারে প্রাকৃতিক নিয়ম যথাসাধ্য অনুবর্ত্তিত হয়, যেখানে অপরাধী আপন অপরাধের অনিবার্য্য ফল ভিন্ন অন্য কোন ফল ভোগ করে না, যে পরিমাণ অধীনতা না থাকিলে সমাজের অনিষ্ট হইতে পারে কেবল সেই পরিমাণ অধীনতায় যেখানে অপরাধীকে বাধ্য করা হয়, এবং যেখানে এইরূপ অধীনতায় থাকিয়া আপন জীবিকার জন্য অপরাধীকে খাটিতে হয়, কেবল সেই সকল সংশোধনাগারেই কথঞ্চিৎ ফল পাওয়া গিয়াছে। অতএব দেখা যাইতেছে, বালক যে প্রাকৃতিক শিক্ষায় জ্ঞান লাভ করিতেছে, পরিণত বয়স্কেরাও তাহাতেই সংযত এবং কথঞ্চিৎ উন্নত হইতেছে। ঈশ্বরের উদ্ভাবিত এই প্রাকৃতিক

দণ্ড-নীতি হইতে মানবের উদ্ভাবিত দণ্ড-নীতির পার্থক্য যত অধিক, ফল-লাভ তত অল্প হয়, আর পার্থক্য যত অল্প, ফল-লাভ তত অধিক হইয়া থাকে।

অতএব নীতি শিক্ষার প্রকৃত উপায় কি, তাহা জানাগেল। বালক এবং পরিণত বয়স্কের পক্ষে যাহা উপযোগী এবং হিত-কর, যুবকের পক্ষে তাহা অনুপযোগী এবং অনিষ্ট-কর হইতে পারে না। বালকেরা যাহাতে আপন আপন কার্য্যের ফল লাভ করিয়া অভিজ্ঞ হইতে পারে, পিতামাতার তাহা হইতে দেওয়া উচিত; যে কার্য্যের যে ফল, তাহাতে বাধা দেওয়া অথবা তাহাকে গুরুতর করা, কিম্বা প্রাকৃতিক শাস্তির পরিবর্ত্তে কৃত্রিম শাস্তি বিধান করা পিতামাতার কর্ত্তব্য নহে।

অনেকে বলিবেন, সন্তানের অপরাধ দেখিলেই পিতামাতা বাক্যে বা কার্য্যে কঠোর ভাবে তাহাকে শাসন করেন, সুতরাং সে দণ্ড শারীরিক হউক আর নৈতিক হউক, আপন কার্য্যের অনিবার্য্য ফল মনে করিয়াই সন্তান তাহা গ্রহণ করে। সন্তানের অপরাধে পিতামাতার অসন্তোষ হয়, এবং এই অসন্তোষ প্রকাশ করিলে বালকের চরিত্র সংশোধিত হয়, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। ক্রুদ্ধ পিতামাতার ধমক, গালাগালি, এবং প্রহার যে সন্তানের অপরাধের ফল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অসংযত পিতামাতার দুর্দ্দমনীয় সন্তানকে এইরূপে শাসন করা আমরা অন্যায় মনে করি না; যে সমাজের এইরূপ অসংযত পিতামাতার সংখ্যাই অধিক, সেই সমাজে সন্তান-শিক্ষায় এইপ্রকার কঠোরতা নিতান্ত সঙ্গত। অন্যান্য প্রণালীর ন্যায় শিক্ষা-প্রণালীও সামাজিক-চরিত্র-নিরপেক্ষ হইয়া উন্নত হইতে পারেনা। অসভ্য পিতামাতার অসভ্য সন্তানেরা কেবল অসভ্য ব্যবহারেই শাসিত হয়, আবার যে অসভ্য সমাজে তাহাদিগকে থাকিতে হইবে, পিতামাতার এই অসভ্য ব্যবহারই তাহাদিগকে সেই সমাজের উপযুক্ত করিয়া তুলে। এদিকে সভ্য সমাজের সভ্য পিতামাতা সন্তানের অপরাধে মৃদুতার সহিত নিজের অসন্তোষ প্রকাশ করেন, এবং সন্তানের শাসন-পক্ষে তাহাই যথেষ্ট বলিয়া উপলব্ধি হয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে, পিতামাতার অসন্তোষ-প্রকাশে এবং সন্তানের শাসনে প্রকৃতির নিয়মই অনুবর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এখন দুইটী কথা বিচার করিয়া দেখা যাউক। প্রথম কথা এই যে, বর্ত্তমান সময় পরিবর্ত্তন শীল, এখন পুরাতনের সঙ্গে নূতনের যুদ্ধ চলিতেছে, সুতরাং প্রচলিত শিক্ষা-প্রণালী সময়ের উপযোগী থাকিয়া যাইবে, এমন সম্ভাবনা নাই। প্রচলিত প্রণালীর অনুবর্ত্তী হইয়া অনেক পিতা মাতা সন্তানকে কঠোর ভাবে শাসন করিতে কষ্ট বোধ করেন, আবার অনেকে আধুনিক প্রণালীর সফলতায় অসঙ্গত নির্ভর করিয়া সন্তানের শাসন একেবারে ছাড়িয়া দেন। আর এক কথা এই যে, পিতা মাতার সন্তোষ বা অসন্তোষ শাসনের উদ্দেশ্য নহে, কোন কার্য্যের কি ফল তাহা বালকের হৃদয়ঙ্গম করাই শাসনের উদ্দেশ্য। পিতা মাতা প্রকৃতির স্থান অধিকার করিয়া সন্তানকে শাসন করিলে তাহাদের প্রকৃত শিক্ষা হয় না, প্রকৃত শিক্ষা কেবল প্রকৃতিরই হাতে।

বালক-বালিকা-কর্ত্তৃক বিশৃঙ্খলা ঘরেই ঘটিয়া থাকে। কোন বালক খেলনা, কেহ ফুল, কেহ বা পুতুলগুলি ঘরময় ছিটাইয়া রাখে। এই সকল বিশৃঙ্খলা যাহাদ্বারা সংশোধিত হওয়া উচিত, প্রায়ই তাহার ঘাড়ে সে ভার পড়ে না, ধাত্রী বা দাস দাসী সে গুলি গুছাইয়া তুলে, বিশৃঙ্খলাকারীকে বড় জোর দুইটা কটু কথা শুনিতে হয়। অনেক সুবোধ পিতা মাতা এই সামান্য কার্য্যেও প্রাকৃতিক প্রণালী অবলম্বন করেন,—যে খেলনাগুলি ছিটাইয়া ফেলিয়াছে, তাহা আবার গুছাইতে তাহাকেই বাধ্য করেন। বিশৃঙ্খলা-সংঘটনে যে অপরাধ হয়, পুনরায় পরিশ্রম করিয়া শৃঙ্খলা স্থাপন করাই তাহার প্রকৃত শাস্তি। প্রত্যেক দোকানী এবং প্রত্যেক গৃহিনী এবিষয় প্রত্যহ প্রত্যক্ষ করেন। সাংসারিক কার্য্যের জন্য প্রস্তুত হওয়া যদি শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে বালকদিগেরও প্রথম হইতেই এবিষয়ে অভিজ্ঞতা হওয়া উচিত। যেখানে নৈতিক শাসনে দোষ আছে, সেখানে অপরাধী বালক ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত খেলনা গুলি গুছাইতে অসম্মত হইতে পারে; যদি এরূপ হয়, তবে তাহাকে এই অবাধ্যতার অবশ্যম্ভাবী ফল বুঝিতে দেওয়া কর্ত্তব্য। সে যখন জিনিসগুলি ছিটাইয়া আবার তাহা গুটাইতে নারাজ, তখন ভবিষ্যতে যাহাতে ঐরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া খেলনাগুলি গুছাইবার ভার অন্যের ঘাড়ে চাপাইতে না পারে, এরূপ উপায় অবলম্বন করা উচিত। বালক যখন আবার যাইয়া মাতার নিকট খেলনা চাহিবে, তখন মাতার বলা উচিত, "সে দিন তুমি খেলনাগুলি ছিটাইয়া রাখিয়াছিলে, তোমার দিদি পরে তাহা গুছায়; আজ সে কাযে আছে, আমারও অবসর নাই। তুমি যখন খেলা শেষ হইলে খেলনা গুলি যত্ন করিয়া গুছাইয়া রাখ না, তখন আর তোমাকে খেলনা দিতে পারি না।" ইহাই প্রাকৃতিক শাসন—যেমন অপরাধ তেমন শাস্তি, একটুকু গুরুতর নহে, একটুকু লঘুতর নহে। শাস্তিটি আবার এমনই উপযুক্ত সময়ে হয় যে, বালকের হৃদয়ে তাহা বিলক্ষণরূপে বসিয়া যায়। খেলিবার অত্যন্ত ইচ্ছা হইয়াছে, এমন সময়ে তাহাতে বাধা পড়িল, হৃদয় একটী আঘাত পাইল; এই প্রথা পুনঃ পুনঃ অনুষ্ঠিত হইলে বালকের দোষ অনায়াসে সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে। এস্থলে বালকের আর একটি বহুমূল্য অভিজ্ঞতা জন্মে—সে বুঝিতে পারে যে, এসংসারে পরিশ্রম করিলেই প্রকৃত সুখ লাভ হইতে পারে।

মনে কর একটি বালক প্রাত্যহিক ভ্রমণের জন্য একদিনও সময় মত প্রস্তুত হয় না। যে পর্য্যন্ত সকলে প্রস্তুত না হইয়াছে, সে পর্য্যন্ত তাহার কোন উদ্‌যোগ নাই। সকলে প্রস্তুত হইয়া অপেক্ষা করিতেছে, মাতা হয় ত ভর্ৎসনা করিতেছেন। এরূপ শাসনে বালকের দোষ সংশোধন হইতেছে না, তথাপি জননী প্রাকৃতিক নিয়ম অবলম্বন করিতেছেন না, অন্যে তাহা বলিয়া দিলেও তিনি সে কথা শুনিতেছেন না। সময় মত প্রস্তুত হইবার অভ্যাস না থাকিলে সংসারে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হয়;—একটুকু পাছে পড়িলে হয়ত গাড়ি কি নৌকা

খানা ছাড়িয়া গেল, বাজারের ভাল জিনিসগুলি ফুরাইয়া গেল, সভা-মণ্ডপের ভাল আসনগুলি অধিকৃত হইয়া গেল। এইরূপ ক্ষতির সম্ভাবনা থাকাতেই লোকে পাছে পড়িতে চায় না। প্রস্তুত হইতে বিলম্ব হইলে যে সকলে চলিয়া যাইবে, বালক বেড়াইয়া সুখী হইতে পারিবে না, তাহার এ বোধ জন্মিতে দেওয়া উচিত। দুই একদিন যখন সে দেখিবে অন্য বালকেরা বেড়াইতে যাইয়া আমোদ করিতেছে, কিন্তু সে সময় মত প্রস্তুত হইতে পারে না বলিয়া সে আমোদ ভোগ করিতে পাইতেছে না, তখন সম্ভবতঃ সে তাহার নিজের দোষ সংশোধন করিবে। অন্ততঃ এ কথা বলা যাইতে পারে যে, গালি কটূক্তি অপেক্ষা এই প্রাকৃতিক প্রণালীতে দোষ সংশোধনের সম্ভাবনা অধিক।

বালক-বালিকাকে কোন দ্রব্য দিলে যদি তাহারা অসতর্ক হইয়া ঐ দ্রব্য হারায় বা নষ্ট করে, তবে প্রাকৃতিক প্রণালীতে তাহাদিগকে শাসন করা উচিত। কোন দ্রব্য নষ্ট হইলে তাহার অভাবে কষ্ট হয়, সেই দ্রব্য আবার পাইতে গেলে পয়সা লাগে, এই কথা মনে করিয়াই পরিণত বয়স্ক লোকেরা কোন দ্রব্য নষ্ট করে না; বালকদিগের অভিজ্ঞতাও এই প্রণালীর হওয়া উচিত। অতি শৈশবে শিশু যখন জিনিস পত্র টানিয়া ছিড়িয়া কামড়াইয়া তাহার গুণাগুণ পরীক্ষা করে, তখনকার কথা বলিতেছিনা, তখন অসতর্কতার কুফল বুঝিতে শিশু অসমর্থ; কিন্তু যখন জিনিসের লাভ ক্ষতি বালক বুঝিতে পারে, তখন এই প্রণালী অবলম্বনীয়। বালক যখন ছুরিকা ব্যবহারের উপযুক্ত হয়, তখন অসতর্ক হইয়া একখানি ছুরী হারাইয়া অথবা ভাঙ্গিয়া ফেলিলে নির্ব্বোধ পিতামাতা তখনই তাহাকে আর একখানি ছুরী কিনিয়া দেন, এই সুযোগে যে তাহার সতর্কতার মূল্য বেশ শিক্ষা হইয়া যাইত, একথা তাঁহারা বুঝেন না। এরূপ ঘটিলে পিতা অনায়াসেই সন্তানকে বুঝিয়াইয়া দিতে পারিতেন, যে, ছুরী কিনিতে পয়সা লাগে, এবং পয়সা উপার্জ্জন করিতে পরিশ্রম লাগে; সুতরাং যে যত্ন করিয়া পয়সার জিনিস রাখিতে জানেনা, তাহকে পয়সার জিনিস দিতে তিনি প্রস্তুত নহেন; যে পর্য্যন্ত সে সাবধানতার সন্তোষ জনক পরিচয় না দিবে, সে পর্যন্ত উহা আর পাইবে না।

এইরূপে দেখা যাইবে, প্রাকৃতিক প্রণালী কৃত্রিম প্রচলিত প্রণালী অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়েই শ্রেষ্ঠ। প্রথমতঃ ইহাতে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ-জ্ঞান জন্মে, এবং ভূয়োদর্শন দ্বারা তাহা দৃঢ়ীভূত হয়। ভাল কার্য্যের ভাল ফল এবং মন্দ কার্য্যের মন্দ ফল, এ কথা কেবল পরের মুখে না শুনিয়া যদি আত্মজীবনের ঘটনা দ্বারা উপলব্ধি হয়, তবেই তদ্দ্বারা লোকে নিজের আচরণ সংযত করিতে পারে। যে বালক খেলার জিনিস ছিটাইয়া ফেলিলে তাহা আবার গুছাইতে বাধ্য হয়, উচিতসময়ে প্রস্তুত হইতে পারে না বলিয়া বেড়াইবার সুখ হইতে বঞ্চিত হয়, অথবা অসতর্ক ভাবে কোন দ্রব্য নষ্ট করিয়া ফেলিলে পিতা মাতার নিকট আবার তাহা না পায়, সে বালক যে কেবল মনে তীব্র কষ্ট অনুভব করে তাহা নহে, ইহাতে তাহার একটি মূল্যবান বিষয় শিক্ষা হইয়া যায়। কিন্তু যে বালক ঐরূপ

অপরাধ করিলে গালি খায় অথবা অন্য কোন প্রকার কৃত্রিম শাস্তি লাভ করে, সে এরূপ শাস্তিতে ত কিছু মাত্র সংশোধিত হয়ই না, পরন্তু সৎ এবং অসৎ আচরণের ফলাফল অবগত হইবার একটি উৎকৃষ্ট সুযোগ সে হারায়। শাস্তি এবং পুরস্কার সম্বন্ধে প্রাকৃতিক উপায়ের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করিলে যে নৈতিক দুর্গতি ঘটে, সূক্ষ্মদর্শী পণ্ডিতেরা তাহা বহু পূর্ব্ব হইতেই জানিতেন। অপরাধ করিলে পিতা মাতা বা শিক্ষকের অসন্তোষ দেখিতে দেখিতে বালকদিগের মনে এইরূপ ধারণা জন্মিয়া যায় যে তাঁহাদের অসন্তোষই অপরাধের একমাত্র অনিবার্য্য ফল। সুতরাং পিতা মাতা এবং শিক্ষকের শাসন যখন অবগত হয়, কাযেই তাঁহাদের অসন্তোষের ভয় থাকে না, তখন অপরাধের সকল প্রকার প্রতিবন্ধক চলিয়া যায়; অপরাধের প্রকৃত ফল যে প্রাকৃতিক দণ্ড, দায়ে ঠেকিয়া তাহা সংসারের বহুদর্শিতা দ্বারা শিক্ষা করিতে হয়। স্বয়ং ভুক্তভোগী একজন এবিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন;—"যে সকল বালকের পিতা মাতা সন্তানের চরিত্র-গঠন উপেক্ষা করেন, তাঁহাদের সন্তানেরা বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া সকল প্রকার কদাচারে লিপ্ত হয়। কার্য্যের নিয়ম তাহাদিগের জানা নাই, নৈতিক আচরণের উপকারিতা তাহারা জানে না, তাহাদিগের দাঁড়াইবার ভিত্তি নাই; যে পর্য্যন্ত সংসারের কঠোর শাসন তাহাদিগকে শিক্ষা না দেয়, সে পর্য্যন্ত সমাজের নিকটে তাহারা বিলক্ষণ [illegible] পাত্র।"

প্রাকৃতিক শাসনের আর এক সুবিধা এই যে, ইহা যে নিতান্ত ন্যায়-সঙ্গত, বালকেরাও তাহা বুঝিতে পারে। কোন অপরাধের প্রাকৃতিক ফল যে টুকু, প্রদও শাস্তি যদি তদপেক্ষা গুরু বা লঘু না হয়, তাহা হইলে তাহার ঔচিত্য সকলেই স্বীকার করিবে। মনে কর একটি বালকের পরিচ্ছদের প্রতি কিছু মাত্র দৃষ্টি নাই। পরিচ্ছদ নষ্ট করিলে যদি তাহাকে প্রহার করা যায়, তবে সে অন্যায়রূপে প্রহারিত হইল বলিয়াই মনে ভাবিবে, অপরাধের জন্য কিছু মাত্র অনুশোচনা করিবে না। কিন্তু মনে কর, সে কাপড়ে যে ময়লা লাগাইয়াছে তাহা ধৌত করিতে, অথবা যে কাপড় ছিন্ন করিয়াছে তাহা সেলাই করিতে যদি তাহাকে বাধ্য করা যায়, তাহা হইলে উহা নিজ অপরাধের উপযুক্ত শাস্তি বলিয়া কি সে তাহা বুঝিতে পারিবে না? যতক্ষণ সে এই শাস্তি ভোগ করিবে, ততক্ষণ কি অপরাধের সঙ্গে যে শাস্তির যোগ আছে তাহা সে ভাহিবে না? তাহার যতই রাগ হউক না কেন, শাস্তিটি যে অপরাধের উপযুক্ত হইল, ইহা কি সে বুঝিবে না? পুনঃ পুনঃ এইরূপ করিলেও যদি বালক সংশোধিত না হয়, তাহা হইলে পরিচ্ছদটি যত্ন পূর্ব্বক রাখিলে যত দিন যাইবার সম্ভাবনা ছিল ততদিন নূতন পরিচ্ছদ তাহাকে দেওয়া পিতা মাতার উচিত নহে; এরূপ করিলে উপযুক্ত পরিচ্ছদের অভাবে বালক অনেক আমোদ প্রমোদ ও উৎসবে যাইতে পারিবে না, তখন নিজের ত্রুটি এবং তজ্জনিত অসুবিধা সে নিজেই বুঝিতে পারিবে। যখন অপরাধের সঙ্গে দণ্ডের সম্বন্ধ সে স্পষ্টরূপে বুঝিবে, তখন তাহার প্রতি অন্যায় লইল ভাবিয়া সে কাহারও উপর অসন্তুষ্ট হইবে না। [illegible]

মনুষ্য জীবনের উন্নতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

এ পর্য্যন্ত আমরা মানসিক শক্তি, বিশেষতঃ বুদ্ধিবৃত্তিটির বিষয়ই আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু শুধু বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিলে আমাদের জীবনের উন্নতি সর্ব্বাঙ্গীন ও সম্পূর্ণ না হইয়া ঐক দেশিক হইবে। এরূপ উন্নতি দ্বারা ঐহিক কল্যাণ হইলেও পারত্রিক কল্যাণের সম্ভাবনা নাই। আত্মাকে অন্ধকারে রাখিয়া জীবনের পথে কখনই অগ্রসর হওয়া যায় না। জীবনের সুপরিনামের জন্য আধ্যাত্মিক উন্নতির প্রতি মনোযোগী হওয়া উচিত। বিশেষ ভাবে দেখিতে গেলে মানসিক উন্নতির সহিত আধ্যাত্মিক উন্নতির গৌণমুখ্য সম্বন্ধ। আত্মা যাহার বিমল ও উন্নত মনোবৃত্তিও তাহার উজ্জ্বল। দৃষ্টি যাহার বহুদূর ব্যাপী, নিকটস্থ বস্তু দর্শনের জন্য তাহার বিস্তর প্রয়াস পাইতে হয় না। বাস্তবিক যিনি সদাত্মা, তাঁহার বিচার শক্তিও তীক্ষ্ণ। তিনি নিরক্ষর হইলেও বিস্তর বিবেচনার অধিকারী।

তিনি বহু অধ্যায়ী না হইতে পারেন, তথাপি তাঁহার দর্শন গভীর ও যুক্তি অখণ্ডনীয়। কারণ উহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে আত্মারই বাক্য। তাঁহার হৃদয়ের বল অভাবনীয়। যিনি এই বল হইতে বঞ্চিত, তিনিই বাস্তবিক দুর্ব্বল।

যে সকল লোক বাল্যকালে আপনাদের কার্য্য পরম্পরা দ্বারা, আশানুপ্রাণিত করিয়া, পরে জগৎকে প্রতারিত করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলেরই এক ব্যাধি ছিল—চিত্ত-দৌর্ব্বল্য। সত্যের প্রতি অবিচলিত অনুরাগ ও তাহার রক্ষার জন্য নানা প্রকার ত্যাগ স্বীকার এবং অসত্যের প্রতি নিরতিশয় ঘৃণা, এ সকল সাংসারিক লোকের মধ্যে অতি বিরল। সুশিক্ষিত লোকেরা, আপনাদের হৃদয়-উদ্যানে এ কুসুম-তরু আদরে পোষণ করিতে পারে বটে, কিন্তু উহাতে এমনই এক কীট আশ্রয় গ্রহণ করে যে, উহার কুসুম নিচয় সম্যকরূপে বিকাশিত হইবার পূর্ব্বেই বৃন্তচ্যুত হইয়া, আপনাদের সৌরভ হইতে সকলকে বঞ্চিত করে। সত্যের আলোকে হয়ত অনেকেই বঞ্চিত না থাকিতে পারেন, কিন্তু অনেকেই সেই আলোক অবলম্বন করিয়াও গম্যস্থলে উপস্থিত হইতে পারেন না। আবার কেহ বা সেই আলোকে অন্যকে পথ দেখাইয়া লইয়া যান, কিন্তু স্বয়ং দীপধারীর ন্যায় অন্ধকারের অসুবিধা ভোগ করেন। একজন অন্যে কি বলিবে এই ভয়েই ম্রিয়মান, আর এক জনের, অন্যে কি বলিবে সে ভাবনা মনেও উপস্থিত হয় না। ইহারাই একের মধ্যে অপূর্ণ মনুষ্যত্ব, অপরের মধ্যে দেবত্ব। একের নিকট যাহা কবি-কল্পনা, অপরের নিকট তাহা প্রত্যক্ষ। কবি স্বাভাবিক প্রতিভাবলে পূর্ব্বেই সেচিত্র অঙ্কিত করেন, আর অন্যে চক্ষুর সম্মুখে না হইলে বুঝিতে পারে না।

তবেই দেখা যাইতেছে যে, আমরা নানা-রূপে সুরক্ষিত হইলেও চিত্তদৌর্ব্বল্য রূপ সামান্য শত্রুর নিকট একান্তই দুর্ব্বল। ইহাই একমাত্র শত্রু নহে, অপর শত্রু অব্যবস্থিত চিত্ততা। বাস্তবিক অব্যবস্থিত চিত্ততা। জীবনের উন্নতি পক্ষে বিষম অন্তরায়। যে-ব্যক্তি কোনও বিষয় বিশেষে চিত্তকে নিবদ্ধ রাখিতে পারে না, তাহার কোন বিষয়ে বুৎপত্তি লাভের প্রত্যাশা বিড়ম্বনা মাত্র। এমন অনেক লোক দেখা যায়, যাঁহারা কিঞ্চিৎ গণিত, কিঞ্চিৎ সাহিত্য, কিঞ্চিৎ দর্শন শাস্ত্র প্রভৃতি সকল বিষয়ই স্পর্শ করেন, কার্য্যতঃ কিছুতেই অধিকারী হইতে পারেন না, এবং কিছুতেই প্রাজ্ঞতা ও বিচক্ষণতা দেখাইতে পারেন না। তাঁহারা কখন বা রাজনৈতিক আন্দোলন দ্বারা দেশ মধ্যে প্রতিপত্তি লাভ করিতে চেষ্টা করেন, কখনও বা ধর্ম্মপ্রচারকের বেশ ধরিয়া জগতের সম্মান লাভের চেষ্টা করেন। কিন্তু কোন কার্য্য দ্বারাই জগতের উপকার সাধন করিতে পারেন না। সুশিক্ষিত কিম্বা অপূর্ণ শিক্ষিত, সকলের মধ্যেই এ দোষ দেখিতে পাওয়া যায়। বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে অনেকের এ দোষটি প্রবল। কোন কোন অধ্যায়ীর এমন কদর্য্য স্বভাব যে, তাহারা পাঠ্য পুস্তক পরিত্যাগ করিয়া কেবল এ পুস্তকের দুই পৃষ্ঠা ও পুস্তকের দুই পাতা পড়িয়া, সর্ব্বদা ভ্রমর-বৃত্তির অভিনয় করিয়া বেড়ায়। এরূপ ছাত্র দিগকে প্রায়ই পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য হইয়া ফিরিয়া আসিতে দেখা যায়। যাহারা এই প্রকার অস্থিরমতি তাহাদিগের নিকট কিরূপে মহত্ত্বের আশা করা যাইতে পারে?

অতএব যাহারা নানা বিপদ্-তরঙ্গ-সঙ্কুল সংসার-সমুদ্রে জীবন-তরীকে অব্যাহত ভাবে চালাইতে চায়; তাহাদিগের অবশ্যই অধ্যবসায়-কর্ণধারের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। অন্যথা কেবল ইতস্ততঃ চালিত হইয়া, অবশেষে দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া, বিষম ব্যাকুলিত হইতে হইবে।

শিক্ষানুশীলন।

[অনুশীলনের জন্য যে সকল প্রশ্ন দেওয়া যাইতেছে, শিক্ষকদিগের নিকট হইতে তাহার উত্তর পাইতে আমরা আশা করি। কেহ নূতন প্রশ্ন পাঠাইলে আমরা তাহা সাদরে গ্রহণ করিব। প্রশ্নকর্ত্তা ইচ্ছা করিলে নিজের প্রশ্নের উত্তরও সেই সঙ্গেই পাঠাইতে পারেন। উত্তর লিখিতে প্রশ্নের সংখ্যার উল্লেখ করিতে হইবে। যিনি অন্যূন বিশটি প্রশ্নের সদুত্তর প্রদান করিবেন, তিনি শিক্ষা-পরিচর-সমিতির নিকট হইতে এক খানি প্রশংসা-পত্র পাইবেন। প্রশংসা-পত্র প্রার্থীকে উত্তরিত প্রশ্নের সংখ্যা উল্লেখ

করিয়া সমিতি সম্পাদককে পত্র লিখিতে হইবে। এই সকল প্রশ্নের উত্তরও আমরা প্রকাশ করিব; তবে বহু উত্তর প্রায় এক রূপ হইলে একটি মাত্র উত্তরই প্রকাশিত হইবে। যিনি যাহা লিখিবেন তাহা সংক্ষিপ্ত অথচ স্পষ্ট হওয়া চাই।

শিঃ পঃ সঃ।]

১ম সংখ্যা প্রশ্ন।—রাম বিদ্যালয়ে যাইতে চায় না। তাহার দরিদ্রা বিধবা মাতা দুঃখে কষ্টে পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া দেন, কিন্তু পাঠে তাহার মনোনিবেশ নাই। শিক্ষক তাহাকে প্রহার করা ছাড়িয়াছেন, তথাপি সে বিদ্যালয়ে যায় না, কোন বালক তাহার সঙ্গে খেলিতে যায় না, তথাপি সে বিদ্যালয়ে না যাইয়া একাকী রাস্তায় রাস্তায় বেড়ায়। বিদ্যালয়ের প্রতি রামের বিরাগ দূর করিবার উপায় কি?

২য় সং প্রঃ।—হরি বিদ্যালয় হইতে ছুটি লইয়া বাহিরে যাইয়া দোকানে বসিয়া তামাক খাইতেছে। যদু তাহাকে দেখিয়া বলিল, এখানে তুমি তামাক খাইতেছ? রও, পণ্ডিত মহাশয়কে বলিয়া দিতেছি।" হরি বিরক্তির সহিত উত্তর করিল, "যাও, বল গিয়া। ইন্‌স্পেক্টর সাহেব স্কুলে আসিলে তাঁহার মুখ হইতে মদের গন্ধে ভূত পালায়, আবার স্কুলে বসিয়াই তিনি চুরট ফুকিতে থাকেন। আর পণ্ডিত মহাশয় কি করেন? তিনি কি তামাক খান না? যত দোষ কেবল আমাদের তামাক খাওয়াতে।" যদু বিদ্যালয়ে যাইয়া শিক্ষককে এই সকল কথা বলিয়া দিল। শিক্ষকের এখন কি করা উচিত?

৩য় সং প্রঃ।—কালীবাবুর অবস্থা ভাল। তাঁহার বিধবা ভ্রাতৃ-বধূর এক মাত্র সন্তান গোপালের বয়স ১২ বৎসর। গোপালের বুদ্ধি বেশ তীক্ষ্ণ, কিন্তু সে লেখা পড়া করে না, সুযোগ পাইলেই কালীবাবুর টাকা পয়সা চুরি করিয়া নষ্ট করে, পাড়া প্রতিবাসীদিগের উপরে অত্যাচার করিয়া বেড়ায় আর শাসন করিলেই যথা তথা চলিয়া যায়। তাহাকে শক্ত করিয়া একটা কথা বলিবার যো নাই; কিছু বলিলেই গোপালের মা অন্ন জল পরিত্যাগ করেন আর বলেন, "ওর যখন কেহ নাই, তখন কে উহার যত্ন করিবে? এখন ও মরিলেই আমি বাঁচি।" কালীবাবু এই কারণেই এ পর্য্যন্ত গোপালকে কিছু বলেন নাই, কিন্তু গোপালের বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাহার ব্যবহার তাঁহার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে। এখন তাহার সংশোধনের জন্য কালীবাবুর কি করা উচিত?

৪র্থ সং প্রঃ।—শ্যাম প্রভৃতি ১০ জন ছাত্র এক বাড়ীতে থাকিয়া পড়ে। শ্যাম ৫ দিনের ছুটি লইয়া বাড়ীতে যায়। বিদায়-প্রার্থনার পত্রখানি কোন্ বালক শিক্ষকের হাতে দিয়াছিল, তাহা কাহারও স্মরণ নাই কিন্তু শ্যাম ফিরিয়া আসিলে জানা গেল,

যে বালকটি পত্র খানি বিদ্যালয়ে আনিয়াছিল, সে ৫ দিনের জায়গায় ১৫ দিন করিয়া দিয়াছে। কে এ কার্য্য করিয়াছে, জিজ্ঞাসা করাতে কেহই স্বীকার করিল না। কি উপায়ে এই দোষী বালককে জানা যাইতে পারে?

৫ম সং প্রঃ।—হেমন্ত সহপাঠী বালকদিগকে বাড়ীতে প্রত্যহ কদর্য্য ভাষায় গালি দেয়, প্রত্যহ সে জন্য নালিস এবং শাস্তি হয়, আর গালি দিবে না বলিয়া প্রত্যহ শিক্ষকের নিকট প্রতিজ্ঞা করে, আবার প্রত্যহই গালি দিয়াছে বলিয়া তাহার উপর নালিস হয়। হেমন্তের এই কদভ্যাস কি রূপে যাইতে পারে?

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

বরং নিষ্পাপ থাকি কষ্টে কাল হর,
কষ্ট-পরিহার হেতু পাপ নাহি কর।

সংসারে সতত নিজে সতর্ক রহিবে,
সন্দেহ-অনলে কিন্তু প্রাণ না দহিবে।

বরং বিলম্বে কায কর সম্পাদন,
তথাপি আরব্ধত্যাগ করোনা কখন।

সতত বিপদ-ভয়ে ভীত না থাকিয়া,
একবার বিপদেরে দেখ আলিঙ্গিয়া।

অন্যেরে শাসিতে যদি মনে ভাললাগে,
বশ্যতা সাধন তবে কর নিজে আগে।

যাহাদের বর্ণ-পুচ্ছ-পক্ষ একাকার,
সে সকল পাখী করে একত্র বিহার।

ডুবিয়াছে যত লোক সমুদ্র মাঝার,
মদিরায় ডুবিয়াছে শত গুণ তার।

অতীতের ভ্রমত্রুটি করিয়া স্মরণ,
ভবিষ্যতে-নিরাপদ রাখিও জীবন।

ক্রোধেতে ধীরতা-শূন্য হইবার আগে,
ভাবি দেখ ক্ষমা-যোগ্য যদি কিছু থাকে।

পর-অনুগ্রহে বাঁচে জীবন যাহার,
বাছিয়া লইতে তার নাই অধিকার।

ক্ষমা কর, সহ্য কর, পার যত কর,
ইহাইত মানবীয় বিজ্ঞানের সার।

সময় থাকিতে যদি কর প্রতিকার,
ভীষণ বিপদে তবে কি ভয় তোমার?

পাপ-অনুষ্ঠানে বাধা না দেয় যেজন,
অলক্ষ্যে সে করে সেই পাপাংশ গ্রহণ।

বরং একাকী থাক তাতে ক্ষতি নাই,
কুসঙ্গে ক্ষণেক তবু থাকিও না ভাই!

বরং হইয়া মূর্খ কাটাইবে কাল,
তথাপি করিবে ত্যাগ কুশিক্ষা-জঞ্জাল।

করিতে যে কোন কায হবে সাবধান,
অযত্নে সহজ কার্য্যে ঠেকে বুদ্ধিমান।

কোন কাযে শেষ ফল না করি বিচার,
আরম্ভিলে, উপকারে ঘটে অপকার।

কেমনে কি কায হবে, ভাব আগে তাই,
না ভাবিয়া কোন কাযে হাত দিতে নাই।

কুৎসিত সাহিত্য-সেবা করে যেই জন,
অন্তরে উথলে তার পাপ-প্রস্রবন।

কেমনে করিতে হয় গ্রন্থ অধ্যয়ন,
গ্রন্থপাঠে সেই জ্ঞান জন্মে না কখন?

পর-কৃত অপরাধ হয়ে বিস্মরণ,
আপনার মহত্ত্ব দেখাও অনুক্ষণ।

অন্তর সাধুতা-হীন, সুন্দর বাহিরে,
হলাহল যেন স্বর্ণ ভাণ্ডের ভিতরে।

পরিত্যাগ করিবার সাধ্য নাই যাহে,
নীরবে সুবোধ জন সহ্য করে তাহে।

যার মনে নাই মান-অপমান- জ্ঞান,
তার সঙ্গে ব্যবহারে হবে সাবধান।

শুনিবে পরের কথা যখন তখন,
উপদেশ দিতে ব্যস্ত হবে না কখন।

পরিশ্রমে জঠরের ক্ষুধা বৃদ্ধি হয়,
আমোদ প্রমোদ হয় সুখ-শান্তিময়।

বিচার করিয়া তবে বন্ধুতা করিবে,
বিনা পরীক্ষায় জন্মে বিশ্বস্ততা কবে?

সময় থাকিতে কর সাধুতা আশ্রয়,
কি জানি এ পরে, যদি না মিলে সময়।

হয় যদি ভাবী আশা হউক সফল,
কিন্তু সে আশার তরে হয়োনা পাগল।

সাবধানে সন্ধ কথা করিবে বিশ্বাস,
সহজেতে সে কথা না করিবে প্রকাশ।

প্রাপ্তগ্রন্থাদি।

চিত্রদর্পণ—মাসিক পত্র। শ্রীবিহারী লাল রায় কর্তৃক প্রকাশিত। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাকমাশুল সমেত ১৲ টাকা। আকার ডিমাই তিন ফর্ম্মা। এই পত্রিকার উদ্দেশ্য চিত্র-প্রচার। সন্নিবেশিত চিত্রগুলি সুদৃশ্য হইতেছে। এরূপ পত্রিকা নিতান্ত ব্যয়-সাধ্য। আমরা আশা করি গ্রাহকদিগের উৎসাহে পত্রিকাখানি জীবিত থাকিবে।

শ্রীহট্টমিহির—সাপ্তাহিক সংবাদপত্র। শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত। আকার রয়েল দুই ফর্ম্মা। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য দুই টাকা। বিদেশে ডাকমাশুল অতিরিক্ত বার আনা। কাগজখানির লেখা বেশ হইতেছে। আমরা ইহার স্থায়িত্ব কামনা করি।

তৃতীয় ভাগ।] জ্যৈষ্ঠ [২য় সংখ্যা।

(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,

সহকারী সম্পাক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল,।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,

১০ নং কৃষ্ণদাস পালের লেন হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৵০। পশ্চাদ্দেয় ২৲ দুই টাকা।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের মূল্যাদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট কলিকাতায় এবং প্রবন্ধাদি পুঁটিয়ায় সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের এজেণ্টগণ।

এজেণ্টের নাম।	ঠিকানা।
বাবু কানাই লাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ	
” নফরদাস রায় জমিদার	বহরমপুর।
” মধুসূদন সিংহ স্কুল সবইন্সপেক্টর	
” কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি, এ, বিএল্	
” দ্বারকানাথ বাগচি স্কুল সবইন্স্পেক্টর	বোয়ালিয়া।
” কালীকমল দাস বি, এল্	শ্রীহট্ট।
” হরকিঙ্কর দাস উকীল	মৌলবী বাজার।
” রাম গোবিন্দ মিশ্র স্কুল সবইন্স্পেক্টর	সাজাহাদ পুর। পাবনা
” কামিনীকুমার চন্দ এম্ এ, বি, এল্	
” অভয় চরণ দাস এম্ এ	শিলচর, কাছাড়।
” সদয় চরণ দাস	
” দীননাথ দাস বি, এ	শিলং।
” নিশিকুমার ঘোষ অরিয়েণ্টেল লাইফ্ ইনসিওরেন্স কোম্পানি	গৌহাটী।
” ব্রজগোপাল সেন	
” আনন্দ চন্দ্র সরকার শিক্ষক	পুঁঠিয়া।
” রাধিকা প্রসাদ সেন জমিদার	
” দীননাথ ভট্টাচার্য্য স্কুল সবইন্স্পেক্টার	জঙ্গিপুর, মুর্শীদাবাদ।
” অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য	বর্দ্ধমান, দেমুড়।
” বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল,	গোয়াড়ী।
” নীলমণি ঘটক উকীল	মালদহ।
” শ্রীশগোবিন্দ সেন	দিনাজপুর।
” গিরিশচন্দ্র নাগ এম, এ, বিএ, ল,	কটক।
” গিরিশচন্দ্র বসু বি, এ,	কুচবিহার।
” দ্বারকানাথ মৈত্র উকীল	নাটোর।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ সাল। | ২য় সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১৪

প্রাণেশ্বর! আমি তোঁরে কিছু ভালবাসি না রে।
হৃদয় চিরিয়া তোরে চাইনা ত রাখিবারে!
পাপ-চিন্তা কদাচারে সতত মলিন আমি,
দয়াময়! পাপী বলে তবু তব ঘৃণা নাই,
না ডাকিতে, প্রাণারাম! দাঁড়াও প্রাণের মাঝে,
অন্তরে, অন্তরতম! তোমারে দেখিতে পাই।
লইয়া শান্তির ডালা আসিতেছ কতবার,
হৃদয়ে প্রবেশ-তরে খুঁজিতেছ অবসর,
তথাপি, পাষাণ আমি! নাবুঝি তোমার স্নেহ,
তাড়াই তোমারে দূরে করি কত অনাদর।
রবির কিরণ-রাশি, চাঁদের রজত হাসি,
অনিলে সঙ্গীত-সুধা, সলিলে অমৃতাসার,
যেখানে যা মনোরম, সুন্দর, আনন্দকর,
কোলে লয়ে প্রেম-ভরে সাধিতেছ কতবার;
কিন্তু মম এহৃদয় তব প্রেমে মুগ্ধ নয়,
ছাড়িয়া তোমার কোল ধাইছে বিষয় প্রতি,
সংসারের কোলাহলে বহিছে অশান্তি-স্রোতঃ,
পড়ি তায় খাইতেছি হাবুডুবু দিন রাতি।

সাহিত্য-পরীক্ষা।

বাঙ্গালীর উদীয়মান সাহিত্যের সহসা অধঃপতন দেখিয়া চিন্তাশীল ব্যক্তি মাত্রেই দুঃখিত এবং ভবিষ্যৎ ভাবনায় ভীত। যাহার ভিতরে জাতীয় উন্নতির বীজ নিহিত, তাহার দুর্দ্দশা দেখিলে কোন স্বদেশ-হিতৈষীর হৃদয় স্থির থাকিতে পারে না।

বাঙ্গালীর দুর্ভাগ্য বশতঃ এখন যে আর বঙ্গভাষায় মৌলিক সাহিত্যের উৎপত্তি হইতেছে না, একথা বোধ হয় সকলেই উপলব্ধি করিতে পারিতেছেন; কিন্তু সে দুঃখের কথা অদ্যকার আলোচ্য নহে। যাহা বর্ত্তমান আছে, তাহারও যে উপযুক্ত পরীক্ষা এবং আদর হইতেছে না, তাহাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের বিচার্য্য।

যেমন অন্নের জন্য ক্ষুধা এবং জলের জন্য পিপাসা, সেইরূপ সাহিত্যের জন্য আকাঙ্ক্ষা মানবের প্রকৃতি-সিদ্ধ। কে কেমন লোক যদি জানিতে চাও, তবে লোকের পুস্তকালয় পরীক্ষা করিয়া দেখ। যাহার প্রকৃতি যেরূপ তাহার পুস্তকালয়ের পুস্তক গুলিও সেইরূপ— পুস্তকালয় তাহার প্রকৃতির ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র। যে গভীর চিন্তাশীল, জ্ঞান-ভক্তির পিপাসা যাহার হৃদয়ে প্রবল, সে কয়েক খান নাটক-নবন্যাস দিয়া আলমারি সাজাইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে, ইহা অসম্ভব।

বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে পুস্তকালয় থাকা দূরে থাকুক, গ্রামে গ্রামে বা নগরে নগরে ও তাহা নাই; কিন্তু যাঁহারা কিছু লেখা পড়া শিখিয়াছেন, তাঁহাদের ঘর খুঁজিলে দুই চারি খানি পুস্তক অবশ্যই পাওয়া যাইবে। এই সকল পুস্তক একবার খুঁজিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে গৃহস্বামীর চরিত্র তাহাতে চিত্রিত রহিয়াছে। এই সকল পুস্তক নানা শ্রেণীর হইলেও অধিকাংশ স্থলেই কেবল নাটক, উপন্যাস, আর ছাই ভস্ম!

কিন্তু ঘরে একখানি পুস্তক থাকিলেই তাহা গৃহস্বামীর প্রকৃতির পরিচয় দেয়, একথা বলা সম্পূর্ণ সঙ্গত নহে,—গৃহস্বামী ইচ্ছাপূর্ব্বক যে পুস্তক ক্রয় করেন, কেবল তাহাই তদীয় প্রকৃতির পরিচায়ক। কিন্তু ঘরে যত পুস্তক আছে, সকল গুলিই যে তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক কিনিয়াছেন, এরূপ মনেকরা উচিত নহে।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, সাহিত্যের আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। যাঁহার হৃদয়ে সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ আছে, তিনি একখানি নূতন পুস্তকের নাম শুনিলেই তাহা দেখিতে ইচ্ছা করেন,—নিজের ঘরে হাজার ভাল পুস্তক থাকিলেও সেই নূতন পুস্তক খানি একবার না দেখিতে পাইলে তাঁহার চিত্তে কেমন যেন একটা অভাব থাকিয়া যায়।

অভিনব পুস্তক খানি ভাল কি মন্দ, ক্রেতা তাহা কিরূপে স্থির করিবেন? বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা তিনটি উপায়ে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে;—প্রথম, পুস্তকের বিজ্ঞাপন দেখিয়া; দ্বিতীয়, সংবাদ পত্রে ও সাময়িক পত্রে নবপ্রকাশিত পুস্তকের সমালোচন পড়িয়া, তৃতীয়, অর্থদ্বারা পুস্তক খানি কিনিয়া। কিন্তু এই উপায়-ত্রয়ের মধ্যে কোনটিই নিরাপদ বলিয়া বোধ হয় না।

প্রথম উপায় বিজ্ঞাপন। বঙ্গদেশে আর কিছুর উন্নতি না হউক, বিজ্ঞাপন-বিজ্ঞানের যে বিলক্ষণ উন্নতি হইয়াছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। বিজ্ঞাপন গুলি কি চমৎকার! কি মনোহর! একটি বিজ্ঞাপন লিখিতে যত যত্ন লাগে, বোধ হয়

পুস্তক খানি লিখিতে তত যত্ন করিলে একটি ভাল জিনিস জন্মিয়া যাইত। যে কোন একটি বিজ্ঞাপন হাতে লইয়া দেখ, তাহার জাঁবাইবা কেমন, আর প্রলোভনইবা কত! ‘এতদিনে দেশের একটা গুরুতর অভাব দূর হইতে চলিল। আমরা দশটি বৎসর ক্রমাগত পরিশ্রম এবং বহু অর্থব্যয় করিয়া পুস্তক খানি ছাপাইতে সক্ষম হইলাম। দেশের জানিত এবং মৃত যত বড় বড় লেখক আছেন, তাঁহারা সকলেই ইহার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। পুস্তক খানি প্রকাশ করিতে প্রচুর অর্থব্যয় হইয়াছে, তথাপি সাধারণের সুবিধার জন্য যত দূর সম্ভব সুলভ করিয়া আমরা ইহার মূল্য পঁচিশ টাকা মাত্র নির্দ্ধারণ করিলাম। আরও সুবিধা দেখুন! আগামী মাসের ৩০এ তারিখের মধ্যে যাঁহারা পুস্তক লইবেন, তাঁহারা কেবল দুইটি টাকা দিলেই পুস্তক খানি পাইবেন, অধিকন্তু আর একখানি পাঁচটাকা মূল্যের পুস্তক উপহার পাইবেন। এই দুইটাকাও আগে দিতে হইবে না, একখান পোষ্ট কার্ডে কেবল নাম ধামটা স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া পাঠাইলেই আমরা ডাকে পুস্তক পাঠাইয়া টাকা দুইটি আদায় করিব। অতি অল্পসংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত হইয়াছে, শীঘ্র গ্রাহক না হইলে ফুরাইয়া যাইতে পারে।’ এইরূপ প্রলোভনের উপর প্রলোভন, তাহার উপরে আবার ভয়;—শীঘ্র পুস্তক ফুরাইয়া যাইবে, তখন ‘হেলায় রতন’ হারাইতে হইবে! এরূপ প্রলোভনে স্থির থাকা কি দুর্ব্বল বাঙ্গালী হৃদয়ের কাম? এই বিজ্ঞাপনের চটকে ভুলিয়া যাঁহারা প্রবঞ্চিত হন, তাঁহাদের ঘরের পুস্তক দেখিয়া তাঁহাদের প্রকৃতি স্থির করা যাইতে পারে না।

যাঁহারা অপেক্ষাকৃত সাবধান, তাঁহারা সংবাদ-পত্রে সমালোচন দেখিবার জন্য উৎসুক হন, এবং সংবাদ-পত্রে সুখ্যাতি দেখিতে পাইলে তবে সে পুস্তক ক্রয় করেন। এই সকল ক্রেতা প্রতারিত হন কিনা, সে কথা আমরা বলিতে ইচ্ছা করি না, তাঁহারা নিজেই তাহা স্মরণ করিয়া দেখিবেন। এ কথা আলোচনা করিতে গেলে বর্ত্তমান সম্পাদকীয় নীতির কথা আসিয়া পড়ে, কিন্তু এ স্থলে আমরা সে দুঃখের কথার অবতারণা করিতে চাই না। তবে মোটের উপর এইটুকু বলিতে পারি যে, সম্পাদকেরা যে আশ্রিত-পালন-দোষের জন্য অন্যকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিয়া থাকেন, তাঁহারা নিজে সে দোষে একেবারে নির্লিপ্ত নহেন।

যাহারা বিজ্ঞাপন বা সমালোচনের উপর নির্ভর না করিয়া একেবারে মূল্য দিয়া পুস্তক কিনিয়া পড়েন, তাঁহাদের পরীক্ষা সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস-যোগ্য বটে, কিন্তু সে পরীক্ষায় যে রক্ত-শোষণ হয়, তাহা সহ্য করিবার শক্তি কত জনের আছে?

শুনিয়াছি সাহিত্য-পরীক্ষার জন্য গবর্ণমেণ্টের একজন মোটা বেতনের কর্ম্মচারী আছেন, কিন্তু তাঁহার কার্য্যকারিতা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিবার কোন উপায় আমাদের নাই। বিশেষতঃ বঙ্গভাষায় প্রতিবৎসর যত পুস্তক বাহির হয়, তাহা যথাযথ পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা একজন মাত্র লোকের আছে কি না, তাহাতেও বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

বালকদিগের পাঠ্য-পুস্তক-নির্ব্বাচনের

জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিয়োজিত আর একটি সভা আছে বটে, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্য এ সভার বিচার্য্যবিষয় নহে। আর বিশেষতঃ সময়ে সময়ে সংবাদ-পত্রে এই সভার বিরুদ্ধে আশ্রিত-পোষণ-দোষের যে সকল কথা শুনা যায়, তাহাতে ইহার প্রতি সম্পূর্ণ আস্থাবান্ হওয়াও সহজ নহে।

তবে কি জাতীয় সাহিত্য পরীক্ষা করিবার কোন উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে না? গবর্ণমেণ্ট যদি দেশীয় সাহিত্যের প্রতি অনুরক্ত থাকিতেন, তাহা হইলে কার্য্যটা তত কঠিন হইত না কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সম্ভব নহে, আর গবর্ণমেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলেও যে সুফল পাওয়া যাইবে, এমনও বোধ হয় না। গবর্ণমেণ্ট বাঙ্গালা-সাহিত্য-বিচারে ব্রতী হইলে নিশ্চয়ই কয়েক জন ইংরাজ এবং স্থূলোদর বাঙ্গালী সাহিত্য-বিচারকের পদে বৃত হইবেন, তাহা হইলেই মঙ্গল আর কি! তখন টনি সাহেবের সুমধুর বাঙ্গালা পড়িয়া বাঙ্গালী পাঠককে পরিতৃপ্ত হইতে হইবে।

অনেক দিন হইল জয়দেবপুরে একটি সাহিত্য-সভা স্থাপিত হইবার সংবাদ শুনিয়াছিলাম, কিন্তু কায় কিছুই দেখি নাই। কেবল নামের জন্য নহে, কিন্তু প্রকৃত কাযের জন্য এইরূপ একটা সেভা সমিতি কিছু হইতে পারে না কি? ব্যাপারটা বড় কঠিন নহে, কেবল একটুকু নিঃস্বার্থভাব এবং স্বদেশের জন্য খাটিবার ইচ্ছা ও পরিশ্রম-শক্তি থাকিলেই কার্য্যটা হইতে পারে। অনুরোধ উপরোধ প্রভৃতি বাধ্যবাধকতার দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া নিরপেক্ষ ভাবে সাহিত্যের সমালোচনা করিবার অভ্যাস থাকিলে শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই এই কার্য্যের উপযুক্ত। সমালোচনার্থ কোন গ্রন্থ উপস্থিত হইলে যদি কেবল একজন সভ্য তাহার সমালোচনা করেন, আর অপর সকলে তাঁহার মতেই মত দিয়া যান, তাহা হইলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। পুস্তকখানি প্রত্যেক সভ্যকে একবার পড়িয়া দেখিতে হইবে, এবং সকলের সমবেত বিচারে তাহার উৎকর্ষ বা অপকর্ষ নির্দ্ধারিত হইবে। এইরূপ নিরপেক্ষ ভাবে সাহিত্যের সমালোচন করিয়া কোন সাময়িক পত্রে তাহা প্রকাশ করিতে থাকিলে নিশ্চয়ই অশেষ উপকার হইবে,—বঙ্গীয় পাঠককে আর পয়সা দিয়া বঙ্গ-সাহিত্যের আবর্জ্জনা কিনিয়া প্রতারিত হইতে হইবে না।

অধুনা কতিপয় উৎসাহী শিক্ষিত যুবক সম্মিলিত হইয়া 'শিক্ষা-পরিচর-সমিতি' নামে একটি সমিতি স্থাপন করিয়াছেন, এবং তাঁহারা সুশিক্ষা-বিস্তার ও সুসাহিত্য প্রচারের জন্য বিশেষ যত্ন করিতেছেন। এই সকল যুবক কি জাতীয় সাহিত্য পরীক্ষার এই ভারটা গ্রহণ করিতে পারেন না? এই কার্য্যটি তাঁহাদিগের বিজ্ঞাপিত উদ্দেশ্যের অন্তর্গত বলিয়াই আমরা মনে করি, এবং সেই জন্যই এবিষয়ে তাঁহাদিগকে অনুরোধ করিলাম।*

* ভরসা করি শিক্ষা-পরিচর-সমিতি প্রস্তাবটা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। তাঁহারা একার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ক্ষুদ্রায়তন শিক্ষা-পরিচর তাঁহাদের সমালোচনা প্রতিমাসে যথা সাধ্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছে। শিঃ পঃ সঃ।

প্রতিভা।

প্রথম পরিচ্ছেদ—জন্মকথা।

"প্রতিভা! বাবা! একবার এদিকে এসত।" স্নেহবিগলিত মধুমাখা কথা জগতে বড়ই দুর্ল্লভ! পিতা স্নেহভরে ডাকিলেন। পুত্র তখন বিস্তৃত প্রাঙ্গণের এক নিভৃত কোণে একটি প্রতিবেশী বালকের সঙ্গে সংগোপনে পরামর্শ করিতেছিল যে আজ বৈকালে ঘুড়ী উড়াইয়া মাঠে মাঠে দৌড়াদৌড়ি করাই ভাল, না বাড়ীতে থাকিয়া ডাণ্ডাগুলী খেলাই ভাল। পিতা আবার ডাকিলেন।

"প্রতিভা! বাবা! একবার এদিগে এসত।" কোন উত্তর নাই, পরামর্শ যেমন চলিতেছিল তেমনি চলিতে লাগিল।

পিতার স্নেহবিগলিত মধুময় আহ্বান প্রতিভার কর্ণকুহরে প্রবেশ পথ পাইল কি না তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। সচরাচর দুই চারি ডাকে পিতা মাতার কথা কাণে তুলা প্রতিভার বড় একটা অভ্যাস ছিল না। খেলার সাথীরা যদি কখন অব্যক্ত ধ্বনি বা অবোধ্য ইঙ্গিতও করিত, তাহার প্রত্যুত্তর দিতে প্রতিভার কখন মুহূর্ত্ত মাত্রও বিলম্ব হইত না। কিন্তু পিতা মাতা এবং শিক্ষক মহাশয় দশবার না ডাকিয়া কখন প্রতিভার নিকট উত্তর পাইতেন না। ইহা তাহার স্বভাবের কি শিক্ষার দোষ তাহা আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি নাই।

প্রতিভাকে এখন একেবারে "শিশু" বলা যায় না। নয় বৎসর ছাড়াইয়া দশ-বৎসরে পদার্পন করিয়াছে—শৈশবের ভাব সুন্দর অসংযত লাবণ্যের উপর বিদ্যালয়ের সুসংযমের ছায়া ধীরে ধীরে পতিত হইতেছে। যে সারাদিন দিদিমার আঁচল ধরিয়া "সূর্য্য কি, চন্দ্র কি, পাখী ডাকে কেন, প্রদীপ জ্বলে কেন", এই সকল গুরুতর দর্শনশাস্ত্রের বিচার করিতেছিল, অথবা প্রতিবেশী বালকদিগের সঙ্গে ধূলাখেলায় মত্ত হইয়া মানব জন্ম সার্থক করিতেছিল; তাহাকে নিরপরাধে প্রতিদিন ৪ ঘণ্টা করিয়া বিদ্যালয়ের কঠিন কাষ্ঠাসনে বসাইয়া রাখিয়া হিজি বিজি লতা পাতা মুখস্থ করাইবার জন্য পিতা মাতা ও শিক্ষকে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। যে কখন হাসি কখন রোদন কখন গাম্ভীর্য্য কখন চপলতা লইয়া সংসারে পরম সুখে মাতৃক্রোড়ে বাস করিতেছিল, তাহাকে একদিনে এক মাসে বা এক বৎসরেই মর্কটগাম্ভীর্য্যের রাজ্যে চিরবন্দী করিবার চেষ্টা হইতেছে,—বস্তুতঃ প্রতিভার জীবনে তুমুল রাষ্ট্রবিপ্লব আসিয়া উপস্থিত!

প্রতিভার নামের একটি ক্ষুদ্র ইতিহাস আছে। সেইটি আগে না শুনিলে তোমরা প্রতিভার সকল কথা ভাল করিয়া বুঝিতে পারিবে না। হয়ত অকারণে প্রতিভাকে, অথবা ততোধিক অকারণে তাহার চরিতাখ্যায়ককে অনেক বিষয়ে দোষের ভাগী করিবে।

প্রতিভার পিতা একজন বিশেষ লেখা

পড়া জানা লোক। শুধু লেখা পড়া জানা লোক বলিলে তাঁহার ঠিক পরিচয় দেওয়া হইল না। তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী, অধ্যয়ন নিপুণ, কাব্যামোদী মিষ্ট ভাষী শান্ত প্রকৃতির ভদ্রলোক। পৃথিবীর মধ্যে এখন তিনটী পদার্থ তাঁহার প্রিয়তম——পুস্তক, প্রতিভা এবং প্রতিভার মাতা। ঈশ্বরানুগ্রহে অন্নবস্ত্রের অভাব ছিল না বলিয়া প্রতিভার পিতা অন্য কোন ব্যবসায়ে লিপ্ত না হইয়া বিদ্যানুশীলনে জীবন ক্ষয় করিতেন। অনেক বয়স পর্য্যন্ত কোন সন্তান সন্ততি হইল না বলিয়া প্রতিভার মাতা কখন কখন ভাবভঙ্গিতে দুঃখ প্রকাশ করিতেন, কিন্তু প্রতিভার পিতা ভাল করিয়া সে দুঃখের তীব্রতা অনুভব করিতে পারিতেন না। ক্রমে পরোপকার নিপুন প্রতিবেশীগণ তাঁহার পারিবারিক সুখদুঃখ সমালোচনা করিবার ভার গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন, এবং সময়ে সময়ে সেই সকল সমালোচনা নানা প্রসঙ্গে নানা ছন্দোবন্ধে প্রতিভার পিতাকে শুনাইতে আরম্ভ করিলেন। যাঁহার সহিত সুখদুঃখের সংস্রব যত অল্প, তিনি তত অধিক আত্মীয়তা দেখাইয়া সহানুভূতিসূচক আক্ষেপ বচনে বলিলেন, "আহা! যদি তোমাদের একটিও ছেলে হইত, তাহা হইলেও সংসারে এক রকম করিয়া থাকিতে।" কেহ বলিলেন "অপুত্রক হইয়া সংসারে থাকা কি কম কষ্টের কথা! "পুত্র হইলে সুখ কি দুঃখ হয় তাহা কিন্তু প্রতিভার পিতা কখনও মীমাংসা করেন নাই। শেষে এইরূপ দাঁড়াইল যে, যিনি তাঁহার সঙ্গে মিষ্টালাপ করিতে আইসেন, তিনিই প্রথমে তাঁহার অপত্যহীনতায় ঈষৎ সহানুভূতি, তারপর একটু তীব্রতর দুঃখ, এবং সর্ব্বশেষে তাঁহার দুরদৃষ্টই যে এই অপত্যহীনতারূপ মহাপাতকের একমাত্র কারণ, তাহা তাঁহার হাড়ে হাড়ে বিঁধিয়া দিতে লাগিলেন।

সকল বাড়ীতেই সন্তান সন্ততির কলরব—যে বাড়ীতে তাহারা নাই "শ্মশানমিব তদ্‌গৃহং"! ক্রমে প্রতিভার পিতা ভাবিতে লাগিলেন, বুঝি সংসারের সার সর্ব্বস্বধন পুত্র। এই চিন্তা প্রথমে ধূমায়িত, পরে প্রজ্জলিত হইয়া তাঁহার হৃদয়-স্তর দগ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। যে সংসার তাঁহার চক্ষে আনন্দ-কানন ছিল, পুত্রাভাবে ক্রমে তাহা শ্মশান বলিয়া মনে হইতে লাগিল। যে অধ্যয়ন তাঁহার জীবনের সুখের অনন্ত প্রস্রবণ ছিল, ক্রমে তাহা গরল উৎগীরণ করিতে লাগিল। চিরদিন সমান যায় না, দেখিতে দেখিতে বহুসাধনার সিদ্ধি স্বরূপ প্রতিভার জন্ম সম্ভাবনা প্রচারিত হইল। যথাকালে শুভদিনে শুভক্ষণে প্রতিভা পৃথিবীর মুখ দর্শন করিলেন।

দরিদ্র মহারত্ন পাইল—শ্মশানে পারিজাত ফুটিয়া উঠিল, আনন্দের কলরবে চারিদিক্ পরিপূর্ণ হইয়া গেল। প্রতিভার পিতা বন্ধু-বান্ধব লইয়া মহাকবি কালিদাসের অমৃতময়ী কাব্য সুধা পান করিতেছিলেন, এমন সময়ে এই সুসংবাদ শ্রবণ করিলেন। এই ঘটনার সঙ্গে পুত্রের ভবিষ্যত বুদ্ধিবৃত্তির কোন সংস্রব থাকুক বা না থাকুক, পিতা সেই হইতেই পুত্রকে "প্রতিভা" নামে ডাকিতে লাগিলেন। পাড়াপ্রতিবাসীরা দিন কতক এই অদ্ভুত নাম লইয়া সানুকূল প্রতিকূল বিবিধ সমালোচনা

করিল, ক্রমে নামটি তাহাদেরও অভ্যস্ত হইয়া গেল। এইরূপে প্রতিভার জন্ম—এইরূপে প্রতিভার নাম-করণ।

——০——

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ—শৈশবে।

পিতা প্রতিভাকে সর্ব্বদাই অলৌকিক চক্ষে দেখিতে লাগিলেন। ধাত্রী কোলে শৈশব সুলভ চাপল্যের হাসি হাসিতে হাসিতে প্রতিভা একবার গাম্ভীর্য্যের ভ্রূকুঞ্চন করিল, অমনি পিতা মনে করিলেন ইহা অসাধারণ প্রতিভার লক্ষণ না হইয়া যায় না। এই-রূপেই তিল তালে পরিণত হইয়া থাকে। এই-রূপে প্রতিভার প্রত্যেক অস্ফুট অর্দ্ধোক্তি, প্রত্যেক অঙ্গভঙ্গি, প্রত্যেক দৌরাত্ম্য, সক-লই প্রতিভার লক্ষণে পরিণত হইতে লাগিল। আর তাহাকে শাসন করে কাহার সাধ্য? পুত্রকে শাসন করিবার কথা তুলিলেই পিতা বলিয়া উঠিতে লাগিলেন, "গগণবিহারিণী বিদ্যুল্লতাকে বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া রাখিতে চাও? প্রতিভাসম্পন্ন, মহাপুরুষদিগের বাল্যজীবন এইরূপই হইয়া থাকে—তাহাদের উপযুক্ত ধাত্রী কোথায় যে শাসন করিতে পারে?" প্রতিবেশীরা ইহার অর্থ ভাল করিয়া বুঝিল না, কিন্তু আপন অসাধারণ প্রতিভাগুণে বালক প্রতিভা বুঝিল—তাহার হাজার খুন মাপ।

প্রতিভা বেশী কথা কহে না, একসঙ্গে ভাল করিয়া বেশী কথা কহিতেও পারে না। কথা অপেক্ষা কায ভাল। তুমি যদি নীতি শাস্ত্রের বক্তৃতা বন্ধ করিয়া নিজে নীতি পরায়ণ হও, তাহাতে অনেকাংশে জগতের মঙ্গল। প্রতিভা এই সকল দর্শন বিজ্ঞানের কথা অবশ্যই বুঝিত না; কিন্তু তাহার সারমর্ম্ম প্রতিপালন করিত। সে কাহাকেও মারিতেছে, কাহারও চুল ধরিয়া টানিতেছে, কোন বালকের সুন্দর পুতুলটি চাহিয়া লইয়া ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিতেছে, চারিদিকে ক্রন্দনের রোল পড়িতেছে, প্রতিভা নীরব। যদি কেহ অভিযোগ করিতে আসিল। পিতা সস্নেহে পুত্রমুখ চুম্বন করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন।

এই শৈশবের ধুলাখেলায় যখন প্রতিভা মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া পরম সুখে দিন যাপন করিতেছিল, তখন তাহাকে একদিন প্রাতে পিতা ডাকিলেন—

"প্রতিভা! বাবা! একবার এদিকে এস ত।' বলা বাহুল্য অনেকবার ডাকিবার পর নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বে প্রতিভা আসিল। তাহার সর্ব্বাঙ্গ ধুলিময়, পরিধেয় বসনে পূর্ব্ব-দিনের ক্রীড়ার চিহ্ন বিরাজমান। পিতা তখন শিক্ষক মহাশয়ের সঙ্গে প্রতিভার বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। প্রতিভা আজ কয়েক মাস হইতে বিদ্যারম্ভ করিয়াছে; তাহার পাঠাদি কেমন চলিতেছে, তাহারই আলোচনা হইতেছে।

শিক্ষক। আমার বোধ হয় ছেলেটির কিছু হবেনা। এরূপ অন্যমনস্ক ছেলেদের কখন বিদ্যালাভ হইতে দেখি নাই।

পিতা। ঐ ত আপনাদের শিক্ষা প্রণালীর মহাদোষ! বালক যদি আপনার ক্ষুদ্র পুস্তক খানির তিন পংক্তি পাঠেই দিন রাত্রি মন দিয়া থাকিবে, তবেত সে মূর্খ হইয়া যাইবে। অনন্ত সংসার যাহার শিক্ষাক্ষেত্র, দুই পংক্তি পুস্তকের পাঠে

তাহার সর্ব্বদা মনোভিনিবেশ হইবে কেন?

পণ্ডিত মহাশয় দেখিলেন তর্কে তাঁহার জয়লাভ করিবার আশা নাই। তিনি সসম্ভ্রমে পরাজয় স্বীকার করিয়া বলিলেন,—

"সে যাহাই হউক, মহাশয়! আপনি বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে একটু দেখা শুনা করিলে ভাল হয়। বিদ্যালয় ত বিদ্যার কল-কারখানা নয় যে আমাদের হাতে ছেলে ছেড়ে দিবেন আর বিদ্বান্ হইয়া আসিবে? আর আপনার প্রতিভা যে প্রতিভাসম্পন্ন, ইহাকে আপনি স্বয়ং শিক্ষা দিলে যেমন হয়, অন্যে কি ততটা পারে?

এবার শিক্ষক মহাশয়ের জয় হইল। তিনি প্রতিভার পিতার মর্ম্মস্থান স্পর্শ করিয়াছেন, প্রতিভার প্রশংসা শুনিবা মাত্র পিতা বলিয়া উঠিলেন তাত বটেই "তাত বটেই!" এবং তখনই মনে মনে সংকল্প করিলেন তিনি স্বয়ং প্রতিভাকে বাড়ীতে শিক্ষা দিবেন, আর পণ্ডিত মহাশয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবেন। তাই প্রতিভার ডাক পড়িয়াছিল।

"প্রতিভা! আজ থেকে আমি তোমাকে বাড়ীতে পড়াইব, পণ্ডিত মহাশয় স্কুলে পড়াইবেন।" প্রতিভা হা করিয়া রহিল।

নয় বৎসরের বালক, দুই মাস মাত্র স্কুলে গিয়াছে; ইহারই মধ্যে তাহাকে একজন অন্ততঃ ২ ঘণ্টা বাড়িতে পড়াইবে, অর্থাৎ একস্থানে স্থির হইয়া বসাইয়া রাখিবে, আর একজন ৪ ঘণ্টা স্কুলে পড়াইবে, এ ব্যবস্থা প্রতিভা ভাল বুঝিতে পারিল না।

প্রতিভার গৃহে ও বিদ্যালয়ে পাঠ চলিতে আরম্ভ হইল। পিতা জানেন ছেলের অসাধারণ প্রতিভা, সুতরাং দশদিনের পাঠ তাহাকে একদিনে শিখাইতে হইবে, নচেৎ প্রতিভার অবমাননা করা হয়। প্রতিভা তোমার আমার ছেলের মত সাত দিনে ক খ শিখিবে না কি? কাযেই বেচারা প্রতিভাকে দশদিনের পাঠ একদিনে শিখিবার চেষ্টা আরম্ভ করিতে হইল।

ক্ষেত্রে না দাঁড়াইলে কৃষকের বুদ্ধির বিকাশ হয় না, জলে না নামিলে সাঁতার শিক্ষা হয় না, পুত্রকে পড়াইতে আরম্ভ করিয়া পিতা তাহা দেখিতে পাইলেন। তিনি দেখিলেন প্রতিভা দশ দিনের পাঠ একদিনে শিখিতে পারেনা। তবে কি প্রতিভার প্রতিভা নাই? প্রতিভা থাকিলেও চর্চ্চার আবশ্যক; পিতা কায়মনোবাক্যে চর্চ্চা আরম্ভ করিলেন। প্রাতে, সায়াহ্নে, রজনীতে, নিদ্রা যাইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পুত্রকে লইয়া "চর্চ্চা" করিতে লাগিলেন।

বালককে শিখাইতে যে পরিমাণ সহিষ্ণুতা, যে পরিমাণ অধ্যবসায়, যে পরিমাণ সূক্ষ্ম দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, তাহা সকল শিক্ষকের থাকে না। প্রতিভার পিতার ক্রমে ধৈর্য্যচ্যুতি, তাহার পর ক্রোধ হইতে লাগিল, অবশেষে তিনি প্রহার অবলম্বন করিলেন।

প্রতিভা কাঁদিতেছে। গণ্ড ভাষাইয়া শত ধারায় গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী —কত নদী বহিয়া যাইতেছে, ছল ছল চক্ষে ভাল করিয়া পুস্তকের অক্ষর দেখা যাইতেছে না; যেন সব জলবুদ্বুদের মত ভাসিতেছে, উঠিতেছে কখন বা ডুবিতেছে; আর সম্মুখে পিতা বেত্রহস্তে দণ্ডায়মান। প্রতিভার আর

ধূলাখেলা নাই, ইচ্ছা থাকিলেও অবসর পাইবার উপায় নাই। বেচারা প্রতিভা দেখিল সংসার অন্ধকার, আর সেই মহান্ধকারের মধ্যে বেত্রহস্তে তাহার শিক্ষাদাতা পিতা জীবন্ত যমের মত দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। প্রেমের রাজ্যে অপ্রেম প্রবেশ করিল, কোরকে কীট বাসস্থান বাঁধিল, প্রতিভার যাহা কিছু প্রতিভা ছিল অঙ্কুরেই তাহা শুকাইতে আরম্ভ করিল। তথাপি পিতা ছাড়িলেন না। স্বভাব সুলভ প্রতিভা না থাকে নাই থাকুক, মারিয়া পিটিয়া প্রতিভা গড়িতে আরম্ভ করিলেন।

প্রতিভার মন ভাঙ্গিল, শরীরে এত ঘন ঘন "চর্চ্চা" সহিল না, মস্তিষ্ক পিতার রুদ্রমুখ ভাবিতে ভাবিতে বিভীষিকাময় হইয়া উঠিল। প্রতিভা আগে হইতেই ভাল করিয়া কথা কহিত না; এখন একেবারেই কথা বন্ধ হইল। সে দায়ে পড়িয়া মৌনাবলম্বন করিল। পিতা পড়ার কথা ভিন্ন আর অন্য কথা একটিও বলেন না। তিনি যে পড়ার কথাটি জিজ্ঞাসা করেন, তাহার উত্তর দিবার জন্য প্রতিভা কথা কহিলেই হয় প্রকৃত উত্তর হয় না, নয় পিতা যতটা আশা করেন ততটা হয় না, তখন অমনি বেত্রাঘাত। কথা কহিলেই একটা না একটা ভুল বাহির করিয়া পিতা বেত্রাঘাত করেন; দেখিয়া শুনিয়া প্রতিভা আর কথা কহে না। দুশবার ধমকাইয়া বিশবার বেত্রাস্ফালন করিয়া একবার কষাঘাত না করিলে আর প্রতিভার মুখে কথা ফুটেনা; যাহা ফুটে, তাহাও ভয়-বিজড়িত অর্দ্ধোক্তিমাত্র! প্রতিভা বুঝিল, সংসার মৃত্যুর কারাগার!

—*—

তৃতীয় পরিচ্ছেদ—বিদ্যালয়ে।

প্রতিভার কপাল পুড়িয়াছে—পিতা তাহাকে বিষচক্ষে দেখিতেছেন, প্রতিবেশীরা তাহার কথা লইয়া সজনে বিজনে নানা ডালপালা লাগাইয়া বাগ্‌বিতণ্ডা করিতেছে, তাহার উপর বাড়ীতে এবং বিদ্যালয়ে বিদ্যাচর্চ্চা সমভাবে চলিতেছে। প্রতিভার শরীরে এত চর্চ্চা সহিল না; প্রতিভার প্রাণে এত সমালোচনা সহ্য করিতে পারিল না। দেখিতে দেখিতে প্রতিভার এক উৎকট পীড়ার সূচনা হইল।

প্রতিভা বিদ্যালয় হইতে আসিবার সময়ে অন্যান্য ছেলেদের মত হাসে না, দৌড়ায় না, পিতামাতার কোলে ছুটিয়া যাইবার জন্য ব্যাকুল হয় না—প্রতিভা বরং অপেক্ষাকৃত উৎফুল্লতার সহিত বিদ্যালয়ে যায়, কিন্তু ছুটী হইবার সময় নিকটবর্ত্তী হইলেই তাহার মুখ শুকাইতে আরম্ভ করে, শরীর বিবর্ণ হইতে থাকে, এবং মস্তিষ্ক গভীর গবেষণায় বিঘূর্ণিত হয়। এক দিন প্রতিভা পিতার কষাঘাত এবং তদপেক্ষা কঠিনতর বাক্য যন্ত্রণা হইতে কথঞ্চিৎ মুক্তি পাইবার জন্য বিদ্যালয় হইতে আসিবার সময়ে পথিমধ্যে গলায় আঙ্গুল দিয়া বমন করিল, বক্ষস্থল ভাসিয়া গেল, চক্ষু আরক্ত হইল, প্রতিভা কাঁদিতে কাঁদিতে বাড়ী আসিল। সেদিন "চর্চ্চা" স্থগিত থাকিল। পরদিন প্রতিভা আবার গলায় আঙ্গুল দিল, সে দিনও ঐ রূপ দেখিয়া পিতা চিন্তিত হইলেন, চিকিৎসক আনিবেন কি না ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। তারপর ক্রমে বমিকরা প্রতিভার অভ্যাস, পরে স্থায়ী রোগে পরিণত হইল। এখন আর গলায় আঙ্গুল

দিতে হয়না, এখন আর চেষ্টা যত্ন করিয়া পীড়া সৃষ্টি করিতে হয় না, বিদ্যালয়ের ছুটী হইতে না হইতেই মস্তিষ্ক ঘুরিতে আরম্ভ হয়, কখন বা পথিমধ্যে কখন বা বাটীতে আসিবা মাত্র অবিশ্রান্ত বমন হইতে থাকে। চিকিৎসক আসিল, ঔষধ আসিল, সেবা শুশ্রূষা আরম্ভ হইল; কিন্তু রোগের কারণ কেহই বুঝিল না; সুতরাং রোগ আরোগ্য না হইয়া দিন দিন শরীর ভাঙ্গিয়া পড়িতে লাগিল। প্রতিভার ক্ষুদ্র দেহযষ্টি আর দারুণ রোগের ভার বহিতে পারে না। ভগ্নতরী ডুবু ডুবু হইল। পিতা চিন্তিত হইলেন, স্নেহময়ী জননী কাঁদিয়া পৃথিবী ভাসাইতে লাগিলেন, প্রতিভা নীরবে মৃত্যুকাল প্রতিক্ষা করিতে লাগিল।

"প্রতিভা! বাবা! একবার কথা কও।" একেই প্রতিভা অল্পভাষী, তাহাতে রোগের তাড়না, প্রতিভা দু চারিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ক্ষীণকণ্ঠ, ক্ষীণশক্তি, কথা ফুটিল না, চক্ষের জল গড়াইয়া পড়িল। মাতা উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলেন, পিতার পাষাণ প্রাণ গলিয়া গেল, "হায়! হায়! আমিই প্রতিভার কাল হইলাম! প্রতিভা! বাবা! আমি আর নির্য্যাতন করিব না, তুই কথা বল্, ফিরে চা," এই বলিয়া "পিতা আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হইয়া উন্মত্তের মত ক্রন্দন করিতে লাগিলেন"। প্রতিবেশীরা সেই ক্রন্দনের উচ্চরোল শুনিয়া আসিল; এক, দুই, তিন, ক্রমে ক্ষুদ্র জনতা, তাহার পর লোক-সমারোহ। প্রতিভার অন্তিমশয্যা ঘেরিয়া গ্রামের বালক, বৃদ্ধ, যুবা দাঁড়াইল, অন্তরাল হইতে পুরবধূরা তাহার রোগক্লিষ্ট মলিন মুখের দিকে সজল নয়নে চাহিতে লাগিল। সকলেই বলিল প্রতিভার পিতাই তাহার কাল হইল—পিতা আর সহ্য করিতে পারিলেন না, মস্তকে করাঘাত করিয়া বালকের মত উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন।

একজন সুচতুর চিকিৎসক প্রতিভার এই অসাধ্য রোগের কথা শুনিয়া অবধি তাহাকে দেখিবেন দেখিবেন মনে করিতেন, কিন্তু "রোগীর পিতা আহ্বান না করিলে কেমন করিয়াই বা যাই"—এই সব ইতস্ততঃ করিয়া দেখিতে আইসেন নাই। প্রতিভার অন্তিমকাল উপস্থিত শুনিয়া তিনি আপনিই দেখিতে আসিলেন। যাহা অনুমান করিয়াছিলেন তাহা সম্ভব বলিয়া বোধ হইল। তিনি কাহাকেও কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে নিজেই প্রতিভার দুর্ব্বল মস্তক আপন ক্রোড়ে উঠাইয়া লইয়া জলসেক করিতে লাগিলেন এবং মধ্যে মধ্যে ঔষধ খাওয়াইতে লাগিলেন। সমুদায় রাত্রি কাটিয়া গেল, প্রভাতের তরুণালোকের সঙ্গে প্রতিভার জীবনের আশা জাগরিত হইল।

সুচিকিৎসায় সুনিয়মে ধীরে ধীরে প্রতিভা আরোগ্য লাভ করিতেছে। একদিন ডাক্তার বাবু প্রতিভার পিতাকে নির্জ্জনে লইয়া বলিলেন:—

"আপনার পুত্রকে যদি বাঁচাইতে চান, কিছু দিনের জন্য ইহার লেখা পড়া একেবারে বন্ধ করিয়া দেন। নচেৎ এই আরোগ্য স্থায়ী হইবে না; লেখা পড়া আরম্ভ করিলেই পীড়া পুনরায় প্রকাশিত হইবে।" পিতা অধোবদনে রহিলেন—এত আশা, এত ভরসা কেমন করিয়া জলাঞ্জলি দিবেন? আর না দিলেই বা কি লাভ? যদি

প্রতিভাই না বাঁচে বিদ্যায় কি হইবে? অবশেষে পিতা সম্মত হইলেন।

প্রতিভা আর বিদ্যালয় যায় না, পিতা আর প্রাতে সায়াহ্নে পড়াইবার জন্য আহ্বান করেন না, রোগের চিহ্ন আজিও ভাল করিয়া দূর হয় নাই বলিয়া মাতা তাহাকে সরিয়া বসিতেও দেন না। এইরূপে এক বৎসর কাটিল। প্রতিভা যাহা শিখিয়াছিল তাহা ভুলিয়াছে, এই এক বৎসরে যাহা কিছু শিখিতে পারিত তাহা শিখা হয় নাই। পিতা বৎসরান্তে যখন প্রতিভার লেখাপড়ার প্রসঙ্গ তুলিলেন, মাতা প্রথমে গুরুতর আপত্তি, তার পর তুমুল বিবাদ, অবশেষে উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন আরম্ভ করিয়া সমর জয় করিলেন। প্রতিভাকে আর কে পায়?

আলস্য একবার অভ্যস্ত হইয়া গেলে তাহাকে পরিত্যাগ করা সহজ হয় না। আলস্য প্রতিভার জীবনের সহচর হইয়া উঠিল। প্রতিভা এখন দশ ডাকেও উত্তর দেয় না, শতবার উত্তেজনা করিলেও কোন কার্য্যে উৎসাহের সঙ্গে লিপ্ত হইতে চায় না। প্রতিভা খায় পরে নিদ্রা যায় কচিৎ সমবয়সীদিগের সঙ্গে ক্রীড়া করিতে যায়, কিন্তু তাহাতেও যেন ঘোর আলস্য।

পাঠক! প্রতিভার কথা আর কি শুনিবে? অতঃপর যাহা ঘটিল তাহা আজিও প্রতিভা আত্মজীবনে ভোগ করিয়া মরিতেছে! সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া তোমরা কি প্রতিভার জন্য একবিন্দু চক্ষের জল ফেলিবে? আর ফেলিলেই বা প্রতিভার তাহাতে কি লাভ? প্রতিভা আজ পিতৃহীন হইয়া প্রথমে সঞ্চিত পিতৃধন উড়াইয়াছে, তাহার পর দ্বারে দ্বারে কর্ম্মপ্রার্থী হইয়া হতাশ-লোচনে কতজনের প্রসন্নমুখের আশ্বাস-বচন শুনিবার জন্য উদ্গ্রীব হইয়া চাহিয়া আছে, অবশেষে কোন গতি না পাইয়া কোন ধনাঢ্যের রন্ধনশালায় পাচকের আসন গ্রহণ করিয়া কোনরূপে জীবনের দুঃখের দিন কাটাইতেছে! সে দুঃখের কাহিনী শুনিয়া সময় নষ্ট না করিয়া প্রিয়তম পাঠক পাঠিকা একবার আপনার স্নেহপাত্র সন্তান সন্ততির মুখের দিকে চাহিয়া আর একবার এই ক্ষুদ্র উপন্যাসটি পাঠ কর —লেখক চরিতার্থ হইবেন!

শ্মশান।

সংসার-সাম্রাজ্যে শ্মশান এক ভীষণ সমর-ক্ষেত্র। অনন্ত নিয়তির প্রতিকূলে বিষয়াসক্ত মানব এই ক্ষেত্রের যোদ্ধা, সংসার-শাসনে স্বজনের আপাত মধুর মিষ্ট বাক্যই ইহার মন্ত্র তন্ত্র, এবং দুশ্ছেদ্য মায়াপাশ অমোঘ অস্ত্র শস্ত্র। সংসার-ক্লিষ্ট মানব সংসারে যতই সাবধানে বিচরণ করুক না কেন, কিছুতেই তাহার সংসার-তৃষ্ণা প্রশমিত হইবার নহে। 'শ্মশান'

শব্দ শুনিয়াই সংসারী ভয়ে আড়ষ্ট হয়, এবং ভোগ-বাসনা-বৃত্তি পরিতৃপ্ত করিতে পারিল না বলিয়া একেবারে অসার, অপদার্থ ও অনুতপ্ত হইয়া পড়ে। মৃত্যু বিভীষিকায় সংসারী ভীত হয়, এবং যাহাতে শ্মশানের ভীষণ শাসনে বাধ্য হইতে না হয় যথাসাধ্য তাহার প্রতিবিধান করিয়া থাকে। যদি নিয়তি-চক্রের আবর্ত্তনে কাহাকেও কখনও নিষ্পেষিত করে, তাহার আত্মীয়বর্গ হাহাকার পূর্ব্বক সংসারের মায়া-জাল সুদূর-বিস্তৃত করিয়া থাকে। ধার্ম্মিকের আত্মা অচল ও অটল, মৃত্যুর ভীষণ ও কুটিল ভ্রূকুটি দেখিয়া তাহারা আতঙ্কে অস্থির হয় না, পরন্তু মৃত্যুকে চির সুহৃদের ন্যায় বাহু বিস্তার করিয়া আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত হয়। এ কবি-বাক্য বাস্তবিক সত্য। যে সংসারে পূত ভাবে বিচরণ করে, বিষয়-বাসনা-বিষ যাহার অস্থি মজ্জা স্পর্শ করিতে পারে নাই, সংসার-মায়া ও কামনা হইতে যে সুদূর-পরাহত, এবং যাহার একমাত্র সেই সচ্চিদানন্দ ধ্যান ও চিন্তা, সেই হিমাচলবৎ মহামনা মহাপুরুষকে মৃত্যু বিচলিত করিতে পারিবে কেন? মৃত্যু-নির্ভীক মহাত্মা ত্রৈলঙ্গ স্বামীই ইহার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত স্থল। উক্ত মহাত্মা ৺কাশীধামে স্বাধীন মনে ও স্বাধীন ভাবে স্থাণুর ন্যায় অবস্থান করিতেন। যেন সংসারের সহিত তাঁহার বাহ্য সম্বন্ধ একেবারে তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। নিয়তির অপরিহার্য্য আবর্ত্তনে তাঁহার প্রাণ-বায়ু কোথায় মিশিয়া গেল, তাহা কে বলিতে পারে? পরমাণু-পুঞ্জ-পূর্ণ অসার দেহ নর-ভাগ্যের অভিনয় করিল; মাটির দেহ মাটিতে মিশিয়া গেল। এইরূপ আরও কত শত সিদ্ধ পুরুষ পরমহংস প্রভৃতি মহাত্মাগণ মৃত্যুকে সাদরে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। ইহাতেই আমরা সংসার-ক্লিষ্ট জীবের আত্মার তুলনায় মহাত্মা-জীবনের আপেক্ষিক গুরুত্ব সহজে অনুভব করিতে পারি। ভোগ বাসনা প্রবৃত্তি অনন্তকাল-স্থায়িনী, কিছুতেই সহজে পরিতৃপ্ত ও চরিতার্থ হইবার নহে, যতই উহার সেবা করিবে ততই দেখিবে উহা হুতাশনবৎ লোলজিহ্বা প্রসারণ পূর্ব্বক প্রাণ মন গ্রাস করিতে বসিয়াছে। কিন্তু বিবেক বীরের এমন কঠোর শাসন ও মোহিনী শক্তি যে এবম্বিধ সংসারী ও সময়ে শেষদশা স্মরণ করিয়া অন্ততঃ ক্ষণকালের তরে পরমেশ্বর-পরায়ণ হয় এবং আত্মদশা ও গত জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া স্বকৃত দুষ্কৃতি হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবার জন্য সচেষ্ট হয়। এই অসীম সংসারে একটি শিশুকে জিজ্ঞাসা কর মৃত্যু কি? সে হয়ত ইহার কিছুই বুঝিতে পারিবে না, হাস্য করিয়া তোমার নিকট হইতে দূরে প্রস্থান করিবে; কারণ তাহার মৃত্যু-জ্ঞান একরূপ আকাশ কুসুম, সে সাংসারিক আনন্দে কাল অতিবাহিত করিবে, এই তাহার দিব্যজ্ঞান ও ধ্রুব বিশ্বাস। ধূলি-খেলাই তাহার জীবনের একমাত্র কর্ত্তব্য ও সরল মধুর হাসিই তাহার জীবন পথের পথিক, সে একই ভাবে সমগ্র জীবন যাপন করিবে; এই তাহার মনোগত ভাব। তারুণ্য-মদ-গর্ব্বিত উদ্ধত-মতি জনৈক যুবককে প্রশ্ন করিলেও ইহার প্রকৃত সদুত্তর পাওয়া দুষ্কর হইবে, কেন না সে যৌবন-মদে মত্ত হইয়া একান্ত মোহান্ধের ন্যায় ভবিষ্যতের দিকে

ভ্রমেও ভ্রুক্ষেপ করিবে না। বাস্তবিক যৌবনারম্ভে ভোগ-বাসনা-প্রবৃত্তিই সমধিক বলবতী হয়; গুরূপদেশ সচ্চিন্তা, গুরুজনের আজ্ঞা ও আধ্যাত্মিক ভাবনা, এ সকল কিছুই মনে স্থান পায় না। জনৈক অশীতিপর জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করিলে এই বিষয়ের প্রকৃত উত্তর পাওয়া যাইবে। কেন না বৃদ্ধের বর্ত্তমান জীবন নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপ অথবা পন্নগ-পরিত্যক্ত অসার নির্ম্মোকবৎ; কেবল দৃষ্টির আকর্ষণ মাত্র, প্রকৃত পক্ষে কিছুই নহে। বৃদ্ধের মনে আধ্যাত্মিক ভাব প্রবল, মৃত্যুর বিকট ভ্রুকুটি তাহার মনে নিয়তই উদিত হয়। শ্মশান-শয্যা, শ্মশানানল, গতজীবন ও পরকাল প্রভৃতি যুগপৎ তাহার হৃদয়মুকুরে প্রতিফলিত হইয়া বৃদ্ধের ভয় বৃদ্ধি করে এবং সোৎসাহে সেই পতিতপাবন পাপহারীর প্রতি প্রকৃত প্রেম প্রকাশ করিতে সে স্বতঃ প্রবৃত্ত হয়। শ্মশান সংসারের জীবকে জীবনের কর্ত্তব্য শিক্ষা দেয় এবং ভগবৎ প্রেমভাব-ব্যঞ্জক সরল কটাক্ষপাত দ্বারা তাহার আত্মা শোধন করিয়া থাকে। সংসারের কার্য্য-প্রণালী বৈষম্য-পূর্ণ; এই দেখিবে সংসার শান্তিময়, আবার পরক্ষণেই সাংসারিক ঝঞ্ঝাট-রূপ প্রবল ঝটিকায় সকল সুখ শান্তি একেবারে উড়াইয়া দিল। শ্মশান-মূর্ত্তি সংসারীর চক্ষে প্রায় প্রতি মুহূর্ত্তেই বিরাজিত থাকিতে দেখা যায়। আজকালের কুটিল গতিতে কোনও অনাথা বৃদ্ধার বার্দ্ধক্যের একমাত্র অবলম্বন পুত্র-রত্ন কাল-কবলিত হইল, সে দেখিল সংসার শ্মশান; আবার নব যুবক নব-পরিনীতা প্রাণ-প্রণয়িণীর পরলোক-যাত্রায় সংসার অসার ও জীবন ভার বোধ করিল, এবং দেখিল, এই সুখের সংসার ভীষণ শ্মশান-মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া করালবেশে তাহার সমক্ষে নৃত্য করিতেছে। এই অসীম সংসার-রাজ্য তন্ন তন্ন করিয়া অনুসন্ধান কর, ইহার প্রচুর দৃষ্টান্ত দৃষ্ট হইবে। সীতা, শকুন্তলা প্রভৃতি আর্য্যরমণীগণ পতি-পরিত্যক্তা হইয়া এ সংসারকে শ্মশান বলিয়া বোধ করিয়াছিলেন। আবার হেলেনা যখন ট্রয়ের নির্জ্জন প্রাসাদে বসিয়া গত জীবন আলোচনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার চক্ষে সংসার-সুষমা প্রকৃত শ্মশানরূপে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এ কথা ইতিহাস বেত্তা পাঠকের জানিবার বাকী নাই। সময়ে সময়ে সংসারীকেও সংসারের প্রতি বীতস্পৃহ হইতে দেখা যায়, কিন্তু সংসারাসক্তির কি ভীষণ প্রভাব, কি মোহিনী শক্তি! আবার নিমেষ মধ্যেই সংসারী নবজীবনে নবীন উৎসাহে সংসার-পথে বিচরণ করিতে অগ্রসর হয়; ভয়, বিভীষিকা, ভবিষ্যৎ চিন্তা বা আধ্যাত্মিকভাব, কিছুতেই তাহাকে তাহার গন্তব্য-পথ হইতে স্খলিত করিতে পারে না। মানব-দেহের শোচনীয় পরিণাম ঐ শ্মশান-ক্ষেত্র। যে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এই অখণ্ড ধরাকে খণ্ড বিখণ্ড করিতে চাহিতেছে, যাহার কঠোর শাসন দুর্ব্বল ও দরিদ্রকে নিয়ত নিপীড়িত করিতেছে, যাহার প্রবল প্রতাপ মেঘ-নির্ম্মুক্ত তপনের প্রখর করের ন্যায় সর্ব্ব সাধারণেরই অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে, তাহারও পরিণাম ফল ঐ শ্মশান, শেষ শয্যা ঐ ভীষণ ভূমি। আবার যাহাকে এক মুষ্টি উদরান্নের জন্য নিতান্ত দীন বেশে দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করিতে হইতেছে, তাহারও ভাগ্যে

সেই একই পরিণাম। ফলতঃ এখানে ধনী ও নির্ধন, ভূপতি বা ভিখারীর কোনও প্রভেদ নাই; জীবনাঙ্কের শেষাংশ সকলের পক্ষেই একরূপ সাধারণ। সংসারী শ্মশানের মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হয় সত্য, কিন্তু মৃতদেহ বা শ্মশানানল দেখিলেই বিবেকের আঘাতে মন বেদনা পায়, ভবিষ্যৎ জীবন চিন্তা করিয়া গত জীবনের পাপানুষ্ঠান জন্য নিজকে ধিক্কার দেয়, এবং সুদীর্ঘ নিশ্বাসে সেই ভূত-ভাবন ভগবানের নামোচ্চারণ করিয়া থাকে। শ্মশানক্ষেত্র ভূত প্রেত পিশাচ প্রভৃতির লীলাভূমি; এখানে শুম্ভ-ঘাতিনী শবাসনা শ্যামা করাল বদন বিস্তার করিয়া সাধকের ভীতি উৎপাদন করেন এবং বিরূপাক্ষ নিয়ত জাগতিক কার্য্য কলাপ প্রত্যক্ষ করিয়া উহাতে অক্ষি নিমীলিত করিয়া থাকেন। একথা কবিকল্পনা প্রসূত হইলেও আমরা ইহার সম্যক্ পক্ষপাতী। বস্তুতঃ যে শ্মশান মানবদেহের পরিণাম, যাহার নাম একবার মাত্র কর্ণ-কুহরে প্রবিষ্ট হইলে বিষয়ী বৈভব-বাসনা ভীত হয়, এবং যাহা সকলেরই অনন্ত নিয়তিরূপে পরিগণিত, তাহা এইরূপ ভয়-মিশ্র না হইয়া আর কি হইবে? আবার সাধনার সুন্দর সুযোগ ও সময় সন্ধ্যাকাল এবং প্রকৃত স্থান শ্মশানক্ষেত্র। সন্ধ্যায় শ্মশান ক্ষেত্র প্রকৃত পক্ষেই ভয়ানক দেখায়, এবং ভূত-ভৈরবের ভয়ানক রোল ও বিকট হাসি যেন শ্রুত হইয়া ক্ষীণমতি মানবের চিত্ত-বিভ্রম জন্মায়। পথশ্রান্ত পথিক প্রতি মুহূর্ত্তেই বিকট বিভীষিকায় ভীত হয়। বস্তুতঃ জগতে ভয় ভাবনার কোনও বস্তু থাকিলে তাহা শ্মশান। শ্মশান হইতে আমাদের মানসিক প্রকৃতির কিরূপ বিকৃতি হয় তাহাই ইদানীং আলোচ্য ও বিবেচ্য বিষয়। শ্মশান ক্ষেত্র অনেকাংশে আমাদের প্রকৃতির বিপর্য্যয় বা রূপান্তর ঘটায়। একদিকে দেবালয়ের শঙ্খ ঘণ্টাদির তীক্ষ্ণ-মধুর নিনাদ, আবার আর দিকে শ্মশান বিহারী নিশাচরদের গভীর কলরব বা ঝিল্লির সুমধুর নিক্কণ, এতদুভয়ই শান্তিরসপ্রদ, একবার মাত্র শুনিলে মনে স্বতঃই শান্তিরসের প্রবাহ আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে। শ্মশানে যোগাসনে বসিতে না পারিলে সাধক সেই জগদানন্দ ময়ীর সন্দর্শন সম্পদ লাভ করিতে পারে না, একথা, একরূপ স্বতঃ সিদ্ধ। একান্ত একাগ্রতা লাভ ব্যতীত পরম পদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাই বল দেখি, সংসারে এমন স্থান কোথায়? নিয়ত সংসারের কুটিল কার্য্য কলাপ মানব মনকে সমাকুল করিয়া তুলে, সুতরাং তাহার পরমার্থ চিন্তার সুযোগ ও সময় কোথায়? তাই বলি, শ্মশানে একাসনে যোগাসন করিতে না পারিলে আর আত্ম-শুদ্ধির অন্যতর উপায় নাই! এইজন্যই বলিতে পারি শ্মশান বিষয়ীর শত্রু, সর্ব্বলোক-ভয়ঙ্কর, এবং সাধকের পরম পবিত্র প্রিয়স্থান, তাহাতে আর অণুমাত্রও সংশয় নাই।

সরল প্রাকৃত-দর্শন।

উপক্রমণিকা।

১। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা। পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা ব্যতীত বাহ্যজগতের কোন তত্ত্বই জানা যায় না; কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা, কি তাহা আগে ভাল করিয়া বুঝা আবশ্যক। বৎসরের মধ্যে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ এই দুই মাসে রৌদ্রের উত্তাপ অত্যন্ত প্রখর হয়; প্রতি বৎসর এইরূপ দেখিয়া দেখিয়া প্রাচীন পণ্ডিত-গণ স্থির করিয়াছেন এই দুই মাস গ্রীষ্মকাল। এইরূপে বৎসরের কোন্ সময় কোন্ ঋতু, তাহা তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন। ঘটনা-বলী যেরূপ ঘটিতেছে সেইরূপই তাহাদিগকে পরিলক্ষ্য করাকে পর্য্যবেক্ষণ কহে। অতএব পর্য্যবেক্ষণ দ্বারাই প্রাচীন পণ্ডিতগণ বৎসরের ঋতু পর্য্যায় স্থির করিয়াছেন। এইরূপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই প্রাচীন জ্যোতির্ব্বিদগণ সূর্য্য চন্দ্র গ্রহাদির গতি ও কক্ষ নির্ণয় করিয়াছেন।

শুধু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা নৈসর্গিক ঘটনার কারণ আমরা অতি অল্পই জানিতে পারি। আমরা সকলেই আকাশে বিদ্যুৎ, নিশাকালে শিশির পতন, জলাভূমিতে আলেয়া, মেঘ, বৃষ্টি ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি। কিন্তু পরীক্ষা ভিন্ন অধিকাংশ স্থলে ঘটনাবলীর পরস্পর কার্য্যকারণ সম্বন্ধ জানিতে পারি না। অনেক প্রাচীন পণ্ডিত মনে করিতেন নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী হইতে রাত্রিতে এক প্রকার বাষ্প-প্রবাহ নির্গত হইয়া পৃথিবীতে আসিয়া শিশির রূপে পরিণত হয়। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই বিষয়ে এই প্রকার ভিন্ন ভিন্ন কাল্পনিক মত প্রচলিত ছিল, অবশেষে পরীক্ষা দ্বারা ইহার প্রকৃত তত্ত্ব স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাহ্য জগতে বহুসংখ্যক ঘটনা সমকালে ঘটিতেছে, শুধু পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা তাহাদের একটীর সহিত অন্যটীর সম্বন্ধ নির্ণয় করা অসাধ্য। জড় পদার্থ-সমূহ বাহ্য জগতে যে অবস্থায় আছে, তাহাদিগকে তাহা হইতে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রাখিলে তাহাদের একের উপর অন্যের ক্রিয়া দ্বারা যে সকল ঘটনা হয়, তাহা পরিলক্ষ্য করাকে পরীক্ষা কহে। রাত্রিতে শিশির পাত হয়, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আকাশে প্রকাশিত হয়, পৃথিবী ও তদুপরিস্থ বৃক্ষ লতা প্রভৃতি যাবতীয় জড় পদার্থ শীতল হয়; অধিকাংশ জন্তুগণ বিশ্রাম করে, ইত্যাদি নানা ঘটনা হইতেছে। কোন্ ঘটনাটী শিশির পাতের কারণ, তাহা জানিতে হইলে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার শিশির উৎপাদন করিয়া তাহার কারণ নির্ণয় করিতে হইবে। দিনের বেলা যদি গ্লাসে অত্যন্ত শীতল জল রাখি, তাহা হইলে অনেক সময় দেখি যে গ্লাসের উপর চারিদিকে শিশিরের ন্যায় জলবিন্দু সঞ্চিত হয়। এক্ষণে নক্ষত্র আকাশে প্রকা-শিত নাই, জন্তুগণও বিশ্রাম করে না, অতএব ইহাদের সহিত শিশির-পাতের কোন সম্বন্ধ

নাই। গ্ল্যাসটী শীতল জল সংস্পর্শে শীতল হইয়াছে; ইহা কি পরিমাণে শীতল হইয়াছে, পরীক্ষার সময়ে উপযুক্ত যন্ত্রদ্বারা তাঁহা জানা আবশ্যক। গ্ল্যাসের ভিতরের জল বাহিরে আসে নাই। শীতল পাত্র-সংস্পর্শে বায়ুরাশি হইতে জল সঞ্চিত হইয়াছে! এইজল বাষ্পরূপে বায়ু-রাশিতে পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল। আমরা জানি, তাপ প্রদান করিলে জল বাষ্প হইয়া বায়ুর ন্যায় স্বচ্ছ ও অদৃশ্য হইয়া যায়; রৌদ্রে কাপড় শুকাইতে দিলে বস্ত্রস্থ জল বাষ্পে পরিণত হয়। পুষ্করিণী, নদী প্রভৃতি জলাশয় হইতে সূর্য্যতাপে বাষ্প উত্থিত হয় এবং বায়ু-রাশির সহিত মিশিয়া যায়। এই বাষ্পই পুনরায় শীতল পাত্র-সংস্পর্শে ঘনীভূত হইয়া শিশির বিন্দুরূপে পরিণত হয়, বায়ু-রাশিতে কি পরিমাণ বাষ্প থাকিলে, কি পরিমাণ তাপাবস্থায় (শীতলতায়) কি পরিমাণ বাষ্প জলাকারে ঘনীভূত হয়, ইত্যাদি পরীক্ষা দ্বারা নির্ণয় করিতে হইবে। পরীক্ষা দ্বারা পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, রাত্রিতে পৃথিবী ও তদুপরিস্থ যাবতীয় পদার্থের শীতল হওয়াই শিশির পাতের কারণ। এই পরীক্ষা-ক্রিয়া অত্যন্ত দুরূহ। অসংশ্লিষ্ট ঘটনা-সমূহ পরিত্যাগ করিয়া পরীক্ষককে উদ্দিষ্ট ঘটনা সম্পাদন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ ঘটনা অথবা পদার্থ অসংশ্লিষ্ট, তাহা নির্ণয় করাও অত্যন্ত কষ্ট-সাধ্য। এসকল বিষয়ে পরীক্ষাকালে সম্পূর্ণরূপে নিজের বিবেচনার উপর নির্ভর করিতে হইবে।

২। কার্য্য ও কারণ। ঘটনা-সমূহের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ নির্ণয় করা প্রাকৃত দর্শনের একটী মুখ্য বিষয়! কার্য্য ও কারণ কি, তাহা বুঝিতে হইবে। যদি কোন একটী ঘটনা নিয়ত রূপে অন্য কোন একটীর অব্যবহিত পরেই সংঘটিত হয়, তাহা হইলে পূর্ব্ববর্ত্তীটীকে কারণ ও পরবর্ত্তীটীকে কার্য্য কহা যায়। যখনই হস্তদ্বারা অগ্নি স্পর্শ করা হয়, তখনই হস্ত দগ্ধ হয়। এস্থলে অগ্নিস্পর্শ কারণ, হস্তদাহ কার্য্য। যখনই দুইটী পদার্থ পরস্পর ঘর্ষণ করা যায়, তখনই তাপ উৎপন্ন হয়; এস্থলে ঘর্ষণ কারণ তাপোৎপাদন কার্য্য। এই কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ দ্বারা আমরা ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য-সংঘটন মাত্র জানিতে পারি, অর্থাৎ কোন্ ঘটনার পর কোন্ ঘটনা হইবে, তাহাই মাত্র বলিতে পারি; কিন্তু ইহাদের বাস্তবিক মূল কারণ কি, তাহার কিছুই জানিতে পারি না। আমরা বলি পোড়ার কারণ আগুন, কিন্তু আগুণে কেন পুড়ে; জিজ্ঞাসা করিলে আমরা এই "কেন" র কোন উত্তর প্রদান করিতে পারি না। ফলতঃ আগুণে কেন পুড়ে, তাহার আমরা কিছুই জানি না।

৩। গুণ ও ধর্ম্ম। অগ্নির ধর্ম্ম অথবা গুণ দাহন করা; অর্থাৎ যে পদার্থ নিয়ত রূপে যে কার্য্য উৎপাদন করে সেই কার্য্য সেই পদার্থের গুণ অথবা ধর্ম্ম। অতএব গুণ ও ধর্ম্ম কার্য্য এবং পদার্থ কারণ। বস্তুতঃ ইহা কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ ভিন্ন আর কিছুই নাহে।

৪। প্রকৃতির সমভাব। বর্ত্তমান সময়ে যে কারণ যে কার্য্যের উৎপাদক, অতীতেও সেই কারণ সেই কার্য্যের উৎপাদক ছিল, এবং ভবিষ্যতেও সেই কারণ সেই কার্য্যের উৎপাদক থাকিবে। আগুণে এখন হাত পুড়ে

অতীতেও অগ্নির এই গুণ ছিল, ভবিষ্যতে ও থাকিবে। যে সকল নিয়ম যে প্রকারে প্রকৃতিকে বর্ত্তমান সময়ে শাসন করিতেছে, অতীতেও সেই প্রকারে শাসন করিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে ও সেই প্রকারে অপ্রতিহত ভাবে শাসন করিবে। এই সমভাবের বিশ্বাসের উপর প্রাকৃত দর্শনের চর্চ্চা নির্ভর করে। এইরূপ বিশ্বাস-কর্ত্তৃক চালিত না হইলে প্রাকৃত দর্শনে কোন ভবিষ্যৎ গণনা কিম্বা ভবিষ্যৎ বাণী সম্ভব হইত না, এবং প্রাকৃত-দর্শন-লব্ধ জ্ঞানেও কোন ফলোদয় হইত না। আকর্ষণের বর্ত্তমান নিয়মানুসারে শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ও শত সহস্র বৎসর পরের গ্রহণ গণনা করা যায়। অতীতে এই নিয়মের কোন ব্যতিক্রম হয় নাই, ভবিষ্যতেও হইবে না, এই প্রতীতি না থাকিলে এইরূপ শত সহস্র বৎসর পূর্ব্বের ও পরের গ্রহণ গণনা করা যাইত না। এই সকল ও অন্যান্য বিষয়ক ভবিষ্যৎ গণনা পরবর্ত্তী ঘটনা দ্বারা সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। আমাদের দৈনন্দিন কার্য্যও এই বিশ্বাস কর্ত্তৃক চালিত হইয়া থাকে, এবং এতদনুসারেই আমরা ভবিষ্যতের বিপৎপাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য নানারূপ উপায় ও আয়োজন করিয়া রাখি।

৫। ইন্দ্রিয়ানুভূতি। ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা বাহ্য জগতে রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ ও তাপ প্রত্যক্ষ করি। যে সকল বাহ্যিক ঘটনা ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মায়, তাহাদের স্বরূপ নিরূপণ করা প্রাকৃত-দর্শনের একটী মুখ্য উদ্দেশ্য। যষ্টি দ্বারা প্রহার করিলে বেদনা অনুভূত হয়। এই আন্তরিক ঘটনা অনুভূতি, তাহার বাহ্যিক কারণ যষ্টির প্রহার। যদি আমরা যষ্টি দেখিতে না পাইতাম, অথবা অন্য কোন ইন্দ্রিয়দ্বারা তাহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিতাম, তাহা হইলে মনের মধ্যে বিচার করিয়া অনুমান করিতাম যে, এই বেদনানুভূতি একটী আন্তরিক ঘটনা মাত্র; পরে পরীক্ষা ও পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা ইহার বাহ্যিক কারণ নির্ণয় করিতে হইত। অন্যান্য ইন্দ্রিয়-জ্ঞান-সম্বন্ধেও এই রূপ। একটী বাঁশীতে ফুৎকার দিলে বায়ুরাশিতে এক প্রকার আন্দোলন উৎপন্ন হয়; এই আন্দোলন জলের তরঙ্গের ন্যায় চতুর্দ্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। এই আন্দোলন শ্রবণেন্দ্রিয়ে পৌছিলেই, আমাদের বাঁশীর শব্দের অনুভূতি হয়। আন্তরিক অনুভূতি শব্দের সহিত বাহ্যিক ঘটনা বায়ুআন্দোলনের যে সম্বন্ধ, বেদনানুভূতির সহিত যষ্টি প্রহারের ও ঠিক সেই সম্বন্ধ। ইন্দ্রিয়ানুভূতি সম্পূর্ণ আন্তরিক, ইহার বাহ্যিক কারণ নির্ণয় করা প্রাকৃত-দর্শনের একটী মুখ্য বিষয়।

৬। প্রাকৃত দর্শনের বিষয়। বাহ্যিক আন্দোলন অথবা অভিঘাত পৌছিলেই ইন্দ্রিয়ে একপ্রকার ক্রিয়া হয়, এবং তাহার পর ইন্দ্রিয়ানুভূতি জন্মে। ইন্দ্রিয় সকলের গঠন ও ক্রিয়া শরীর-সংস্থান-শাস্ত্রের বিষয়। ইহাও প্রাকৃত দর্শনের এক অংশ; কিন্তু বোধ-সৌকর্য্যার্থে ইহা স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হইয়া থাকে। রসায়ন, জ্যোতিষ প্রভৃতি ও প্রাকৃত-দর্শনের অন্তর্গত; কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কারণ-নিবন্ধন শরীর-সংস্থান-শাস্ত্রের ন্যায় ইহারাও স্বতন্ত্ররূপে আলোচিত হয়।

সচরাচর প্রাকৃত-দর্শনে নিম্নলিখিত বিষয়-গুলির আলোচনা হইয়া থাকে।

১। জড় পদার্থ।

২। গতি।

৩। শক্তি।

৪। শব্দ।

৫। তাপ।

৬। আলোক।

৭। তাড়িত ও চুম্বক।

ছোটকথা।

১

"যাহা করিয়াছি তাহা করিয়াছি—আর না।" এই কথাটি প্রাণের সঙ্গে বলিতে একটুকু বীরত্বের আবশ্যক। এই বীরত্ব যে দেখাইতে পারে, সেই সংসার-সংগ্রামে জয়যুক্ত হইয়া থাকে। যে সকল কুঅভ্যাস জীবনের সঙ্গের সঙ্গী হইয়াছে, শত চেষ্টাতেও আজ কাল করিয়া যাহাদের দৃঢ়বন্ধন মোচন করিতে পারি না, একবার যদি বীর প্রতাপে বলিতে পারি 'আর না', মুহূর্ত্তে তাহারা দূরে পলায়ন করে। কিন্তু বলি বলি করিয়া এই ক্ষুদ্র কথাটি এ জীবনে বলা হইল না, অথচ বলিবার সময় ক্রমেই ফুরাইয়া যাইতেছে।

২

কত কথা বলিলাম, কত কথা শুনিলাম। কিন্তু যাহাতে প্রাণ স্পর্শ করে, এমন কথা কত বলিয়াছি, কত শুনিয়াছি, তাহা ত অনুসন্ধান করিয়া পাই না। এত কথা শুনিলাম, কিন্তু প্রাণ যেমন তেমনি থাকিল কেন? সেই পুরাতন জড়ভাব, সেই পুরাতন পাপ তাপ, সেই পুরাতন মৃতভাব আজিও প্রাণকে জড়ীভূত করিয়া রাখিয়াছে! এত কথা বলিলাম—কেবল পরকে শুনাইলাম। আপন প্রাণকে কয়টা কথা শুনাইয়াছি?

৩

সকলেই বলে ভাল হও—আমারও ইচ্ছা করে ভাল হইয়া যাই। কিন্তু পারি না কেন? উপদেশের অভাব নাই, বরং তাহার আবশ্যক অপেক্ষা বাড়াবাড়িই আছে; কিন্তু ইচ্ছা কোথায়? ভাল হইবার ইচ্ছা আছে, অথচ ভাল হইতেছি না, তাহার নাম কি ইচ্ছা? ইচ্ছা সকর্ম্মক বৃত্তি—যেখানে ইচ্ছা, সেখানেই কার্য্য। মনে ভাবিতেছি ভাল হইব, মুখে বলিতেছি ভাল হইব; কিন্তু কার্য্যের বেলা তাহার কি অনুষ্ঠান করিলাম?

৪

দিন ফুরাইয়া যায়, কেবল কলহ ফুরায় না—গ্লানির অবসান হয় না। কত অন্যায়

কার্য্য করিয়া জীবনকে কলুষিত করিয়াছি, সে সকল দিন আর নাই, তাহারা জলস্রোতের মত কোথায় ভাসিয়া গিয়াছে। কিন্তু সেই সকল অন্যায় কার্য্যের কলঙ্ক ত তাহার সঙ্গে ভাসিয়া যায় নাই, তাহা যে আজিও জীবনকে কলুষিত করিয়া রাখিয়াছে! জীবনের কলঙ্ক-ভঞ্জন করিবার উপায় কি?

৫

আমি যেদিন চলিয়া যাইব, তোমরা বসিয়া বসিয়া দেখিবে। কেহ হাসিবে, কেহ কাঁদিবে, কেহ বা উচ্চ হাহাকার করিবে! কিন্তু আমাকে কেহ ফিরাইতে পারিবে কি? তবে তোমাদের দশ জনের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমি একবারও আপন মুখের দিকে চাহিবার অবসর পাই না কেন?

৬

শৈশবে অনেক ধূলাখেলা করিয়াছি, তথাপি ধূলাখেলার সাধ মিটিল না! যৌবনে সেই ধূলাখেলা খেলিবার জন্য ভাল করিয়া লেখা পড়া করিলাম না—এখনও বৃদ্ধদশায় সেই ধূলাখেলা করিবার জন্য ভাল করিয়া আপন কায করিতে পারিতেছি না! এ ধূলা-খেলার কি কখন অবসান হইবে না?

৭

আমাকে কেহ চিনিল না। আমিও সকলের সঙ্গে মিশিয়া মানুষের দেখা দেখি, আমাকে চিনিবার জন্য কোন দিন চেষ্টা করিলাম না। সকলেই অপরকে চিনিবার জন্য পাগল—পরের মুখের একটুকু হাসির জন্য, পরের কথায় একটুকু প্রশংসা পাইবার জন্য সকলেই ব্যস্ত। এ সংসারে আপনাকে চিনিবার জন্য কেহ কি যত্ন করিবে না?

৮

তুমি আজ বালক—কিন্তু কাল তুমিই যুবা হইবে। তুমি আজ যুবক—কিন্তু কাল তুমিই বৃদ্ধ সাজিবে। তুমি আজ বৃদ্ধ—কিন্তু কাল তোমাকে আর এ জগতে কোথায়ও খুঁজিয়া পাইব না। তোমার আদি, অন্ত, মধ্য, সর্ব্বত্র এত পরিবর্ত্তন, অথচ তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘুমাইতেছ কেন?

৯

আমার মত কত শত লোক মানুষ হইয়া দেবতা হইয়া গেল; আমি সংসারের গলিত নর্দ্দমায় পড়িয়া রহিয়াছি কেন? সুখের আশায় মুগ্ধ হইয়া কষ্টসাধ্য কার্য্য পরিত্যাগ করিলাম—কিন্তু আমি সুখী না দুঃখী? সকলে চলিয়া গেল, আমি কেবল বসিয়া বসিয়া দেখিতেছি, আর ভাবিতেছি!

১০

কি শিখিতে আসিয়াছিলাম, কি শিখি-লাম? অনেক কথা শিখিয়াছি, কিন্তু সত্য কথা শিখি নাই। অনেক তর্ক শিখিয়াছি, কিন্তু সারসিদ্ধান্ত শিখি নাই। আমি বাক্যে পণ্ডিত—কাহারও নিকট পরাজয় স্বীকার করিনা। মুখে সাধু—কাহারও নিকট উপ-দেশ শুনিবার আবশ্যকতা মানি না। কিন্তু কার্য্যে আমি বড়ই মূর্খ—বড়ই পাপী! আমি যাহা করিয়াছি, মহামূর্খও বুঝি তাহা করে না, আমি যাহা ভুগিতেছি, মহাপাপীও বুঝি তেমন ভোগ ভুগে না! আমি আত্মজীবন বিনষ্ট করিয়াছি, আপন পায়ে আপনি কুঠার মারিয়াছি—তোমরা কি আমাকে বাঁচাইতে পারিবে?

১০

আসল ও নকল।

অক্ষয়ের অত্যাচারে গ্রামস্থ সকলেই বড় উৎপীড়িত। সে এক জন প্রকাশ্য বদমাইশ ও চোর। সে যে কত লোকের ধন সম্পত্তি অপহরণ করিয়াছে, কত লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। তাহার হৃদয়ে দয়া মায়ার লেশ মাত্র নাই। লোকের দুঃখ দেখিলে তাহার দুঃখ হয় না, লোকের আর্ত্তনাদে তাহার হৃদয় দ্রব হয় না। প্রত্যহই সে নূতন নূতন অত্যাচার করে এবং প্রত্যহই তাহার বিরুদ্ধে রাজার নিকট আবেদন ও দরখাস্ত পড়িয়া থাকে। কিন্তু অক্ষয় এমনই ধূর্ত্ত যে এপর্য্যন্ত রাজা তাহাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন নাই। তিনি নানা প্রকার চেষ্টায় বিফল হইয়া শেষে ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, যে ব্যক্তি অক্ষয়কে ধৃত করিয়া দিবে, তাহাকে তিনি ৫০০০৲ টাকা পুরস্কার দিবেন।

রাজার এই ঘোষণা অক্ষয়ের কর্ণগোচর হইল। সে তাহাতে ভীত না হইয়া বরং আরও উৎসাহিত হইল। মনে মনে করিল "আমি সামান্য গ্রামবাসীদের বাটীতে চুরি করিয়া বৃথা হস্ত ও মন কলুষিত করিয়াছি! অদ্য স্বয়ং রাজাকে শিক্ষা দিতে হইবে; আমার প্রতাপ কি পর্য্যন্ত তাহা তাঁহাকে বিশেষরূপ দেখাইতে হইবে।"

সমস্ত দিন অপেক্ষা করিয়া অক্ষয় রজনীযোগে স্বকার্য্য-সাধনে বাহির হইল। তাহাকে রাজ-প্রাসাদ অভিমুখে যাইতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি; কিন্তু তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিতে পারি নাই; কারণ তাহার সাহস অসীম, কি করিতে কি করে স্থিরতা নাই। অতএব ঐ রজনীতে সে রাজ বাটীতে কি প্রকারে প্রবেশ করিল এবং তথায় কি কি কার্য্য করিল তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু পর দিবস প্রাতঃকালে যাহা যাহা শুনিলাম ও দেখিলাম তাহাই বলিতেছি।

রাজা প্রত্যূষে অন্দর মহল হইতে বাহির হইয়া মন্ত্রীকে বলিলেন "দেখ, আমার কন্যা বয়স্থা হইয়াছে, তাহাকে আর বিবাহ না দিলে চলে না। গত রজনীতে মহিষী আমাকে তজ্জন্য নানারূপ অনুযোগ করিয়াছেন। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে অদ্য প্রত্যূষে দ্বারদেশ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে যে পুরুষের সহিত সাক্ষাত হইবে, তাহাকেই পাত্র মনোনীত করিয়া কন্যা সম্প্রদান করিব ও অর্দ্ধেক রাজত্ব দিব। অতএব পাত্র অন্বেষণের চেষ্টা কর, আর বিলম্ব করিও না।"

মন্ত্রী দ্বার-রক্ষককে ডাকিয়া বলিলেন, "দ্বারদেশ হইতে বহির্গত হইয়া সম্মুখে

যে পুরুষকে দেখিতে পাইবে, তাহাকেই সসম্মানে রাজ সদনে লইয়া আসিবে। রাজা তাহাকে কন্যা সম্প্রদান করিবেন।”

দ্বার-রক্ষক প্রস্থান করিল এবং দ্বার-দেশ হইতে বহির্গত হইয়া এক বৃক্ষ-মূলে জটা-জুট-ধারী এক সন্ন্যাসী দেখিতে পাইল। তাহার সমস্ত অঙ্গ বিভূতি-ভূষিত, পরিধানে ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, গল-দেশে রুদ্রাক্ষ-মালা। সন্ন্যাসী ধ্যান-নেত্রে গম্ভীর ভাবে বৃক্ষ-মূলে উপবেশন করিয়া আছেন।

দ্বার-রক্ষক বিনীতভাবে বলিল—“ঠাকুর, গাত্রোত্থান করুন, রাজা আপনাকে আহ্বান করিয়াছেন।”

সন্ন্যাসী নিরুত্তর।

দ্বার-রক্ষক পুনরায় বলিল—“ঠাকুর, গাত্রোত্থান করুন, আপনাকে রাজসদনে যাইতে হইবে।”

সন্ন্যাসী নিরুত্তর।

দ্বার-রক্ষক এইরূপ বারম্বার আহ্বান করিয়া সন্ন্যাসীর কোন উত্তর না পাইয়া মন্ত্রীকে যাইয়া জানাইল যে, দ্বার-দেশ হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমেই এক জন সন্ন্যাসীর সহিত সাক্ষাত হইয়াছে ; কিন্তু কিছুতেই তিনি আগমন করিলেন না। তখন মন্ত্রী একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, পেস্কারকে পাঠাইলেন। কিন্তু তাহাতেও কোন ফল হইল না, সন্ন্যাসী আগমন করিলেন না। তখন মন্ত্রী মহাশয় স্বয়ং গমন করিলেন, কিন্তু তিনিও সন্ন্যাসীকে আনিতে পারিলেন না।

তখন রাজার নিকট সম্বাদ দেওয়া হইল। রাজা মহিষী সমভিব্যাহারে সন্ন্যাসী-সমীপে উপস্থিত হইয়া নানারূপ স্তুতি মিনতি করিতে লাগিলেন। কিন্তু সন্ন্যাসী তথাপি নিরুত্তর। অবশেষে রাজ-দম্পতী গললগ্নীকৃত-বাসে সন্ন্যাসীর পদাবনত হইবার উপক্রম করিলে সন্ন্যাসী ত্রস্তবেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং বলিতে লাগিলেন ;—

“রাজন্, আমি দুরাত্মা অক্ষয়, সন্ন্যাসী নহি। আপনি আমার নকল সাজ দেখিয়া ভুলিয়াছেন ? আহাহা ! না জানি আসল সাজে কত মাধুর্য্য ! মহারাজ, আজ আমি আপনার গতিকে আসল ও নকলের প্রভেদ বুঝিলাম। আজ আপনি আমাকে দিব্য জ্ঞান দিয়াছেন। আমি দেখিতেছি যে এই পৃথিবীর আগাগোড়া সমস্তই নকল। আমাদের আসল পিতা স্বর্গে, আসল সুখ স্বর্গে, আসল অস্তিত্ব পর্য্যন্ত স্বর্গে। এখানকার নকল মায়ায় ভুলিয়া নকল স্নেহের বশীভূত হইয়া, আসলের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি না। মহারাজ, আপনার মণি-মাণিক্য ধন-দৌলত সমুদায়ই নলক,—আসল কেবল পরমার্থ ; আপনার পুত্র-কন্যা, দাস-দাসী সমুদায়ই নকল ;—আসল কেবল পরব্রহ্ম। মহারাজ, নকলের বশীভূত হইয়া আসল হারাইবেন না। আপনার কন্যা ও অর্দ্ধেক রাজত্ব দিয়া আমাকে আর নকলের বশীভূত হইতে অনুরোধ করিবেন না।”

“মহারাজ, আরও দেখুন, আমি ঘোর নারকী ; চিরকাল পরের অনিষ্ট করিয়া কাল কাটাইয়াছি, আজ আমি আপনাকে শিক্ষা দিতে আসিয়াছিলাম, কিন্তু আপনি আমাকে পরম শিক্ষা দিয়াছেন। গত রজনীতে আমি আপনার রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করিয়াছিলাম, এমন কি আপনার শয়ন কক্ষের নিকট গমন

করিয়াছিলাম। রাজকন্যার বিবাহ সম্বন্ধে আপনার ও মহিষীর যে কথোপকথন হয় এবং আপনি যে প্রতিজ্ঞা করেন তাহার সমস্তই শুনিয়াছিলাম। রাজকন্যা ও রাজত্ব-লাভের বাসনায় এই নকল সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করিয়াছিলাম। প্রত্যূষে যখন আপনার দ্বার-রক্ষক আমাকে ডাকিতে আসিল, তখন মনে করিলাম "আরও ক্ষণেক স্তুতি মিনতি করিলে যাইব"। পরে যখন আপনার পেস্কার আসিলেন তখন আমার উচ্চাভিলাষ ক্রমে বাড়িয়া গেল, মনে করিলাম "মন্ত্রী না ডাকিলে যাইব না"। কিন্তু যখন মন্ত্রী মহাশয় আসিলেন, তখন ভাবিলাম, "আহা কি সাজে সাজিয়াছি, সকলেই আমার পদানত"। এক্ষণে আপনি সস্ত্রীক আসিয়াছেন, আপনিও আমার নকল সাজে ভুলিয়াছেন। যাহাকে ধৃত করিবার জন্য ৫০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করিয়াছেন, তাহার নিকট আপনি গললগ্নীকৃত-বাসে দণ্ডায়মান! মহারাজ, নকল সাজে যদি এতদূর হয়, তবে না জানি আসল সাজের কত মহিমা, কত পরাক্রম"।

"মহারাজ, কি কারণে কি হয় বলা যায় না। পরমেশ্বর কোন্ সূত্রে কাহাকে বাঁধিয়া কোন্ পথে লইয়া যান, তাহা অন্ধ মনুষ্য স্থির করিতে পারে না। কল্য যে ঘোর নারকী ছিল, অদ্য সে পরম ধার্ম্মিক হইয়াছে, এক দিনে, এমন কি এক মুহূর্ত্তে তাহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আজ এক মুহূর্ত্তে আপনি আমার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়াছেন, আসল ও নকলের প্রভেদ বুঝাইয়াছেন। আপনি আমার গুরুদেব, আপনাকে প্রণাম করি"।

"মহারাজ, চেষ্টা করুন, বৃথা সময় নষ্ট করিবেন না। মনুষ্যের হৃদয়-ক্ষেত্র সামান্য শস্য-ক্ষেত্রের ন্যায়। উভয়েরই উৎপাদিকা শক্তি আছে। তবে কার্য্য-কারণ বশতঃ কাহারও শক্তি কম, কাহারও অধিক। আমার শক্তি কম ছিল, কিন্তু আপনি উপযুক্ত সময়ে আমার হৃদয়-ক্ষেত্রে বীজ বপন করিয়াছেন, আমার হৃদয়-তন্ত্রী নাচিয়া উঠিয়াছে, যেন ঠিক সময়ে সমে আঘাত পড়িয়াছে। আপনাদের শক্তি অধিক আছে, অতএব চেষ্টা করুন; সময় বহিয়া গেলে আর ফল ফলিবে না। মহারাজ, অসময়ে বীজ বপন করিয়া সহস্র চেষ্টা করুন, সর্ব্বদা জল সিঞ্চন করুন, কিছুতেই আশানুরূপ ফল পাইবেন না। আপনাকে আর অধিক কি বলিব; আপনি আমার পরমগুরু। আপনাকে প্রণাম করি"।

অক্ষয় রাজাকে প্রণাম করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়ন করিলেন এবং লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া বিজন কাননে প্রবেশ করিলেন।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

আগ পাছ বিচারিয়া সঙ্কল্প করিবে,
আরব্ধ করিতে পূর্ণ সত্বর হইবে।

আরম্ভের পূর্ব্বে দেখ করিয়া বিচার,
আছে কি না উপযুক্ত শক্তি আপনার।

দেহের সৌন্দর্য্য যেন পুষ্প নিরমল,
ধর্ম্ম কিন্তু জীবনের সুখ-সেব্য ফল।

বিষয়েতে হয় লোক চতুর যেমন,
বিষয়েতে হয় তার পরীক্ষা তেমন।

বিপদ পড়িলে কর ধীরতা আশ্রয়,
ধিনয় অভ্যাস কর সৌভাগ্য-সময়।

মনে মনে সাধু চিন্তা করিলে পোষণ,
পাপের কল্পনা স্থান পাবে না কখন।

অকৃতজ্ঞ হয় যবে মানবের মন,
ছিন্ন হয় বন্ধুতার সুদৃঢ় বন্ধন।

এজগতে আছে এক পরশ-রতন,
সন্তোষ তাহার নাম বলে বুধগণ।

কর্ম্মেতে তৎপর যদি থাক অনুক্ষণ,
পারিবে না ভুলাইতে পাপ-প্রলোভন।

রীতি ক্রমে পাপ যদি প্রচলিত হয়,
চিরদিন তবু পাপ পাপই নিশ্চয়।

কৌটিল্য কাপট্য ছাড়ি সরল হইবে,
তা হইলে চরিত্রের মহত্ব বাড়িবে।

সাবধানে রসনার করিবে শাসন,
নতুবা ঘটিতে পারে নিজের বন্ধন।

ক্রোধের দমন যদি না কর এবার,
অচিরে পড়িবে বাঁধা দাসত্বে তাহার।

সাহসের সঙ্গে যদি বিচার না রয়,
কর্ণহীন তরী যথা ডুবে সে নিশ্চয়।

অনিশ্চিত আশা প্রতি করিয়া নির্ভর,
যে ছাড়ে নিশ্চিত ধন, সে বড় বর্ব্বর

ধর্ম্মের বিবাদ নাই প্রফুল্লতাসনে,
চিরানন্দ বিরাজিত ধার্ম্মিকের মনে।

সদ্ভাবে শত্রুর মন পরাজিত হয়,
অসদ্ভাবে বন্ধুতায় ঘটায় প্রলয়।

যে বিষয় অন্তরকে অপবিত্র করে,
ভুলিয়াও রসনাগ্রে তুলিও না তারে।

বলিবে নিজের যুক্তি করিলে আহ্বান,
পারে পড়ি পরামর্শ করিবে না দান।

গভীর বিজ্ঞান-বুদ্ধি কদাচিৎ মিলে,
সুলভ সহজ-জ্ঞান সমস্ত ভূতলে।

প্রতিশোধে যে অনিষ্ট নহে নিবারিত,
ঘৃণার কটাক্ষে তাহা হয় নিষ্পেশিত।

দোষ দেখাইয়া যাহা সুবিচার করে,
সঙ্গত সমালোচন লোকে বলে তারে।

যাহারা উন্নত পদে করে আরোহণ,
নিন্দা চর্চ্চা তাহাদের অঙ্গের ভূষণ।

সুখের উদ্ভব ভাবি নাহি প্রয়োজন,
সদা তার পরিণাম করিবে স্মরণ।

বাল্যকালে যে কায অভ্যাস করা যায়,
প্রকৃতি হইয়া তাহা বার্দ্ধক্যে দাঁড়ায়।

বলিওনা গুপ্ত কথা নির্ব্বোধের কাছে,
লোকে রাষ্ট্র হইবার সম্ভাবনা আছে।

যতই গোপন হোক পাপের বাসনা,
হৃদয়ে পশিতে তারে প্রশ্রয় দিও না।

অবশ্যই যেই কায করিতে হইবে,
প্রফুল্ল হৃদয়ে তাহা সমাধা করিবে।

সদ্ভাবে উভয় পক্ষে না হ'লে মিলন,
এক পক্ষে সাধুভাব র'বে কতক্ষণ?

অঙ্কুরে পাপের সঙ্গে করিলে সংগ্রাম।
অনায়াসে জয়-যুক্ত হবে পরিণাম।

তৃতীয় ভাগ। আষাঢ় ৩য় সংখ্যা।
(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল,।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,
৯০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।৵০। পশ্চাদেয় ২, দুই টাকা।

শিক্ষা-পরিচরের এজেণ্টগণ।

এজেণ্টের নাম।	ঠিকানা।
বাবু কানাই লাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ	বহরমপুর।
,, নফরদাস রায় জমিদার	
,, মধুসূদন সিংহ স্কুল সবইন্সপেক্টর	
,, কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি, এ, বিএল্	বোয়ালিয়া।
,, দ্বারকানাথ বাগচি স্কুল সবইন্স্পেক্টর	
,, কালীকমল দাস বি, এল্	শ্রীহট্ট।
,, হরকিঙ্কর দাস উকীল	মৌলবী বাজার।
,, রাম গোবিন্দ মিশ্র স্কুল সবইন্স্পেক্টর	সাজাহাদ পুর। পাবনা
,, কামিনীকুমার চন্দ এম্, এ, বি, এল্	শিলচর, কাছাড়।
,, অভয় চরণ দাস এম্ এ	
,, সদয় চরণ দাস	শিলং।
,, দীননাথ দাস বি, এ	
,, নিশিকুমার ঘোষ অরিয়েণ্টেল লাইফ্ ইনসিওরেন্স কোম্পানি	গৌহাটী।
,, ব্রজগোপাল সেন	পুঁঠিয়া।
,, আনন্দ চন্দ্র সরকার শিক্ষক	
,, রাধিকা প্রসাদ সেন জমিদার	
,, দীননাথ ভট্টাচার্য্য স্কুল সবইন্স্পেক্টর	জঙ্গিপুর, মুর্শীদাবাদ।
,, অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য	বর্দ্ধমান, দেমুড়।
,, বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল,	গোয়াড়ী।
,, নীলমণি ঘটক উকীল	মালদহ।
,, শ্রীশগোবিন্দ সেন	দিনাজপুর।
,, গিরিশচন্দ্র নাগ এম, এ, বিএ, ল,	কটক।
,, গিরিশচন্দ্র বসু বি, এ,	কুচবিহার।
,, দ্বারকানাথ মৈত্র উকীল	নাটোর।
,, চন্দ্রমোহন দাস পণ্ডিত	নওহাট্টা, কেন্দ্র, রাজসাহী।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। আষাঢ় ১২৯৮ সাল। ৩য় সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১৫

কতদিনে প্রাণেশ্বর! প্রাণে শান্তি উপজিবে;
আনন্দ-সাগরে আত্মা কবে গো সাঁতার দিবে।
সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান জনমিবে কতকালে,
আত্ম-পরে ভেদ-ভাব কতদিনে দূরে যাবে,
নিবিড় নৈরাশ্য-জাল কবে বা সরিয়া যাবে,
ইহকাল পরকাল কতদিনে এক হবে,
কবে বা জন্মিবে হায় স্বর্ণলোষ্ট্রে সমজ্ঞান,
মান-অপমান-বোধ কবে বা ঘুচিয়া যাবে,
ঘৃণায় পূজায় কবে হৃদয় অটল রবে,
নিন্দা-প্রশংসায় কবে সমান আনন্দ হবে,
ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভনে, বাহিরের প্রলোভনে,
কবে গো শিখিব আমি থাকিতে অটলভাবে,
নিঃস্বার্থ শাখীর মত আর কতকালে হরি!
জগতের সেবা-কল্পে জীবন-উৎসর্গ হবে,
বিগলিত জীব-দেহ হেরিলে যেমতি হয়,
তেমতি পাপের প্রতি কতকালে ঘৃণা হবে,
কবে হবে বিষ্ণু-ধ্যান জীবনের অন্নজল,
জীবনে মুক্তির স্বাদ অনুভব হবে কবে।

শিক্ষা-পরিচরের এজেণ্টগণ।

এজেণ্টের নাম।	ঠিকানা।
বাবু কানাই লাল বন্দোপাধ্যায় বি, এ	
„ সর্ব্বদাস রায় জমিদার	বহরমপুর।
„ মধুসূদন সিংহ স্কুল সবইন্সপেক্টর	
„ কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি, এ, বিএল্	
„ দ্বারকানাথ বাগচি স্কুল সবইন্স্পেক্টর	বোয়ালিয়া।
„ কালীকমল দাস বি, এল্	শ্রীহট্ট।
„ হরকিঙ্কর দাস উকীল	মৌলবী বাজার।
„ রাম গোবিন্দ মিশ্র স্কুল সবইন্স্পেক্টর ...	সাজাহাদ পুর। পাবনা
„ কামিনীকুমার চন্দ এম্ এ, বি, এল্	
„ অভয় চরণ দাস এম্ এ ...	শিলচর, কাছাড়।
„ সদয় চরণ দাস	
„ দীননাথ দাস বি, এ	শিলং।
„ নিশিকুমার ঘোষ অরিয়েণ্টেল লাইফ্ ইনসিওরেন্স কোম্পানি ...	গৌহাটী।
„ ব্রজগোপাল সেন	
„ আনন্দ চন্দ্র সরকার শিক্ষক ...	পুঁঠিয়া।
„ রাধিকা প্রসাদ সেন জমিদার ...	
„ দীননাথ ভট্টাচার্য্য স্কুল সবইন্স্পেক্টর ...	জঙ্গিপুর, মুর্শীদাবাদ।
„ অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য	বর্দ্ধমান, দেমুড়।
„ বসন্ত কুমার চট্টোপাধ্যায় বি, এল, ...	গোয়াড়ী।
„ নীলমণি ঘটক উকীল	মালদহ।
„ শ্রীশগোবিন্দ সেন	দিনাজপুর।
„ গিরিশচন্দ্র নাগ এম, এ, বিএ, ল, ...	কটক।
„ গিরিশচন্দ্র বসু বি, এ, ...	কুচবিহার।
„ দ্বারকানাথ মৈত্র উকীল	নাটোর।
„ চন্দ্রমোহন দাস পণ্ডিত	নওহাট্টা, কেন্দ্র, রাজসাহী।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। } আষাঢ় ১২৯৮ সাল। { ৩য় সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১৫

কতদিনে প্রাণেশ্বর। প্রাণে শান্তি উপজিবে,
আনন্দ-সাগরে আত্মা কবে গো সাঁতার দিবে।
সুখ-দুঃখে সমজ্ঞান জনমিবে কতকালে,
আত্ম-পরে ভেদ-ভাব কতদিনে দূরে যাবে,
নিবিড় নৈরাশ্য-জাল কবে বা সরিয়া যাবে,
ইহকাল পরকাল কতদিনে এক হবে,
কবে বা জন্মিবে হায় স্বর্ণলোষ্ট্রে সমজ্ঞান,
মান-অপমান-বোধ কবে বা ঘুচিয়া যাবে,
ঘৃণায় পূজায় কবে হৃদয় অটল রবে,
নিন্দা-প্রশংসায় কবে সমান আনন্দ হবে,
ইন্দ্রিয়ের বিক্ষোভনে, বাহিরের প্রলোভনে,
কবে গো শিখিব আমি থাকিতে অটলভাবে,
নিঃস্বার্থ শাধীর মত আর কতকালে হরি।
জগতের সেবা-কল্পে জীবন-উৎসর্গ হবে,
বিগলিত জীব-দেহ হেরিলে যেমতি হয়,
তেমতি পাপের প্রতি কতকালে ঘৃণা হবে,
কবে হবে বিভু-ধ্যান জীবনের অন্নজল,
জীবনে মুক্তির স্বাদ অনুভব হবে কবে।

হিত-কথা।

(কৃষক-লিখিত—পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যৌবন সম্বন্ধীয়।

তোমরা এক্ষণে যুবক। এখনই তোমরা প্রকৃত সংসারী। মনুষ্য ফলভোগের আশায় আম্র কাঁঠাল ইত্যাদি ফলের বৃক্ষ রোপণ করিয়া সযত্নে তাহাকে যেমন প্রতিপালন করিয়া থাকে, এবং বৃক্ষ সকল পরিণত বয়সে সুফল প্রদান করিয়া রোপণকারীকে যেমন কৃতার্থ ও সুখী করিয়া থাকে; শিশুকালে তোমাদিগের পিতামাতা তোমাদিগকে সেই রূপে প্রতিপালন করিয়াছেন এবং সযত্নে সুশিক্ষিত করিয়াছেন। এখন সুফল-প্রাপ্তির আশায় তোমাদিগের জনক জননী, আত্মীয় স্বজন, বন্ধু বান্ধব, প্রতিবেশী এবং দেশবাসী লোক তোমাদিগের প্রতি চাহিয়া আছেন। বৃক্ষ যেমন রোপণকারী ও গ্রামবাসী অপর সাধারণকে মধুর ফলাস্বাদন করাইয়া থাকে, এবং উহাই যেমন বৃক্ষের পক্ষে কৃতার্থতা, তোমরাও সেইরূপ সুফল প্রদান করিয়া সকলকে সুখী কর ও কৃতার্থ হও।

যৌবনকালে শরীর যেমন পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইয়া থাকে, সদসৎ প্রবৃত্তিগুলিও তেমনই প্রবল হইয়া উঠে। সৎপ্রবৃত্তির পোষণ ও অসৎ প্রবৃত্তির পীড়ন এ সময়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কার্য্য। প্রবৃত্তির সেবা ও নিগ্রহ চিত্তের ক্রিয়া; উহা মনুষ্য-লক্ষ্য নহে। কোন্ ব্যক্তি কোন্ প্রবৃত্তিকে কি ভাবে পোষণ কি পীড়ন করিতেছে, অপরের তাহা জানিবার কোন উপায় নাই; কেবল ক্রিয়ায় তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে। যৌবন-মদে মত্ত হইয়া কুপ্রবৃত্তি-স্রোতে হৃদয় ঢালিয়া দাও, বর্ষা প্রবাহে তৃণ-খণ্ডের ন্যায় কোথায় ভাসিয়া যাইবে স্থিরতা নাই। অচিরে অধঃপাতের প্রান্ত-সীমায় পতিত হইবে। তোমাদিগের পিতৃপিতামহের অসীম জমিদারী, অতুল সম্পত্তি দেখিতে দেখিতে উড়িয়া যাইবে। শীঘ্রই তোমাদিগকে পথের ভিখারী হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। তখন ঘৃণায় তোমাদিগের মুখপানেও কেহ চাহিয়া দেখিবে না। তোমাদের দুর্নামে দেশ ভাসিয়া যাইবে। আর যদি কুপ্রবৃত্তিগুলিকে নিগ্রহ করিয়া সৎপ্রবৃত্তির সেবায় তৎপর থাক, তোমাদের অবস্থা দুঃস্থ থাকিলেও অধ্যবসায় ও যত্ন-বলে অতি সত্বরে আত্ম-অবস্থার উন্নতি সাধন করিয়া সুখী হইতে পারিবে। তোমাদের আচরণে অপরেও সুখী হইবে। সুযশে দেশ প্লাবিত হইয়া যাইবে।

সংসারের প্রথম কর্ত্তব্য সংসার-পালন অর্থাৎ আত্ম-পোষণ। উহার নিমিত্ত অর্থের প্রয়োজন। চাকরী, ব্যবসায়, কৃষি, শিল্প ইত্যাদি দ্বারা অর্থ সংগৃহীত হইয়া থাকে।

শিক্ষকতা—এক প্রকারের চাকরী। শিক্ষকের দায়িত্ব বড়ই গুরুতর। নানা জাতীয় বিবিধ শ্রেণীর বিভিন্ন প্রকৃতির ছাত্রদিগকে শিক্ষা প্রদান অতিশয় গুরুতর ব্যাপার ও কঠিন কার্য্য। ছাত্রদিগের প্রকৃতি বুঝিয়া

শিক্ষাদান ও সকলকে শিক্ষিত করা কতদূর কঠিন ব্যাপার, ভুক্তভোগী ব্যতীত অপরে তাহা বুঝিতে সক্ষম নহে। ছাত্রের প্রকৃতি যেরূপই হউক, শিক্ষককে তাহার মঙ্গলবিধান করিতে হইবে। দুশ্চরিত্র ছাত্রের সদ্বৃত্তির উন্মেষ করিয়া দিয়া সচ্চরিত্র করিতে হইবে। কেবল পুস্তকলিখিত বিষয় শিক্ষা দিলে চলিবে না। যিনি ছাত্র-প্রকৃতি নিক্তির ওজনের ন্যায় ওজন করিয়া বুঝিতে পারেন, তিনিই প্রকৃত শিক্ষক।

শিক্ষকের চরিত্র সর্ব্বথা বিশুদ্ধ হওয়া একান্ত প্রার্থনীয়। চরিত্রহীন শিক্ষকের শিক্ষা-দানে ছাত্রের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে উপকারের পরিবর্ত্তে অপকারই ঘটিয়া থাকে। শিক্ষক প্রত্যহ বালকদিগকে মিথ্যা কথা কহিতে নিষেধ করিয়া স্বয়ং মিথ্যা বাক্য ব্যবহার করিলে সত্যবাদী ছাত্রগণও শিক্ষকের আচরণের অনুকরণে মিথ্যাবাদী হইয়া পড়ে। জ্ঞানার্জ্জন মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত মনুষ্য-জীবনের কর্ত্তব্যের মধ্যে পরিগণিত। অতএব মুহূর্ত্তের নিমিত্তে যে বস্তুতে জ্ঞানের ব্যত্যয় ঘটাইয়া থাকে, কখনই তাহা ব্যবহার করিও না, অর্থাৎ ভ্রমেও কখন কোন প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন করিও না। শিক্ষকে এই উপদেশ দিয়া তিনি নিজেই যদি সুরা সেবনে উন্মত্ত হইয়া থাকেন, তবে তাঁহার ছাত্রদিগকে অচিরেই সুরাসক্ত দেখিতে পাইবেন। মৌখিক উপদেশাপেক্ষা আদর্শই চরিত্র সম্বন্ধে শিক্ষালাভের প্রকৃষ্ট উপায়, উপদেশ হইতে সহস্র গুণে প্রবল। শিক্ষকের চরিত্র এরূপ নির্দ্দোষ পবিত্র ও নির্ম্মল করা চাহি, যেন তাহাতে অণুমাত্রও ন্যূনতার নিদর্শন না থাকে। বাহ্যিক চরিত্রশীলতায় চলিবে না, অন্তরের পবিত্রতার আবশ্যক। চরিত্রের হীনতা লুকাইয়া রাখিবার সামগ্রী নহে, সময়ে স্বতঃই প্রকাশ হইয়া পড়ে। শিক্ষকের পক্ষে উহা বড়ই দুর্নামের বিষয়। যদি তোমাদিগের চরিত্রে কোন দোষ না থাকে, শিক্ষকতায় নিযুক্ত হও। হীনচরিত্র হইয়া শত শত বালকের—পক্ষান্তরে দেশের অমঙ্গল করিও না।

প্রমাণ প্রয়োগ দলিলাদি বিচারকের সম্বল। উহাতে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সত্য মিথ্যার বিশ্লেষণ পটুতা ও নিপুণতার প্রয়োজন। বিচারকের দোষে অবিচার হইলে অবশ্য প্রত্যবায় আছে। আজ্‌কাল্‌কার দিনের গতি মতি দেখিয়া ইচ্ছা হয় প্রবেশ কর।

নানাবিধ চাকরী। কত উদাহরণ দিব? উৎকোচ সকলেরই গভীর কলঙ্ক! উহার অপনোদন একান্ত কামনীয়।

অর্থোপার্জ্জনের আর একটি পথ ওকালতী। ব্যবহারজীবিগণ কাহারও বেতনভোগী কর্ম্মচারী নহেন। মোকদ্দমার নিষ্পত্তি-অন্তে আইনানুযায়ী 'রসুম' পাইয়া থাকেন। শিক্ষিতদিগের মধ্যে এই একটী মাত্র স্বাধীন লেখা পড়ার ব্যবসায়। উকীলদিগের নিকট অর্থী প্রত্যর্থীকে মামলা মোকদ্দমার সকল কথা খুলিয়া বলিতে হয়, গোপন করিলে ক্ষতি হয়। উকীলের পরামর্শে বহুবিধ অন্যায় মোকদ্দমা সজ্জিত হইয়া অনেককে সর্ব্বস্বান্ত হইতে হয়। মোকদ্দমার চক্রে পড়িয়া অনেক সম্পত্তিশালী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পথের ভিখারী হইতে দেখা যায়। উকীলগণ যদি পরামর্শ করিয়া অন্যায়পক্ষ সমর্থন না করেন, তাহা

হইলে দেশের মামলা মোকদ্দমা অনেক কমিয়া যায়। উকীলদিগের সাহায্যাভাবে লোকে অন্যায় মোকদ্দমা উপস্থিত করিতেই সাহস পায় না। বিচারালয় হইতে মিথ্যা অভিযোগ বিতাড়িত হইলে লোকের গৃহে প্রচুর অর্থ থাকিয়া যায়। কেবল উকীল-দিগের যত্নে এই অন্যায় কার্য্যটী দেশ হইতে সহজেই বিদূরিত হইতে পারে। বর্ত্তমান উকীল সম্প্রদায় সে পক্ষে চেষ্টা করিবেন কি না ভগবান জানেন। তোমরা এই ব্যবসায় অবলম্বন করিলে অন্যায়পক্ষাবলম্বন পরিত্যাগ করিও।

'বাণিজ্যে লক্ষ্মীর বাস' দেশ প্রচলিত এই প্রবাদটী মিথ্যা নহে। প্রবৃত্তি হয় উহারই আশ্রয় লও। বাণিজ্য কার্য্যও দোষ-বর্জ্জিত নহে। ভেজাল ও ওজনে বেশী লওয়া, কম দেওয়া প্রভৃতি উহার প্রধান দোষ। প্রতারণা মনুষ্যোচিত কার্য্য নহে।

অর্থ-সংগ্রহের পক্ষে কৃষিই দোষবর্জ্জিত ব্যবসায়। কৃষি সম্বন্ধেও একটী প্রবাদ আছে "লক্ষার বাণিজ্য ক্ষেতের কোণা।" উর্ব্বর ভূমিতে উপযুক্ত কৃষি তাহাই বটে। ইচ্ছা হয় ইহাতেই প্রবৃত্ত হও। কিন্তু গোপালন ও অজ্ঞ কৃষক লইয়া কার্য্যনির্ব্বাহ বিষম সমস্যা! মূর্খকে চালাইতে পার, তোমাদের তেমন নিপুণতা থাকে, অগ্রসর হও।

সূত্রধর কর্ম্মকার কুম্ভকার প্রভৃতি এ দেশের শিল্পকর। আমাদের দেশে শিল্প-কার্য্যের অবনতির একশেষ হইলেও অদ্যাপি উক্ত কার্য্যে অর্থোপার্জ্জন মন্দ হয় না। কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় শিল্পকর দাম রাখিয়া শিল্প ব্যবসায়ে জীবন যাপন করিবেন, এমন দিন আজিও আইসে নাই। হাতে হাতিয়ারে শিল্পকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিবে কি?

পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী স্ত্রী পুত্র কন্যা ইত্যাদি লইয়া পরিবার। পিতা মাতা তোমা-দিগকে প্রতিপালন করিতে কত ক্লেশ ভোগ করিয়াছেন। জননী ঘোর শীতে তোমাদের মল মূত্রে সিক্ত হইয়া তোমাদিগকে বক্ষে লইয়া রক্ষা করিয়াছেন, নিজে না খাইয়া তোমাদিগের আহার যোগাইয়াছেন। পরি-জনকে পরিতোষ করিয়া ভাল খাবার যা একটু খাইতে পাইয়াছেন, নিজে না খাইয়া তোমাদের জন্য সযত্নে তুলিয়া রাখিয়াছেন। সময়ে তোমাদিগকে ভক্ষণ করাইয়া অপার আনন্দ অনুভব করিয়াছেন। জননীর অনু-গ্রহের কথা বর্ণনা করিয়া শেষ করিবার সামর্থ্য মানুষের নাই। মনের কথা বল দেখি, জগতে মাতার তুল্য হিতৈষিণী আর কেহ আছেন কি? পিতা কত যত্নে তোমাদের লালন পালন করিয়াছেন। কত কষ্টে তোমা-দের আহার্য্য, পরিধেয় ও শিক্ষা-ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়াছেন। তোমাদের সুখে সুখী দুঃখে দুঃখী জনক জননীর ন্যায় আর কে আছেন? এখন তাঁহাদিগের বৃদ্ধাবস্থা। এখন তাঁহারা তোমাদের মুখাপেক্ষী। তাঁহাদের অনুগ্রহে তোমাদের জীবন। এখন তোমাদিগের প্রতিদানের সময়। জনক জননীর ঋণ কেহই পরিশোধ করিতে পারে না। 'ওটা কি মা' 'ওটা কি বাবা' পুত্রের এই জিজ্ঞাসার পরি-বর্ত্তে পিতা মাতা হাসিতে হাসিতে সহস্র সহস্র বার 'ওটা কাক' বলিয়া উত্তর দিয়াছেন। সেই পিতা মাতা এখন শেষকালে কোন কথা দুইটীবার মাত্র জিজ্ঞাসা করিলে

আজকালকার দিনে পুত্রের চক্ষুঃ আরক্ত হইয়া উঠে। ভগবন্! এই কি ঋণ পরিশোধ? পিতৃমাতৃ-ঋণ পরিশোধনীয় নহে, কিন্তু তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষার ক্রটি না হয়। তাঁহারা যেন এই শেষ বয়সে কোন বিষয়ে মনঃকষ্ট উপভোগ না করেন। যথাসময়ে তাঁহাদিগের আহার যোগাইবে, এবং প্রাণপণ যত্নে তাঁহাদিগের আদেশ প্রতিপালন করিবে। বৃদ্ধাবস্থায় অনেকেরই চলৎশক্তি থাকে না, তোমরা বিদ্যমান থাকিতে তাঁহাদিগের যেন সেজন্য যাতনা না হয়। পুত্রের ক্রটিতে পুত্র বা পুত্রপরিবার কর্ত্তৃক পিতা মাতা অন্তিমকালে শারীরিক ও মানসিক যন্ত্রণা উপভোগ করিলে, সে পুত্রের স্থান কোথায়, তাহা ভগবানই জানেন।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনী পিতৃমাতৃ স্থানীয়, এবং তাঁহাদিগের সেবা শুশ্রূষাও তদনুরূপ কর্ত্তব্য।

বনিতা অর্দ্ধাঙ্গিনী নামে অভিহিতা। পরিণীতা ভার্য্যা সংসারে সুখ দুঃখ ধর্ম্মকর্ম্মাদির সহচারিণী। ইহাঁর প্রতি আত্মবৎ ব্যবহার করিবে।

কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনী ও পুত্র কন্যাদি স্নেহাস্পদদিগকে অভেদে বাৎসল্যদান করিবে, এবং সযত্নে ইহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণ ও শিক্ষার ব্যবস্থা করিবে।

পরিবারের পরে তোমাদিগের গৃহের দাস দাসী। দাস দাসীগণ তোমাদের বয়োজ্যেষ্ঠ হউক বা ন্যূন বয়সেরই হউক, সকলকে সন্তানের ন্যায় স্নেহ করিবে। তাহারা বেতনভোগী হইলেও তোমাদিগ হইতে প্রতিপালিত বলিয়া তোমাদিগের সন্তান-স্থানীয়। সংসারের বহুবিধ কার্য্য-ভার তাহাদিগের উপর অর্পিত থাকে, বহুবিধ দ্রব্য সামগ্রী তাহাদিগের তত্ত্বাবধানে রাখিতে হয়। তাহাদিগের প্রতি অন্যায় প্রভুত্ব ফলাইলে, সতত কর্কশ ব্যবহার করিলে, গালাগালি দিলে, তাহারা পেটের দায়ে সংসারের জ্বালায় বাধ্য হইয়া কায কর্ম্ম করে বটে, কিন্তু মনে মনে অনর্গল গালি বর্ষণ করিতে থাকে, পরস্পরে প্রভুর কুৎসা গাহিয়া দিন কাটায়, মনের সুখে গালি পাড়িয়া আনন্দানুভব করে, কখনই প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষা করে না, এবং মনের সহিত তাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য একটী দিনও সম্পন্ন করে না। অপর কর্ত্তৃক প্রভুর কোন অমঙ্গলের কার্য্য উপস্থিত দেখিলে অলক্ষ্যে সকলে তাহাতে যোগদান করিয়া প্রভুর সর্ব্বনাশ সাধনের পক্ষে সাধ্যমতে চেষ্টা করিয়া থাকে। সুযোগ পাইলে কর্কশ ব্যবহারের প্রতিশোধ লইতেও পরাঙ্মুখ হয় না। তাহাদিগের প্রতি বাৎসল্য প্রকাশ করিলে, তাহারা যেমন সামান্য লোক, তাহাদের আপদ বিপদে সেইরূপ সামান্য রকম সাহায্য প্রদান করিলে, সতত স্মিতমুখে মিষ্ট কথা বলিলে, তাহারা আনন্দের সহিত সকল কার্য্য নিষ্পন্ন করিয়া থাকে, ঘণ্টার কায দণ্ডে পারিলে সম্পন্ন করিতে ক্রটি করে না। প্রভুর অজ্ঞাতসারে তাঁহার কোন অমঙ্গলের কার্য্য দৃষ্ট হইলে প্রাণপণ চেষ্টায় তাহার প্রতিবিধান করিয়া থাকে, প্রভু হয়ত সে আসন্ন বিপদের সন্ধানও পান না। ফলতঃ তাহারা সর্ব্বতোভাবে প্রভুর মঙ্গল কামনা করিয়া থাকে। প্রভুর বিপদে আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

অনন্তর অতিথি অভ্যাগত। তোমাদিগের আলয়ে অতিথি সমাগত হইলে তাহাদিগের যথাসাধ্য সৎকার করিবে, এবং মধুর বচনে তাহাদিগকে প্রীত করিবে। সংসারে কথার সদৃশ মিষ্টতা আর কিছুতেই নাই। তোমরা প্রত্যহ শত শত ব্যক্তিকে রসনাতৃপ্তিকর আহার্য্য ভোজন করাইয়া দেখ, তোমাদের গৃহের বাহিরে গমন করিলেই তাহারা খাদ্যের মধুর স্বাদ বিস্মৃত হইবে। মিষ্টান্নে একজনের উদর ফাটাইয়া দিয়া একটী কটু কথা বল, তোমাদের আহার্য্য-দান পণ্ড হইয়া যাইবে, সে মিষ্টান্নের স্বাদ ভুলিয়া গিয়া তোমাদিগের কটু কথার তীব্রস্বাদে আর তোমাদের দ্বারেও আসিবে না। আর কাহাকে কিছু খাইতে না দিয়া মিষ্ট কথা বল, দেখ সে তোমাদের উপর কেমন সন্তুষ্ট থাকে; তোমাদিগের সুযশ গাহিয়া তোমাদিগকে কেমন সুখী করে। বুভুক্ষুকে পরিতোষ পূর্ব্বক আহার করাইয়া মিষ্ট কথা বলিলে তাহার সন্তোষের পার থাকে না। আহার্য্যের অল্পতা-নিবন্ধন যিনি স্বয়ং অনাহারে থাকিয়া অভ্যাগত ব্যক্তিকে ভোজন করাইতে পারেন, তিনিই প্রকৃত হৃদয়বান্। ভগবানের করুণা-হস্ত নিয়ত তাঁহার মঙ্গল-সাধনে নিযুক্ত।

তাহার পর প্রতিবেশী। সংসারে সকলের অবস্থা সমান নহে। কেবল মনুষ্যের পক্ষে এ বাক্য প্রযোজ্য নহে, প্রকৃতিরও এই নিয়ম। তৃণ গুল্ম লতা বৃক্ষাদি উদ্ভিদ্ শ্রেণী, হ্রদ তড়াগ স্রোতস্বতী সমুদ্রাদি জলাশয়-পুঞ্জ, কৃষিযোগ্য সমতল ভূমি, বিভীষণ মরুময় প্রদেশ, নাত্যুন্নত শৈল-সমূহ, উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-মালা, সূর্য্য চন্দ্রাদি গ্রহোপগ্রহ, ক্ষুদ্র বৃহৎ নক্ষত্রব্যূহ, যেদিকে ইচ্ছা দৃষ্টিনিক্ষেপ কর, দেখিতে পাইবে অবস্থার বিভিন্নতা সর্ব্বত্রই বিরাজমান! সৃষ্টিই বৈচিত্র্যময়! এই বিচিত্রতা হইতেই জগৎ সুরক্ষিত। সংসারে সকলের অবস্থা সমান হইলে সাংসারিক কার্য্য অচল হইত। এই অবস্থাভেদে কেহ সম্পত্তি-শালী, কেহ নিঃসম্বল। তোমাদিগের প্রতিবেশীর মধ্যে দৈব-বশতঃ অনেকের গৃহে অনেকদিন অন্নের সংস্থান নাও থাকিতে পারে। তাহাদিগের তত্ত্বাবধান তোমাদিগের অবশ্য কর্ত্তব্য। তাহাদিগের প্রতি করুণা-প্রকাশে ও সাধ্যানুসারে অভাব-মোচনে ত্রুটি না হয়। প্রতিবাসী ব্যতীত সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহাদিগের সহিত অন্য সম্বন্ধ না থাকিলেও সম্পদ বিপদে তাহারা তোমাদের প্রবল সহায়। গ্রাম মধ্যে কোন নিঃসহায় নিরন্ন উপায়হীন মনুষ্য বাস করিলে, তাহাকে উপবাসী রাখিয়া নিজে আহার করা বিহিত নহে।

ব্যাধি মনুষ্যের প্রধান শত্রু। প্রতিবাসীর মধ্যে কেহ পীড়িত হইলে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করা এবং রোগোপশমের জন্য চেষ্টা ও যত্ন করা উচিত। অর্থাভাবে চিকিৎসার ব্যাঘাত ঘটিলে, নিজ ব্যয়ে চিকিৎসা করান মনুষ্যোচিত কার্য্য।

প্রতিবেশীর পরে সমাজ। সমাজের অবনতিকর কার্য্য দূরীকৃত করিতে এবং তাহার উন্নতি সাধন করিতে তৎপর থাকিবে।

সমাজের পরে দেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে। যদি হৃদয় থাকে, তবে দেশের মঙ্গল বিধানে জীবনোৎসর্গ করিয়া সুখী হও।

তোমাদিগের অধ্যবসায় ও যত্নে সমাজ ও

দেশের অবনতির প্রতিষেধ ও উন্নতি-বিধান না হইলেও তাহাতে বিমুখ হইও না। অধ্যবসায় ও যত্নের অভাব না ঘটিলেই তোমাদের কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হইল। আমাদের দেশের অবস্থা বড় শোচনীয়, সমাজ-দেহ বিবিধ পীড়ায় জর্জ্জরিত! তোমাদিগের অনুকরণে ইহার অবনতি দূরীকরণ ও উন্নতি সম্পাদনের চেষ্টা এবং অধ্যবসায় ধারাবাহিকরূপে চলিতে থাকিলে, ভবিষ্যতে সুমঙ্গলের সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

এদেশে আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহারা ভিক্ষোপজীবী। অনেকে সংসারকে অসার ভাবিয়া কেবল ঈশ্বরারাধনায় প্রবৃত্ত। অনাহারে জীবন রক্ষা হয় না বলিয়া যথাকথঞ্চিৎরূপে জীবন-রক্ষার উদ্দেশে গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষার আশায় ঝুলি স্কন্ধে উপস্থিত। যাঁহারা যথার্থপক্ষে সংসারকে অসার ভাবিয়া জীবনের প্রতি অনাস্থা বশতঃ গৃহস্থ-গৃহে যাচ্ঞা-লব্ধ সামান্য দ্রব্যে দেহ রক্ষা করিয়া থাকেন, তাঁহাদিগের সম্বন্ধে কিছু বক্তব্য নাই; কিন্তু অধিকাংশ ভিক্ষুক সংসারকে অসার না ভাবিয়া বরং তাহার সারবত্তাই উপলব্ধি করিয়া থাকে। কেবল গৃহস্থের শ্রদ্ধা আকর্ষণ ও অনায়াসে জীবন যাপন করিবার অভিলাষে তাহারা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়া থাকে। তাহাদিগের হৃদয়ে বৈরাগ্যের পরিবর্ত্তে সংসারানুরাগের নিদর্শন স্পষ্টই প্রতিভাত হইয়া থাকে। পরিশ্রমের সামর্থ্য আছে, অথচ বৈরাগ্যবেশে সজ্জিত হইয়া গৃহস্থের মস্তকে হস্তমর্দ্দন করিয়া—এককালে নির্ব্বোধ সাজাইয়া মনোভিলাষ পূর্ণ করিয়া থাকে। অবস্থার হীনতায় পরিশ্রমই কর্ত্তব্য। যখন যেরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতে হয়, তখনকার উপযোগী কার্য্যে অমনোযোগ সম্পূর্ণ ন্যায়-বহির্ভূত। পূর্ব্বে ধনী ছিলাম বা আমার পূর্ব্ব পুরুষ ভাগ্যবান ছিলেন, এই হেতুতে আমাদের পরিশ্রম করা লজ্জার বিষয়, উহা হইতে ভিক্ষা করিয়া খাওয়া ভাল,—আর কতকগুলি এই দলের ভিক্ষুক। সংসারের চক্ষে দর্শন করিলে তাহারা সংসারের শত্রু বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। এই ভণ্ড ভিক্ষুকদিগের ভণ্ডামীর প্রতিবিধান করাই উচিত। যতদিন ইহার একটা প্রতিকার না হইতেছে, ততদিন তাহারা যে ভগবানের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিয়া যাচ্ঞা করিয়া থাকে, তজ্জন্য কিছু দেওয়াই ভাল। কিন্তু সে ভিক্ষাদান একমুষ্টি তণ্ডুলের অতিরিক্ত না হওয়াই উচিত।

কিন্তু অন্ধ খঞ্জ বিকলাঙ্গ আধিক্ষীণ ব্যাধি পীড়িত ব্যক্তিদিগের প্রকৃতপক্ষে পরিশ্রমের ক্ষমতা নাই বলিয়া তাহাদিগের যথাসাধ্য সাহায্য করা একান্ত কর্ত্তব্য। পার যদি তাহাদিগের কুটীরে গমন করিয়া তাহাদিগকে সময়োপযোগী বসন ও উপযুক্ত পরিমাণ অশন প্রদান করিয়া ধন্য হও।

অনেকে যৌবনে অর্থসঞ্চয়ে প্রবৃত্ত হইয়া সঞ্চিত অর্থের আধিক্যের সঙ্গে সঙ্গে আত্মীয়তা বিসর্জ্জন করিয়া থাকে। এমনকি এক পাঠী বাল্যসখাদিগকেও বিস্মৃত হইয়া পড়ে। যে সৌহার্দ্দ্য দুইটী হৃদয়কে একে পরিণত করে, সেই সৌহার্দ্দ্যের অপনয়ন সংসারের পক্ষেও অতিশয় অহিতকর। সুখ-দুঃখ-সম্পদ-বিপদে সুহৃদের তুল্য সহায় জগতে আর কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ধন-মদে মত্ত হইয়া তাহাতে অবজ্ঞা প্রকাশ মানবোচিত

কার্য্য নহে। যে সম্পদ্-গর্ব্বে গর্ব্বিত হইয়া হৃদয়ের প্রধান সম্পত্তি সখ্যকে বিসর্জ্জন করিতে পারে, সে মনুষ্য নামের অযোগ্য। মানব যখন জন্মগ্রহণ করে, তখন উলঙ্গাবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে ধরাপৃষ্ঠে পতিত হয়, আবার মৃত্যুকালে সেই অবস্থায় পাঞ্চভৌতিক দেহ পঞ্চভূতে মিশাইতে বাধ্য হয়। ধনী দরিদ্রে এসম্বন্ধে সৃষ্টির আদিকাল হইতে এ পর্য্যন্ত কিছুমাত্র ভিন্ন ভেদ দৃষ্টিগোচর হয় নাই, কখন হইবেও না। একথাটী সতত স্মরণ রাখিয়া সংসার-বক্ষে বিচরণ করিবে।

তোমরা দৃশ্যমান জীব সকলের জন্ম, জীবিতকালের অবস্থা এবং মরণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া স্বীয় জীবনের অসারত্ব অনুভব করিবে এবং কায়মনোবাক্যে প্রত্যহ দয়াময় ভগবানকে পূজা করিবে। ভগবানের প্রতি আস্থা থাকিলে তোমাদের কৃতকার্য্য দোষশূন্য হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। ভগবদ্ভীতি তোমাদিগকে ন্যায়বহির্ভূত কার্য্য হইতে সাবধানে রক্ষা করিয়া অভ্যাসের ক্রমোন্নতিতে দেবত্ব প্রদান করিবে।

বার্দ্ধক্য সম্বন্ধীয়।

এখন তোমরা স্থবির, উত্থান-শক্তি-বিরহিত, বিকলাঙ্গ, অবশ-দেহ, অক্ষম-হস্ত, অচল-পদ, জড়পিণ্ডে পরিণত। সদ্যজাত শিশু সন্তান জীবন-মরণ-সম্বন্ধে যেমন সম্পূর্ণ পরমুখাপেক্ষী, এখন তোমাদেরও সেই দশা। বিস্মৃতি উভয়ের আন্তরিক অবস্থাকেও তুল্য করিয়া থাকে। সুখ-স্বপ্নের স্মৃতি-সদৃশ যা একটু স্মৃতি-চিহ্ন বর্ত্তমান থাকে, তাহাই সে সময়ের মনুষ্যত্বের নিদর্শন। তোমাদিগের জীবনের আলোচনা এখন তোমাদের একটী প্রধান কার্য্য। তোমরা বাল্য যৌবন সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিয়া থাকিলে, এ জড়পিণ্ডাবস্থাতেও বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে পারিবে। তোমাদিগের আত্মা স্বতঃই বলিবে "ভগবন্! জীবনের শেষ যবনিকা কখন পতিত হয় তুমিই জান, আমারত আর মুহূর্ত্তের জন্যও বিশ্বাস নাই। কিন্তু দয়াময়! তোমার অনন্ত করুণায় এজীবন যে সৎকার্য্যে অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহাই আমার বর্ত্তমানের শারীরিক যন্ত্রণা ও মানসিক ক্লেশ উভয় প্রকার গ্লানি বিদূরিত করিবার একমাত্র সম্বল। জগদীশ! এই বিশ্বাস ও আন্তরিক এই বিমল আনন্দই যেন আমার শেষ নিশ্বাসে পরিণত হয়।"

অসৎ কার্য্যে জীবন যাপন করিয়া থাকিলে তোমাদিগের অনুতাপের ইয়ত্তা থাকিবে না। তোমাদিগের শারীরিক ও মানসিক গ্লানি এই অনুতাপে আরও কষ্টকর হইয়া তোমাদিগের জীবিতাবস্থাতেই তোমাদিগকে নরক যন্ত্রণা প্রদান করিবে। ভগবানের অপারকরুণা ব্যতীত তোমাদিগের নিস্তারের অন্য উপায় নাই।

স্থবির! তোমরা সাধু অসাধু যাই হও, তোমরা এই অন্তিমকাল কেবল ঈশ্বর চিন্তা ও তাঁহার অর্চ্চনায় অতিবাহিত কর। তোমাদিগের জীবন-বায়ু জাগতিক বায়ুতে মিশ্রিত হইতে আর বিলম্ব নাই।

জলবুদ্বুদ ও মনুষ্য-জীবন সদৃশ পদার্থ। সময়ের গুরুত্বে যদি তোমাদিগের বিশ্বাস থাকে, ভাবিয়া দেখ অনন্তকালের তুলনায় তাহা কিছুই নহে।

জীবন অসার, সৎকর্ম্মই একমাত্র সার।

চিকিৎসা-বিদ্যা।

সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য শরীর মনু পালয়েৎ।
তদভাবে হি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিণাং॥

কি শিক্ষক, কি ছাত্র, সাধারণতঃ শরীরী মাত্রেরই সর্ব্বাগ্রে শরীর-রক্ষার উপায় শিক্ষা করা কর্ত্তব্য, কারণ এক স্বাস্থ্যের অভাবেই ইহ সংসারে সকল বিষয়ের অভাব হইয়া থাকে। শরীর ধারণ করিতে গেলে সকলেরই চিকিৎসার যেমন প্রয়োজন; তদ্বিষয়ে স্বদেশে কয়টি মত কিরূপ প্রণালীতে প্রচলিত রহিয়াছে, এবং কাহার ভিত্তি কতদূর দৃঢ়, এ গুলি অবগত হওয়াও তেমনি প্রয়োজনীয়। এতৎসম্বন্ধে সঙ্ক্ষেপে কিছু বলা এবং বর্ত্তমান চিকিৎসা-সমাজের অবস্থা-ঘটিত দুই এক কথার আলোচনা করাই অদ্যকার প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

স্বাস্থ্য-রক্ষার নিমিত্ত বা রোগনিবারণোদ্দেশে যে সকল উপায় অবলম্বিত হয় তাহাই চিকিৎসা বিদ্যার অন্তর্গত। পীড়া হইলে লক্ষণানুসারে ঔষধ প্রয়োগই ইহার প্রথম উপায়; প্রচুর নির্ম্মল বায়ুসেবন, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা, যথাসময়ে পবিত্র আহার্য্য আহার, পরিষ্কার পানীয় পান, উপযুক্ত ব্যায়াম ইত্যাদি দ্বিতীয় উপায়। এতদ্ভিন্ন অনেক সময়ে জল বায়ু পরিবর্ত্তন, নদীতে স্নান, অজীর্ণে অনাহার, প্রদাহে পোল্টিশ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে তৃতীয় উপায় বলা যায়। এই সকল উপায় মধ্যে রোগে ঔষধ প্রয়োগই চিকিৎসার বিশেষ কথা। তাই বলিয়া আমরা অন্যান্য উপায়গুলিকে চিকিৎসার পরিত্যজ্য বলিতেছি না। কেননা রোগ-চিকিৎসায় ঔষধ প্রয়োগ যেমন আবশ্যকীয়, উল্লিখিত উপায় সকল তদপেক্ষা অল্প প্রয়োজনীয় নহে। চিকিৎসা-বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞগণই কেবলমাত্র ঔষধের উপর নির্ভর করিয়া থাকেন।

যতদিন হইতে চিকিৎসা-শাস্ত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ততদিন হইতে রোগে ঔষধপ্রয়োগ সম্বন্ধীয় তিন প্রকার মত চলিয়া আসিতেছে। এই তিন প্রকার মত ব্যতীত এতদ্বিষয়ে মতান্তর দেখা যায় না। জগতে যত প্রকার চিকিৎসা-প্রণালী প্রচলিত আছে, তাহারা সকলেই এই মত-ত্রয়ের প্রকার-ভেদ মাত্র।

তিন প্রকার মত যথা—

ভৈষজ্যের গুণ রোগের (১) বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত।
,, (২) বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত।
,, (৩) সদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত।

১। রোগের বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ভেষজ,—ইংরাজী ভাষায় এই মতকে "এনাণ্টিওপ্যাথি" কহে। ইহার মর্ম্ম এই যে, বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত রোগে বিপরীত ধর্ম্মাক্রান্ত ঔষধ প্রযোজ্য। যেমন, উদরাময়ে ধারক, কোষ্ঠবদ্ধে বিরেচক, ঘর্ম্মাবরোধে ঘর্ম্মকারক, অনিদ্রায় নিদ্রাকারক ইত্যাদি এমতের দৃষ্টান্তস্থল।

২। রোগের বিভিন্ন ধর্ম্মাক্রান্ত ভেষজ,—ইহারই নাম প্রচলিত "এলোপ্যাথি" মত। ইহার মর্ম্ম এই যে, রোগ যে স্থানে যে প্রকারে

আক্রমণ করিয়াছে, তদ্ভিন্ন অন্য স্থানে এবং বিভিন্ন প্রকারে ইহার ঔষধের ক্রিয়া প্রকাশ পায়। যেমন প্রদাহে ফোস্কাকারক (ব্লিষ্টার), বমনে জ্বালাকারক (মাষ্টার্ড প্লাষ্টার), শিরঃ-পীড়ায় বিরেচক প্রভৃতি প্রয়োগ এলোপ্যাথির দৃষ্টান্তস্থল। যদিও আমরা এমতকে এলোপ্যাথি বলিয়া বর্ণন করিলাম বটে, কিন্তু বাস্তবিক আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহাদের মত বা শাস্ত্র অর্থাৎ কি মূলে রোগে ঔষধ প্রয়োগ করা হয়, তদ্বিষয়ে সটীক উত্তর পাওয়া যায় না। ফলতঃ এই মত উল্লিখিত অপর মতের সহিত জড়িতভাবে প্রচলিত দেখা যায়।

৩। রোগের সদৃশ ধর্ম্মাক্রান্ত ভেষজ—ইহাই "হোমিওপ্যাথি" মত। ইহার মর্ম্ম এই যে, যে ধর্ম্মাক্রান্ত বিষ রোগের কারণ হইবে, অত্যল্প মাত্রায় সেই ধর্ম্মাক্রান্ত একটি ঔষধেই তাহা নিবারণ করিতে পারিবে। সমধর্ম্মাক্রান্ত ভেষজ দ্বারা রোগের কারণ নাশ করাই এমতের গূঢ় তত্ত্ব। ইহার মূল মাত্র "সমঃ সমং শময়তি।" যেমন, অতি মাত্রায় কুইনাইন (সিঙ্কোনেসী জাতীয় বিষ) উদরস্থ হইলে যে যে লক্ষণযুক্ত কম্পজ্বর বা যে কোন রোগ প্রকাশ পায়, সেই সেই লক্ষণযুক্ত কম্পজ্বর বা রোগে উক্ত জাতীয় ও ধর্ম্মাক্রান্ত যে কোন ঔষধ অর্থাৎ কুইনাইন বা সিঙ্কোনা অত্যল্প মাত্রায় প্রয়োগ করিলেই তত্তাবতের শান্তি হইবে। ফলতঃ ইহার মূল কেবল সত্যের উপরে স্থাপিত। কারণ ইহা সুস্থ শরীরের পরীক্ষার ফল।

প্রাচীন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রও "বিষস্য বিষমৌষধং" মতকে পরিত্যাগ করেন নাই। ইহার মর্ম্মোদঘাটনে যদিও আমরা অপারক, তথাপি প্রাগুক্ত বচনাংশ এবং উদরাময়ে বেলপানা, কোষ্ঠবদ্ধে হরীতকী (কষায়), প্রদাহে উষ্ণ প্রয়োগ ইত্যাদি সমধর্ম্মাক্রান্ত ব্যবস্থা ও অন্যান্য যুক্তি আদির সূক্ষ্মদর্শিতা দেখিয়া ঐরূপ অনুমান করিতে পারি।

ইতঃপূর্ব্বে কতকদিন চিকিৎসা বিদ্যার যেরূপ অধঃপতন হইয়াছিল, তদপেক্ষা বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজ রাজের কৃপায় ও চিকিৎসা বিদ্যাবিদ্‌গণের চেষ্টায় নানামতে এতদ্বিষয়ের অনুশীলন দিন দিনই বৃদ্ধি হওয়ায় চির-রুগ্ন-ভারতবাসীদিগের যে কি পরিমাণে মঙ্গল সাধিত হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। ত্রিশ বত্রিশ বৎসরের পূর্ব্বের সহিত বর্ত্তমান অবস্থার তারতম্য করিলেই অনায়াসে বুঝিতে পারা যায় অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা-বিষয়ের জ্ঞান কত পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বে প্রাচীন সম্প্রদায়, বিশেষতঃ পল্লীগ্রামবাসীগণ "ডাক্তার" নাম শুনিলেই কি যেন একটা অদ্ভুত কল্পনা করিয়া বসিতেন; পূর্ব্বোক্ত মহোদয়গণের অনুগ্রহে অধুনা পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তার স্থান পাইতেছে। আজ স্ত্রীলোকেও তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার জানে। ইহা অল্প সুখের বিষয় নহে।

ডাক্তারী চিকিৎসার প্রথমোদ্যম হইতে দিন কতক প্রাচীন প্রণালী বড়ই নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু সম্প্রতি ইহা পুনরায় সতেজ হইয়া পাশ্চাত্য উন্নতির সহিত সমকক্ষভাবে (বেশী বলিলেও হানি হয় না) বিস্তৃত হইতেছে।

হোমিওপ্যাথি মত সর্ব্বাপেক্ষা নূতন হইয়াও

অত্যল্প সময় মধ্যে আশাতীত উন্নতাবস্থায় প্রচলিত হইতেছে। সম্ভবতঃ ইহার গুণ অসাধারণ ও অদ্ভুত বলিয়াই এরূপ ঘটিতেছে সন্দেহ নাই। কিন্তু এই মতটিতে রাজার ঔদাসীন্য দেখিয়া আমরা দুঃখ রাখিবার স্থান পাই না। ইহার উপকার যিনিই একবার প্রত্যক্ষ করিতেছেন, তিনিই ইহার-সেবকানুসেবক হইতেছেন। কিন্তু বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে আজিও আমাদের রাজকীয় মুহামুভাব মহা চক্ষুঃ উন্মীলিত হইল না!!

চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহুল প্রচারের ফলে আজকাল অনেক গৃহস্থই এরূপ ব্যুৎপন্ন হইয়াছেন যে, সাধারণ রোগাদিতে প্রায়শঃই চিকিৎসকের আশ্রয় লইতে হয় না। প্রায় গৃহেই এখন চিকিৎসা-বিষয়ক দুই একখানি পুস্তক, কোন না কোন প্রকার ঔষধ ও তাপমান যন্ত্রাদি সরঞ্জাম দেখিতে পাওয়া যায়। কোন কোন গৃহস্থ এমনই সুব্যবস্থা-কারক যে, কেবল পথ্যাদির ধরাধর করিয়াই তাঁহারা অনেক ব্যাধি নিবারণে কৃতকার্য্য হইয়া থাকেন। কেহ বা সদ্য ফলপ্রদ মুষ্টিযোগ অথবা বাজারে পেটেন্ট ঔষধ ব্যবহার করিয়াই ব্যাধি-মুক্ত হইয়া থাকেন। প্রায় পল্লীতেই এরূপ চিকিৎসক দুই একজন দেখা যায়। তন্মধ্যে যাঁহারা পীড়ার প্রখরতা বুঝিয়া সুচিকিৎসক ডাকিতে পরামর্শ দেন, তাঁহারাই প্রথম শ্রেণীর মধ্যে গণ্য।

ফলতঃ যাঁহার উপরে জীবনের সুখদুঃখ সতত নির্ভর করিতেছে, শত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এহেন শরীরকে সর্ব্বদা সুস্থ রাখিবার উপায় যে শরীরীমাত্রেরই শিক্ষা করিতে যত্নবান হওয়া উচিত তাহাতে আর ভুল কি? *

* রোগ হইতে মুক্ত থাকিবার উপায় দুইটি,—প্রথম অনাগত প্রতিষেধ, দ্বিতীয় চিকিৎসা। স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়মাদি অবগত হইয়া যে প্রণালীতে চলিলে রোগ হইবার সম্ভাবনা অল্প, তাহাই অনাগত প্রতিষেধ, এবং তাহাই সকলের আয়ত্ত; কিন্তু দ্বিতীয় উপায়, অর্থাৎ রোগাক্রান্ত হইলে ঔষধ-সেবন প্রভৃতি যে প্রণালীতে চলিলে রোগের উপশম হইতে পারে, অব্যবসায়ী লোক তাহা গ্রন্থে পাঠ করিয়া লাভবান্ হইতে পারেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই। ছাঁচে ঢালার মত কোন নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অবলম্বন করিলেই অভিলষিত ফল পাওয়া যাইতে পারে, আয়ুর্ব্বেদটা তেমন সহজ বিদ্যা নহে। যিনি এক প্রকার রোগাক্রান্ত শত শত রোগীকে আরোগ্য দান করিয়া যশস্বী এবং বহুদর্শী হইয়াছেন, তিনিও সময়ে সময়ে সেই রোগের চিকিৎসা করিতে যাইয়া ঠেকিয়া যান। ফলতঃ যে বিদ্যা এত কঠিন, এবং যাহার ফলাফলের উপরে জীবন-মৃত্যু নির্ভর করে, তাহা কেবল গ্রন্থমাত্র পড়িয়া শিখিলেই আয়ত্ত হইল, এমন কথা মনে করা উচিত নহে। অনেক অব্যবসায়ী গ্রন্থাধীত উপদেশ-বলে নিজে নিজের চিকিৎসা করিতে যাইয়া চির-রুগ্ন হইয়াছেন, অনেকে জীবন-লীলা অকালে সম্বরণ করিয়াছেন। চিকিৎসা-কার্য্য যে অতি দুরূহ, তাহার একটি অকাট্য প্রমাণ এই যে, এই কার্য্যে যাঁহার যে পরিমাণে বহুদর্শিতা জন্মে, তিনি সেই পরিমাণে সাবধান হন, এবং বহুদর্শিতার সঙ্গে সঙ্গে ক্রমে তাঁহার আপন বিদ্যা-বুদ্ধির গর্ব্ব কমিতে থাকে। বাস্তবিক যে স্থলে চিকিৎসক ডাকিবার সময় এবং সামর্থ্য রহিয়াছে, সে স্থলে নিজের চিকিৎসা নিজে করা নিতান্তই অবৈধ, সুতরাং সাধারণের পক্ষে তাহার শিক্ষাতেও বিশেষ কোন ফল নাই। তবে ওলাউঠা প্রভৃতি কতকগুলি এমন আকস্মিক রোগ আছে, যাহাতে অনেক স্থলে চিকিৎসক ডাকিবার সময় পাওয়া যায় না। এই সকল আকস্মিক রোগের প্রতিকারের উপায় সকলেরই কিছু কিছু জানা থাকা উচিত; কিন্তু তাহা হইলেও যে স্থলে সহজে চিকিৎসক পাওয়া যাইতে পারে, সে স্থলে নিজের চিকিৎসা নিজে করা কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এই জন্যই আমাদের বিশ্বাস, চিকিৎসা-শাস্ত্রের বহুল-প্রচারে চিকিৎসকের উপকার থাকিলেও রোগীর পক্ষে উপকারের বিপরীত ঘটিতেছে। কোন বিজ্ঞ চিকিৎসক যদি আমাদিগের এ সংস্কারে ভ্রম দেখাইয়া দিতে পারেন, আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকিব। শিঃ পঃ সঃ।

সাহিত্য-পরীক্ষায় সংশয় কেন ?

গত জ্যৈষ্ঠমাসের শিক্ষা-পরিচরে সাহিত্য-পরীক্ষা শীর্ষক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত গ্রন্থাদির সমালোচনের ভার গ্রহণ করিবার জন্য লেখক শিক্ষা-পরিচর সমিতিকে অনুরোধ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এ প্রস্তাবে অনেকেই আনন্দ প্রকাশ করিয়াছেন, এবং ইহা দ্বারা বঙ্গীয় সাহিত্যের বিশেষ উপকার হইবে বলিয়া অনেকেই আশা করিতেছেন। কিন্তু আমরা জানিতে পারিলাম, শিক্ষা-পরিচর-সমিতি এ বিষয়ে ইতি-কর্ত্তব্যতা স্থির করিতে পারিতেছেন না। সমিতি এখনও বাল্যাবস্থায় আছেন, প্রস্তাবিত গুরুতর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা অবশ্যই বিশেষ বিবেচনা সাপেক্ষ্য। বিলাতী সভ্যতার বিস্তারেই হউক, আর যে কারণেই হউক, আজ কাল বাঙ্গালী জাতি বিলক্ষণ হুজুগ প্রিয় হইয়া উঠিয়াছে। যে কোন অনুষ্ঠান করিলে অমনি সংবাদ পত্রে তাহার খবর উঠিল, দেশ যুড়িয়া একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল, আবার দেখিতে দেখিতে খড়ের আগুনের মত তাহা নিবিল। বাঙ্গালীর কার্য্য এইরূপ, উৎসাহ এই প্রণালীর, কাযেই সাহিত্য পরীক্ষার প্রস্তাব শুনিয়া সে ভার গ্রহণ করিবেন কি না এবিষয় সমিতি বিশেষরূপে বিবেচনা করিতেছেন, ইহাতে সমিতির সভ্যদিগের ধীরতাই প্রকাশ পাইতেছে। তাঁহারা যেরূপ আড়ম্বর শূন্য হইয়া নিঃশব্দে কার্য্য করিতেছেন, তাহাতে সহসা কোন গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া প্রকাশ্য ভাবে সাধারণের সম্মুখে উপস্থিত হইতে যে তাঁহারা সংশয় বোধ করিবেন, ইহা বিচিত্র নহে।

কিন্তু আমরা যতটুকু বুঝিতে পারিতেছি, তাহাতে এবিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতে তাঁহাদের পক্ষে বিশেষ সংশয়ের কারণ দেখিতেছি না। তাঁহারা বলিতে পারেন তাঁহাদের মত ক্ষুদ্র একটা সমিতি সর্ব্ব সমক্ষে দাঁড়াইয়া দেশীয় সাহিত্য পরীক্ষার ন্যায় একটা গুরুতর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিলে ধৃষ্টতা প্রকাশ পাইবারই অধিক সম্ভাবনা। কিন্তু আমরা বলি এটী তাঁহাদের অতি-বিনয়ের কথা। আমরা জানি, এপর্য্যন্ত যাঁহারা শিক্ষা-পরিচর সমিতির সভ্য হইয়াছেন, তাঁহারা সকলেই শিক্ষিত এবং উপাধিভূষিত, সকলেই বঙ্গভাষার প্রতি বিশেষরূপে অনুরক্ত, এবং সকলেই যোগ্যতার সহিত মাতৃ-ভাষায় লেখনী ধারণে সমর্থ। এই অনুরাগ এবং যোগ্যতাই তাঁহাদিগকে মাতৃ ভাষার উন্নতি কল্পে বদ্ধ পরিকর করিয়াছে, এই জন্যই তাঁহারা বঙ্গীয় সাহিত্যের এই দুর্দ্দশার দিনে ইংরাজী ভাষায় অভিজ্ঞ হইয়াও অনাদৃত দরিদ্র মাতৃ ভাষার সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন, এবং উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকলে সমবেত হইয়া শিক্ষা-পরিচর সমিতি স্থাপন করিয়াছেন। যাঁহারা এতদূর ব্যগ্রতা দেখাইয়াছেন, এবং এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহারা নিজে স্বীকার না

করিলেও আমরা শতবার বলিব, মাতৃ ভাষার সাহিত্য পরীক্ষার ভার গ্রহণ করিতে নিঃসন্দেহ তাঁহাদিগের অধিকার আছে।

যোগ্যতা আছে, অধিকার আছে; তবে আর সংশয় কেন? বিনয়ের আধিক্য বশতঃ একেবারে ঘরে বসিয়া থাকিলে স্বদেশের সেবা প্রকৃতরূপে হয় না। ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তিটুকু দিয়াছেন তাহাই লইয়া সাধারণের সম্মুখে দাঁড়াইতে হইবে, শক্তির সঙ্গে প্রীতি মিশাইয়া মাতৃ-চরণে অঞ্জলি দিতে হইবে, তবে যদি দেশের দুর্দ্দশা যায়, তবে যদি ভারত এক দিন উঠিয়া দাঁড়াইতে পারে, বিনয়ের সৌন্দর্য্য আছে, আকর্ষণ আছে, কার্য্যকারিতা আছে; কিন্তু অতিমাত্র কিছুই ভাল নহে।

সমিতি বলিতে পারেন, এরূপ সমালোচনে কাহার কি উপকার হইবে? ইহার উত্তরে আমরা বলিব, বিদ্যাসাগর মহাশয় বা বঙ্কিম বাবুর মত লোকের ইহাতে কোন উপকার না হইতে পারে; কিন্তু কুৎসিত-সাহিত্য-ব্যবসায়ীর প্ররোচনায় যাহারা অহরহঃ প্রবঞ্চিত হইতেছে, তাহারা নিশ্চয়ই উপকৃত হইয়া সমিতিকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

দ্বিতীয় উপকার বাঙ্গালা সাহিত্যের। কথাটা বলিলে অনেকের মনে হয়ত আঘাত লাগিবে; কিন্তু সত্যের সম্মান রাখিতে গেলে বাধ্য হইয়া বলিতে হয়, ব্যক্তি-বিশেষের হাতে জীবিত বা সচল সাহিত্যের নিরপেক্ষ সমালোচনা হয় না। বঙ্গীয় সাহিত্যে সমালোচনার প্রথা প্রকৃত প্রস্তাবে বঙ্গদর্শনের সময় হইতেই আরম্ভ হয়; কিন্তু যাঁহারা হেলেনা-কাব্য প্রভৃতি গ্রন্থের সমালোচনা বঙ্গদর্শনে পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, দেশ-কাল-পাত্রভেদে সমালোচকের নিরপেক্ষতা কতদূর কেন্দ্র-ভ্রষ্ট হইতে পারে, ঈর্ষ্যার কতদূর অধঃপতন হইতে পারে! কিন্তু সমিতির সুশিক্ষিত সভ্যগণ সাহিত্য-পরীক্ষার ভার লইলে পক্ষপাতের সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকিবে, সুতরাং তাঁহাদের সমালোচন অনেক পরিমাণে অভ্রান্ত হইবে। একের কায অপেক্ষা দশের কায যে অধিকতর ভ্রান্তি-শূন্য এবং নিরপেক্ষ হয়, ইহা সকলেই জানেন।

সমিতির সংশয়ের দ্বিতীয় কারণ, কথায় যাহা বলা যাইতেছে, কার্য্যে তাহা পরিণত হইবার কতদূর সম্ভাবনা আছে। এ আপত্তি অবশ্যই গুরুতর, কিন্তু ইহা সকল কাযে চিরদিনই থাকিয়া যাইবে। মনের আগ্রহ, প্রাণের পিপাসা কে কবে মিটাইতে পারিয়াছে? এ ক্ষুদ্র জগৎ মানবের কোন উচ্চ আকাঙ্ক্ষাই সম্পূর্ণরূপে পরিতৃপ্ত করিতে পারিবে না। সাধু আকাঙ্ক্ষা পোষণ কর, সৎকার্য্যে মনে প্রাণে যোগ দেও; যাহা আকাঙ্ক্ষা কর, তাহার সহস্র ভাগের একভাগও যদি সম্পাদন করিয়া উঠিতে পার, কৃতার্থ হইবে, জীবন ব্যর্থ হয় নাই জানিয়া আত্মায় অপার আনন্দ লাভ করিবে।

এই শুভানুষ্ঠানে কি প্রণালীতে অগ্রসর হইতে হইবে, তদ্বিষয়ে কিছু বলা আমাদের পক্ষে ধৃষ্টতা হইতে পারে; সমিতির সুযোগ্য সভ্যগণই তাহার অবধারণে যথোচিতরূপে সমর্থ।

শিক্ষানুশীলন।

[যিনি কুড়িটি প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর করিবেন, তিনি শিক্ষা-পরিচর-সমিতি হইতে এক খান প্রশংসা-পত্র পাইবেন। বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা-পরিচর তৃতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। শিঃ পঃ সঃ।]

৬ সংখ্যা প্রশ্ন। সরোজিনী সপ্তবর্ষীয়া বালিকা। তাহার পিতা যত্ন করিয়া কতকগুলি গোলাপের গাছ লাগাইয়াছেন, তাহাতে কিছু ফুল ফুটিয়াছে। একদিন প্রাতঃকালে বালিকা কাহাকেও কিছু না বলিয়া সমস্তগুলি ফুল তুলিয়াছে, একখানি কাচের রিকাবে তাহা সুন্দর করিয়া সাজাইয়াছে, এবং কি জানি কি মনে করিয়া সেই রিকাব খানি লইয়া তাহার মাতার নিকট যাইতেছে; এমন সময়ে সরোজিনী আছাড় খাইয়া পড়িয়া গেল, ফুলগুলি কাদার উপর ছিটিয়া পড়িল, কাচের রিকাব খানি বহুখণ্ডে ভাঙ্গিয়া গেল, বালিকা কাঁদিয়া উঠিল। তাহার মাতা ক্রন্দন শুনিয়া আসিলেন এবং ফুল, রিকাব ও বালিকার দুর্দ্দশা দেখিয়া দুঃখিত এবং ক্রুদ্ধ হইলেন। এখন তাঁহার কি করা উচিত?

---

৭ সং প্রঃ। অবোধ দরিদ্রের সন্তান। অবোধের বয়স ১৫ বৎসর হইয়াছে, তথাপি সে যাহার যাহা দেখে তাহাই পাইবার জন্য আবদার করে, না পাইলে মাকে ধরিয়া মারে। অবোধের এরোগ কিসে সারিবে?

---

৮ সং প্রঃ। যদু বাবু জমিদারের চাকুরী করেন, মফস্বলে সপরিবারে তাঁহাকে থাকিতে হয়। তাঁহার বাসার নিকটে ইতর লোকের বাস, ভদ্রলোক কেহ নাই। তাঁহার ষষ্ঠ বর্ষীয় পুত্র লোকনাথ সেই সকল ইতর লোকের সন্তানের সঙ্গে সর্ব্বদা থাকিয়া তাহাদের অশ্লীল ভাষা ও অসদ্ব্যবহার শিক্ষা করে, খেলনা, সন্দেশ বা টাকা পয়সা কিছুরই প্রলোভনে তাহাকে নিবৃত্ত রাখা যায় না। বালকটিকে ইতর-সংসর্গ হইতে রক্ষা করিবার উপায় কি?

---

৯ সং প্রঃ। রাম ধারাপাত পড়ে। শিক্ষক প্রশ্ন করিলেন, "ত্রিশ কড়ায় কত গণ্ডা?" শিক্ষকের মুখ হইতে প্রশ্ন বাহির হইতে না হইতে রাম উত্তর করিল, "পৌনে পাঁচ গণ্ডা।" বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া ধীরভাবে উত্তর করিবার জন্য উপদেশ করিয়া শিক্ষক আবার সেই প্রশ্নই করিলেন, কিন্তু রাম পূর্ব্ববৎ ব্যস্ততাসহকারে এবার উত্তর করিল, "সাড়ে দশ গণ্ডা।" রামের বিশ্বাস, ধারাপাত পড়িলেই বিদ্যা হয়, আর প্রশ্নের উপর যাহা তাহা একটা বলিলেই উত্তর হয়; যত্ন করিয়া পুস্তকের পড়া মনে রাখিবার, অথবা প্রশ্ন বুঝিয়া বিবেচনা করিয়া উত্তর দিবার কোন প্রয়োজন নাই। রামের এ কুসংস্কার কিসে দূর হইবে?

---

১০ সং প্রঃ। মনঃসংযোগের অন্তরায় কি কি, এবং কি কি উপায়ে সে সকল অন্তরায় হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে?

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

সতত সহজ জ্ঞান প্রস্ফুটিত যার,
অপর সঙ্গীর কিবা প্রয়োজন তার?

সংসারে জীবন যেই করেছে ধারণ,
সেই জানে ভাগ্যে ঘটে কি পরিবর্ত্তন।

যতনে আয়ত্ত কর প্রাকৃতিক জ্ঞান,
প্রকৃতির মধ্যে কর ঈশ্বরের ধ্যান।

যতনেতে যে দুঃখের হয় না বারণ,
তার তরে খেদোক্তির দেখিনে কারণ।

কার কাছে কোন্ কথা কখন বলিবে,
বলিবার আগে তাহা মনেতে ভাবিবে।

বিজ্ঞের চিন্তায় যাহা হয় উদ্ভাবিত,
উৎসাহী করে তাহা কার্য্যে পরিণত।

শিষ্টতায় কিবা মোহ থাকে লুক্কায়িত,
সকলেরই চিত্ত তাহে হয় আকর্ষিত।

পরের সন্তোষ তরে কর আলাপন,
খুঁজিও না তাহে নিজ চিত্ত-বিনোদন।

একবার প্রতারণা করেছে যে জন,
তারে আর বিশ্বাস না করিও কখন।

রমণীর প্রতি যেই করে অত্যাচার,
মানুষ বলিতে তার নাই অধিকার।

আপনাতে আপনার অবিশ্বাস যার,
কথায় কথায় দিব্য অভ্যাস তাহার।

পর-দুঃখে যাহাদের হৃদয় না গলে,
তাদের বিমল সুখ ভাগ্যে নাহি মিলে।

সরলতা প্রফুল্লতা দুইটি রতন,
ধর্ম্মের সতত তারা অঙ্গের ভূষণ।

উদারতা পৃথিবীতে সর্ব্ব-ভোগ্য ধন,
বন্ধু কিন্তু ঔদার্য্যের নিগড়-বন্ধন।

হউক স্বাধীন কথা যত হ'তে পারে,
অশ্লীলতা যেন তাহা স্পর্শ নাহি করে।

অন্যের প্রশংসা কর যত মনে লয়,
ধর্ম্ম তুল্য প্রশংসার্হ কিন্তু কেহ নয়।

লোভে আর বিবেকেতে মিলে না কখন,
আঁধার আলোক সহ মিশে না যেমন।

যথা আছে ভোগ্য বস্তু, কাষ কর্ম্ম নাই,
ইন্দ্রিয়ের স্বেচ্ছাচার সেখানেই পাই।

ভ্রম হেতু ত্রুটি যথা হয় অনুষ্ঠানে,
পরিপূর্ণ দণ্ড যেন না হয় সেখানে।

যাহারা রয়েছে বাঁধা রক্তের বন্ধনে,
থাকুক প্রেমের বাঁধ তাহাদের প্রাণে।

করিও না তীব্রভাবে কাহারো শাসন,
বিনা বিচারেতে দণ্ড দিও না কখন।

মানসিক সুখে যার অভিলাষ থাকে,
আপন শরীরে সেই আত্ম-বশে রাখে।

যাহা পারিবে না তুমি করিতে পালন,
করিবে না তার তরে প্রতিজ্ঞা কখন।

অহঙ্কারে বিবাদের সূত্র-পাত হয়,
হিংসার বলেতে তাহা পরিপুষ্ট রয়।

বাহিরে সন্তোষ-রত্ন কোথা পাবে আর?
আপনার চিত্তে কর অন্বেষণ তার।

নিন্দুক অন্যের দোষ করি উদ্‌ঘাটন,
আপনার তরে করে উৎপাত সৃজন।

ক্রোধী লোক অবিচারে অপরাধ করে,
স্থির হয়ে অনুতাপ করে তার পরে।

যখনই প্রকাশ করিবে শিষ্টাচার,
থাকে যেন তার সঙ্গে ঔদার্য্য তোমার।

বিবিধ বিধানে কর যতই শাসন,
বলেতে বিবেক বশ হয় না কখন।

অভ্যাসেতে প্রকৃতির হয় পরাজয়,
হইবে সতর্ক তাই অভ্যাস-সময়।

অবিশ্বাস নাহি করে উদার যে জন,
বিজ্ঞ পরীক্ষিয়া করে বিশ্বাস স্থাপন।

যাহাদের যত্ন সদা সদ্ভাব-স্থাপনে,
তাহারা কাটায় কাল লোকের সম্মানে।

যতনে গোপিত দোষ সংশোধিত নয়,
বরং গোপনে তার আরো বৃদ্ধি হয়।

জীবন সঙ্কীর্ণ বলি আক্ষেপ বিফল,
যাহা আছে তাই কর সুকর্ম্মে সফল।

কল্পনায় করিও না অভাব সৃজন,
কি জানি যদি নহে সে অভাব-মোচন।

কিবা ছোট কিবা বড় যা কিছু দেখিবে,
সকলেরি যথাযোগ্য বিচার করিবে।

সরল প্রাকৃত দর্শন।

জড়পদার্থ। তোমার সম্মুখে যে শ্লেটখানা রহিয়াছে, তুমি চক্ষুদ্বারা দেখিয়া বলিতেছ যে ইহা চতুষ্কোণ এবং কাল, হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া বলিতেছ যে ইহা কঠিন। রূপ ও কাঠিন্যবিশিষ্ট এই শ্লেটখানি জড়-পদার্থ। এইরূপ আমরা চক্ষুদ্বারা জড়পদার্থের রূপ, নাসিকা দ্বারা তাহাদের ঘ্রাণ, রসনা দ্বারা তাহাদের স্বাদ, ত্বক্ দ্বারা তাহাদের স্পর্শ এবং কর্ণ দ্বারা তাহাদের শব্দ প্রত্যক্ষ করি। ইন্দ্রিয় দ্বারা যে সকল বস্তুর প্রত্যক্ষ হয়, তাহাদিগকে জড়পদার্থ কহে। আমরা জড়পদার্থের পরিবর্ত্তে সংক্ষেপতঃ "পদার্থ" শব্দ ব্যবহার করিব।

কঠিন পদার্থ। এই চতুষ্কোণ শ্লেটখানা তুমি জলের ন্যায় গ্লাসে কিম্বা বোতলে পূরিতে পার না। ইহার আকৃতি সহজে পরিবর্ত্তন করা যায় না; ইহা কঠিন পদার্থ। এইরূপ থালা, বাটী, টেবিল প্রভৃতি কঠিন পদার্থ। কঠিন পদার্থের নির্দ্দিষ্ট আকৃতি আছে, সহজে সেই আকৃতির পরিবর্ত্তন করা যায় না।

ব্যাপ্তি ও আকৃতি। এই শ্লেট-খানা নির্দ্দিষ্ট স্থান ব্যাপিয়া রহিয়াছে। এই-রূপ সমুদায় জড়পদার্থই অল্প বা অধিক স্থান ব্যাপিয়া থাকে। জড়পদার্থের এই গুণকে ব্যাপ্তি কহে। ব্যাপ্তি আছে বলিয়াই পদার্থ মাত্রেরই আকৃতি আছে।

কাঠিন্য। পেন্সিলের পরিবর্ত্তে যদি একটী লোহার শলা দিয়া শ্লেটের উপর লিখ, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে যে এই লেখা পেন্সিলের লেখার মত মুছিলে উঠিয়া যায় না; শ্লেটের উপর ঈষৎ গভীর দাগ পড়িয়া যায়। লোহা শ্লেট অপেক্ষা অধিকতর কঠিন। যে কোন কঠিন পদার্থের ধারাল দিক্ দিয়া অন্য কোন পদার্থের উপর দাগ টানিলে যদি তাহাতে দাগ পড়িতে দেখি, তাহা হইলে প্রথমটীকে দ্বিতীয়টী অপেক্ষা কঠিনতর বলিতে হয়। কাগজ হইতে আমাদের নখ অধিকতর কঠিন। কাঠ অপেক্ষা শ্লেট, শ্লেট অপেক্ষা লোহা, এবং লোহা অপেক্ষা কাচ অধিকতর কঠিন। হীরার তুল্য কঠিন পদার্থ আর নাই; ইহা দ্বারা কাচ কাটা যায়।

যদিও কাঠ হইতে শ্লেট অধিকতর কঠিন, তথাপি ইহা যেরূপ অল্প আঘাত পাইলেই ভাঙ্গিয়া যায় কাঠ সেরূপ আঘাতে ভাঙ্গে না। কাচ যদিও অতিশয় কঠিন, তথাপি শ্লেটের ন্যায় অল্পাঘাত পাইলেই ভাঙ্গিয়া যায়। এই জন্য শ্লেট কাচ প্রভৃতিকে ভঙ্গুর কহে।

গতি ও বেগ। শ্লেট, বহি, দোয়াৎ প্রভৃতি টেবিলের উপর স্থিরভাবে রহিয়াছে, অর্থাৎ ইহারা যেস্থানে আছে সেই স্থানেই থাকে, উহা পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যায় না। যখন ইহারা এক স্থান পরিত্যাগ করিয়া অন্য স্থান অধিকার করে, তখন ইহারা গতি-বিশিষ্ট হয়। এই স্থান পরিবর্ত্তনকে গতি কহে। কোন একটী পদার্থের গতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে অবগত হইতে হইলে আমাদিগকে দুইটী বিষয় জানিতে হয়; গতির দিক্,

অর্থাৎ পদার্থটী কোন্ দিকে যাইতেছে, এবং গতির বেগ অর্থাৎ কত জোরে যাইতেছে। মনে কর, আমি সমভাবে চলিয়া এক ঘণ্টায় এক ক্রোশ, দুই ঘণ্টায় দুই ক্রোশ, এইরূপ ক্রমশঃ যদি চলিতে পারি, তাহা হইলে আমার চলিবার বেগ প্রতি ঘণ্টায় একক্রোশ। গতির বেগ সর্ব্বদা সমান না হইতে পারে; আমরা কখনও ধীরে ধীরে, কখনও তাড়াতাড়ি হাটিয়া থাকি। বেগ সর্ব্বদা সমান থাকিলে তাহাকে "সমবেগ" এবং সময়ানুসারে বিভিন্ন হইলে তাহাকে "বিষম-বেগ" কহে।

বল। শ্লেট কি বহি টেবিলের উপর যেখানে রাখিবে সেখানেই থাকিবে। স্থির পদার্থসমূহ আপনা হইতে চলিতে পারে না। কেহ ধাক্কা না দিলে ইহারা আপনা আপনি গতিবিশিষ্ট হয় না; কেহ চালাইয়া না দিলে একস্থান ছাড়িয়া অন্যস্থানে যাইতে পারে না। যদ্দ্বারা পদার্থসমূহ স্থিরভাব পরিত্যাগ করিয়া গতিবিশিষ্ট হয়, তাহাকে "বল" কহে। ধাক্কা দেওয়া বল-প্রয়োগ ভিন্ন আর কিছুই নহে। বলের আরও নানাবিধ কার্য্য আছে; ইহা গতি-বিশিষ্ট পদার্থকে পুনরায় স্থিরভাবে আনয়ন করে; তুমি "ব্যাট" দ্বারা আঘাত করিয়া একটী গোলা ("বল") দ্রুতবেগে চালাও, যদি কেহ ইহা থামায়, তাহা হইলে তাহাকে গোলার গতির বিপরীত দিকে ইহাতে বল প্রয়োগ করিতে হয়। যত অধিক বেগে গোলা চলিবে, ইহাকে থামাইতে তত অধিক প্রতিকূল বল প্রয়োগের প্রয়োজন হইবে। যেদিকে আঘাত করিবে, গোলা সেই দিকেই ছুটিবে; অধিক বলে আঘাত করিলে, গোলাও অধিক বলে চলিবে, আঘাতের বল অল্প হইলে, গোলার বেগও অল্প হইবে। যদি গোলাটী নির্দ্দিষ্ট বেগে কোন দিকে চলিতে থাকে, তাহা হইলে ইহাকে সেইদিকে অধিকতর বেগে চালাইতে হইবে, সেইদিকে ইহার উপর বল প্রয়োগ করিতে হয়; এইরূপ জড়পদার্থের সরলরেখা ক্রমে সমবেগ পরিবর্ত্তন করিতে হইলেও ইহার উপর বল-প্রয়োগ আবশ্যক। ফলতঃ যদ্দ্বারা জড়পদার্থের সচল অথবা নিশ্চল অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন সাধিত হয়, তাহাকে "বল" কহে। যেদিকে বল প্রয়োগ করা যায়, পদার্থের গতিও সেই দিকেই হয়। অধিক বল প্রয়োগ করিলে পদার্থের বেগও অধিক হয়; বল অল্প হইলে, বেগ অল্প হয়।

সার। সমান আয়তনের একটি কাঠের ও অপরটি লোহার গোলাকে যদি সমান বলে আঘাত কর তথাপি দুইটি গোলাই সমান বেগে ছুটিবেনা, কাঠের গোলা অপেক্ষা লোহার গোলা নিশ্চয়ই অল্প বেগে ছুটিবে। ইহার অর্থ এই যে, পদার্থের পরিমাণ অনুসারে তাহাদের বেগ ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। পদার্থের পরিমাণকে "সার" কহে। কাঠের গোলা অপেক্ষা সমান আয়তনের লোহার গোলাতে সার অধিকতর। এক ঘন-ইঞ্চ তৈল * অপেক্ষা এক ঘন-ইঞ্চ জলে সার অধিকতর; আবার এক ঘন-ইঞ্চ জল অপেক্ষা এক ঘন ইঞ্চ লৌহে সার অধিকতর। সারের সহিত বেগের একটি অনুপাত আছে, ইহাকে

* এক ইঞ্চ দীর্ঘ এক ইঞ্চ প্রস্থ ও এক ইঞ্চ বেধ এই পরিমাণ স্থানে যতটুকু তৈল ধরে।

প্রতিলোম অনুপাত কহে। তুমি যদি দুইটি ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে সমান বল প্রয়োগ কর, তাহা হইলে তাহাদের বেগ সমান না হইয়া যে পদার্থের সার বেশী তাহার বেগ অল্প, ও যাহার সার অল্প তাহার বেগ অধিক হইবে। সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন সার-বিশিষ্ট পদার্থে তুল্য বেগ উৎপাদন করিতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ বল-প্রয়োগের প্রয়োজন। প্রযুক্ত বল সারের অনুপাতীয় হইলে উৎপন্ন বেগ তুল্য হইবে। কোন একটী পদার্থে কোন বল যে বেগ উৎপাদন করে, ইহার দ্বিগুণ সারবিশিষ্ট একটী পদার্থে সেই বেগ উৎপাদন করিতে পূর্ব্বের দ্বিগুণ বলের প্রয়োজন।

ঘর্ষণ। টেবিলের উপর একটী গুরু ভার টানিয়া নিতে সমধিক বলের প্রয়োজন। টেবিল কাঠের না হইয়া যদি কাচের হইত, তাহা হইলে এই ভার ইহার উপর টানিয়া নিতে পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় অল্প বলেরই প্রয়োজন হইত। কাঠের ঘর্ষণ জনিত সমধিক প্রতিকূল বলই ইহার কারণ। কাচের ঘর্ষণের প্রতিকূল বল অপেক্ষা কাঠের ঘর্ষণের প্রতিকূল বল অতিশয় অধিক। যে পদার্থ যত মসৃণ, তাহার ঘর্ষণ তত অল্প। একটী গোলাতে আঘাত করিলে কিয়দ্দূর চলিয়াই তাহা থামিয়া যায়; ইহার কারণ এই যে, ভূমির ও বায়ুর ঘর্ষণ-নিবন্ধন ইহাতে একটী প্রতিকূল বল প্রযুক্ত হয়।

জড়ত্ব। বন্ধুর ভূমির পরিবর্ত্তে যদি মসৃণ বরফের উপর তুল্য বল গোলাতে আঘাত করা যায়, তাহা হইলে গোলা পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় অধিক দূর পর্য্যন্ত যাইয়া থামে। ঘর্ষণ যতই কম হয়, ইহা থামিবার পূর্ব্বে ততই অধিক দূর পর্য্যন্ত যায়; যদি ঘর্ষণ-জনিত অথবা অন্য কোন রূপ প্রতিকূল বল প্রযুক্ত না হয়, তাহা হইলে গোলা সমবেগে সরলরেখা-ক্রমে চলিয়া যায়। বলপ্রয়োগ ভিন্ন ইহার গতির কোন পরিবর্ত্তন হয় না। পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে, কোন পদার্থ স্থির থাকিলে স্থিরভাবেই থাকিবে, আপনা হইতে চলিতে পারে না; এবং সচল থাকিলে সমবেগে সরল-রেখা-ক্রমে চলিতে থাকে, আপনা হইতে স্থির হইতে পারে না। বাহ্যিক বল-প্রয়োগ ভিন্ন ইহার সচল কি নিশ্চল ভাবের কোন পরিবর্ত্তন হয় না। জড়পদার্থের এই গুণকে জড়ত্ব কহে।

জড়ত্বের উদাহরণ। নৌকা চলিতে চলিতে যদি হঠাৎ কোন বাধা পাইয়া থামিয়া যায়, তাহা হইলে নৌকাস্থ আরোহিগণের শরীরের অগ্রভাগ সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, এবং বেগ প্রতিরোধ করিতে না পারিলে নৌকার উপর পড়িয়া যায়। নৌকার আরোহিগণও গতিশীল ছিল; যখন বাধা পাইয়া নৌকা থামিয়া যায়, তখন আরোহিগণের পাদদেশ ও শরীরের নিম্নভাগ নৌকা-সংলগ্ন ছিল বলিয়া নৌকার সহিত গতিশূন্য হয়; শরীরের অগ্রভাগ সমবেগে সম্মুখের দিকে চলিতে থাকে; সুতরাং পড়িয়া যায়। ঘোড়া দৌড়িতে দৌড়িতে হঠাৎ থামিলে আরোহী সম্মুখের দিকে পড়িয়া যায়। ধাবমান গাড়ী হইতে কেহ লম্ফ প্রদান করিলে, যেদিকে গাড়ী চলিতেছিল, সে সেইদিকে ভূমিতে পড়িয়া যায়। গাড়ীর বেগ অধিক হইলে গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়। রেলের গাড়ীতে

দুর্ঘটনা-সমূহও পদার্থের জড়ত্ব-নিবন্ধন হইয়া থাকে। ধাবমান গাড়ী হঠাৎ থামিলে, আরোহিগণ সম্মুখের দিকে পড়িয়া সমধিক আঘাত প্রাপ্ত হয়। ময়লা কাপড়ে লাঠি দ্বারা আঘাত করিলে, ধূলাগুলি উড়িয়া যায়। কুকুর বিড়াল প্রভৃতি পশু ভিজিলে গা ঝাড়ে এবং ইহাতে জল-কণা-সমূহ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়। এক খণ্ড দড়ির অগ্রভাগে একটা ঢেলা বাঁধিয়া, অপরপ্রান্ত হাতে ধরিয়া ঘুরাও, দড়ি ছাড়িয়া দিলে ঢেলা সরল-রেখা-ক্রমে একদিক চলিয়া যায়। যে মুহূর্ত্তে দড়ি ছাড়িয়া দেওয়া যায়, সেই মুহূর্ত্তে ঢেলাটীর যেদিকে যে বেগ ছিল, ইহা সেই দিকে সেই বেগে চলিতে থাকে।

উপকথা।

১১

বসন্তকুমার।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বসন্তকুমার বড় ভাল ছেলে। চতুর্দ্দশ বৎসর অতিক্রম করিয়া বসন্ত পঞ্চদশে পদার্পণ করিয়াছে, বলিতে গেলে বসন্ত এখনও বালক। তাহার সাধুতা, নম্রতা, বিনয়, শিক্ষানুরাগ এবং পারদর্শিতা গুণে গ্রামস্থ সকলেই তাহাকে ভাল বাসে, সকলেই বলে বসন্ত মানুষ হইলেই তাহার জননীর দুর্দ্দশা ঘুচিবে। সংসারে মা ভিন্ন বসন্তের আপনার বলিতে কেহ নাই। সেই স্নেহময়ী জননী পাঁচবৎসরের শিশু বসন্তকে কোলে করিয়া একাকিনী অকূল সংসারসাগরে ঝাঁপ দেন। স্বামীর পরলোক গমনের পর হইতে বসন্তই তাঁহার নয়নের মণি, অন্ধের যষ্টি! তাহাকে কোলে করিয়া আশায় বুক বাঁধিয়া জননী আজ দশ বৎসর সংসারের দুঃখ কষ্ট সহিয়া বসন্তকে মানুষ করিতেছেন। বসন্তও আশাতিরিক্ত ভাল ছেলে হইয়াছে—কিন্তু বেচারা বড়ই গরিব। একখানি ছোট রকমের বাড়ী আর সামান্য একটু জোত জমা—তাহাই নাড়িয়া চাড়িয়া বসন্ত ও তাহার বিধবা জননীর দিনপাত হয়। বসন্তের মা কাঙ্গালিনী, কিন্তু তাঁহার ন্যায় ধর্ম্মশীলা ব্রহ্মচারিণী বিধবা অতি অল্পই দেখিয়াছি। তিনি আপনার অন্নবস্ত্রের দিকে না চাহিয়া কিসে বসন্তের ভাল রকম লেখা পড়া হয় নিশিদিন সেই জন্য কায়ক্লেশে দিনপাত করিয়াও অর্থসঞ্চয় করেন, তাহাতেই বসন্তের এতদিন লেখা পড়া চলিতেছিল।

আজ দশ বৎসরের পর বসন্তের মাতার মুখ উজ্জ্বল হইয়াছে, তাঁহার বৈধব্যক্লিষ্ট

অধরপ্রান্তে হাসির রেখা দেখা দিয়াছে। বহুদিনের আশালতা আজ পল্লবিত হইয়াছে—বসন্ত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তি পাইয়াছে। সংবাদ শুনিয়া গ্রামের সকলেই সন্তুষ্ট। আজ দরিদ্রকুটীরে গ্রামস্থ বালক-বৃদ্ধযুবারা দলে দলে আসিয়া কেহ বসন্তের সঙ্গে, কেহ বা তাহার মাতার সঙ্গে আনন্দের অভিনন্দন করিতেছে। বালকেরা দেখিতে আসিয়াছে যে ছাত্রবৃত্তি পাইয়া বসন্তের কোন নূতন অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বাড়িয়াছে কি না? পুর-রমণীরাও আসিয়াছেন—কেহ আহ্লাদ জানাইতেছেন, কেহ আশার কাহিনী শুনাইতেছেন, কেহ ভবিষ্যদ্বাণী কহিতেছেন, এবং সকলেই অল্পাধিক পরিমাণে আপনাপন সন্তানের বিদ্যাহীনতা লক্ষ্য করিয়া উদ্দেশে সমালোচনা করিতেছেন!

মাতার সুখের হাসি দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারিল না। এতকাল যে বসন্তকে শয়নে স্বপনে কোলের মধ্যে করিয়া সংসারে ঝঞ্ঝাবাত সহিয়াছেন, আজ সে বিদ্যাভ্যাসের জন্য মাতাকে ছাড়িয়া বিদেশে যাইবে! বসন্ত বৃত্তি পাইয়াছে, বসন্ত মানুষ হইবার পথে দাঁড়াইয়াছে, বসন্ত উত্তরোত্তর উন্নতিলাভ করিয়া মাতার চক্ষের জল মুছাইতেছে—ইহা কল্পনায় ভাবিয়া কত সুখ হইত; আজ সেই কল্পনা সত্যে পরিণত হইয়াছে, মা আনন্দে মগ্ন না হইয়া কি থাকিতে পারেন? কিন্তু হায়! দরিদ্রের সুখের সঙ্গেও দুঃখের হলাহল মিশিয়া আইসে—বসন্ত বিদেশে যাইবে, কে তাহাকে খাওয়াইবে, কে পরাইবে, কে পীড়ার সময় শিয়রে বসিয়া স্নেহের হাত বুলাইয়া তাহার তাপিত অঙ্গ জুড়াইয়া দিবে? আর স্নেহময়ী জননীই বা তাহাকে বিদায় দিয়া শূন্যঘরে কেমন করিয়া থাকিবেন? এই সকল চিন্তা যুগপৎ উদিত হইয়া মাতার হরিষে বিষাদ উপস্থিত হইল। কিন্তু যাহা না করিলে নয়, বসন্তের মঙ্গলের জন্য চিরদিনইত তাহা অকাতরে করিয়া আসিতেছেন, আজ কি তিনি বসন্তের উন্নতির পথে কণ্টক হইবেন? না—তাহা কখনই হইতে পারে না। বসন্তের যাওয়াই স্থির হইল।

"বসন্ত! বাবা! তুই যে অন্ধের নয়নতারা—তোকে ছাড়িয়া আমি কেমন করিয়া থাকিব—আমার যে ত্রিসংসারে আর কেহ নাই?" বালির বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেল—মাতার উচ্চপ্রতিজ্ঞা ভাসিয়া গেল, শ্রাবণের জলস্রোতের মত বুক ভাসাইয়া অশ্রুস্রোত বহিল, মা ও ছেলে উভয়েই কাঁদিয়া আকুল। বিদায়ের দৃশ্য বড়ই শোকাবহ হইয়া উঠিল। সময় বুঝিয়া পূর্ব্বস্মৃতি জাগিল, পূর্ব্ব অবস্থা স্মরণ হইল।

চিরদিন কিছু এমন ছিল না। একদিন সংসারের অবস্থা ভালই ছিল, অন্নবস্ত্রের ক্লেশ ছিল না। ধনে জনে মধ্যবিধ ভদ্রপরিবার যেমন দশ স্থানে থাকে তাঁহাদেরও সেইরূপ অবস্থা ছিল। তার পর কপাল পুড়িল, শ্বশুর শ্বাশুরী স্বর্গারোহণ করিলেন, স্বামী সমাজশাসনের অনুরোধে শ্রাদ্ধাদিতে প্রথমে অল্প ঋণগ্রস্ত হইলেন। ক্রমে সুদে আসলে তাহা বাড়িল, বন্যার জলের মত তাহার প্লাবনে সামান্য সম্পত্তি টুকু ডুবিয়া গেল। মহাজনের দায় মুক্ত হইয়া স্বামী দেখিলেন একখানি ক্ষুদ্র বাটী আর একটি সামান্য জোত বাঁচিয়াছে—তাঁহার বুক ভাঙ্গিয়া

পড়িল। চিন্তা পীড়া ক্লেশের হস্ত ছাড়িয়া তিনি শান্তিধামে গমন করিলেন। কিন্তু বসন্ত ও তাহার মা অকূল সাগরে পড়িলেন। মা আজ দশ বৎসরের শোক নূতন করিয়া বুঝিতে লাগিলেন। ক্রমে সময় নিকট হইয়া আসিল, স্নেহময়ী জননী উর্দ্ধনেত্রে করযোড়ে মনে মনে ইষ্টদেবতাকে ডাকিয়া তাঁহার হাতে পুত্রকে সমর্পণ করিলেন। মা ও ছেলে কাহারই কথা ফুটিল না, নয়নজলে বক্ষঃস্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। তারপর বসন্ত প্রণাম করিল, ক্ষুদ্র পুঁটিলীটি লইয়া সঙ্গীদের সঙ্গে যাত্রা করিল—মা একদৃষ্টে সেই পথের দিকে চিত্রপুত্তলিকার মত চাহিয়া চাহিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। আবার যেমন চাহিয়া দেখিলেন বসন্তের মুখ আর দেখা যাইতেছে না, তখন ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পাঠক! তোমার স্নেহময়ী জননী আছেন কি? সেই স্বর্গাদপি গরীয়সী সাক্ষাৎ দেবীমূর্ত্তি তোমার গৃহে যদি থাকেন, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এই শোকের গাম্ভীর্য্য তিনি বুঝাইতে পারিবেন! লেখকের ক্ষুদ্রশক্তি, ভাষার ক্ষীণকণ্ঠ, শব্দবিন্যাসে সে শোক কেমন করিয়া বুঝাইয়া দিব?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

"এখানে থাকিবার স্থান নাই—একি অতিথিশালা পাইয়াছ?" অতি কর্কশ স্বরে একজন বাবু আপন সৌধশিখরে সায়াহ্ন সমীরণ সেবন করিতে করিতে এই কয়েকটী কথা বলিতেছেন, আর সৌধপাদমূলে আজানু ধূলিধূসরিত দুইটি পঞ্চদশ বর্ষীয় বালক কাতর বদনে উর্দ্ধনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া সেই কথা শুনিতেছে।

বাবুর কথাগুলি বসন্ত ভাল করিয়া বুঝিতে পারিল না। সে কখনও অতিথিশালা কাহাকে বলে জন্মে তাহা দেখে নাই। সে দেখিয়াছে যে তাহাদের এমন দুঃখের সংসারেও অতিথি আসিলে মা অতি শ্রদ্ধার সঙ্গে সাধ্যমত সেবা করিয়া থাকেন এবং শীতের সময়ে আপনার শীতবস্ত্র অতিথিকে দিয়া মাতা পুত্রে কায়ক্লেশে রজনী যাপন করেন। বসন্ত জানিত তাহার মা দরিদ্র হইয়া আপন জীর্ণ কুটীরের একাংশ দান করেন, আপনার ক্ষুধার অন্নের অর্দ্ধভাগ অতিথিকে দিয়া থাকেন—ইহা অবশ্যই পৃথিবীর নিয়ম; যেখানে যাইবে সেখানেই এইরূপ ঘটনা দেখিতে পাইবে। এই বিশ্বাসে সে বাড়ী হইতে আসিয়াছে। এবং যেখানে উচ্চ উচ্চ অট্টালিকা, স্থানের অভাব নাই, অন্নের অভাব নাই, আশ্রয় পাইবার সন্দেহই হইতে পারে না, বসন্ত সঙ্গী বালকটীর হাত ধরিয়া সেইরূপ একটি বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছে! সেই রাজ প্রাসাদ তুল্য প্রকাণ্ড বাটীতে এত স্থান রহিয়াছে তবুও "এখানে থাকিবার স্থান নাই" একথা কেন গৃহবাসী বারম্বার বলিতেছেন তাহা সহসা বসন্তের মস্তকে প্রবেশ করিল না। সে কেবল কাতর কণ্ঠে বিনয় বচনে বলিল।

"আমাদের দাঁড়াইবার স্থান নাই, বিশেষ আমরা কখনও সহরে আসি নাই, পথ ঘাট চিনি না; অন্ততঃ আজকার রাত্রিটী এখানে থাকিতে দিলে কাল প্রাতঃকালে দেখিয়া শুনিয়া লইতাম"।

বাবু। পথ ঘাট না চিনিলে এখানে আসিলে কেমন করিয়া। আমার বাড়ী, আমি থাকিতে দিব না, তাহাতে এত ন্যায় শাস্ত্রের ছড়াছড়ি কেন? দ্বারোয়ান্! ইহা-দিগকে ফাটকের বাহিরে যাইবার পথ দেখা-ইয়া দেও।”

বসন্ত তখন বুঝিলেন ইহার নাম “সহর” —এখানে কেহ কাহাকেও থাকিতে দেয় না। দ্বারবান আসিতে না আসিতেই সঙ্গী বালকের হাত ধরিয়া আবার রাজপথে দাঁড়া-ইলেন। স্নেহময়ী জননীর রোরুদ্যমান মুখ মনে পড়িল, ক্ষুধাতৃষ্ণার যন্ত্রণাও পথশ্রমের সঙ্গে শোকের তীব্রতা আসিয়া মিশিল, বসন্ত কাঁদিয়া ফেলিবার উপক্রম করিয়াছেন। এমন সময়ে একজন ভদ্র বেশধারী নিকটে আসিয়া মধুর বচনে জিজ্ঞাসা করিলেন।

“তোমরা কে—এখানে কি খুঁজিতেছ”?

“আমরা—” বসন্ত এবার সত্য সত্যই কাঁদিয়া ফেলিলেন। “আমরা” বলিতে না বলিতেই কণ্ঠরুদ্ধ হইয়া আসিল, নয়ন জলে বুক ভাসিয়া গেল।

ভদ্রলোকটী ধীরে ধীরে প্রশ্নের উপর প্রশ্ন করিয়া বসন্তের কাহিনী কিয়ৎ পরিমাণে শুনিলেন; বুঝিলেন—নিরাশ্রয়। তাঁহার দুঃখ হইল, দয়া হইল; তিনি বালক দুইটিকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন। সে রাত্রির মত বসন্ত আশ্রয় পাইলেন।

এমন করিয়া কয়দিন কাটিবে? বসন্ত বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছেন, এমন সময়ে সেই দয়াশীল ভদ্রলোক তাঁহার কাছে আসিয়া বসিলেন এবং বলিলেন।

“তুমি যদি বালকদিগের সঙ্গে কোন ছাত্রাবাসে থাকিতে পার তবে মাসিক ৩ টাকা খরচে থাকিবার সুবিধা করিয়া দিতে পারি।”

বসন্ত আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন। তিনি মাসে মাসে পাঁচটাকা বৃত্তি পাইবেন, তিন টাকা খরচ করিয়া থাকিতে পারিলে দুইটাকা বাঁচিবে। তাহাতেই পাঠের আনুষঙ্গিক ব্যয় কুলাইতে পারে! মা আসিবার সময়ে তাঁহার সযত্ন সঞ্চিত দুইটী টাকা সঙ্গে দিয়াছিলেন, তাহা কোমরে বাঁধাই আছে। যদি কখন অকুলন পড়ে তাহা হইতে পূরণ করিবেন। মনে মনে পরামর্শ স্থির হইল। বসন্ত সম্মত হইলেন।

পিঞ্জরাবদ্ধ বন বিহঙ্গকে দীর্ঘকালের পর পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া দিলে সে আবার পিঞ্জরে প্রবেশ করিবার জন্যই চেষ্টা করে; অনন্ত আকাশের মুক্ত বায়ু তাহার প্রাণে আধি তুলিয়া দেয়, তাই সে পাতাটি নড়িলে পাখীটি ডাকিলে কুকুর বিড়াল দেখিলে পিঞ্জরের কোণে লুকাইবার চেষ্টা করে। দুই চারিদিন বড়ই বাধ বাধ করে, বড়ই ভয় ভয় করে, বড়ই যেন নিরাশ্রয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে—তার পর থাকিতে থাকিতে সহিয়া যায়, উড়িতে উড়িতে পাখায় বল হয়, দেখিতে দেখিতে সাহস জন্মিয়া থাকে, কিছুদিন পরে সে পুরাতন পিঞ্জরের কথা স্বপ্ন কাহিনীর মত কখন কখন মনে পড়ে মাত্র। মাতার স্নেহময় কোল ছাড়িয়া একেবারে সংসারের মুক্ত আকাশে আসিয়া দিন কতক বসন্তের প্রাণ বড়ই কেমন কেমন করিতে লাগিল। আহারের সময়ে মাতার স্নেহমাখা মুখখানি মনে পড়ে, বসন্ত ভাল করিয়া

আহার করিতে পারেন না—শয়নের সময়ে তাঁহার স্নেহবিজড়িত মধুর সম্ভাষণ মনে পড়ে বসন্ত ভাল করিয়া ঘুমাইতে পারেন না!

সময়ে সকলই সহিয়া যায়—আর বসন্তের মত গরিবের সহ্য না করিয়া আর কি কোন উপায়ান্তর আছে? বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া যাহারা পিতৃসঞ্চিত বিপুল ঐশ্বর্য্য উপভোগ করিবে তাহারা এই সকল দুঃখ ক্লেশ সহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারে। কিন্তু যাহাকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া দৈনিক জীবিকা আহরণ করিতে হইবে, যাহাকে একদিনের অন্নজল দিয়া সাহায্য করে এমন কেহ নাই, সে চিরদিন মাতৃক্রোড়ে শয়ন করিয়া মাতার অঞ্চল ধরিয়া হাঁটি হাঁটি পা পা করিয়া বেড়াইলে চলিবে কেন? এখন ত বসন্ত একেবারে বালক নহে—এ সকল কথা ভাবিতে এবং বুঝিতে শিখিয়াছে। তাই আপন অবস্থা স্মরণ করিয়া, আপন কর্ত্তব্য আলোচনা করিয়া, জীবনের লক্ষ্যের দিকে চাহিয়া বসন্ত ক্রমে সকল সহ্য করিতে শিখিলেন।

বসন্ত প্রবাসে গেলে মা প্রথম প্রথম দিন কতক বড়ই কাঁদিলেন, অন্নজল ছাড়িবার উপক্রম করিলেন, প্রতিবেশী বালকদিগের মধ্যে বসন্তের খেলার সাথীদিগকে কখন দেখিলে সেই দিকে বহুক্ষণ অনিমেষ লোচনে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন! অবশেষে মনে হইল, বসন্তের লেখা পড়ার জন্য এখন হইতে অধিক অর্থ আবশ্যক হইবে, সে বিষয়ে উদাসীন হইয়া কেবল বৃথা শোক করিলে বাছা আমার প্রবাসে কষ্ট পাইবে যে! জননি! তুমি যদি দেবী না হও স্বর্গে দেবতা নাই! এমন করিয়া সন্তানের জন্য আত্মজীবন বিসর্জ্জন দিতে এমন করিয়া তাহার নিত্য মঙ্গল চিন্তা করিয়া তাহার জন্য জীবনপাত করিতে তুমি ভিন্ন আর কেহ পারে না। পিতা আকাশ হইতে উচ্চ, কিন্তু মা তুমি স্বর্গ হইতে গরীয়সী!!

তৃতীয় ভাগ।] শ্রাবণ [৪র্থ সংখ্যা।

(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল,।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,

৯০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। } শ্রাবণ ১২৯৮ সাল। { ৪র্থ সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১৬

তোমার প্রেমের কথা যখনি ভাবিতে যাই,
জননি! তখনি দেখি সে প্রেমের অন্ত নাই!
চোর, দস্যু, মিথ্যাবাদী, ব্যভিচার-পরায়ণ,
নৃশংস রক্তাক্ত-কর নর-ঘাতী ভয়ঙ্কর,
কাননে দুর্দ্দান্ত ব্যাধ, নগরে কসাই-চয়,
পাপ-স্পর্শ পাপ-স্মৃতি বিশ্বাস-ঘাতক নর;—
মা! তোমার রাজ্য হ'তে নির্ব্বাসিত নহে এরা,
হয় না এদের রক্তে বসুমতী কলঙ্কিত,
মানব-বিচার-পতি—ক্রোধ যেন মূর্ত্তিমান।
আপন বিধান-বলে যদি না করে দণ্ডিত।
অনন্ত পাপীর দল কোলে লয়ে বসে আছ,
তুষিতেছ পুষিতেছ সমস্ত সম্পদ-দানে,
অনিল, অনল, জল, রবি-তেজ, শশি-কর,
সকলে করিছ দান যথা-যুক্ত পরিমাণে।
সুরসে রসনা তুষ্ট, সুগন্ধে নাসিকা তৃপ্ত,
সুস্বরে শ্রবণ মুগ্ধ তুল্যভাবে সবাকার,
সুজন দুর্জ্জন তব সমান কি প্রেমাস্পদ?
কি জানি মা! বুঝিনা ত কি যে বিধি এ তোমার।

স্বদেশ-প্রীতির উপকরণ।

আপনার দেশকে ভাল বাস। ব্যক্তি-বিশেষ বা স্থান-বিশেষকে ভাল বাসিলে কেবল ব্যক্তি-বিশেষ বা স্থান-বিশেষ তোমার প্রেম উপভোগ করিবে, কিন্তু দেশকে ভাল বাসিলে দেশের অগণ্য নর-নারী প্রীতির সহিত তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিবে। প্রতি-দানের আশা না করিয়া স্বদেশকে ভাল বাসাতে মহত্ত্ব আছে; কিন্তু যদি প্রতিদান চাও, তাহা হইলে এই সর্ব্বজনীন-প্রীতি-প্রসূত-আশীর্ব্বাদের বড় আর কি আছে?

যাহারা স্বাধীন, তাহারা দেখ কেমন প্রাণের সহিত স্বদেশকে ভাল বাসে, প্রয়োজন হইলে কেমন আনন্দের সহিত স্বদেশের জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত দান করে। স্বাধীন অপেক্ষা অধীন দেশে স্বদেশ-প্রীতির প্রয়োজন অধিক, অথচ তাহাতে বাধা বিঘ্নও প্রচুর। কিন্তু এই সকল বাধা বিঘ্ন থাকে বলিয়াই অধীন দেশে স্বদেশ-প্রীতিকে যেমন সুন্দর দেখায়, স্বাধীন দেশে তেমন নহে। যে প্রীতি প্রতি-কূল-শক্তির সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ করিতে না পারিল, তাহার সৌন্দর্য্য বা মহত্ত্ব কোথায়? পরাধীনা জননী সন্তানের সেবায় যত তুষ্ট, এত আর কিছুতেই নহে।

স্বদেশ-প্রীতি কিসে প্রকাশ পায়? কেবল কর্ম্মে। স্বদেশকে ভাল বাস, একথা কেবল মুখে বলিলে হইবে না, কাযে দেখাইতে হইবে। মনে মনে ভালবাসা থাকিতে পারে, কিন্তু যতক্ষণ তাহার উপযুক্ত কায কিছু দেখাইতে না পারিতেছ, ততক্ষণ সে ভালবাসার বন্ধ্যাত্ব দূর হইতেছে না।

কাযের জন্য শক্তি-সংগ্রহ চাই, বিনা শক্তিতে কার্য্যোদ্ধার হয় না; আবার শক্তি-সংগ্রহের জন্য আলোচনা বা পরিচালনা চাই, বিনা আলোচনা বা পরিচালনায় শক্তি-সংগ্রহ অসম্ভব। একজন জলে ডুবিয়া মরিতেছে, তাহাকে তুলিয়া রক্ষা করা তোমার কার্য্য; কিন্তু নিজে জলে নামিয়া সাঁতার দিবার শক্তি না থাকিলে কেমন করিয়া তাহাকে বাঁচাইবে, আর রীতিমত যত্ন করিয়া সাঁতার শিখিয়া না থাকিলে কেমনেই বা জলে সাঁতার দিবে?

সকল কাযেরই সাধনোপযোগী কতকগুলি উপায় আছে। ছোট বড় সকল কাযই উপায়-সাপেক্ষ। এই উপায়গুলি যথাযোগ্য হওয়া চাই;—একগাছি কেশ দ্বারা ক্ষুদ্র পতঙ্গের বন্ধন হয় বলিয়া মত্ত হস্তীকে তদ্দ্বারা বাঁধা যায় না, মত্ত হস্তীর উপযুক্ত স্থূল কঠিন রজ্জু চাই।

স্বদেশ-প্রীতি-সাধনের উপায় কি কি? এ বড় কঠিন প্রশ্ন। কখন কোন্ মহাত্মা কি উপায়ে স্বদেশের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করিয়াছেন, ভবিষ্যতেই বা কে কি উপায়ে স্বদেশ-প্রীতি দেখাইয়া জগৎকে চমৎকৃত করিবেন, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে, সঙ্কীর্ণ-দৃষ্টি মানবের সে সাধ্য নাই। যাঁহারা স্বদেশের জন্য আমরণ খাটিয়া শরীরের প্রত্যেক রক্ত-বিন্দু মাতৃ-ভূমির সন্তর্পণে উৎ-

সর্গ করিয়াছেন, সেই সুর-লোক-বন্দনীয়, পূজ্য, অমরাত্ম, আত্মোৎসর্গামোদী ঋষিগণই এই কঠিন প্রশ্নের উত্তরদানে সমর্থ, ক্ষুদ্র-চেতাঃ আমরা সে প্রশ্ন বুঝিবার কে? উত্তর দেওয়া ত দূরের কথা! বন্ধ্যা প্রসব-বেদনা জানে না, পুত্র-মুখ-দর্শনের আনন্দও অনুভব করে না। যাঁহারা প্রাণ দিয়া স্বদেশকে ভাল বাসিয়াছেন, তাঁহারাই স্বদেশ-প্রীতির মর্ম্ম বুঝিয়াছেন, তাঁহারাই স্বদেশ-প্রীতি-সাধনের উপায় বলিতে পারেন।

এই সকল মহাত্মার প্রকৃত জীবনী পাওয়া যায় না; যাহা পাওয়া যায়, তাহা তোমার আমার মত ক্ষুদ্র মানবের কল্পনার সঙ্গে মিশ্রিত। তথাপি মহাত্মাদিগের জীবনী পাঠ করিয়া আমাদের ক্ষুদ্র মনে যাহা উপলব্ধি হইয়াছে, তদনুসারে সাধারণভাবে স্বদেশ-প্রীতির কয়েকটি উপকরণ আমরা নিম্নে সন্নিবেশিত করিলাম। আমরা জানি অনেক বালকের মনে বিলক্ষণ স্বদেশ-প্রীতি আছে, এবং ভাবী জীবনে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবার আশাও তাহারা রাখে; কিন্তু তাহারা বাল্যাবধি স্বদেশ-প্রীতির উপকরণ অভ্যাস করে না, কাযেই পরিণত বয়সে কার্য্য দ্বারা প্রাণ ভরিয়া স্বদেশের প্রতি ভালবাসা দেখাইতে পারে না। বালকের যেমন, অনেক প্রাপ্তবয়স্কেরও সেই দশা। ফলতঃ বাল্যে যে ব্যক্তি যে বিষয়ে যত্ন করে নাই, প্রাপ্ত-বয়সে কি প্রকারে সে বিষয় সে ব্যক্তির আয়ত্ত হইবে? কোন-উপকরণ না লইয়াও, সম্যক্ প্রকারে স্বয়ং প্রস্তুত না হইয়াও স্বদেশ-প্রীতি প্রকাশ করা যায়, স্বদেশের সেবা করিতে পারা যায়, এরূপ ভাব যাঁহারা মনে মনে পোষণ করেন, তাঁহাদিগকে মিনতি করিয়া বলি, ক্ষণকালের জন্য সে ভ্রান্তভাব বিস্মৃত হইয়া নিম্নলিখিত পংক্তি কয়টি পাঠ করুন।

১। **ঈশ্বরে বিশ্বাস।** জগতে যে কেহ যাহা কিছু স্মরণ-যোগ্য মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিয়াছে, সেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিল। বীরেন্দ্র-কেশরী প্রতাপ, বীরেন্দ্র-ভূষণ ওয়াশিংটন, বীরেন্দ্র-গৌরব গারিবল্ডি,—কত বলিব? কি প্রাচীন কি আধুনিক, যাঁহারা বীর-ধাত্রী ধরণীর মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই ঈশ্বরে বিশ্বাসী ছিলেন। কেবল যুদ্ধ-বীর বলিয়া নহে, দান-বীর, ধর্ম্ম-বীর, দয়া-বীর—বীর কেবল বিশ্বাসী, জগতে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন কেবল বিশ্বাসী, প্রত্যহ মানব-জাতির কৃতজ্ঞতা-পুষ্পাঞ্জলি পাইতেছেন কেবল বিশ্বাসী। বিশ্বাসেই বল, বিশ্বাসেই বুদ্ধির স্ফূর্ত্তি। স্বদেশের সেবা, স্বজাতির সেবা, মানব-জাতির সেবা,—মুখের কথা নহে, বালকের খেলা নহে, যুবকের সখ নহে। বৈরাগ্যে স্বদেশ-সেবীর তৃপ্তি, কষ্টে তাঁহার সুখ, যন্ত্রণায় তাঁহার আমোদ, অনাদর, লোক-নিন্দা, কারাগার, কখন বা বধ্য-ভূমি তাঁহার পুরস্কার! এ সকল সহ্য করিতে সমর্থ কে? একমাত্র বিশ্বাসী। এ-সকল কঠোর সাধনে কেবলমাত্র মনুষ্যের বল প্রচুর নহে, ইহাতে ঈশ্বরের বল চাই। বিশ্বাসী জানেন তাঁহার বল ক্ষুদ্র হইলেও অনন্ত-শক্তি জগদ্ধাত্রী তাঁহার পশ্চাতে থাকিয়া বল যোগাইতেছেন, জগজ্জননী জড়জগতের অন্তরালে থাকিয়া এক মহাশক্তি দ্বারা তাঁহার বিশ্বাসী সন্তানকে অনুপ্রাণিত করিতেছেন। এই বিশ্বাসের

বলেই, অন্যে যাহা কল্পনা করিতেও ভয় পায়, বিশ্বাসী নির্ভীক-চিত্তে সহজ-সাধ্য ব্যাপারের ন্যায় তাহাতে হস্তক্ষেপ করেন, আবার ঈশ্বরের কৃপায় তাহা সুন্দররূপে সম্পাদন করিয়া জগৎকে চমৎকৃত করেন। বিশ্বাসীর এক একটি কার্য্য এক একটি হর-ধনুর্ভঙ্গ।

২। উদারতা। প্রকৃত পদার্থ যেখানে যত কম, ফাঁকা আওয়াজ সেখানে তত অধিক,—সঙ্কীর্ণতা যেখানে যত প্রবল, উদারতার ধ্বনি সেখানে তত গম্ভীর। মুখে যে যত উদার, অন্তরে সে তত সঙ্কীর্ণ। দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয়, যাহারা উদারতা বলিয়া একটা কথা না জানে, তাহারাই বুঝি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উদার। এই উদারতা-ধ্বজী অনেক ধর্ম্ম, অনেক সম্প্রদায়, অনেক ব্যক্তি আছেন,—কাহারও নাম করিব না, বুদ্ধি থাকে বুঝিয়া লও। আমি সর্ব্বাপেক্ষা উদার, আমার ঈশ্বর সর্ব্বাপেক্ষা বড়, আমার ধর্ম্ম সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, ইত্যাদি বাক্যই বর্ত্তমান কালের ধর্ম্ম-প্রচার-প্রণালীর মূল মন্ত্র। এই প্রণালী দ্বারা জগতের ইষ্ট যত দূর না হউক, অনিষ্ট তাহার শতগুণ হইতেছে। হিংসা, দ্বেষ, অনৈক্য, মজ্জাগত বৈরী-ভাব এই প্রচার-প্রণালীর ফল। "তুমি যাহা অনুষ্ঠান করিতেছ, তাহাই তোমার প্রকৃত ধর্ম্ম, বিশ্বাসের সহিত সরল প্রাণে সাধন করিলে তাহাতেই তোমার মুক্তি হইবে," এরূপ উদার উচ্চ ভূমির উপর দাঁড়াইয়া প্রচার করিতে কাহাকেও দেখি নাই, সুতরাং এ প্রকার প্রচারের ফল কি হইতে পারে তাহাও জানি না। আর কিছু না হউক, অন্ততঃ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সম্প্রদায়ের যে একটা মজ্জা-গত বৈরীভাব দেখা যাইতেছে, তাহা তিরোহিত হইতে পারিত বলিয়া আশা করা যায়। আমরা ভিন্ন মতাবলম্বী লোককে ভণ্ড কপটী বলিয়া ঘৃণা করি, আমরা জানি না যে ভণ্ডতা এবং কপটতা আমাদেরই হৃদয়-ভূষণ!

কেবল ধর্ম্ম-বিষয়ক উদারতার কথা বলিতেছি না, উদারতার প্রয়োজন সর্ব্বত্র। স্বদেশপ্রীতির একটি কার্য্যে দশ জনের সহানুভূতি এবং সাহায্য না পাইলে চলে না। তোমার মতের সঙ্গে না মিলিলে, তোমার উপদেশে না চলিলে, তোমার পদানুসরণ না করিলেই যদি তুমি লোককে অনুদার, কপটাচার, ভ্রান্ত প্রভৃতি সুমধুর বিশেষণে সম্ভাষণ কর, তাহা হইলে কে তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইবে, কে তোমার হৃদয়ের মাধুর্য্য বুঝিবে, কে তোমার সাধুসঙ্কল্পে সহায়তা করিবে? কাহারও সঙ্গে মতভেদ উপস্থিত হইলে তোমার যে ভ্রান্তির সম্ভাবনা আছে, একথাটা আগে মনে করিয়া লও, আর তোমার সঙ্গে মত-ভেদ হইলেই যে লোকের অসদভিপ্রায় থাকিবে, এ বিশ্বাসটা দূর কর। উদারতা থাকিলে একতা আপনা হইতে জন্মিবে, একতা জন্মিলে অসাধ্য ব্যাপার সাধিত হইবে। ক্ষমা, সহিষ্ণুতা প্রভৃতি যে সকল গুণ না থাকিলে একতা অসম্ভব, উদারতা তাহাদের সকলেরই জননী।

৩। স্বার্থ-শূন্যতা। যতক্ষণ মনে স্বার্থ থাকে, ততক্ষণ প্রীতি অসম্ভব। স্বার্থের জন্য পরকে যে প্রীতি করা যায়, তাহা পর-প্রীতি নহে, বস্তুতঃ তাহা আত্ম-প্রীতি। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ—জগতে আপনাকে কে না ভালবাসে? যিনি যে পরিমাণে স্বার্থের

দাস, তিনি সেই পরিমাণে নিকৃষ্ট,—পশু পক্ষীর সমজাতীয়; আর যিনি যে পরিমাণে নীচ স্বার্থ হইতে পরিমুক্ত, তিনি সেই পরিমাণে মহৎ। যাহার কার্য্য স্বার্থ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, স্বার্থের ক্ষুদ্রতায় যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ, স্বদেশ প্রীতি-রূপ পবিত্র বৃত্তি তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে পারে না। যদি স্বদেশ-প্রীতির মহান্ অধিকারে আপনাকে গৌরবান্বিত করিতে চাও, যদি ক্ষুদ্রতা ছাড়িয়া মহৎ হইতে চাও, যদি সামান্য সুখের বিনিময়ে অপার আনন্দ উপভোগ করিতে চাও, তবে হৃদয়কে স্বদেশময় করিয়া আপনাকে ভুলিয়া যাও, স্বদেশের সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যাও, স্বদেশ-প্রীতির অপার সমুদ্রের মধ্যে আত্ম-প্রীতির ক্ষুদ্র বিন্দুটি ঢালিয়া দাও। যে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার তুষ্টির জন্য কেমন করিয়া খাটে, একবার ভাবিয়া দেখ। কোথায় কি মিলিবে, কি উপহার দিলে, কেমন কাযটি করিলে, কি কথাটি বলিলে প্রেমাস্পদের মনে আনন্দ হইবে, তাহা জানিবার জন্য প্রেমিকের চিত্ত কিরূপ ব্যাকুল থাকে, তাহা অবগত আছ কি? যদি অবগত থাক, তবে সেইরূপে স্বদেশকে ভাল বাস—আপনার সুখ-দুঃখের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া মাতৃ-ভূমির সেবা কর। প্রসিদ্ধ স্বদেশ-প্রেমিকদিগের জীবনী পড়িলে বুঝিতে পারিবে, স্বার্থ ত্যাগ না করিলে স্বদেশের সেবা হয় না; সেই সকল জীবনী পাঠ কর, কেমন করিয়া আত্ম-বিস্মৃত হইয়া মাতৃ-ভূমির সেবা করিতে হয়, তাহা শিক্ষা হইবে।

৪। **বিলাস-শূন্যতা।** যে স্বয়ং বিলাসী, তাহা দ্বারা অন্যের সেবা হয় না। মাতৃ-ভূমির সেবা করিতে হইলে নির্ব্বিলাস হইতে হইবে। কতিপয় বর্ষ অতীত হইল, একটি জাতীয় সদনুষ্ঠানের জন্য চাঁদা করিয়া টাকা তুলিবার প্রয়োজন হয়। দুইটি বাবু কোন বিশেষ প্রদেশে প্রেরিত হইলেন এবং তেজস্বিনী ভাষায় বক্তৃতা করিয়া দুই তিন শত টাকাও চাঁদা তুলিলেন; কিন্তু প্রথম শ্রেণীর গাড়ীতে ভ্রমণ ও প্রথম শ্রেণীর হোটেলে আহার প্রভৃতি দ্বারা সেই অর্থ প্রায় সমস্তই ব্যয় করিয়া ফেলিলেন। এরূপ সৌখীন বৃত্তিতে নিজের বিলাস-বাসনা পরিতৃপ্ত হয় বটে, কিন্তু মাতৃ-ভূমির সেবা হয় না। সেবকের জীবন বিলাসের প্রমোদ-কানন নহে।

৫। **শ্রম-শীলতা।** বুদ্ধির সঙ্গে পরিশ্রমের যোগ হইলে অসাধ্য সাধিত হয়, কিন্তু পরিশ্রম-শূন্য বুদ্ধি বা বুদ্ধি-শূন্য পরিশ্রম দ্বারা কোন কার্য্যই হয় না। মাতৃ-ভূমির সেবা বিনা পরিশ্রমে হয় না,—কেবল কথায়, কেবল বক্তৃতায়, কেবল বাহ্যাড়ম্বরে মাতৃ-ভূমির দুর্দ্দশা ঘুচে না। মহাজন-জীবন পরীক্ষা করিয়া দেখ, একথার প্রমাণ পাইবে। মহাজনদিগের এই একটা বিশেষ লক্ষণ যে, তাঁহাদিগের বাক্য অপেক্ষা কার্য্যে আস্থা অধিক,—তাঁহারা কথায় সময় নষ্ট না করিয়া কার্য্য দ্বারা তাহা সার্থক করেন। সম্রাট্ নেপোলিয়ন যখন বন্দীভাবে 'বেলারফন' নামক জাহাজে নীত হইলেন, তখন ইংরাজ-সৈন্যেরা সামরিক নিয়মে তাঁহার অভ্যর্থনা করিল। কিন্তু সম্রাট্ তাহাতে সন্তুষ্ট হইলেন না; তিনি জনৈক সৈন্যের নিকট হইতে বন্দুক লইয়া কেমন করিয়া অভ্যর্থনা করিতে হয় তাহা দেখাইয়া দিলেন, আর সম্রাটের

অসাধারণ পটুতা-দর্শনে ইংরাজ-সৈন্যাধ্যক্ষেরা অবাক্ হইয়া চাহিয়া রহিলেন। পরে জানা গেল, সম্রাট্ নেপোলিয়ন কেবল দিগ্বিজয় এবং রাজ্য-শাসনেই পটু ছিলেন না, অতি সামান্য ভৃত্যের কার্য্যও অন্যকে সুন্দররূপে হাতে কলমে শিখাইবার শক্তি তাঁহার ছিল। কোন কাযে ঘৃণা নাই, কোন কাযে অপারগতা নাই, ইহাই মহত্ত্বের পরিচয়, ইহাই স্বদেশ-সেবীর লক্ষণ। কুর্দ্দন, ধাবন, সন্তরণ, অশ্বারোহণ প্রভৃতি কার্য্যে কেবল শারীরিক পটুতা লাভ হয় এবং জড়তা দুর হয়, এমন নহে, এই সকল বিষয়ে অভ্যাস থাকিলে অনেক সময়ে আসন্ন মৃত্যু হইতেও উদ্ধার পাওয়া যায়। ভারতের সম্রাট্ বাবর সাহ সাঁতার দিয়া গঙ্গানদী পার হইতেন, প্রত্যহ তিন চারি যোজন পথ হাঁটিয়া চলিতেন; তাঁহা হইতে কি তুমি বড়লোক? থিব্স্নগরে নাগরিক (মিউনিসিপাল) কার্য্য অতি হেয় বলিয়া গণ্য ছিল; কিন্তু যেদিন প্রাতঃ-স্মরণীয় ইপামিনন্দাস্ সেই কার্য্য গ্রহণ করিলেন, সেই দিন হইতে তাহা গৌরবের পদ হইয়া দাঁড়াইল, সম্ভ্রান্ত লোকের মধ্যে তাহার জন্য প্রতিযোগিতা চলিতে লাগিল। তুমি যদি মহৎ হইতে পার, তাহা হইলে তুমি যে কাযে হাত দিবে, তাহাই মহত্ত্বের পরিচায়ক হইয়া উঠিবে।

৬। **প্রাধান্য-বিমুখতা।** প্রাধান্য-লাভে এক প্রকার সুখ পাওয়া যায়; কিন্তু যিনি প্রকৃত কর্ত্তব্য-নিষ্ঠ, তিনি প্রাধান্য-জনিত দায়িত্বের আতঙ্কে সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকেন, সুতরাং সে সুখ উপভোগ করিতে পারেন না।

দুই কারণে প্রাধান্য-লাভে বাসনা জন্মিতে পারে,—প্রথম, প্রাধান্য-জনিত সুখ-ভোগের ইচ্ছা; দ্বিতীয়, আমার তুল্য বুদ্ধিমান আর কেহ নাই, সুতরাং আমা দ্বারা এ কায যেমন সুন্দররূপে সাধিত হইবে, অন্য দ্বারা সেরূপ হইবে না, এই ধারণা। এ উভয়ই নিন্দনীয়, তবে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি কিঞ্চিৎ ভাল, এই মাত্র।

প্রাধান্য শক্তির পরিচায়ক। শক্তি থাকিলে প্রাধান্য আপনা হইতে ফুটিয়া উঠিবে, ইহাকে আহ্বান করিতে হইবে না,—ভিক্ষা করিতে হইবে না। স্বাধীনতা যেমন কেহ কাহাকেও দেয় না, যে তাহার উপযুক্ত সে তাহা জোর করিয়া লয়, প্রাধান্যও সেইরূপ কেহ কাহাকেও দিতে পারে না,—যাহার শক্তি আছে, আপনা হইতে তাহার প্রাধান্য জন্মে।

দশ জনে মিলিয়া স্বদেশ-প্রীতির কোন কার্য্য করিলেও যে অনেক স্থলে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না, প্রাধান্য-লাভের জন্য প্রতিযোগিতাই তাহার কারণ। কোন সদুদ্দেশ্যে একটি সভা স্থাপিত হইল, তাহার সভা-পতি হইবার জন্য পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বী উপস্থিত হইলেন, অবশেষে ঘোরতর বাগ্বিতণ্ডার পর, ঘোরতর মনোমালিন্য এবং আত্ম-বিচ্ছেদের পর, যাঁহার অনুব্রজি-সংখ্যা অধিক তিনিই সভা-পতিত্ব পাইলেন। কিন্তু যে প্রাধান্যের লাভে এত বিঘ্ন, তাহার পরিচালনা যে নিরাপদ হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ভাল মন্দ বিচার নাই, যে সে কার্য্যে সভা-পতির সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল; যতদিন সভা-পতি সকলের মন যোগাইয়া অনুব্রজি-

সংখ্যা অধিক রাখিতে পারিলেন, ততদিনই তাঁহার প্রাধান্য,—অনুব্রজি-সংখ্যায় হ্রাস পড়িলেই তাঁহার পতন। নির্ব্বাচন-প্রণালীর অনেক গুণ থাকিলেও এই দোষটা বড়ই অনিষ্টকর। প্রথমতঃ ব্যক্তিগত থাকিলেও কালক্রমে এ দোষ জাতি-ব্যাপক হইয়া দাঁড়ায়। ইংরাজজাতির "যেন তেন প্রকারেণ কার্য্য-সিদ্ধি গরীয়সী" নীতি, "স্বার্থের প্রতিকূলে দাঁড়াইলে ন্যায়-ধর্ম্ম-সত্য কিছু নয়" নীতি এই জাতীয়। চির-শত্রু ফরাসী জাতির সান্নিধ্য প্রভৃতি বহু কারণ এই দোষের মূলে থাকিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যে রাজনৈতিক নির্ব্বাচন-প্রথা যে একটি প্রধান কারণ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

স্বদেশ-প্রীতির সকল অনুষ্ঠানে যোগ দেও, কিন্তু প্রাধান্য চাহিও না—অন্যকে প্রাধান্য দিতে পারিলে নিজে তাহা লইও না। তোমার স্বদেশ-সেবার শক্তি যদি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক থাকে, তাহা আপনা হইতে ভাসিয়া উঠিবে, নামে সে প্রধান হইবে, কাযে সে সাক্ষী-গোপাল হইয়া থাকিবে। পাত্রস্থ জল যেমন ছিদ্র পাইলেই বাহির হইয়া পড়ে, মানবাত্মার শক্তিও সেইরূপ সুযোগ পাইলেই আপনা হইতে প্রকাশ হয়। মহজ্জীবনের আখ্যায়িকা পড়, মহাজনেরা কে কি সুযোগে আত্ম-শক্তি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পর্য্যবেক্ষণ কর। অকর্ম্মণ্য নাবিক যখন ভীষণ তরঙ্গে তরণী বাঁচাইতে অপারগ হয়, তখন উপযুক্ত হস্তে হাইল সমর্পণ করিয়া সে আপনা হইতেই তফাৎ হইয়া দাঁড়ায়,—সেরূপ না করিলে উপযুক্ত হস্তের চড় খাইয়া হাইল ছাড়িয়া দিতে সে বাধ্য হয়।

৭। দূর-দৃষ্টি। স্বদেশ-প্রেমিককে দূর-দর্শী হইতে হইবে, কোন্ কার্য্যের দূরবর্ত্তী ফল কি তাহাই সর্ব্বাগ্রে বিচার করিতে হইবে। তুমি স্বদেশ-প্রেমে প্রণোদিত হইয়া কোন সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে যাইতেছ, স্বদেশ-দ্রোহীর চক্ষুঃ তাহাতে পড়িল, অমনি সে তোমাকে লাভ-জনক কিছু দেখাইয়া সে অনুষ্ঠান হইতে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সুখ, সম্মান, পদ, গৌরব, ধন, জন, এ সমস্তই প্রথমাবস্থায় স্বদেশ-প্রেমের অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইতে পারে। তিনিই ধন্য, যিনি এ সকলকে উপেক্ষা করিয়া স্বদেশের সেবা করিতে পারেন, যিনি ধ্রুব তারার ন্যায় সদনুষ্ঠানের দূরবর্ত্তী ফলের উপরে দৃষ্টি স্থির রাখিয়া অভিন্ন-সঙ্কল্পে মাতৃ-ভূমির প্রতি প্রেম প্রকাশ করিতে পারেন। ঔষধ-সেবনের অব্যবহিত ফল অপ্রীতিকর তিক্ত স্বাদ, দূরবর্ত্তী ফল সর্ব্ব-মঙ্গল-নিদান স্বাস্থ্য। বালক অবোধ, তাই সে রোগের অবস্থাতেও তিক্ত রসে বিরক্ত, মিষ্ট রসের জন্য লালায়িত। যে জাতি বর্ত্তমান সুবিধার অনুরোধে ভাবী শুভফল উপেক্ষা করে, সে জাতি কেবল হতভাগ্য নহে, সে জাতি বালকের ন্যায় নির্ব্বোধ।

৮। সহিষ্ণুতা। কোন মহৎ-কার্য্যেই বীজ বপন করিতে করিতেই ফল ধরে না। যেমন জড়জগতে, সেইরূপ নৈতিক জগতে, যে ফল যত দীর্ঘকাল স্থায়ী এবং উপকারী, তাহা তত বিলম্বে জন্মে। কি রাজ-নৈতিক, কি ধর্ম্ম-নৈতিক, কি সামাজিক,—এক একটি কার্য্যের ফল পাইতে বহু বৎসর লাগে। যাঁহারা মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠাতা,

তাঁহাদের অনেকেই মহৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া সমাজ-রঙ্গ-ভূমি হইতে চলিয়া যান, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদি সে কার্য্যের ফলভোগ করে। সহিষ্ণুতা না থাকিলে এরূপ বিলম্ব-প্রসূত ফলের জন্য কে অপেক্ষা করিয়া থাকিতে পারে? ফল-ভোগের প্রত্যাশা যাহাতে নাই, নিঃস্বার্থতা না থাকিলে কে এমন কাযের অনুষ্ঠান করিতে পারে? স্বদেশ-প্রীতির সকল কার্য্যই যে নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়, এমন নহে; অনেক কার্য্যে প্রভূত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হয়, অনেক কার্য্যে পুনঃপুনঃ বিফল-প্রয়াস হইতে হয়। সহিষ্ণুতা না থাকিলে সেই সকল বাধা বিঘ্নের পেষণ হইতে কে তোমাকে বাঁচাইবে? আর কাহার বলে বাধা-বিঘ্ন-ঘৃণা-নিন্দার বোঝা মাথায় লইয়া সঙ্কল্পিত স্বদেশ-প্রীতির সাধুপথে অগ্রসর হইবে? অতএব ধৈর্য্যশীল হও, সাধু-সঙ্কল্পের সহায় ঈশ্বর, এই সুপরীক্ষিত সত্যে বিশ্বাস কর, স্বার্থের নিকটে মস্তক অবনত না করিয়া অপরাজিত চিত্তে স্বদেশ-প্রীতি-সাধনে অগ্রসর হইতে থাক, ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে তোমার কামনা সিদ্ধ হইবে।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

যারে তারে বিশ্বাস না করিবে কখন,
বিশ্বাসে থাকেনা যেন কপটাচরণ।

কারো প্রতি যদি ঘটে অসদাচরণ,
স্বীকারেতে হবে তার অর্দ্ধ সংশোধন।

নিজে যাহা করিবারে পার সম্পাদন,
পর প্রতি ভার তার দিওনা কখন।

বহু লোক মিত্র হয় বিনয় থাকিলে,
গর্ব্বিতের শত্রু বাড়ে আচরণ-ফলে।

কৃপণের ধনে সাধে কোন্ প্রয়োজন?
তবু দেখ ধনে তার আকাঙ্ক্ষা কেমন!

অল্পাক্ষরে বহু ভাব প্রকাশ করিবে,
বেশী কথা অল্প ভাবে বাচাল হইবে।

উপেক্ষায় নিন্দাবাদ করিবে দমন,
প্রতিবাদে ঘটে তার পুনরাবর্ত্তন।

মিষ্ট ভর্ৎসনায় হয় দোষ-সংশোধন,
অথচ তাহাতে রুষ্ট নহে কারো মন।

মণিমুক্তা যাহা থাকে রাজার মুকুটে,
সকলে মলিন তারা দয়ার নিকটে।

বরং আপোসে কর বিবাদের শেষ,
ক্রোধ-যুক্ত বিবাদের কুফল অশেষ।

বঙ্গভাষা।

বঙ্গভাষার দাঁড়াইবার স্থান নাই; যেখানে যায় সেখানেই তাচ্ছিল্যের ভ্রুকুটী দেখিয়া তাহার প্রাণের উৎসাহ জল হইয়া যায়! যাঁহারা কৃতবিদ্য বলিয়া পরিচিত, যাঁহাদের নিকট বঙ্গভাষা আশ্রয় স্থান পাইবার সমধিক ভরসা করিতে অধিকারিণী, সময়দোষে তাঁহারা ইহার মলিন মুখ দেখিয়া আত্মীয় বলিয়া স্বীকার করিতেও যেন লজ্জিত! নিতান্ত অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া যদি বা কোন মহাত্মা নিজ পুস্তকালয়ের নিভৃত কোণে ইহাকে একটুখানি বসিবার স্থান দিতে স্বীকৃত হন, সেখানেও অযত্নে অনাদরে কীটদষ্ট হইয়া বঙ্গভাষা নীরবে রোদন করিতে থাকে। আমরা বঙ্গভাষার আশ্রয়-ভিক্ষার জন্য দ্বারে দ্বারে বেড়াইয়া দেখিয়াছি, দুই চারি জন নিতান্ত ব্যথার ব্যথী ভিন্ন একমুষ্টি তণ্ডুল দিয়াও দুঃখিনীর জীবন রক্ষা করিতে কেহ প্রস্তুত নহেন। যে দেশে মাতৃভাষার এত অনাদর, সে দেশে কতদিনে যে ইহার দুঃখ দুর্দ্দশা দূর হইবে, তাহা কেমন করিয়া বলিব? নিরাশ্রয়ের দশা যাহা হয়, আজ বঙ্গভাষারও সেই দশা;—তাহার মলিন মুখের দিকে চাহিবার অবসর কাহারও নাই, তাহার কাতর কণ্ঠের মর্ম্মভেদী আর্ত্তনাদে কর্ণপাত করিবার মত সহৃদয় সুহৃৎ কেহ নাই! বঙ্গভাষার এই করুণ ক্রন্দন কি ঘুচিবে না?

আমাদের মনে হয় যেন সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিলে সহজেই ইহার একটা প্রতিকার হইতে পারে। কিন্তু সে প্রতিকার করিবে কে? যাঁহাদের লেখনী বঙ্গভাষার অঙ্গ পুষ্টির জন্য দিবানিশি নিষ্পেষিত হইতেছে, তাঁহাদের অধিকাংশ লেখনীকেই চিরবিশ্রাম প্রদান করা উচিত; তাঁহাদের সেবায় ইহার অঙ্গপুষ্টি না হইয়া বরং শত শত মলিন আবর্জ্জনা রাশি ইহার কঙ্কাল দেহে সংযুক্ত হইতেছে! যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে এই জীবন্মৃত ভাষাকে রক্ষা করিবার যোগ্যতা রাখেন, তাঁহারা যদি সকলে মিলিয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগেন, তবেই কথঞ্চিৎ আশার কথা,—নচেৎ যাহার যাহা নাই, সে কেমন করিয়া তাহা দান করিবে?

যাঁহারা সুলেখক, বারম্বার আহ্বান করিয়াও তাঁহাদিগকে লেখনী ধারণ করাইতে পারা যায় না;—বঙ্গভাষার কথা তুলিলেই তাঁহারা বলেন বঙ্গভাষার পাঠক নাই, ইহাকে বাঁচাইবার চেষ্টা বৃথা! যাঁহারা ধনশালী তাঁহাদিগকে ইহার অন্নজল যোগাইবার অনুরোধ করিলে তাঁহারা বলেন, ইহাকে বাঁচাইয়া গৌরব কি? ইহাতে রাজসম্মান পাইবার কোন আশা নাই। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা, তাঁহাদের কাছে কাতরকণ্ঠে রোদন করিলে তাঁহারা বলেন বঙ্গভাষা আশ্রয় পাইতে পারে, এরূপ যোগ্যতা ইহার আজিও জন্মে নাই। এই দুর্দ্দশার মধ্যে পড়িয়া বঙ্গভাষা যথার্থই নিরাশ্রয় হইয়াছে!

ইহাকে বিশ্ববিদ্যালয় রক্ষা না করিলে,

বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা সমূহে ইহাকে আসন না দিলে ইহার উন্নতির আশা নাই। বঙ্গভাষা যদি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করে, ইহাতে পাঠোপযোগী উচ্চশ্রেণীর পুস্তক লিখিত হইবে; বঙ্গভাষা যদি পাঠ্য-মধ্যে নির্দ্দিষ্ট হয়, পরীক্ষার দায়ে পড়িয়া ছাত্রেরা ইহার অনুশীলন করিবে। বঙ্গভাষা যদি বিদ্যালয়ে এবং কালেজে অধ্যাপিত হয়, কৃতবিদ্য যুবকগণ আর ইহার নামে নাসিকা কুঞ্চিত করিতে সাহস পাইবেন না। শুধু তাহাই নহে, বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবে বঙ্গ-ভাষার গৌরব বর্দ্ধিত হইবে।

সকল দেশের বিশ্ববিদ্যালয়েই মাতৃ-ভাষার প্রবেশাধিকার আছে; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও যে বঙ্গভাষা একেবারেই অপরিচিত তাহা নহে। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বঙ্গভাষার জন্য যতটুকু স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা ইহার বাঁচিবার পক্ষে যথেষ্ট নহে। একমাত্র প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গভাষার আসন আছে, কিন্তু সেখানেও তাহাকে ছাত্রগণের অনুগ্রহের ভিখারী হইয়া বসিয়া বসিয়া জীবন কাটাইতে হইতেছে। পরবর্ত্তী পরীক্ষাসমূহে বঙ্গভাষার আসন না থাকায় প্রতিভাশালী ছাত্রগণ বঙ্গ-ভাষা অধ্যয়ন করিয়া বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে চাহেন না; যাহারা পড়িলেও চলে না পড়িলেও চলে, সেইরূপ জনকতক ছাত্র ইহাকে গ্রহণ করিয়া থাকে। তাদৃশ অযোগ্য সেবকের চেষ্টায় কি উপকার হইবে?

বঙ্গভাষা আমাদের মাতৃভাষা। যদি নিজের বলিতে আমাদের কিছু থাকে, তাহা ইহারই অন্তর্গত। বঙ্গভাষা আমাদের আনন্দের ভাষা। ক্রন্দনের ভাষা, গৃহের ভাষা, কার্য্যক্ষেত্রের ভাষা। ইহাকে বিদায় করিয়া দিলে সংসার চলে না, জাতি-গৌরব বাঁচে না। কেবল তাহাই নহে,—বঙ্গভাষার সমধিক উন্নতি না হইলে কল্যাণকর লোক-শিক্ষা আশানুরূপ বিস্তৃতি লাভ করিতে পারে না। রাজনৈতিক অধিকার বল, ধর্ম্ম-নৈতিক উন্নতি বল, কৃষি-বাণিজ্য-শিল্পের উন্নতি চেষ্টা বল, যে বিষয়েই আন্দোলন করিতে চাও তাহারই নিদান মাতৃভাষা। কয়জন লোক ইংরাজি শিখিয়াছে, কয়জন লোক ইংরাজি বুঝিয়াছে? যাহাদিগকে লইয়া দেশ, তাহারা বাঙ্গালী, তাহাদের জন্য বাঙ্গালীর ভাষা চাই।

বঙ্গভাষাকে লোক শিক্ষার উপযোগী করিতে হইলে তাহাকে সমুন্নত করিতে হইবে, বিশ্ববিদ্যালয়ে তাহার আসন দিয়া তাহার কার্য্যকারিতা বাড়াইতে হইবে, এবং বিশ্ব বিদ্যালয়ের প্রতিভাশালী ছাত্রগণ যাহাতে বঙ্গভাষার অনুশীলন করিতে বাধ্য হন, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম যে, বিশ্ববিদ্যালয় এই গুরুতর বিষ-য়ের মীমাংসার জন্য প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া-ছেন। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতা, নানা কারণেই তাঁহারা দেশের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র। স্বদেশের উন্নতি কল্পে তাঁহাদের যে প্রাণগত আকাঙ্ক্ষা আছে, তাহা কেহই অস্বীকার করিতে পারেন না। তাঁহাদিগকে আত্ম কর্ত্তব্য পালনের জন্য উপ-দেশ দিবার অভিমান আমাদের শোভা পায় না। আমরা তাঁহাদের হাতে মাতৃ ভাষার কাতর ক্রন্দনের সমুচিত প্রতিকার দেখিতে

আশা করি, এবং সেই আশা-প্রণোদিত-হৃদয়ে কর্ত্তব্যানুরোধে বিনীতভাবে তাঁহাদিগকে কয়েকটি কথা নিবেদন করিতে চাই।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় বঙ্গভাষার আসন পূর্ব্বাপর হইতেই নির্দ্দিষ্ট আছে; সুতরাং বঙ্গভাষা শিক্ষা দেওয়া যে বিশ্ববিদ্যালয়ের লক্ষ্য, তাহা স্বীকৃত কথা। কতকগুলি কারণে এই মহদুদ্দেশ্য সফল হইতেছে না। বঙ্গভাষা অধ্যয়ন করা না করা যতদিন ছাত্রদিগের ইচ্ছাধীন থাকিবে, ততদিন সেই উদ্দেশ্য সফল হইবার কোন আশা নাই। যদি উদ্দেশ্য সফল করিতে হয় তাহা হইলে বিশ্ব-বিদ্যালয়ে বঙ্গভাষার জন্য পূর্ব্ব হইতে যে স্থানটুকু নির্দ্দিষ্ট আছে, তাহাকে প্রকৃতরূপে কার্য্যক্ষম করিবার জন্য বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতের সঙ্গে তুল্যাধিকার প্রদান করা আবশ্যক।

বঙ্গভাষাকে সংস্কৃতের সঙ্গে তুল্যাধিকার দিবার প্রস্তাব করিলেই সচরাচর দুই শ্রেণীর আপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। প্রথম আপত্তি এই যে, তাহাতে সংস্কৃত চর্চ্চা বিলুপ্ত হইবে; দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, বঙ্গভাষায় তাদৃশ উচ্চ শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকের অভাব। "বঙ্গভাষার আশ্রয় ভিক্ষা" নামক প্রবন্ধে আমরা ইহার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছি, এবং বিশ্ববিদ্যালয় ও দেশের কৃতবিদ্য সমাজের সহানুভূতি আকর্ষণ জন্য উক্ত প্রবন্ধ ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়া বিনামূল্যে যথাসাধ্য বিতরণ করিয়াছি। আমরা বাঙ্গলাকে সংস্কৃতের সহিত সহপাঠ্য করিয়া অন্ততঃ প্রবেশিকা ও ফাষ্ট-আর্টস পরীক্ষাতে উভয় ভাষাকেই অবশ্য পাঠ্য করিতে প্রার্থনা করি। আমাদিগের কাতর ক্রন্দনে যাঁহারা সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা উপহার দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সুযোগ্য সদস্যগণকে বিনীত ভাবে অনুরোধ করি, যখন বঙ্গভাষার কাতর নিবেদন বিশ্ববিদ্যালয়ের লৌহদ্বার ভেদ করিয়া সেনেট সভায় উপস্থিত হইয়াছে, তখন সদস্যগণ ইহার মলিন মুখের দিকে চাহিয়া ইহার জীবন্মৃত শরীরে শক্তিসঞ্চারের ব্যবস্থা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করুন। বঙ্গভাষার আপনার বলিতে কেহ নাই,—বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারে সে আশ্রয় ভিক্ষার জন্য অনেক দিন হইতে কাতর নয়নে আশাপথ চাহিয়া রহিয়াছে!

ছাত্রজীবন।

১

সে কালের ছাত্রজীবনের কথা বলিতে গেলেই ব্রহ্মচর্য্যের কথা বলিতে হয়। প্রাচীন আর্য্যগণ মানবজীবনকে চারিভাগে চারিটি ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমে বিভাগ করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের উপযোগী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম্মনীতির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শিক্ষা-কালকে তাঁহারা ব্রহ্মচর্য্য নামে অভিহিত করিতেন। সুতরাং প্রাচীন ভারতবর্ষে ছাত্রজীবন কিরূপ নিয়মাধীন ছিল তাহার আলোচনা করিতে হইলে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের রীতি নীতি বিশেষ ভাবে অধ্যয়ন করা অবশ্যক। বর্ত্তমান সময়ের ছাত্রজীবনে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ছাত্রজীবনে ব্রহ্মচর্য্যের নিয়মাবলী প্রবর্ত্তন করার আবশ্যকতা বুঝাইয়া শিক্ষক, অভিভাবক ও স্বদেশবৎসল ব্যক্তিদিগকে শিক্ষানীতির উন্নতি করিবার জন্য উপদেশ দিয়াছেন। রাজনারায়ণ বাবুর প্রগাঢ়-চিন্তা-প্রসূত উপদেশগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করা উচিত; কিন্তু তাহার সম্যক্ আলোচনা করিতে হইলে সেকালে কি ছিল আর একালে কেমন দাঁড়াইয়াছে, তাহা না দেখাইলে, সেকালের নিকট একাল কোন্ কোন্ বিষয় শিক্ষা করিবে তাহা নির্ণীত হইতে পারে না। আমরা যথাক্রমে এই তিনটি বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

জ্ঞান আছে বলিয়াই মানুষ মানুষ নামের যোগ্য, নচেৎ মানুষে আর পশুতে বড় বেশী ইতর বিশেষ থাকিত না। এই জ্ঞান বিবিধ শ্রেণীর, এবং জ্ঞান-সমুদ্র এমনই অনন্ত অপার যে তাহার তুলনায় মানব-জীবন ক্ষুদ্র জলকণা মাত্র! যদিও সমুদায় জীবনই শিক্ষাকাল, তথাপি বাল্যকাল বিশেষভাবে জ্ঞানশিক্ষার জন্য নিয়োগ না করিলে মানুষ সংসার-সংগ্রামে প্রবেশ করিতে পারে না। এই জন্য সকল দেশেই বাল্যকালে অল্পাধিক মাত্রায় বিদ্যাশিক্ষা দিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়। যাহার জন্য শিক্ষার আবশ্যক, বাল্যশিক্ষা যদি তদুপযোগী হয়, তাহা হইলে সোনায় সোহাগা হয়। আমরা বাল্যজীবনে যেরূপ শিক্ষা লাভ করি, সমুদায় জীবন সেই ছাঁচে গঠিত হইয়া থাকে। সুতরাং বাল্য শিক্ষার প্রতি উদাসীন হইলে ব্যক্তিগত বা জাতিগত উন্নতি সাধন করা অসম্ভব হয়। একদিন এদেশের উন্নতির অবস্থা ছিল, একদিন এদেশের পাদমূলে বসিয়া পৃথিবীর নরনারীগণ বিবিধ বিদ্যা অধ্যয়ন করিত, একদিন এদেশের গৌরব-মণ্ডিত কীর্ত্তি-পতাকা উচ্চ আকাশে উড্ডীন হইত—সকলেই জানেন যে, ইহা স্বদেশ-প্রেমিকগণের অত্যুক্তি মাত্র নহে, ইতিহাস ইহার সত্যাসত্য প্রমাণ করিতে সক্ষম। আজ সেই দেশের এ দুঃখ দুর্দ্দশা হইল কেন?

জাতীয় শিক্ষার অভাব যে অনেকাংশে তাহার কারণ, তাহাতে সন্দেহ কি? কি ছিলাম আর কি হইয়াছি, তাহা বুঝিতে হইলে সেকাল ও একালের শিক্ষানীতি আলোচনা করিতে হয়। আমরা যথাক্রমে সেই বিষয় সাধ্যানুসারে পাঠকগণের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

প্রাচীনকালে আর্য্যগণের ধারণা ছিল যে, শিক্ষাহীন জীবন আর্য্যজনোচিত জীবন নহে; তাঁহারা সেইজন্য জ্ঞানের উপাসক ছিলেন। তাঁহারা কথায় কথায় বলিতেন,—

"ন তেন বৃদ্ধো ভবতি যেনাস্য পলিতং শিরঃ।
যো বৈ যুবাপ্যধীয়ান স্তং দেবাঃ স্থবিরং বিদুঃ॥"

দীর্ঘকাল সংসারে বাস করিয়া মস্তকের কেশ পলিত হইলেই বৃদ্ধ হয় না, যদি যুবা হইয়াও কেহ জ্ঞানবান্ হয়, দেবতারা তাহাকেই স্থবির বলিয়া জানেন। আর্য্য-শাস্ত্রে জ্ঞানের গৌরব, বিদ্যার সম্মান, শিক্ষার প্রশংসা এত অধিক যে, শিক্ষাহীন জীবনকে তাঁহারা শূদ্র জীবন বলিয়া গণ্য করিতেন। তাঁহাদের ধারণা ছিল যে জন্মমাত্রে মানুষ শূদ্র থাকে, উপনীত হইলে দ্বিজ হয়, বিদ্যাভ্যাস করিলে বিপ্র নামের যোগ্য হয়, এবং ব্রহ্মজ্ঞ হইলে ব্রাহ্মণ-পদবী লাভ করে। ইহা তাঁহাদিগের কথার কথা মাত্র ছিল না, এই ধারণা অনুসারে তাঁহারা জীবনকে ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বাণপ্রস্থ ও ভিক্ষু নামক চারিটি পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক আশ্রমের রীতিনীতি ও নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করিয়া তদনুসারে জীবন যাপন করিতেন। প্রাচীনকালের ছাত্র-জীবন পূর্ব্বোক্ত ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের অধীন ছিল। এই আশ্রম শেষ হইলে তবে মানুষ গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশের অধিকারী হইত —গৃহস্থ হইবার পূর্ব্বে, সংসার-সংগ্রামে দাঁড়াইবার পূর্ব্বে, শত শত পাপ, তাপ ও প্রলোভনময় সংসার ভূমিতে আবাস গৃহ বাঁধিবার পূর্ব্বে জীবনের প্রথমাংশ ব্রহ্মচর্য্যের শিক্ষাধীন করিতে হইত।

জন্মমাত্রেই মানুষ দ্বিজ হয় না, তজ্জন্য তাহাকে উপনয়ন দিবার ব্যবস্থা ছিল। শিশু উপনীত হইয়া গুরুগৃহে আসিতেন, ব্রহ্মচারী হইয়া গুরুকুলে বাস করতঃ বিবিধ বিদ্যা শিখিতেন, এবং সমাবর্ত্তন করিয়া পরিণত বয়সে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ করিতেন। ব্রাহ্মণ-কুমারগণ সাধারণত পঞ্চম হইতে অষ্টম বর্ষের মধ্যে উপনীত হইয়া গুরুগৃহে প্রেরিত হইত, নিতান্ত বিশেষ-স্থলে ষোড়শ বৎসর পর্য্যন্তও উপনয়নের বিধি ছিল, কিন্তু তাহা গৌণকল্প। গুরুগৃহে আসিয়া কিরূপ শিক্ষা লাভ হইত তাহাই যথাক্রমে আলোচনা করি।

"উপনীয় গুরুঃ শিষ্যং শিক্ষয়েৎ শৌচমাদিতঃ।
আচারমগ্নিকার্য্যঞ্চ সন্ধ্যোপাসন মেব চ॥"

গুরু শিষ্যকে উপনীত করিয়া সর্ব্বাগ্রে শুচি হইবার জন্য উপদেশ দিতেন। অন্তর ও বাহ্য শৌচ শিক্ষা না করিলে শিশু ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের উপযুক্ত হইতে পারে না। তারপর তাহাকে সদাচার, অগ্নিকার্য্য, এবং সন্ধ্যা উপাসনাদি শিক্ষা দিতেন—ধর্ম্ম যে সর্ব্বকালে মানব-জীবনের অবলম্বনীয়, তাহা বাল্য-শিক্ষার অঙ্গীভূত থাকায় পরিণত বয়সে আর্য্যগণ বর্ত্তমান যুগের যুবকগণের ন্যায় ধর্ম্মহীন হইতেন না।

শিশু আত্ম-সংযম জানে না—যখনই ক্ষুধা

তখনই আহার, যখনই ইচ্ছা তখনই নিদ্রা, এইরূপ স্বেচ্ছাচার তাহার অভ্যাস। তাহাকে জীবন-সংগ্রামের উপযোগী শিক্ষা দিতে হইলে সর্ব্বপ্রথমে আত্ম-সংযম শিখাইতে হয়। ইহা যত্ন পূর্ব্বক শিখিতে হয়, আপনা আপনি মানুষ সংযমী হইয়া উঠে না। সারথী যেমন রজ্জু-সাহায্যে অশ্বচালনা করে, আত্মসংযম-সাহায্যে সেইরূপ ইন্দ্রিয়গণকে চালনা করিতে হয়। যদি ইন্দ্রিয়দিগের মধ্যে একটিকেও অনবধান বশতঃ অসংযত রাখা যায়, সমুদায় শিক্ষা দীক্ষার ফল সেই দ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়, আমারা যে পশু ছিলাম সেই পশুই হইয়া পড়ি। সর্ব্বাঙ্গীন আত্মসংযম না থাকিলে আত্মসংযমের কোন অর্থ থাকে না।

"ইন্দ্রিয়াণাস্তু সর্ব্বেষাং যদ্যেকং ক্ষরতীন্দ্রিয়ম্।
তেনাস্য ক্ষরতি প্রজ্ঞা দৃতেঃ পাত্রাদিবোদকম্॥"

সমুদায় ইন্দ্রিয়ের মধ্যে একটি ইন্দ্রিয়ও যদি ক্ষরিত হয়, সেই ছিদ্র পথ দিয়া সমুদয় কষ্টলব্ধ প্রজ্ঞা পলায়ন করে; চর্ম্ম নির্ম্মিত পাত্রে একটি মাত্র ছিদ্র থাকিলেও তাহার ভিতর দিয়াই সমুদায় জল বহির্গত হইয়া যায়! ছাত্রগণ! একবার ভাবিয়া দেখ, সেকাল আর এ কালের ছাত্রজীবনের আদর্শের মধ্যে কত প্রভেদ। অভিভাবক ও চিন্তাশীল শিক্ষকগণ! একবার ভাবিয়া দেখুন, কত চেষ্টা কত যত্ন করিয়া শিশুকে যে জ্ঞানরত্ন বিতরণ করিতেছেন, সে তাহা আত্মজীবনে কয়দিন উপভোগ করিতে পারিবে?

আজকাল পুস্তক পড়াইয়া নীতি শিক্ষা দিবার চেষ্টা হইতেছে, কিন্তু সেকালের ব্রহ্মচর্য্য সেরূপ পুস্তকগত শিক্ষা ছিল না—তাহা ছাত্রদিগকে জীবনে পরিণত করিতে হইত। নিয়ম যতই কঠোর হউক না কেন, যত্ন, চেষ্টা, ও অধ্যবসায় দ্বারা তাহাকে পালন করিতে হইত, কদাচিৎ পদ-স্খলন হইলে সর্ব্বসমক্ষে আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া যথা-বিহিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিতে হইত।

ছাত্রজীবনে নিত্যোপাসনাদি ধর্ম্ম বিষয়ক, আত্মশৌচাদি নীতি বিষয়ক ও অধ্যয়নাদি শিক্ষা বিষয়ক কতকগুলি নিয়ম প্রতিপালন করিতে হইত। গুরুর জন্য গ্রামে গ্রামে ভিক্ষা আহরণ, গোচারণ, সমিৎপুষ্পাদি সংগ্রহ এবং মৃত্তিকায় শয়ন করা ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম ছিল। ধনবানের পুত্রও গুরুকুলে বাস করিবার সময়ে এই সকল নিয়মাধীন হইতেন। বিলাসকে ছাত্রজীবন হইতে দূরে না রাখিলে তাহাকে ইচ্ছানুরূপ শিক্ষা দেওয়া কঠিন হয়, তাই ছাত্রজীবন হইতে বিলাসকে সর্ব্বতোভাবে তাড়িত করিতে হইত। সে কালের ছাত্রজীবনের প্রধান শিক্ষা 'বিলাস-ত্যাগ'। তার পর আত্ম-শৌচ, তার পর গুরু-জনাদির সহিত কিরূপ ব্যবহার করা উচিত, তার পর কিরূপে বিদ্যাদি শিক্ষা করা উচিত, তাহার শিক্ষা প্রদত্ত হইত।

(১) বিলাস ত্যাগের শিক্ষা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য ভিক্ষা আহরণ। মৃত্তিকাশয়-নাদির ব্যবস্থা ছিল।

(২) শৌচ-শিক্ষার জন্য পান-ভোজন ও অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ নিয়মাবলি পালন করিতে হইত। কতকগুলি বিষয় পরিবর্জ্জন ও কতকগুলি গ্রহণ করিতে হইত। (মনু দ্বিতীয়াধ্যায় ১৭৭ হইতে ১৮০ শ্লোক দেখুন)

ছাত্রজীবনে কি কি বর্জ্জন করিতে হইত? মধু, মাংস, গন্ধ, মাল্য, রস, স্ত্রী, শুক্ত এবং প্রাণি-হিংসা। মদ্যমাংস মানুষকে উচ্ছৃঙ্খল করে, গন্ধমাল্য বিলাসী করে, রস ও স্ত্রী ছাত্রগণকে নীতি ও ধর্ম্মচ্যুত করে, সুতরাং ছাত্রজীবনে এইগুলি সর্ব্বথা পরিত্যাগ করিতে হইত। সুস্নিগ্ধ তৈলাদি-মর্দ্দন, কজ্জলাদি দ্বারা অঙ্গরাগ-বর্দ্ধন, পাদুকাছত্র-ব্যবহার, কুদৃষ্টিতে স্ত্রীলোকদিগের প্রতি অবলোকন, নৃত্যগীত-দর্শন-শ্রবণ, কাম-ক্রোধ-লোভ-দ্যূতাদি ক্রীড়া, পরনিন্দা, মিথ্যাকথা, এই সমুদায়গুলি ছাত্রজীবনে যত্নপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে হইত। ছাত্রগণ মৃত্তিকায় একাকী শয়ন করিত, যদি কখন প্রমাদ বশতঃ রেতঃপাত করিত তাহারা ব্রহ্মচর্য্যচ্যুত হইত, এবং স্বপ্নযোগেও তাদৃশ দুর্ঘটনা হইলে প্রায়শ্চিত্তানুষ্ঠান করিতে হইত! এইগুলি সেকালের ছাত্রজীবনের "তপস্যা" ছিল, ক্রমে ক্রমে এই সকল শিক্ষা জীবন-গত কার্য্যে পরিণত করিতে হইত।

(৩) গুরুজনাদির সহিত কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে, কিরূপ নিয়ম ও শিষ্টাচারের সঙ্গে আত্মপরিচয় দিতে হইবে, কিরূপে কাহাকে অভিবাদন ও প্রত্যভিবাদন করিতে হইবে, তাহাও যত্নপূর্ব্বক শিখিতে হইত। পিতামাতা প্রভৃতি গুরুজনদিগকে কিরূপ ভক্তি, কিরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতে হইবে, তাহা অক্ষরে অক্ষরে শিক্ষা দেওয়া হইত।

(৪) এই সকল নিয়ম পালন না করিলে ব্রতভঙ্গ হইত, পালন করিতে পারিলে ব্রত-পূর্ণ হইত। ইহার সঙ্গে সঙ্গে অধ্যয়নের নিয়ম ছিল। আচার্য্য সর্ব্বদা পড়িবার জন্য অনুজ্ঞা করুন বা না করুন, যত্ন পূর্ব্বক স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিত্যপাঠ অধ্যয়ন করিতে হইত, এবং শ্রদ্ধা ও ভক্তির সঙ্গে উপদেশ গ্রহণ করিতে হইত। এইরূপে গুরুকুলে বাস করিয়া ছাত্রজীবন যাপন করা সে কালের নিয়ম ছিল। চিন্তাশীল পাঠকগণ দেখিবেন, কত চিন্তা, কত যত্নের সঙ্গে এই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ হইত, এবং কিরূপ অধ্যবসায়-সংযোগে নিয়মগুলি ছাত্র-জীবনে প্রতিপালিত হইত।

সে কালের ছাত্রজীবন ব্রহ্মচারীর জীবন ছিল। জীবনের প্রারম্ভে এই সকল আত্ম-ত্যাগ ও আত্মসংযম, সদাচার ও শিষ্ট ব্যব-হারের সঙ্গে জ্ঞানোপার্জ্জন করিতে পারিলে সাংসারিক জীবনে তাহার ফল যে মধুময় হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? সংসার আত্ম-ত্যাগের পরীক্ষাগৃহ, এখানে আত্মজীবন বলি দিয়া পরের সেবা করিতে হয়, আত্ম-সুখ বিসর্জ্জন দিয়া পরের সুখ সম্পাদন করিতে হয়; যদি কেহ বাল্যজীবনে আত্মত্যাগ ও আত্মসংযম না শিখিতে পারে, সে কেমন করিয়া এই দুষ্কর সংসার-ব্রত পালন করিবে? আমাদের ছাত্রজীবনের উচ্ছৃঙ্খল শিক্ষার ফল সাংসারিক জীবনে ভোগ করিতে হয়; সুতরাং যদি সংসারকে সুন্দর করিতে চাও, গৃহকে সুখভূমি করিতে চাও, আত্ম-জীবনকে সুখ-পাদপ করিতে চাও, স্বদেশের মলিন মুখ উজ্জ্বল করিতে চাও, তবে ছাত্রজীবনের বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থার প্রতিকার কর। সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে সহজে তাহা সাধন করিতে পার,—যাহাতে নিজের ও দেশের মঙ্গল, তাহার প্রতি উদাসীন থাকিও না। এদেশের ছাত্রজীবন কি ছিল আর কি হইয়াছে, একবার তুলনায় সমালোচনা কর, বিষাদে হৃদয় ভরিয়া যাইবে, লজ্জায় মস্তক অবনত হইবে!!

সরল প্রাকৃতদর্শন।

মাধ্যাকর্ষণ ও মহাকর্ষণ। নীচ হইতে টেবিল সরাইয়া নিলে ইহার উপরিস্থ বহি, শ্লেট প্রভৃতি ভূমিতে পড়িয়া যায়। ফলতঃ যাবতীয় পদার্থই অবলম্বনশূন্য হইলে, ভূতলে পতিত হয়। এই সামান্য পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা আমরা দেখিতে পাই, পৃথিবী ইহার উপরিস্থ যাবতীয় পদার্থ আপনার দিকে আকর্ষণ করে। ছাদের উপর অথবা অন্য কোন উচ্চ স্থান হইতে এক খণ্ড প্রস্তর এবং একখণ্ড কাগজ ফেলিয়া দিলে, প্রস্তরখণ্ড কাগজের অনেক পূর্ব্বে ভূমিতে পতিত হয়; বোঁটা হইতে একটী ফল মাটিতে পড়িতে যে সময় লাগে, সেই বোঁটা হইতে একটী পাতা মাটিতে পড়িতে তাহা অপেক্ষা অধিক সময় লাগে; এই সকল দেখিয়া তোমরা মনে করিতে পার যে সমোচ্চ স্থল হইতে গুরু পদার্থ অল্পতর সময়ে এবং লঘু পদার্থ অধিকতর সময়ে ভূমিতে পতিত হয়। কিন্তু বাস্তবিক ইহা ঠিক নহে। ইহাদের পতনকালের বিষমতা বায়ুর প্রতিরোধের জন্যই হইয়া থাকে। প্রস্তরখণ্ড অপেক্ষা কাগজে, ফল অপেক্ষা পাতায়, বায়ুর প্রতিরোধ অধিকতর। কাগজে প্রতিরোধ অধিক বলিয়াই আমরা ঘুড়ি উড়াইতে পারি। বায়ুর প্রতিরোধ না থাকিলে সমুদায় পদার্থই সমোচ্চ-স্থান হইতে সম-সময়ে ভূতলে পতিত হইত। বাতনিষ্কাশন নামক এক প্রকার যন্ত্র আছে, ইহা দ্বারা কোন পাত্র বায়ুশূন্য করা যায়; এই যন্ত্র দ্বারা কোন স্থান নির্ব্বাত করিয়া পরীক্ষিত হইয়াছে যে প্রস্তর ও পালক তুল্য সময়ে সমোচ্চ-স্থান হইতে ভূতলে পতিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সারবিশিষ্ট পদার্থ সমোচ্চ স্থান হইতে তুল্য সময়ে ভূতলে পতিত হয় সুতরাং পৃথিবী ইহাদিগের উপর প্রতি মুহূর্ত্তে তুল্য বেগ উৎপাদন করে। আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে ভিন্ন ভিন্ন পরিমাণ সারবিশিষ্ট পদার্থে তুল্য বেগ উৎপাদন করিতে হইলে সারের অনুপাতীয় বলের প্রয়োজন; অতএব পৃথিবীর এই আকর্ষণের বল সারের অনুপাতীয়। পৃথিবীও তদুপরিস্থ পদার্থের মধ্যে যে আকর্ষণ রহিয়াছে, তাহাকে মাধ্যাকর্ষণ কহে।

মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পদার্থ সমূহ পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইত না, তাহাদিগকে যেখানে রাখা যাইত, সেই খানেই থাকিত; অবলম্বনরহিত হইয়াও শূন্যে অবস্থান করিতে পারিত। কোন পদার্থ ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষেপ করিলে, পুনরায় আর ভূতলে পতিত হইত না, জড়ত্বানুসারে পৃথিবী ছাড়িয়া আকাশ-পথে চলিয়া যাইত। আমরাও ঊর্দ্ধদিকে লম্ফ প্রদান করিলে পুনরায় পৃথিবীতে না পড়িয়া অন্তরীক্ষে চলিয়া যাইতাম।

কেপ্‌লার নামক জর্ম্মণ দেশীয় একজন বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ গ্রহদিগের কক্ষ ও গতি নির্ণয় করেন; ইংলণ্ডদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত নিউটন প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীস্থ এই

মাধ্যাকর্ষণকে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কল্পনা করিলে গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতির গতি ও কক্ষ ব্যাখ্যাত হয়। এই বিশ্বব্যাপী আকর্ষণকে "মহাকর্ষণ" কহে। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ এই বিশ্বব্যাপী মহাকর্ষণের এক-দেশ মাত্র। যে আকর্ষণ অবলম্বনশূন্য পদার্থকে ভূতলে আনয়ন করে, সেই আকর্ষণই গ্রহ উপগ্রহ প্রভৃতিকে নিজ নিজ কক্ষে রাখিয়াছে।

নিউটনের আকর্ষণ বিষয়ক প্রসিদ্ধ নিয়ম এই :—ব্রহ্মাণ্ডের প্রত্যেক পদার্থকণা অবশিষ্ট প্রত্যেক পদার্থ কণাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে; কোন দুই কণার পরস্পর আকর্ষণের বল উভয়ের সারের গুণফলের অনুলোমভাবে এবং অন্তরের বর্গের প্রতিলোম ভাবে অনুপাতীয়। মনে কর ব্রহ্মাণ্ড কেবল দুইটী মাত্র পদার্থ কণা আছে; যদি ইহাদের সার যথাক্রমে 'ম' ও 'ম' হয় এবং অন্তর দ হয়, তাহা হইলে ইহাদের পরস্পরের আকর্ষণের বল $\frac{ম \times ম'}{দ^{২}}$ র অনুপাতক। অন্তর দ্বিগুণ হইলে আকর্ষণের বল পূর্ব্বের $\left(\frac{১}{২^{২}}=\right) \frac{১}{৪}$, ত্রিগুণ হইলে $\left(\frac{১}{৩^{২}}=\right) \frac{১}{৯}$, ইত্যাদি হইবে। যদি কোন একটী সার বর্ত্তমান সারের দ্বিগুণ হয়, তাহা হইলে পরস্পরের আকর্ষণ বর্ত্তমান আকর্ষণের দ্বিগুণ হইবে, একটীর দ্বিগুণ, এবং অপরটীর ত্রিগুণ হইলে, আকর্ষণ বর্ত্তমান আকর্ষণের (২×৩ =) ৬ গুণ হইবে, ইত্যাদি।

পদার্থের জাতির সহিত এই আকর্ষণের কোন সম্বন্ধ নাই; যে জাতীয় পদার্থই কেন হউক না, আকর্ষণের বল ইহাদের সার ও অন্তরের উপর নির্ভর করে; ইহাদের জাতির উপর নির্ভর করে না। ৫ সের একটী লৌহ খণ্ড ও ১০ সের একটী তাম্র খণ্ডের মধ্যে যে আকর্ষণ রহিয়াছে, সমদূরবর্ত্তী ৫ সের একটী প্রস্তরখণ্ড ও ১০ সের একটী কাষ্ঠখণ্ডের মধ্যেও ঠিক সেই আকর্ষণ রহিয়াছে। পৃথিবী এক সের একটী ফলকে যে বলে নীচের দিকে আকর্ষণ করে ১ সের একটী লৌহপিণ্ডকেও ঠিক সেই বলে আকর্ষণ করে; আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে সমোচ্চ স্থান হইতে ভিন্ন ভিন্ন সারবিশিষ্ট পদার্থের পতনের সময় সমান; অতএব যাবতীয় পদার্থই অবলম্বনশূন্য হইলে, জাতি ও সারনির্ব্বিশেষে সমোচ্চ স্থান হইতে তুল্য সময়ে ভূতলে পতিত হয়।

আমাদিগকে আর একটী কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখিতে হইবে। এই আকর্ষণ পারস্পরিক উভয় উভয়কে তুল্য বলে আপনার দিকে আকর্ষণ করে। ম ম'কে যে বলে আপনার দিকে টানে, ম'ও মকে ঠিক সেই বলে নিজের দিকে টানে, এই তুল্য বল ভিন্ন ভিন্ন সারবিশিষ্ট পদার্থে ভিন্ন ভিন্ন বেগ উৎপাদন করে;—যাহার সার অধিক, তাহাতে অল্প বেগ এবং যাহার সার অল্প তাহাতে অধিক বেগ উৎপাদন করে। ম ম'র দিকে চলে এবং ম' মর দিকে চলে; এই দুইটী পদার্থ কণার সার তুল্য হইলে ইহাদের মিলন স্থান উভয়ের অন্তরের ঠিক মধ্যস্থলে হইবে, সার অসমান হইলে, অধিক সারবিশিষ্টটী অল্প বেগে, এবং অল্প সারবিশিষ্টটী অধিক বেগে পরস্পরের দিকে অগ্রসর হইবে; মিলন স্থান অধিক সারবিশিষ্ট পদার্থের নিকটতর হইবে। পৃথিবী যে বলে

বৃষ্টির জল বিন্দুকে আপনার দিকে আকর্ষণ করে, জলবিন্দুও ঠিক সেই বলে পৃথিবীকে আপনার দিকে (অর্থাৎ ঊর্দ্ধ দিকে) আকর্ষণ করে। পৃথিবীর সার অতিশয় অধিক এবং জলবিন্দুর সার অতিশয় অল্প, সুতরাং জলবিন্দুর বেগ অতিশয় অধিক এবং পৃথিবীর বেগ অতিশয় অল্প; উভয়ের মিলনের পূর্ব্বে পৃথিবী অত্যন্ত অল্প দূর যায়।

উপকথা।

১১

উকিলের পরামর্শ।

রামসুন্দর বাবু একজন মস্তরাম উকিল; দেশের রাজা মহারাজা তাঁহার পরামর্শ না লইয়া বিষয় কার্য্য করে না। কখন কখন এমনও শুনা গিয়াছে যে বড় লোকের ঘরের অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহ এবং শ্রাদ্ধাদির ফর্দ্দও তিনিই করিয়া থাকেন। উকিল বাবুর পসারের প্রসর বিস্তর, তিনি অনেকের ঘরেই বাঁধা। যেমন মল্লিকার সঙ্গে মৌমাছি বাঁধা থাকে, মধু ফুরাইলেই অন্য ফুলে উড়িয়া যায়; উকিল বাবুরাও সেইরূপই বাঁধা থাকেন; যত দিন পয়সা, তত দিন যাতায়াত, পয়সা ফুরাইলে স্বাধীন ব্যবসায়ী উকিলকে আর কে পরাধীনতার শৃঙ্খলে বাঁধিতে পারে?

রামসুন্দর বাবুর ধী শব্দ নাম; তাঁহার পরামর্শ লইয়া কায কর্ম্ম করা বড় লোকের লক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। খোদাবক্স মণ্ডল একজন সম্পত্তিপন্ন কৃষক, নিতান্ত দরিদ্রাবস্থা হইতে সে আপন অধ্যবসায় গুণে দুই চারি টাকা সঞ্চয় করিয়া কৃষকপল্লীতে একটু মান্যগণ্য হইয়াছে; কিন্তু সে কখনও উকিলের পরামর্শ লয় নাই। উকিলের পরামর্শ না লইয়া কার্য্য করা আর ভাল দেখায় না; তাহার যখন বড় মানুষ সাজিবার সাধ হইয়াছে, তখন বড় মানুষীর সর্ব্বপ্রধান অঙ্গস্বরূপ উকিল বাড়ী যাতায়াত করা তাহার নিতান্তই আবশ্যক। কাঙ্গালের যেমন ঘোড়া রোগ হয়, বালকের যেমন চাঁদ ধরিতে সখ হয়, খোদাবক্সেরও তেমনি উকিলের সঙ্গে পরামর্শ করিতে সখ হইল। সে আর কাল হরণ না করিয়া একদিন প্রত্যূষে রামসুন্দর বাবুর বৈঠকখানায় আসিয়া উপস্থিত হইল।

উকিল্ বাবু গম্ভীরভাবে বসিয়া আছেন, খোদাবক্স সম্মুখের একখানি কাষ্ঠাসনে গিয়া উপবেশন করিল দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন "কি জন্য আগমন?"

খোদাবক্স—"আমার একটা পরামর্শ লইতে হইবে"

উকিল বাবু—"কোন বিষয়ে পরামর্শ দিতে আমি এক স্বর্ণমুদ্রা লইয়া থাকি।"

খোদাবক্স এক স্বর্ণমুদ্রার কথা শুনিয়া

একটু ইতস্ততের মধ্যে পড়িল; কিন্তু তাহার বড় মানুষ বলিয়া পরিচয় দিবার ইচ্ছা; টাকা ব্যয়ে কুণ্ঠিত হইলে কৃপণতা হয় ভাবিয়া আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উকিল বাবুকে ১৬৲ গুণিয়া দিল।

ওকালতি ব্যবসার এক্ষণে যেরূপ অবস্থা তাহাতে কোন পরামর্শ লইতে সচরাচর কেহ ফিঃ দেয় না, দিলেও প্রায়শঃ ১৬৲ দেয় না। খোদাবক্স নিরাপত্তিতে ১৬৲ টাকা প্রদান করিল তাহাতে উকিল বাবু বিশেষ সন্তুষ্ট হইলেন একটু আশ্চর্য্যও বোধ করিলেন। মক্কেলকে অধিকতর সম্মান দেখাইবার জন্য তামাক দিতে বলিলেন এবং "আপনি" সম্বোধন আরম্ভ করিলেন।

উকিল বাবু—"আপনি কি বিষয়ে পরামর্শ চান; আপনার কি কোন মোকদ্দমা আছে?"

খোদাবক্স—"আজ্ঞে না, আমি সামান্য মানুষ, আমার আর কি মোকদ্দমা থাকিবে।"

উকিল বাবু—"তবে কি কোন খতের মুসাবিদা করাইতে আসিয়াছেন?"

খোদাবক্স—"আজ্ঞে না, আপনার আশীর্ব্বাদে আমার দেনা করার কোন আবশ্যক নাই।"

উকিল বাবু—"তবে কি কোন বিক্রয় কবালা লিখাইতে চান?"

খোদাবক্স—"আজ্ঞে না, আমি সামান্য গৃহস্থ মানুষ, আমার খরিদ বিক্রয়ের কোন কারবার নাই।"

উকিল বাবু কিছু গোলযোগের মধ্যে পড়িলেন; খোদাবক্স কি বিষয়ের পরামর্শ চায় স্থির করিতে পারিলেন না। খোদাবক্সের বিশ্বাস উকিল বাবু সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহাকে আপনা হইতে কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

উকিল বাবু—"তবে আপনি বোধ হয় নিশ্চয়ই কোন উইলের মুসাবিদার জন্য আসিয়াছেন।"

খোদাবক্স—"আজ্ঞে, তাহাও নয়, আমার পুত্র কন্যা বাঁচিয়া থাকুক, উইল কি জন্য করিব?"

এইবার উকিল বাবু পরাজিত হইলেন। মনে মনে করিলেন "আমি বারম্বার জিজ্ঞাসা করিলাম তাহাতেও বিষয় স্থির করিতে পারিলাম না; মক্কেল হয়ত মনে করিতেছে উকিল কার্য্যের নয়।" কিন্তু রামসুন্দর বাবুর কখনও অপ্রতিভ হওয়া অভ্যাস নাই; তাহা হইলে ব্যবসায় চলে কি? বিশেষতঃ খোদাবক্সের টাকা কয়টি তখনও ঝক্‌ঝক্ করিতেছে।

উকিল বাবু—"হাঁ, এতক্ষণে আমি সমস্ত বুঝিয়াছি; আচ্ছা, আপনার পরামর্শ আমি লিখিয়া দিতেছি।"

এই বলিয়া উকিল বাবু এক খণ্ড ডাক কাগজ বাহির করিয়া তাহাতে ক্ষণেক কি লিখিলেন, পরে ঐ কাগজখানি এক খামের মধ্যে রাখিয়া খাম বন্ধ করিলেন, শিরোনামায় খোদাবক্সের নাম লিখিয়া বলিলেন, "এই লউন, ইহার মধ্যে পরামর্শ লিখা থাকিল। যখন কোন পরামর্শের নিতান্ত আবশ্যক হইবে, তখন এই খাম খুলিবেন, নতুবা কিছুতেই ইহা খুলিবেন না।"

খোদাবক্স যেন আকাশের চাঁদ হাতে পাইল সযত্নে বস্ত্রাঞ্চলে খামখানি বাঁধিয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিল এবং বাটী আসিয়াই

রটাইয়া দিল যে সে উকিলের পরামর্শ লইয়া আসিয়াছে। প্রতিবেশীগণ উৎসুকমনে তাহা শুনিতে আসিল। খোদাবক্সের আজ আহ্লাদের আর সীমা নাই; দলে দলে গ্রাম-বাসীগণ আসিতেছে ও যাইতেছে। খোদা বক্সের বিশ্রাম নাই; উকিল কি প্রকার জীব, কিরূপে পরামর্শ দেয়, তাহাতে কতশত টাকা ব্যয় হয়, পরামর্শ লওয়া বিশেষ বাহাদুরীর কার্য্য ইত্যাদি নানা বিষয়ে বক্তৃতা করিতেছে ও থাম দেখাইতেছে। প্রতিবেশীগণ অবাক; হাঁ করিয়া শুনিতেছে।

ক্রমে অপরাহ্ণ হইয়া আসিল। খোদা-বক্সের পুত্র পিঁপোড় মণ্ডল আসিয়া বলিল "বাবা, ধান কাটিয়া মাঠে পালা দেওয়া হইয়াছে, এক্ষণে সমস্ত ঘরে লইয়া আসিতে হয়।"

খোদাবক্সের অবসর নাই বোধ হয় পুত্রের কথা সে শুনিতেও পাইল না।

পিঁপোড় মণ্ডল পুনরায় বলিল "বাবা, বেলা গেল, শীঘ্র মাঠে চল, ধান কাটা হই-য়াছে লইয়া আসিতে হইবে।"

খোদাবক্স বড় বিপদে পড়িল। গল্প ছাড়িয়া তাহার যাওয়ার ইচ্ছা নাই; প্রতি-বেশীরা কি মনে করিবে? তখন প্রকাশ্যে বলিল "না, আজ থাকুক, কাল আনিলেই হইবে।"

পিঁপোড় সহজে ছাড়িবার ছেলে নহে। তখনই আনিবার জন্য জিদাজিদি করিতে লাগিল। খোদাবক্স ক্রমশঃ বিরক্ত হইয়া শেষে রাগান্বিত হইয়া উঠিল; পুত্রকে গালা-গালি দিতে লাগিল। খোদাবক্সের স্ত্রী পুত্রের পক্ষাবলম্বন করিয়া খোদাবক্সকে বকিতে লাগিল। ক্রমশঃ স্ত্রী পুরুষের দ্বন্দ্ব গুরুতর হইয়া উঠিল।

তখন একজন বৃদ্ধ প্রতিবেশী বলিল "এ বড় কঠিন সমস্যা;—আজ ধান আনিতে যাওয়া উচিত কি না,—আমার বোধ হয় থাম খুলিয়া উকিল বাবুর পরামর্শ অনুসারে কার্য্য করা উচিত।"

এই পরামর্শে সকলেই সম্মতি দিল। তখন গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত মহাশয়কে থাম খানি দিয়া খোদাবক্স বিশেষ গম্ভীরতার সহিত পরামর্শ শুনিবার জন্য উৎকর্ণ হইল। পণ্ডিত মহাশয় কাগজ খানি এ পিট ও পিট উল্টাইয়া অবশেষে পড়িলেন, "যাহা আজ করিতে পার, কাল করিব বলিয়া তাহা ফেলিয়া রাখিও না।"

উকিল বাবুর বিদ্যা ও বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া সকলেই বিশেষ আশ্চর্য্যান্বিত হইল। খোদাবক্স আর দ্বিরুক্তি না করিয়া পুত্র ও লোকজন সহকারে ধান আনিতে মাঠে গেল। উকিল বাবু পরামর্শ দিয়াছেন "যাহা আজ করিতে পার, কাল করিব বলিয়া তাহা ফেলিয়া রাখিও না";—আর এই পরামর্শ খোদাবক্স ১৬ টাকা ব্যয় করিয়া লইয়া আসিয়াছে। ইহার উপর কি আর দ্বিরুক্তি চলে?

খোদাবক্সের সমস্ত ধান গৃহে আনীত হইল। ক্রমশঃ রজনী অধিক হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে তুমুল ঝড় বৃষ্টি আরম্ভ হইল। এমন ঝড়, এমন বৃষ্টি, এমন শিলাপতন বুঝি আর কখনও হয় নাই। মাঠে প্রায় এক কোমর জল দাঁড়াইল। যাহাদের ধান মাঠে ছিল তাহা সমুদায় ডুবিয়া নষ্ট হইয়া

গেল। কেবল খোদাবক্‌স উকিলের পরামর্শে তাহার ধান গৃহে আনিয়াছিল, তজ্জন্য তাহার ধান রক্ষা পাইল। এইরূপ হটাৎ অতি বৃষ্টিতে ধান নষ্ট হওয়ায় দেশে দুর্ভিক্ষ লাগিয়া উঠিল। খোদাবক্‌স এই সুযোগে আপন ধান বিক্রয় করিয়া বহুতর টাকা লাভ করিল। তাহার আনন্দের আর সীমা রহিল না। আমরা শুনিয়াছি যে সেই অবধি খোদাবক্‌স উকিলের পরামর্শ ভিন্ন কোন কার্য্যই করিত না।

ছোট কথা।

সকলেই সুখের কাঙ্গাল, কিন্তু অতি অল্প লোকেই সুখের মুখ দেখিয়া থাকে! যাহাকে জিজ্ঞাসা করি সেই বিষন্নমুখে করুণবচনে কাতরকণ্ঠে বলিয়া থাকে, "সুখের লাগিয়া যে ঘর বাঁধিনু, আগুণে পুড়ি সে গেল!" সুখ কি তবে কল্পনার কথা—মানবমস্তিষ্কের উন্মত্তভাব মাত্র? জানি না সুখ কি, কিন্তু কথন কথন তাহার দূরাগত অস্ফুট বংশী ধ্বনি শুনিয়া মনে হয় সুখ কল্পনা নহে, তাহা নিত্য বস্তু! অযোগ্য লোকেও প্রভূত ধনরত্ন উপার্জ্জন করিতে পারে, মূর্খ লোকেও দশের মুখে প্রশংসা পাইয়া পণ্ডিত বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকে; কিন্তু সুখ কখনও অযোগ্য লোককে দর্শন দেয় না—আমরা যদি যোগ্য হইতাম, সুখের জন্য কাঁদিয়া জীবন কাটাইতে হইত না!

আমরা কল্পনার দাস, সকলের গোলাম; আসল সত্য বস্তুকে ভাল করিয়া আদর করিতে জানি না। যাহার বাহির যত জম কাল তাহাকেই তত আদর করি; বোধ হয় সেই জন্য নকলের মধ্যে সুখের অনুসন্ধান করিতেই জীবন ফুরাইতেছে। আসল ফুলে কত শোভা, কত সৌরভ, কত স্বর্গীয় আনন্দ—তাহা কি আমরা ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি? যদি কেহ নকল ফুল গড়িতে পড়িল, অমনি তাহার শিল্পচাতুর্য্যের বাহবা দিয়া তাহার স্তুতিগানে দেশ মাতাইতে বসিলাম। যদি আসলের মহিমা বুঝিয়া তাহার স্তুতিগান করিতাম, তবে বুঝি এই মৃত প্রাণ মাতিয়া উঠিত!

আমরা মুখের কথার বড়ই প্রত্যাশী, মুখের প্রশংসার জন্য বড়ই লালায়িত! তোমার মুখের একটু প্রশংসার খাতিরে আমি সকলই করিয়া থাকি, সকলই করিতে পারি। দশজনের প্রশংসার খাতিরে আমরা কত অকার্য্যই না করিতেছি, কত কর্ত্তব্যই না অবহেলায় পদদলিত হইতেছে? পরের মুখের শূন্যময় একটা কথার মধ্যে, লৌকিক একটা প্রশংসার উপর যাহার সুখ দুঃখ নির্ভর করে; সে যদি জগতে সুখী, তবে প্রকৃত দুঃখী কে?

প্রাপ্তগ্রন্থাদি।

(শিক্ষা-পরিচয় সমিতি কর্ত্তৃক সমালোচিত।*)

আদিম বৈদিক সময়ের আর্য্য-সভ্যতা। শ্রীশশধর রায়, এম্, এ, বি, এল, প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা। আকার ৯৫ পৃষ্ঠা।

শিক্ষিত বাঙ্গালীকে মাতৃভাষায় পুস্তক লিখিতে দেখিলে বড়ই আনন্দ হয়। বঙ্গভাষার দরিদ্রতা এখনও ঘুচে নাই; বাঙ্গালী সংস্কৃত, ইংরাজী প্রভৃতি ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়া মাতৃভাষায় পুস্তকাদি লিখিলে—মাতৃভাষাকে সমৃদ্ধিশালিনী করিতে যত্ন করিলে তাহার এ দুর্দ্দশা থাকে না। অনেকের মনে মনে এবাসনা থাকিলেও আলোচনার অভাবে তাহা কার্য্যে পরিণত হয় না। তাঁহারা মনে করেন, মাতৃভাষা যখন শৈশব হইতেই অভ্যস্ত আছে, তখন ইচ্ছা করিলেই ইহাতে পুস্তকাদি লিখা যাইতে পারে। এইরূপ ভ্রম থাকাতে চিরদিন মাতৃভাষার অনাদর করেন, কিন্তু যখন কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসেন, তখন নিজের ভ্রম বুঝিতে পারেন। তথাপি ইহা একটি শুভ লক্ষণ বলিতে হইবে, কেননা ক্ষমতা সকলের থাকে না, কিন্তু অনুরাগ সকলেরই থাকা বাঞ্ছনীয়। কোন ভাষাতেই যে কেহ লেখা পড়া জানে সেই গ্রন্থ লিখিতে পারে না; কিন্তু যে দেশে মাতৃভাষার প্রতি জাতিগত সার্ব্বজনীন অনুরাগ আছে, কেবল সেই দেশেই মাতৃভাষা উন্নতির পরাকাষ্ঠা লাভ করিতে পারিয়াছে।

সমালোচ্য গ্রন্থের লেখক ইংরাজীতে কৃতবিদ্য। মাতৃভাষার প্রতি তাঁহার অনুরাগ রহিয়াছে দেখিয়া আমরা আহ্লাদিত হইলাম। তিনি যে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিয়াছেন, তাহা অতি উচ্চ। হিন্দুর বেদাদি শাস্ত্র তাহার জাতীয় সম্পত্তি; কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা, শাস্ত্রের মর্ম্মানভিজ্ঞ বিজাতীয়দিগের মুখে তাহার ব্যাখ্যা শুনিয়া হিন্দুকে আপনার শাস্ত্রে জ্ঞান-লাভ করিতে হইতেছে।

---

* বঙ্গ সাহিত্য, বঙ্গভাষা ও সুশিক্ষার উন্নতি কামনায় শিক্ষা-পরিচয় সমিতির জন্ম হইয়াছে। যাঁহারা প্রবন্ধ ও পুস্তকাদি লিখিয়া সমিতির নিয়মানুসারে প্রকাশ করিতে সম্মত হইবেন তাঁহারাই নিয়মিত সভ্য হইতে পারেন। যাঁহারা সমিতির উদ্দেশ্যের সহিত সহানুভূতি রাখেন, তাঁহারা ইহার মাননীয় সভ্য হইবার অধিকারী। সমিতিকে বন্ধু বান্ধবগণ পুনঃপুনঃ সাহিত্য সমালোচনার ভার গ্রহণ করিতে অনুরোধ করায় সমিতি তাহা আর অধিক দিন উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। নিরপেক্ষভাবে বঙ্গ-সাহিত্য সমালোচনা করাই ইহার উদ্দেশ্য, আবর্জ্জনা রাশি দূর করিয়া প্রকৃত মণি মাণিক্যগুলি সাধারণের চক্ষের সম্মুখে ধরিয়া দেওয়া ইহার লক্ষ্য। সমিতির এই সকল সমালোচনা শিক্ষা-পরিচয় এবং আবশ্যক হইলে অন্যান্য সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে।

শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি-সম্পাদক।

অধুনা দেশীয় কৃতবিদ্যদিগের মধ্যে কেহ কেহ এবিষয়ে হস্তার্পণ করিতেছেন বটে, কিন্তু আশানুরূপ কৃতকার্য্য হইতেছেন বলিয়া আমাদের বিশ্বাস নাই; বরং সময়ে সময়ে তাঁহাদের মুখে বিজাতির অনুকৃত ব্যাখ্যা শুনিলে হাস্যের উদ্রেক হয়। বর্ত্তমান গ্রন্থের লেখক অন্ধভাবে পরানুকরণ না করিয়া—স্থানে স্থানে স্বাধীন ভাব ব্যক্ত করিয়াছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। গ্রন্থখানি যে সম্পূর্ণ সুখ-পাঠ্য হইয়াছে, গ্রন্থকার যে লিপি-কর্ম্মে সুন্দর পটুতা লাভ করিয়াছেন, একথা বলিতে পারি না; তবে তাঁহার এই প্রথম নমুনা দেখিলে আশা হয়, কায়মনে মাতৃভাষার সেবা করিতে থাকিলে কালে তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন।

গ্রন্থখানির মুদ্রণ-কার্য্যে ভুল ভ্রান্তি বড়ই অধিক রহিয়াছে, এবং তজ্জন্য গ্রাহক ও পাঠকগণের নিকট গ্রন্থকার ক্ষমা চাহিয়াছেন। আমরা কৌতূহল বশতঃ গণিয়া দেখিলাম, ২৮ ছত্র-বিশিষ্ট বিজ্ঞাপনটির মধ্যে ১১টি ভুল রহিয়াছে। গ্রন্থকারকে বড়ই উদার বলিতে হইবে যে, এই গ্রন্থের প্রুফ্ সংশোধক মহাশয়ের নিকট তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন। "বলিহারাধিপতি বিদ্যোৎসাহী শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা কৃষ্ণেন্দ্র রায় বাহাদুরের বদান্যতায় তদীয় মুদ্রাযন্ত্রে এই গ্রন্থ মুদ্রিত হইল।" সুতরাং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতে বাধ্য; কিন্তু আমাদের বোধ হয় টাকা খরচ করিয়া অন্য একটা ভাল ছাপাখানা হইতে পুস্তক খানি মুদ্রিত করিয়া দিলে যথার্থই রাজা বাহাদুরের "বদান্যতা" প্রকাশ পাইত।

স্থানাভাব বশতঃ আমরা এই গ্রন্থের কোন অংশ উদ্ধৃত করিতে পারিলাম না, এজন্য গ্রন্থকার মহাশয় ক্ষমা করিবেন।

পরিশিষ্টে যে সকল মূল শ্রুতি উদ্ধৃত হইয়াছে তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ দেওয়া উচিত ছিল তাহা না হওয়ায় ঐ অংশ সাধারণের বোধগম্য হয় নাই।

ঋগ্বেদ কি তাহাতে কি আছে কি নিয়মে তাহা গ্রথিত ও সংগৃহীত ভূমিকায় এসম্বন্ধে একটী বিস্তৃত অধ্যায় লিখিত হওয়া উচিত ছিল। হিন্দুশাস্ত্রবিৎ হিন্দুরা বেদকে অপৌরুষের ও ঈশ্বরের উক্তি ঋষিদিগের কর্ত্তৃক প্রকাশিতমাত্র বলিয়া বিশ্বাস করে। পাশ্চাত্য সভ্য জাতি বেদকে আদিম অবস্থা হইতে উন্নতি এবং সমাজ প্রবর্ত্তক আর্য্য কৃষকগণের সঙ্গীত বলিয়া অনুমান করেন। শশধর বাবু শেষোক্ত মতেরই আংশিক অনুসরণ করিয়াছেন, কিন্তু তিনি যাহার আনুষঙ্গিক সমালোচনে প্রবৃত্ত সে জিনিসটি কি তাহা পাঠকদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। ঋগ্বেদ কি অনেকেই তাহা বুঝে না ও জানে না; ইহা তাঁহার বিবেচনা করা উচিত ছিল।

গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের অবতারণা করা হইয়াছে, তাহাতে গভীর গবেষণার আবশ্যক; বিষয়গুলি অতি গুরুতর কিন্তু অতি অল্প কথায় শেষ করা হইয়াছে। শশধর বাবুর ন্যায় শিক্ষিত লোকের নিকট আমরা ইহা অপেক্ষা অধিক আশা করি। বালকের আধ আধ ভাষার ন্যায় তিনিও চিত্তভাব সম্যক্ ব্যক্ত করিতে পারেন নাই, আমরাও তৃপ্তিলাভ করিতে পারি না।

এই গ্রন্থের সম্যক্ সমালোচনা করিবার উপযোগিতা আমাদিগের নাই, সুতরাং সাধারণতঃ পাঠকালে যে সকল অভাব আমরা বোধ করিয়াছি 'তাহারই উল্লেখ করিলাম মাত্র। শশধর বাবুর উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয়। বেদ অপেক্ষা হিন্দুর প্রিয় জিনিস আর কিছু হইতে পারে না; বংশগৌরব ও বংশমর্য্যাদা জন্য সকলেই ব্যগ্র। বেদই হিন্দুজাতিকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বাপেক্ষা আদিম জাতি মধ্যে পরিগণিত করিয়াছে, সুতরাং তাহার আলোচনা যাহাতে হিন্দুমাত্রেই করেন ইহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়। যে কোন ভাবে হউক শিক্ষিত যুবকগণ এই প্রাচীনতম বিষয়ের আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেই সুখের বিষয়। এক্ষণে কোন ভ্রমাত্মক মত থাকিলেও সম্যক্ অনুশীলনে তাহার সংশোধন অবশ্যই হইবে।

ধর্ম্মমণ্ডলী। উত্তর পাড়ার রাজা শ্রীযুক্ত প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় এবং তাহেরপুরের রাজা শ্রীযুক্ত শশিশেখরেশ্বর রায়, এই উভয়ের স্বাক্ষরিত একখানি অনুষ্ঠান পত্র আমরা পাইয়াছি। হিন্দু-শাস্ত্রানুসারে বালকদিগের শিক্ষার ব্যবস্থা, উপদেশ ও পুস্তক-প্রচার দ্বারা সাধারণকে হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত করা, সংস্কৃত-বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন, সংস্কৃত অধ্যাপকদিগকে উৎসাহ ও সাহায্যদান, ইত্যাদি বিষয় এই ধর্ম্মমণ্ডলীর উদ্দেশ্য। সম্মতি-বিষয়ক আইন লইয়া রাজপুরুষগণ যেরূপ এক-দেশ দর্শিতা প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতাকালে হিন্দু-ধর্ম্ম ও হিন্দু-সমাজের প্রতি ভাবী আক্রমণের যেরূপ লক্ষণ সূচিত হইয়াছে, তাহাতে জাতি এবং ধর্ম্ম-রক্ষার জন্য হিন্দুকে বিশেষরূপে বদ্ধপরিকর হইবার প্রয়োজন হইয়াছে। বোধ হয় উক্ত ঘটনা হইতেই ধর্ম্মমণ্ডলী স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুষ্ঠাতৃগণ উপলব্ধি করিয়া থাকিবেন। তাঁহাদিগের উদ্যোগ প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই। কিন্তু নূতন সভাসমিতি স্থাপন অপেক্ষা পুরাতন যাহা আছে তাহার সঙ্গে যোগ দেওয়া কি অধিক সঙ্গত নহে? ধর্ম্ম-মণ্ডলীর প্রস্তাব ভারত-ধর্ম্ম-মহামণ্ডলী দ্বারা কি সিদ্ধ হইতে পারিত না? এক একটি বিষয় লইয়া এক একটি সমিতি স্থাপন করা অপেক্ষা এই সকল সভা সমিতিকে মূল মণ্ডলীর শাখা প্রশাখারূপে পরিণত করিলেই অধিক বল সঞ্চয়ের সম্ভাবনা। স্বতন্ত্র ভাবে নূতন নূতন সমিতি স্থাপন করিলে অনুষ্ঠাতাদিগের নাম জাহির করিবার পক্ষে কতকটা সুবিধা হয় বটে, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য সাধনে তেমন সুবিধা হয় বলিয়া বোধ হয় না। আমরা এই ধর্ম্ম মণ্ডলীকে ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলীর শাখারূপে বা বিভাগ বিশেষে পরিণত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

হিন্দুমাত্রেই বার্ষিক ৩৲ টাকা চাঁদা দিলে ধর্ম্ম মণ্ডলীর সভ্য হইতে পারিবেন, প্রস্তাবিত অনুষ্ঠানের এই একটি নিয়ম হইয়াছে। টাকা দিয়া সভ্য হইবার নিয়মটা আমাদের দেশে পূর্ব্বাপর ছিল না, এবং ইহা আমাদের প্রকৃতির ঠিক অনুরূপ বলিয়া বোধ হয় না। যাহার যাহা আছে; তাহাই যথাসাধ্য দান করিয়া মণ্ডলীর সাহায্য করিবার নিয়ম থাকিলে বোধ হয় হিন্দু মাত্রেই ইহার সভ্য হইতে পারে। টাকা অপেক্ষা কাযের লোকের অভাব কি আমাদিগের অধিক নহে? টাকা দিতে বাধ্য না হইলে অনেক দরিদ্র সাধুশীল হিন্দু বোধ হয় প্রাণ দিয়া মণ্ডলীর জন্য খাটিতে পারেন। যাহা হউক মণ্ডলী দীর্ঘজীবী হইয়া সংকল্প সাধনে কৃতকার্য্য হউন, ঈশ্বরের নিকট আমাদের এই প্রার্থনা।

তৃতীয় ভাগ।] ভাদ্র [৫ম সংখ্যা।
(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক
শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ,

সহকারী সম্পাদক
শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল,।

তত্ত্বাবধায়ক
শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,
৯০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৸৹।

বিজ্ঞাপনের নিয়ম কার্য্যালয়ে জ্ঞাতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের মূল্যাদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট কলিকাতায় এবং প্রবন্ধাদি পুঁটিয়ায় সম্পাদকের নিকট প্রেরিতব্য।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। | ভাদ্র ১২৯৮ সাল। | ৫ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১৭

দিয়াছ হৃদয়-ধন, প্রাণেশ্বর! কোথা রাখি?
এ জগতে কোন স্থান নিরাপদ নাহি দেখি!
বিষয় ভীষণ দৈত্য, সদা তার ভয়ে কাঁপি,
পালাইতে স্থান নাই, বেড়া জাল চারি দিকে,
কখন বা পদাঘাতে ভাঙ্গে সে সাধের ধন,
এই ভাবনায় মন সদা সঙ্কুচিত থাকে!
হিংসা, দ্বেষ, অবিশ্বাস বহিতেছে অবিরাম,
তাদের কঠোর শ্বাসে হৃদয় শুকায়ে যায়,
পাইয়া এমন ধন বুঝিবা বঞ্চিত হই,
দরিদ্রের ধন-লাভে একি অভিনব দায়!
যারে দেই রাখিবারে, সেই হয় অপহারী,
একটি রক্ষক নাই, সংসার ভক্ষকে ভরা,
লুকাইয়া কত ধন রাখে ধনী—আমি শুধু
একটি হৃদয় লয়ে হ'তেছি ভাবিয়া সারা!
নিখিল-সংসার-মাঝে বিশ্বাসের স্থান নাই,
প্রাণেশ! তোমারি ধন তোমারি নিকটে রাখি,
ভবের বিষাক্ত বায়ু পারিবে না পরশিতে,
তোমারি চরণ-তলে নিরাপদ হয়ে থাকি।

ছাত্রজীবন।

২

সে কালের ছাত্রজীবন যেমন ব্রহ্মচর্য্যের কঠোর শাসনের অধীনে পরিচালিত হইত, আজকালিকার ছাত্রজীবন সেরূপ কোন ধরা-বাঁধা নিয়মের দাসত্ব স্বীকার করে না। সে গুরুকুলে বাস ও গুরুগৃহে দাস্যবৃত্তিও নাই; তাহার সঙ্গে সঙ্গে সেই স্বার্থ-ত্যাগ, বিলাস-ত্যাগ, আলস্য-ত্যাগও উঠিয়া গিয়াছে! এখন যাহার যেমন ইচ্ছা সেইরূপ ভাবেই ছাত্রজীবন যাপন করিবার স্বাধীনতা জন্মিয়াছে। এই স্বাধীনতার সহিত বাল্য-বিবাহ আসিয়া মিলিত হইয়া সোণায় সোহাগা হইয়াছে; একে বিলাস-ভোগের প্রবৃত্তি যৌবনে স্বভাবতঃই প্রবল, তাহার উপর বিদ্যালয়ে থাকিতেই ছাত্রগণ পুত্র কন্যার জনক,—ইহাতে জাতীয়জীবন যে কত বিপর্য্যস্ত হইতেছে তাহা স্থিরভাবে আলোচনা করিবার প্রবৃত্তি কাহারও দেখিতে পাই না। এ কালের ছাত্রজীবন স্বেচ্ছাচার ও দেশাচারের অনুরোধে ব্রহ্মচর্য্য-চ্যুত হওয়ায় ছাত্রজীবন ও গার্হস্থ্য-জীবনের মধ্যে যে ব্যবধান ছিল তাহা আর নাই; অধ্যয়ন ও সন্তান-পালন যুগপৎ আরম্ভ হইয়াছে! সম-বয়স্ক ছাত্রগণের মধ্যে যাহারা বিবাহিত তাহাদের সংশ্রবে থাকিয়া অবিবাহিত ছাত্রগণও যৌবন-সুলভ চপলতা ও চিত্ত-বিক্ষেপ অভ্যাস করিতেছে; ইহাতে ছাত্রজীবনে কত রোগ, কত জীর্ণতা, কত মলিনতা, কত নীরসতা, প্রবেশ করিতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। যাহারা বিবাহিত, তাহারা পাঠ্য-পুস্তক ফেলিয়া রাখিয়া প্রেম-লিপি কণ্ঠস্থ করে। যাহারা অবিবাহিত, তাহারা বিবাহ-বাসরের প্রতীক্ষায় অশ্লীল অশ্রাব্য কুপাঠ্য-পাঠে আত্মজীবন ও মূল্যবান্ সময় কলুষিত করে;—এ দৃষ্টান্ত আজ কাল বিরল নহে। ইহাতে যে ছাত্রগণের পরকাল নষ্ট হয় কেবল তাহাই নহে, অধ্যয়নের ব্যাঘাত জন্মিয়া সমুচিত শিক্ষা-লাভেরও বিলক্ষণ ক্ষতি হইয়া থাকে। আত্ম-সংযম শিখিতে আসিয়া পদে পদে আত্ম-স্খলন অভ্যাস করিলে যাহা হইতে পারে, বর্ত্তমান কালের ছাত্র-জীবনেও তাহাই হইতেছে।

সে কালের ছাত্রজীবনের প্রধান শিক্ষা ছিল বিলাস-ত্যাগ।—এ কালের ছাত্রজীবন বিলাসের লীলা-ভূমি হইয়া উঠিয়াছে! নদী-তীরে ভ্রমণ করিতে যাও, রঙ্গ-মঞ্চে অভিনয় দর্শন করিতে যাও, সভা-মণ্ডপে বক্তৃতা শুনিতে যাও, সর্ব্বত্রই দেখিবে ছাত্র-সমাজেই যত বিলাসের চাকচিক্য! বিলাসের প্রধান দোষ এই যে, তাহাতে জীবনকে কষ্ট-সাধ্য কার্য্যের অনুপযোগী করিয়া তুলে। বাল্য-কালে কেহই বলিতে পারে না কাহার ভবিষ্যৎ জীবন কিরূপে অতিবাহিত হইবে; সুতরাং ছাত্রজীবনে বিলাস-ত্যাগ শিক্ষা করা কেবল আবশ্যক নহে, ইহা পরিণামে অনন্ত মঙ্গলের নিদান।

সেকালের ছাত্রজীবন গুরুকুলে অতিবাহিত হইত, সদ্‌গুরু দেখিয়া পুত্রকে তাঁহার তত্ত্বাবধানে রাখিয়া পিতা মাতা নিশ্চিন্ত হইতে পারিতেন। এ কালে কখন পিতৃগৃহে দাস-দাসী পরিবারমধ্যে, কখন বিদ্যালয়ে বিবিধ শিক্ষকের ও বিবিধ শ্রেণীর ছাত্রগণের সহবাসে, এবং কখন বা সুদূর নগর ও রাজধানীর স্বাধীন ছাত্রাবাসে ছাত্রজীবন অতিবাহিত হয়। ইহার কোন স্থানেই আহার বিহারের কঠোরতা নাই, কোন স্থানেই ইচ্ছানুরূপ চলা ফেরার বিশেষ প্রতিবন্ধক নাই, সুতরাং নিতান্ত সাধু-স্বভাব ছাত্র না হইলে ছাত্রজীবনেই চরিত্র-স্খলন হওয়া অসম্ভব নহে।

আজ কাল ছাত্রজীবনের উচ্ছৃঙ্খল স্বাধীনতা দেখিয়া রাজপুরুষেরাও শঙ্কিত হইয়াছেন। অনেকের মুখেই শুনিতে পাই, তাহারা পিতা মাতাকে মানে না, গুরুজনদিগকে সম্মান করে না, বৃদ্ধদিগকে দেখিয়া সঙ্কুচিত হয় না। ইহা সম্পূর্ণ মাত্রায় সত্য হইলে পরিতাপের সীমা থাকিত না! কিন্তু ইহার যতটুকু সত্য তাহাই যথেষ্ট। ইহার জন্য কেবল ছাত্রগণকে দোষী করিতে পারি না, অভিভাবক ও শিক্ষকগণ কিয়দংশে যে ইহার জন্য দায়ী তাহাতে সন্দেহ নাই। যেখানে পিতা মাতা ও অভিভাবক ছাত্রদিগের মঙ্গলামঙ্গলে উদাসীন নহেন, যেখানে শিক্ষক মহাশয়েরা মাসান্তে যেন তেন প্রকারেণ নিরূপিত বেতন উপার্জ্জনের জন্যই ব্যাকুল নহেন, সেখানে এই উচ্ছৃঙ্খলতা পূর্ণ-মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না।

গুরুশিষ্যে মনের মিল না হইলে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা আশানুরূপ ফল প্রসব করে না। আজ কাল গুরুশিষ্যে সময়ে সময়ে হাতাহাতি পর্য্যন্তও হইয়া থাকে। গুরু নিন্দা সেকালে ছাত্রজীবনের মহাপাপ বলিয়া পরিগণিত হইত; এমন কি যেখানে গুরু-নিন্দা হইত, ছাত্রগণ কর্ণে অঙ্গুলি দিয়া সেই স্থান পরিত্যাগ করিবার উপদেশ পাইত। এখন দশ জন ছাত্র একত্র হইলে সর্ব্বপ্রথমেই অধ্যাপকগণের নিন্দা আরম্ভ হয়, এবং কত কি অশ্রাব্য সম্বোধনই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, তাহা লিখিতেও লজ্জা বোধ হয়! ইহাতে অধ্যয়ন ভাল হয় না, উপদেশের ফল ফলে না, এবং অধ্যাপকের জীবন অনুকরণ করিয়া ছাত্রগণ যাহা কিছু উপকার পাইতে পারিত তাহা হইতে বঞ্চিত হয়। কিন্তু ইহার জন্যও ছাত্রগণের সম্পূর্ণ দোষ নাই; অনেক অধ্যাপক যোগ্যতায়, চরিত্রে এবং ব্যবহারে এমন নিকৃষ্ট যে, সাধু-স্বভাব ছাত্রগণও তাঁহাদিগকে আন্তরিক ভক্তি-শ্রদ্ধা প্রদান করিতে পারে না।

এ কালের ছাত্রজীবনে সমালোচনা-বৃত্তির বড়ই অযথা অনুশীলন দেখিতে পাই। যাঁহারা দেশের উজ্জ্বল-রত্ন, যাঁহাদের কার্য্য-কলাপ পরিণত-বয়স্ক ব্যক্তিগণও সমালোচনা করিতে ইতস্ততঃ করেন, সুকুমারমতি বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ অনায়াসে তাঁহাদিগকে লইয়া ক্রীড়া-পুত্তলের মত আলোচনা করিয়া থাকে। ইহার অবশ্যম্ভাবি কুফল এই হইয়াছে যে আত্ম-মর্য্যাদার সঙ্গে পর-মর্য্যাদা-জ্ঞানও অবনত হইয়া পড়িতেছে।

সে কালের ছাত্রগণকে কোন নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিতে হইত না; জীবন-সংগ্রামে

প্রস্তুত হইবার জন্য শিক্ষা-লাভ করিতে হইত বলিয়া শিক্ষাই তাহাদের লক্ষ্য ছিল। আজ কাল কায়-ক্লেশে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই ছাত্রজীবনের লক্ষ্য হইয়াছে; তাহার অনুরোধে ছাত্রগণ শিক্ষা ভুলিয়া পরীক্ষাই নিশিদিন চিন্তা করে। বর্ত্তমান শিক্ষা-প্রণালী ইহার জন্য দায়ী। এই প্রণালী-দোষে বিদ্যালয়-ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ অধ্যয়ন ত্যাগ করে। অসম্পূর্ণভাবে ছাত্রজীবনে যাহা শিখিয়া আইসে সংসারে আসিয়া আলোচনার অভাবে তাহাও ভুলিয়া যায়, এবং পরিণত-বয়সে মূর্খতার সঞ্চিত স্তূপ হইয়া আত্মাভিমানে আপনার নামের পুচ্ছ-স্থানীয় উপাধির বর্ণমালা দেখাইয়া দেয়!

যদি জাতীয়জীবনকে উন্নত করিতে হয়, তবে ছাত্রজীবনকে উন্নত করিতে হইবে। ছাত্রজীবনকে অবহেলা করিলে দেশের দুর্দ্দশা কখনও ঘুচিবে না। ছাত্র-জীবনই দেশের আশা, সমাজের গৌরব, ভবিষ্যৎ বংশের উন্নতির মূল। সেকালের সঙ্গে একালের তুলনা করিয়া দেখ ছাত্রজীবনের বর্ত্তমান অবস্থা কত শোচনীয়!

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

ধৈর্য্য আর বিবেচনা করে যুদ্ধ জয়,
শরীরের ক্ষুদ্র বলে তাহা সাধ্য নয়।

হৃদয়ে সাহস ধর, হও সদাচারী,
হবে পুরুষার্থ লাভ, থাক ধৈর্য্য ধরি।

লোক-মুখে যেই যশঃ শুনিবারে পাই,
প্রায়শঃ তাহার মূলে সত্য কিছু নাই।

রাজ-পদ-সেবিগণ বাজিকর প্রায়,
ধূর্ত্ততায় বুদ্ধিহীন রাজারে ভুলায়।

দেশে অন্তর্যুদ্ধ যেন ভীষণ প্লাবন,
প্রাসাদকুটির তাহে তুল্য নিমগন।

লৌকিক বিশ্বাস যেন কাচের দর্পণ,
বারেক ভাঙ্গিলে যোড়া লাগে না কখন।

সামাজিক নিয়মের করিবে আদর,
কুরীতি হইতে কিন্তু থাকিবে অন্তর।

ধনী প্রতি তোষামোদ, দরিদ্রেতে ঘৃণা,
এ দুই ভীষণ দোষে সুবোধ ডুবে না।

আত্ম-বলে থাকে যার সুদৃঢ় প্রত্যয়,
সর্ব্বকার্য্যে সিদ্ধ-কাম সে হয় নিশ্চয়।

সাহস সদ্‌গুণ বলি গণ্য ততক্ষণ,
যতক্ষণ ন্যায় তার অঙ্গের ভূষণ।

মানব-চক্ষের প্রতি আলোক যেমন,
মানব-চিত্তের প্রতি সন্তোষ তেমন।

—

সুতীক্ষ্ণ বিচার-শক্তি রহিয়াছে যার,
সমুজ্জ্বল অলঙ্কারে কি হইবে তার ?

—

ভাল মন্দ দোষ গুণ না করি বিচার,
প্রশংসা কি নিন্দা-বাদ করিও না কার।

—

ধনরত্ন-বিনিময়ে সন্তোষ কি মিলে ?
এ রতন শোভে শুধু ধার্ম্মিকের গলে।

—

সুগতি দেখিবে যথা, দুর্গতি সেখানে,
সুখ দুঃখ বাঁধা আছে অচ্ছেদ্য বন্ধনে।

—

অলস অশক্ত যারা কার্য্যক্ষম নয়,
তারাই প্রায়শঃ করে ধূর্ত্ততা আশ্রয়।

—

দুঃসাহসে কোন্ কায যদি কেহ করে,
সতত রাখিবে লক্ষ্য তাহার উপরে।

—

যে যায় পদার্থ ছাড়ি ছায়া ধরিবারে,
অবোধ উন্মাদগ্রস্ত লোকে বলে তারে।

—

দিবসের পুরোভাগে প্রথম চিন্তন,
ঈশ্বর-পূজার তরে করিবে অর্পণ।

—

না করিয়া ঈশ্বরেতে আত্ম-সমর্পণ,
মুদিও না রজনীতে নিদ্রার্থ নয়ন।

—

সরল প্রাকৃতদর্শন।

গুরুত্ব। হাতের উপর শ্লেট, বহি, কিম্বা অন্য কোন পদার্থ রাখিলে আমাদের অল্প কি অধিক আয়াস বোধ হয়। মাধ্যাকর্ষণ নিবন্ধন সমুদায় পদার্থই পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হয় ; এই আকর্ষণের প্রতিকূলে একটী তুল্য-বল প্রয়োগদ্বারা পদার্থটীকে হাতের উপর স্থির রাখা হয় ; নচেৎ ভূতলে পড়িয়া যায়। আয়াস এই প্রতিকূল বল প্রয়োগ করা হয় বলিয়াই হইয়া থাকে। আমরা পূর্ব্ব প্রকরণে দেখাইয়াছি যে, আকর্ষণ সারের অনুপাতীয় ; পদার্থ অধিক সারবিশিষ্ট হইলে অধিক বলে আকৃষ্ট হয়, সুতরাং স্থিরভাবে রাখিতে হইলে, ইহার তুল্য একটী প্রতিকূল বল প্রয়োগ করা হয় বলিয়া অধিক আয়াস বোধ হয়। মাধ্যাকর্ষণের প্রতিকূলে স্থির-ভাবে রাখিতে যে পদার্থে যত অধিক আয়াস বোধ হয়, সে পদার্থ তত অধিক গুরু। পদার্থের গুরুত্ব অথবা ভার মাধ্যাকর্ষণের ফল ; মাধ্যাকর্ষণ না থাকিলে পদার্থের ভার থাকিত না। কোন পদার্থের উপর মাধ্যাকর্ষণের ক্রিয়াকে ইহার ভার কহে। যে পদার্থের সার অধিক তাহার ভারও অধিক ; ভার সারের অনুপাতক ; এই নিমিত্ত পদার্থের সার ইহার ভার দ্বারা পরিমিত হয়। জড়-

পদার্থের ভার আমরা তুলাযন্ত্র দ্বারা পরিমাণ করিয়া থাকি; ইহা পরে বিবৃত হইবে। পদার্থের ভার এক সের হইলে, ইহার সারও একসের, ভার দুই সের হইলে, সারও দুই সের, ইত্যাদি এইরূপ কহা যায়।

আপেক্ষিক গুরুত্ব। সম ঘনায়তন ভিন্ন—ভিন্ন পদার্থের ভার তুল্য নহে; জল অপেক্ষা সম ঘনায়তন লৌহ অধিকতর গুরু, সম-ঘনায়তন সীসক আবার লৌহ অপেক্ষা গুরুতর। সাধারণতঃ সম ঘনায়তন বিশুদ্ধ জলের ভারের সহিত অন্যান্য পদার্থের ভারের তুলনা করা হইয়া থাকে। কোন পদার্থের ভারকে সমঘনায়তন জলের ভার দ্বারা ভাগ করিলে, ভাগফলকে এই পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব কহে। পারদের আপেক্ষিক গুরুত্ব ১৩½; ইহার অর্থ এই যে পারদ সমঘনায়তন জল অপেক্ষা ১৩½ গুণ গুরু। এক ঘন ইঞ্চ পারার ভার এক ঘন ইঞ্চ বিশুদ্ধ জলের ভারের ১৩½ গুণ অর্থাৎ ১৩½ ঘনইঞ্চ বিশুদ্ধ জলের ভারের তুল্য। নিম্নে কতকগুলি পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব দেওয়া হইল।

পদার্থের নাম।	আপেক্ষিক গুরুত্ব।
পিত্তল	৭.৮২৪ হইতে ৮.৩৯৬
তাম্র	৮.৯
স্বর্ণ	১৯.২৫
লৌহ	৭.৭৮৮
সীসক	১১.৩৫
পারদ	১৩.৫৮
রৌপ্য	১০.৪৭
ইস্পাত	৭.৮
রাঙ্গ (টিন)	৭.২৯
দস্তা	৭.১
দুগ্ধ	১.০৩২
তিসির তৈল	.৯৯
তার্পিন তৈল	.৮৭
চিনি	১.৬০৬
মোম	.৯৬৪
বিশুদ্ধ সুরা-নির্য্যাস	.৭৯৭
মানবশরীরের শোণিত	১.০৫৩
মাখন	.৯৫২

সংহতি। এক খণ্ড সূতাকে ছিঁড়িয়া দুই ভাগ করিতে নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ বল আবশ্যক। বাস্তবিক সূতার সূক্ষ্ম অংশ সমূহ যে বল দ্বারা পরস্পর আকৃষ্ট, ছিঁড়িতে হইলে (অর্থাৎ কণাসমূহ পৃথক্ করিতে হইলে), তাহা হইতে অধিকতর বিপরীত বল-প্রয়োগ করা আবশ্যক। যে আকর্ষণ দ্বারা কণাসমূহ * পরস্পর আকৃষ্ট তাহাকে সংহতি কহে। দ্বিখণ্ড করিবার সময় প্রযুক্ত-বল এই আকর্ষণের বলের প্রতিকূলে ক্রিয়া করে। সমায়তন একটী লৌহ-তার ছিঁড়িতে সূতার অপেক্ষা অতিশয় অধিকতর বলের প্রয়োজন; অতএব লৌহতারে কণাসমূহের সংহতি সূতার সংহতির অপেক্ষা সমধিক প্রবল। কোন একটী পদার্থ ভাঙ্গিতে কিম্বা নোয়াইতে কিম্বা বাকা করিতে অথবা অন্য কোনরূপ বিকৃত করিতে যে বলের প্রয়োজন হয় তাহা এই সংহতির নিমিত্তই হইয়া থাকে। খড়ি গুঁড়া করিয়া গুঁড়াগুলি একত্র রাখিলে ইহারা পুনরায় পূর্ব্ববৎ একখণ্ড হয় না। ইহা হইতে আমরা দেখিতে পাই যে এই অবস্থায় সংহতি কার্য্যকর নহে। এই অবস্থায় কণাগুলির মধ্যে যে অন্তর রহিয়াছে সেই অন্তরে সংহতির ক্রিয়া হয় না। সমজাতীয় দুইটী কণা নিতান্ত নিকটবর্ত্তী না হইলে পরস্পরের মধ্যে এই সংহতি হয় না। ইহাদের অন্তর নির্দ্দিষ্ট সীমা অতিক্রম করিলে ইহাদের মধ্যে সংহতি থাকে না। খড়ি প্রভৃতি পদার্থে অব্যবহিত সমীপবর্ত্তী অণুসমূহের অন্তর এই সীমা অতিক্রম করে না;

* পদার্থের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অংশকে কণা অথবা অণু কহে।

চূর্ণ অবস্থায় একত্র রাখিলে ইহাদের অন্তর এই সীমা অতিক্রম করে।

জল প্রভৃতি তরল পদার্থে কণা-সমূহের মধ্যে সংহতি অতি অল্প; এই নিমিত্তই আমরা জলের মধ্যে হাত যে দিকে ইচ্ছা সেই দিকে নাড়িতে পারি, এবং অনায়াসে এক বাটী জল দুই তিন বা ততোধিক অংশে বিভক্ত করিতে পারি।

সংহতি না থাকিলে কণা-সমূহ পরস্পর একত্র সংবদ্ধ না থাকিয়া পৃথক্ থাকিত; ইট, কাঠ, লোহা প্রভৃতি পদার্থ সূক্ষ্ম চূর্ণরূপে অবস্থান করিত।

সংসক্তি। কালি কাগজে ও কাপড়ে লাগিয়া থাকে; এই নিমিত্তই আমরা কালি দ্বারা কাগজের উপর লিখিতে পারি। হাতে জল লাগিয়া থাকে, এই নিমিত্তই হাত ভিজে। এই সমুদয় স্থলে ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় নিকটবর্ত্তী কণা সমূহের মধ্যে আকর্ষণ রহিয়াছে। এই আকর্ষণকে সংসক্তি কহে। কচু ও পদ্মের পাতায় জল লাগে না, সুতরাং ইহারা জলে ভিজে না। জল ও এই সকল পাতার কণা সমূহের মধ্যে সংসক্তি নাই। কাগজে আঠা অতি দৃঢ়রূপে সংলগ্ন হয়; কাগজ ও আঠার অণু সমূহের মধ্যে সংসক্তি সমধিক প্রবল।

স্বর্গীয় পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

রজনী হইল শেষ, গগনে উদিল রবি,
তবু কেন অন্ধকার যায় না জগৎ ছাড়ি?
প্রভাতের সমীরণ ভুলিয়া মধুর স্বন,
বেড়ায় উন্মত্তভাবে কেন হায় হায় করি?
কাননে বিহঙ্গ-কুল মধুর সঙ্গীত ভুলি,
মিলি সবে শোক-ভরে কেন করে হাহাকার?
তপন-কিরণ লভি ফুটে না কুসুম কেন?
কেন মহীরুহগণ কাঁদিতেছে অনিবার?

অই যে জাহ্নবী-তীরে দেখরে শ্মশান-ঘাটে,
দহিতেছে বৈশ্বানর কার এ অমূল্য ধন?
ঘেরি কারে চারি ধারে অগণিত নর-নারী
বিলাপে আকাশ পূরি করে অশ্রু বরিষণ?
মনের অমিততেজ, অদম্য স্বাধীন ভাব,
শঙ্কা-শূন্য প্রাণগত বিশ্ব-উপকার-ব্রত,
দয়া, মায়া, গম্ভীরতা, অতুল স্বজাতি-প্রেম;
শ্মশান-অনলে আজ হইতেছে ভস্মীভূত!
সম্মুখে বিরাট-মূর্ত্তি বিশ্বব্যাপী মহাকাল,
মহাদণ্ড করে ধরি করিছে সৎকার যার,
তারি অদর্শনে আজি আঁধার হয়েছে বঙ্গ,
তারি তরে নর-নারী করিতেছে হাহাকার!

কাঙ্গালের তরে যে আঁখি ঝরিত
আজ সে পলক-হীন!
অবলার তরে যে হৃদি গলিত
আজ সে চিতায় লীন!!
অনাথের তরে যে বাহু খাটিত
সুখে দুঃখে চিরদিন;
ছিন্ন-লতা-সম ধূলি-বিলুণ্ঠিত
অসাড় জীবন-হীন!!

২

স্বদেশের তরে প্রাণের ভিতরে
বহিত যে প্রেম-ধারা,
শয়নে স্বপনে, জীবনে মরণে,
ভাসিত যে প্রেমে ধরা
যে প্রেমের নদী শোক-সিন্ধু মাঝে
আঁধারে হইল লীন!
আঁধারের কোলে, নর-নারী মিলে
কাঁদে তাই নিশিদিন!!

৩

কত দিন শত, কত বর্ষ যাবে
কালের সাগরে ডুবে,
বিদ্যার সাগর দয়ার সাগর
আর না ফিরিবে ভবে!
জাহ্নবীর তীরে জ্বলিয়াছে চিতা
শত শিখা জ্বলে তার,
এক মুষ্টি ধূলি হবে পরিণাম
আঁধার হইবে সার!!

৪

শোক তাপ ল'য়ে, আঁধারে লুকায়ে
নীরবে কাঁদিছে ভাষা;
রহিয়া রহিয়া সহিয়া সহিয়া
ফুরায় প্রাণের আশা!
জনম দুঃখিনি! চির-কাঙ্গালিনি!
জননি! জনম ভূমি!
কি দেখ মা চেয়ে, জ্যোতির সাগরে
আঁধারে ডুবিলে তুমি!!

কীর্ত্তির্যস্য স জীবতি।

ভারত-গগন হ'তে খসিল একটী তারা।
বাঙ্গলা-সাহিত্য আজি হইল জনক-হারা॥
কাঁদিছে ভারত আজি বিদ্যাসাগরের তরে।
বিষাদের গাঢ় ছায়া পড়িয়াছে ঘরে ঘরে॥
হায় রে, দুঃখিনী বঙ্গ! একে একে হারাইলি—
যাদের সুনাম-বলে গরবিনী তুই ছিলি!
কে তোর রাখিবে নাম? উজলিবে কেবা মুখ?
কে খাটিবে তোর তরে? কে তোর ঘুচাবে দুঃখ?
বঙ্গ-ভাষা, হায়! তুই হ'লি আজি পিতৃ-হীনা।
লালন পালন তোর কে করিবে পিতা বিনা?
অকালে জনক-হারা হইলি দুঃখিনী বালা!
কে চাহিবে তোর পানে, কে সহিবে তোর জ্বালা
বিদ্যার সাগর তুমি গেলে হে অমর ধাম।
'কীর্ত্তির্যস্য সজীবতি'—হেথায় রহিল নাম॥
খাটিলে পরের তরে, পরার্থে রাখিলে সব।
তুমি শুধু রহিলে না! রহিল সুকীর্ত্তি তব॥

—০:০:০:০:০—

স্বর্গগত

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর।

শোকের তীব্রতায় চক্ষের জল উথলিয়া উঠিতেছে,—আজ কি লিখিব, কি বলিব, তাহার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না! বঙ্গভাষা আজ পিতৃহীন হইয়াছে, কত দীন দুঃখী আজ ঘরে ঘরে হাহাকার করিতেছে, কত অনাথ ছাত্রমণ্ডলী আজ শূন্যদৃষ্টিতে অন্ধকারময় আকাশের দিকে চাহিয়া চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিতেছে,—বঙ্গদেশের রাজধানী হইতে গ্রাম নগর উপনগর ব্যাপিয়া আজ যে জাতীয় হাহাকারের উচ্চরব উঠিয়াছে, বঙ্গভাষার সে শোক-সংবাদ বহন করিবার শক্তি নাই!

সময়ে সকলকেই পৃথিবীর নিকট চিরবিদায় গ্রহণ করিতে হয়। মৃত্যুই জগতের নিয়ম,—তাহার জন্য কাঁদি না। প্রতিদিন যত লোক মৃত্যু-শয্যা আলিঙ্গন করিতেছে তাহাদের জন্য যদি কাঁদিতে হইত, মানবজীবনের অবিশ্রান্ত-ক্রন্দনেও তাহার অবসান হইত না। কাঁদি স্বদেশের মলিন মুখের দিকে চাহিয়া, কাঁদি হতভাগিনী জন্মভূমির শূন্য-কক্ষ দেখিয়া, কাঁদি চিরদুঃখিনী বঙ্গভাষার করুণ বিলাপ শুনিয়া! এ ক্রন্দনের কি কখনও অবসান হইবে? আজ যে রত্ন অতল সলিলে বিসর্জ্জন দিয়া দেশময় বিশ্বব্যাপী ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। জানি না কত দিনে, কত বর্ষে, কত যুগে এই ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি তিরোহিত হইবে! কিন্তু ইহা জানি যে, আজ বঙ্গভূমি যেমন গভীর শোকে আচ্ছন্ন হইয়া সমস্বরে কাতরকণ্ঠে রোদন করিতেছে, এ দেশের একজন মানুষের জন্য মানুষ কখন এমন করিয়া কাঁদে নাই। একদিন সুদূর-সমুদ্র-পার হইতে মহাত্মা রামমোহনের মৃত্যু-সংবাদ আসিলে একদল কাঁদিতেছিল, কিন্তু তাহারই পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আর একদল উপহাসের হাসি হাসিয়াছিল! একদিন ভারত-গৌরব বাগ্মীবর কেশবচন্দ্রের চিতাপার্শ্বে অগণ্য নর-নারী উচ্চ হাহাকার করিয়াছিল, কিন্তু আরও কত অগণ্য লোকে

---

* বিগত ২৪শে শ্রাবণ শনিবার শিক্ষা-পরিচর-সমিতি এবং ছাত্র-সভার সম্মিলিত-যত্নে রাজসাহী কলেজ-গৃহে স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিবার জন্য সাধারণের একটি সভা আহূত হয়। কলেজের প্রিন্সিপাল মহোদয় স্বয়ং সভাপতি হইয়াছিলেন, এবং স্থানীয় গণ্য মান্য সর্ব্বশ্রেণীর লোক উপস্থিত হইয়া মৃত মহাত্মাদিগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়াছিলেন। সে দিন "বড় দুর্দ্দিন গিয়াছে; অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছিল, তথাপি লোকে লোকারণ্য, ৭টা হইতে ১১॥টা রজনী পর্য্যন্ত একটি প্রাণীও সভাস্থল ত্যাগ করে নাই।" মৃত মহাত্মা দ্বয়ের চিত্রিত প্রতিকৃতি রাজসাহী কলেজ-গৃহে স্থাপনের প্রস্তাব সর্ব্ব-সম্মতি-ক্রমে গৃহীত হইয়াছে। উক্ত সভাতে এই প্রবন্ধটি পঠিত হইয়াছিল।

শিঃ পঃ সঃ।

উদাসীনের মত সেই পথ দিয়া চলিয়া গিয়াছে, একবার ফিরিয়াও চাহে নাই! একদিন কৃষ্ণমোহনের জরাপলিত-দেহপঞ্জর ঘিরিয়া স্বদেশ-বন্ধুগণ শোকের পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, কিন্তু সেদিনও এমন করিয়া সর্ব্বব্যাপী শোকের তরঙ্গ উঠে নাই। একদিন স্বনাম-খ্যাত কৃষ্ণদাস পালের চিতাভস্মের সম্মুখে রাজা মহারাজা মিলিত হইয়া শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু সে দিনও এমন করিয়া রাজা প্রজা সমস্বরে কাঁদে নাই! আজ যে মুখের দিকে চাহিতেছি, তাহাতেই বিষাদের কালিমা-রেখা, আজ যাহার সঙ্গে আলাপ করিতে যাইতেছি, তাহার হৃদয় হইতেই শোকের দীর্ঘনিশ্বাস! ধন্য বিদ্যাসাগর! মৃত্যুর অভেদ্য আবরণ ভেদ করিয়াও তোমার পুণ্য-কীর্ত্তি উদিত হইতেছে।

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নাম জানে না, এমন লোক বঙ্গদেশে আছেন কি না জানি না; বিদ্যাসাগরের নিকট সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে উপকৃত নহেন, এমন শিক্ষিত সন্তান বঙ্গভূমিতে আছেন কি না শুনি নাই। সেই জন্যই ত আজ পরলোকগত বিদ্যাসাগরের পবিত্র স্মৃতি লইয়া বঙ্গদেশের নর-নারী হাহাকার করিয়া বেড়াইতেছে। মানব-হস্ত-গঠিত অনেক সুদৃঢ় কীর্ত্তি-স্তম্ভ কালে ধূলি-পরিণত হইয়াছে, কিন্তু এই জাতীয় মহাশোকের কীর্ত্তি-স্তম্ভ ভাষার সঙ্গে, সাহিত্যের সঙ্গে, কবিতার সঙ্গে, সঙ্গীতের সঙ্গে, জাতীয় স্মৃতির সঙ্গে মিশিয়া অনন্ত কালের বক্ষোভেদ করিয়া উচ্চশৃঙ্গে ভবিষ্যৎ বংশের নিকট বিদ্যাসাগরের পুণ্য-নাম অনন্ত জীবনে সঞ্জীবিত করিবে!

বিদ্যাসাগরের পবিত্র জীবনের পুণ্য কথা যথোপযুক্তরূপে লিখিবার অবসর এবং যোগ্যতা আমাদিগের নাই। ইতিহাস তাহা গৌরবের সঙ্গে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত করিবে, চরিতাখ্যায়ক তাহা জীবন্ত ভাষায় বর্ণনা করিবে, বঙ্গদেশের ভবিষ্যৎ পুত্র-কন্যারা তাহা শ্লাঘার সঙ্গে অধ্যয়ন করিবে। আমরা আজ এই জাতীয় শোক-সন্তাপের সময়ে তাঁহার উন্নত-জীবনের প্রধান প্রধান কীর্ত্তি-কথা স্মরণ করিব। অর্থ নাই যে পৃথিবীর বহু-মূল্য প্রস্তর-প্রবালের উচ্চ-সিংহাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপর সেই স্বদেশ-বৎসলের স্বর্গ-প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করি, ক্ষমতা নাই যে আদর্শ ভাষায় সেই আদর্শ জীবনের পবিত্র-কাহিনী মুদ্রিত করিয়া বঙ্গবাসীর ঘরে ঘরে বিতরণ করি। দরিদ্রের চির-সম্বল যাহা, সেই অশ্রু-জল লইয়া আজ জগতের সম্মুখে আসিয়াছি;—যেখানে কোটী-কণ্ঠের করুণ আর্ত্তনাদ নৈশ-গগন বিদীর্ণ করিতেছে, এই ক্ষীণ কণ্ঠের অস্ফুট-রোদন-ধ্বনি সেখানে মিশিয়া যাউক; যেখানে কোটি কোটি নর-নারীর অশ্রু-ধারা মিলিত হইয়া শোকের তুমুল তরঙ্গ উঠাইয়াছে, এই ক্ষুদ্র সমিতির অশ্রু-বিন্দু সেখানে গিয়া মিলিত হউক; বিদ্যাসাগরের ন্যায় পিতা ও অভিভাবক হারাইয়া তাঁহার শোকাকুল পুত্র-কন্যারা যেখানে বসিয়া নীরবে শোকাশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন, আমাদিগের অন্তরের সহানুভূতি সেখানে প্রকাশিত হউক; এবং অমর-কীর্ত্তি-বিভূষিত হইয়া আজ বিদ্যাসাগর যে গৌরব-মণ্ডিত শান্তি-ধামে বিরাজ করিতেছেন, সেখানে যদি আমাদিগের ন্যায় ক্ষুদ্র

হৃদয়ের কল্যাণ-কামনা প্রবেশ করিতে পারে, সেই সর্ব্ব-মঙ্গল-বিধাতার শ্রীপাদ-পদ্মে আমাদিগের হৃদয়-গত কাতর প্রার্থনা উপনীত হউক!

বর্ত্তমান মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল মহকুমার অধীন বীরসিংহ নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় নামক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের বাস ছিল। ঠাকুরদাসের ৭ পুত্র ও ৪ কন্যা, ঈশ্বরচন্দ্র তাহাদের সর্ব্বজ্যেষ্ঠ। এই বীরসিংহ গ্রামে ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিনে বিদ্যাসাগরের জন্ম। আজ তাঁহার বাল্যজীবনের দুঃখদুর্দ্দশার কাহিনী পাঠ করিয়া কেহ অশ্রুবেগ সম্বরণ করিতে পারিতেছেন না; কিন্তু দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত সহ্য করিয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে থাকিয়া বালক ঈশ্বরচন্দ্র যখন ধীরে ধীরে কীর্ত্তি-মন্দিরে আরোহণ করিতেছিলেন, সে দিন তাঁহার কত কঠোর পরীক্ষার দিনই গিয়াছে! যিনি আপাদমস্তক ঋণ-জালে জড়িত হইয়াও দীন দুঃখীর অশ্রু-ধারা মুছাইবার জন্য অনাথ বালক-বালিকার সুশিক্ষা বিধান করিবার জন্য, হতভাগিনী বালবিধবার অন্ন জল আহরণ করিবার জন্য পরিণত-জীবনে প্রতিমাসে নিয়মিতরূপে দেড় হাজার টাকা দান করিতেন; যাঁহার সরল সদয় হৃদয়ের করুণা-ধারা জাতি, ধর্ম্ম, সভ্যতা ও যোগ্যতা বিচার না করিয়া হিন্দু, মুসলমান, অসভ্য পর্ব্বত-কোটরবাসী অর্দ্ধ-উলঙ্গ সাঁওতাল পর্য্যন্ত প্রবাহিত হইত, সেই মহাত্মা বাল্য-জীবনে দিনান্তে একবার ভাল করিয়া অন্ন জল পাইতেন না; এক বেলা স্বহস্তে রন্ধন করিয়া দুই বেলা আহার করিতেন; সপ্তাহান্তে একদিন মৎস্য ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া একদিন ঝোল, পরদিন অম্বল ও তাহার পরদিন সেই পর্য্যুষিত মৎস্য-খণ্ড আহার করিয়া পদ-ব্রজে দূরপথ অতিক্রম করতঃ কলিকাতায় অধ্যয়ন করিতেন;—এই দুঃখ-যন্ত্রণার কাহিনী শ্রবণ করিলে কাহার হৃদয় না বিগলিত হয়? তথাপি ইহাই বুঝি মহাপুরুষের পরীক্ষা; যাহারা এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ না হইতে পারে, যাহারা প্রতিকুল-স্রোতে পড়িয়া আত্ম-বলে সন্তরণ করিয়া উন্নতির কূলে না উঠিতে পারে, পৃথিবীর ইতিহাসে তাহাদের জন্য বুঝি কীর্ত্তি-মন্দিরে স্থান নাই!

বাল্য-শিক্ষা মানব-জীবনকে যেভাবে গঠিত করে, তাহা মানুষের অস্থি মজ্জার সঙ্গে মিশিয়া যায়; সুসংস্কারই হউক আর কুসংস্কারই হউক, সুশিক্ষাই হউক আর কুশিক্ষাই হউক, বাল্য-জীবনে যে বীজ অঙ্কুরিত হয়, পরিণত বয়সে সেইরূপ বৃক্ষ জন্মে, সেইরূপ ফুল-ফল ফলিয়া থাকে। ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনের রহস্য যদি জানিতে চাও, তাঁহার স্বর্গীয়া জননীর দেবীচরিত্র অধ্যয়ন কর, তাঁহার বাল্য-শিক্ষকগণের চরিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত কর। গৃহে আদর্শ-স্বভাবা জননী, বিদ্যালয়ে বঙ্গদেশের বিখ্যাত সাধু-স্বভাব অধ্যাপকগণ এবং আত্ম-হৃদয়ে অধ্যয়নের জন্য অকৃত্রিম যত্ন ও আগ্রহ,—এই কয়েকটি কারণ একত্র মিলিত হইয়া ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্র-জীবনকে মধু-ময় করিয়াছিল। তিনি অধ্যয়নের আনন্দে দারিদ্র্যের কশাঘাত ভুলিয়া যাইতেন; অধ্যাপক ও জনক-জননীর স্নেহে পৃথিবীর অনাদর বিস্মৃত হইতেন। এইরূপ অবিচলিত-

অধ্যবসায়, অকৃত্রিম অনুরাগ, অনবরত পরিশ্রমে ঈশ্বরচন্দ্র কলিকাতা সংস্কৃত কালেজে বিবিধ বিদ্যায় বিভূষিত, হইয়া চিরস্মরণীয় "বিদ্যাসাগর" উপাধি উপার্জ্জন করেন। বিদ্যাসাগর উপাধি নূতন নহে, অনেকেই ইহা বহন করিয়াছেন। কিন্তু ঈশ্বরচন্দ্রের নামের সঙ্গে মিলিয়া এই উপাধি এত গৌরব-মণ্ডিত হইয়াছে যে, গবর্ণমেণ্ট যখন তাঁহাকে "মহামহোপাধ্যায়" নামক সুদীর্ঘ উপাধি প্রদান করিবার জন্য যত্ন করেন, বিদ্যাসাগর বিনীতভাবে তাহা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন।

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা কলিকাতায় মাসিক দশ টাকা বেতনের একটি সামান্য কার্য্য করিতেন। ৫ বৎসর বয়সের সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গ্রাম্য পাঠশালায় প্রবেশ করিয়া ৮ বৎসর বয়সের সময়ে কলিকাতার পাঠশালায় আগমন করেন, এবং ৯ বৎসরের সময়ে সংস্কৃত কালেজে প্রবিষ্ট হন। এত যে সাংসারিক অস্বচ্ছলতা, এত যে দুঃখ-দারিদ্র্যের কশাঘাত, এত যে শারীরিক ক্লেশ, তথাপি এমন এক স্বাধীন আত্ম-মর্য্যাদা সর্ব্বদা প্রাণের মধ্যে জাগিত যে, ঈশ্বরচন্দ্র কখনও পরের গলগ্রহ হন নাই। এই আত্ম-নির্ভরের গুণে তিনি বাল্যজীবনে কত দুঃখ ক্লেশ অতিক্রম করিয়াছিলেন, আবার পরিণত জীবনে সামাজিক নির্য্যাতন এবং ঋণ-ভারও ইহারই গুণে তিনি সহাস্যবদনে একাকী বহন করিয়া মৃত্যুর পূর্ব্বে সর্ব্বজন-পূজনীয় অমর-পদবী লাভ করিয়াছেন। ২১ বৎসর বয়সের সময়ে উপাধি-ভূষিত হইয়া কালেজ পরিত্যাগ করিলেন, সেই সময় হইতেই তাঁহার গুণের পুরস্কারের আরম্ভ হইল। ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের প্রধান পণ্ডিতের পদে মাসিক ৫০৲ পঞ্চাশ টাকা বেতনে নিযুক্ত হইয়া বিদ্যাসাগর অধ্যাপনা কার্য্য আরম্ভ করিলেন। এই কালেজে ইংরেজ সিবিলিয়ানগণ দেশীয় ভাষা শিখিতেন। বিদ্যাসাগর অধ্যাপনা কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াই দেখিলেন বঙ্গভাষায় পাঠ্য পুস্তক নাই, বঙ্গভাষায় গদ্য-সাহিত্যের নিতান্ত শোচনীয় দশা, বঙ্গভাষায় গৌরব করিবার মত লিপি-কৌশল অজ্ঞাত! বিদ্যাসাগর বঙ্গভাষার এই গুরুতর বিঘ্ন বাধা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া স্বীয় উদ্ভাবনী-শক্তি-বলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিলেন। "বেতাল পঞ্চবিংশতি" তাঁহার প্রথম পুস্তক,—তাহার পর বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবিধ রাজ-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া এবং রাজ-কার্য্য পরিত্যাগের পর আপনার বিশ্রাম-ভবনে বসিয়া কত অমূল্য সুন্দর সুন্দর সাহিত্যের অলঙ্কারে বঙ্গভাষাকে সুসজ্জিত করিয়াছেন, তাহা বঙ্গবাসী নর-নারী চিরদিন কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করিতেছে। তাঁহার "বর্ণ পরিচয়" বাঙ্গালা ভাষার প্রথম সোপান, তাঁহার "বোধোদয়" বাঙ্গালা ভাষার জ্ঞান-প্রদীপ, তাঁহার "চরিতাবলী" ও "আখ্যান-মঞ্জরী" বঙ্গভাষার আদর্শ-চরিত-পুস্তক। তাঁহার "শকুন্তলা" পড়িতে পড়িতে বিস্ময়ে পূর্ণ না হইয়াছেন, তাঁহার "সীতার বনবাস" পড়িতে পড়িতে নয়ন-জলে আপ্লুত না হইয়াছেন, এমন পাঠক বঙ্গদেশে নাই। তাঁহার ভাষার সমালোচনা করি এমন ক্ষমতা নাই, তাঁহার পদ-বিন্যাস-প্রণালীর সমুচিত প্রশংসা যে করিব এরূপ যোগ্যতাও নাই। বস্তুতঃ বঙ্গভাষা ভাষা বলিয়া] জগতের নিকট যদি

কখনও মুখ তুলিয়া কথা কহিতে পারে, সে দিনেও সে বিদ্যাসাগরকেই "পিতা" বলিয়া সম্বোধন করিবে!

ক্রমে পদোন্নতি হইতে লাগিল। ১৮৪৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ৮০৲ টাকা বেতনে ফোর্ট উইলিয়ম কালেজের প্রধান কেরাণীর পদ তিনি পাইলেন। ১৮৫০ সালে সংস্কৃত কালেজে ৯০৲ টাকা বেতনে সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইলেন, এবং ১৮৫১ সালে ১৫০৲ টাকা বেতনে সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপাল হইলেন। ১৮৫৫ সালে বর্দ্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও নদীয়া জেলার বিদ্যালয়-সমূহের ইনেস্‌পেক্টার হইয়া কালেজ ও পরিদর্শন উভয় কার্য্যে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতন পাইতে লাগিলেন। ১৮৫৮ সালের শেষে শিক্ষা-বিভাগের ডিরেক্টার সাহেবের কর্কশ ব্যবহারে সহসা এই পদ ত্যাগ করেন। পরিদর্শন-বিবরণীর একস্থান বল পূর্ব্বক পরিবর্ত্তন করার জন্য শিক্ষা-বিভাগের অধ্যক্ষ গর্ডন ইয়ং সাহেব আদেশ করেন; কিছুতেই তাঁহাকে নিরস্ত করিতে না পারিয়া বিদ্যাসাগর তৎক্ষণাৎ পদ-ত্যাগ-পত্র লিখিয়া দেন। তাঁহাকে পুনরায় পদ-গ্রহণের জন্য ছোট লাট সাহেব পর্য্যন্ত বিশেষ অনুরোধ করিয়াছিলেন এবং ৫০০৲ টাকা বেতনের পদ সহসা পরিত্যাগ করা অসঙ্গত বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইবারও চেষ্টা করিয়াছিলেন। বিদ্যাসাগর তদুত্তরে কেবল এই মাত্র বলিয়াছিলেন "আমি অর্থ অপেক্ষা স্বাধীনতাকে অধিক মূল্যবান্ জ্ঞান করি।" কয় জন লোকে দারিদ্র্যের কঠোর কশাঘাত সহ্য করিয়া পরিণত-জীবনে মাসিক ৫০০৲ টাকা বেতনের কার্য্য লাভ করিয়া বিদ্যাসাগরের মত স্বাধীনতার জন্য মুহূর্ত্তে তাহা ত্যাগ করিতে পারে? এই বিস্তীর্ণ বঙ্গ-ভূমে একবার ঘরে ঘরে এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, তাহার পর দেখিব তুমি বিদ্যাসাগরের মনুষ্যত্ব-পূর্ণ স্বাধীন-ব্যবহারের নিকট মস্তক অবনত কর কি না!

বিদ্যাসাগরের সকল কীর্ত্তিই সমান, কোন্‌টির কথা বলিব, কোন্‌টির কথা বলিব না, তাহা নির্ব্বাচন করা সহজ নহে। বঙ্গ-ভাষা ও সংস্কৃত-শিক্ষা বিদ্যাসাগরের নিকট চিরঋণী; উভয় ভাষা শিক্ষার ও উন্নতির জন্য তিনি প্রাণ-পণে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সে চেষ্টা আত্ম-জীবনেই ফলবতী হইতে দেখিয়া গিয়াছেন। শিক্ষা-বিস্তারের জন্য তিনি যে সকল উদ্যোগ ও অনুষ্ঠান করিয়াছেন, যে সকল শারীরিক মানসিক শ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিয়া আসিয়াছেন, তাহাও সফল হইয়াছে। স্ত্রী-শিক্ষা, পাঠশালার সংস্কার, বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত শিক্ষার উন্নতি এবং সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় কীর্ত্তি মেট্রোপলিটেন কালেজ, তাঁহার উজ্জ্বল কীর্ত্তি-স্তম্ভ। ১৮৫৯ সালে ট্রেনিং স্কুল নামে কলিকাতায় একটী ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। স্থাপনাবধিই বিদ্যাসাগর তাহার একজন পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। কাল-ক্রমে অন্যান্য সাহায্যকারীগণের উৎসাহ যখন শিথিল হইতে লাগিল, তখন বিদ্যাসাগর সেই গুরুভার আপন স্কন্ধে তুলিয়া লইলেন এবং ১৮৭১ সাল হইতে "মেট্রোপলিটেন ইন্‌ষ্টিটিউসন" নাম দিয়া

দেশীয় লোকের অধ্যাপনায় ইংরেজী সর্ব্বোচ্চ শিক্ষা প্রদান করিবার জন্য বিদ্যাসাগরের কালেজ প্রতিষ্ঠিত হইল। প্রতিষ্ঠার দিনে কত লোকে কত কথা বলিয়াছিলেন, দেশীয় লোকের অধ্যাপনায় কখনও উচ্চ-শিক্ষা প্রদান করা সম্ভবপর হইবে না বলিয়া কত গণ্য-মান্য লোকে ভয় দেখাইয়াছিলেন। কিন্তু জাতীয় গৌরব উজ্জ্বল করিবার জন্য, জাতীয় কলঙ্ক অপনোদন করিবার জন্য, সে সকল কথায় বিদ্যাসাগর কর্ণ-পাত করেন নাই। এখন তাঁহার কালেজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্বাধীন কালেজ হইয়াছে; তাঁহার আদর্শ দেখিয়া দেশের মধ্যে বহুতর স্বাধীন কালেজ সংস্থাপিত হইতেছে, এবং কালে গবর্ণমেণ্ট উচ্চ-শিক্ষা তুলিয়া দিলেও যে বঙ্গবাসীগণ উচ্চ শিক্ষার অভাবে হাহাকার করিবে না, বিদ্যাসাগর হাতে কলমে তাহার শিক্ষা প্রদান করিয়া অমর-ধামে গমন করিয়াছেন।

সমাজ-সংস্কারের অভাবে যত দুর্নীতি সমাজের মধ্যে অন্তঃ-সলিলা ফল্গু নদীর মত প্রবাহিত হইতেছে, বালিকাবিধবার মর্কট ব্রহ্মচর্য্য * তাহার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। শাস্ত্রের দোহাই দিয়া আজীবন বাল-বিধবাকে কঠোর ব্রহ্মচর্য্যের শৃঙ্খলে বলপূর্ব্বক বাঁধিয়া রাখার নিষ্ঠুরতা এ দেশে এতই প্রবল যে, একাদশীর দিনে হৃদয়বান্ লোক সহাস্য-মুখে আহার করিতে পারেন না! পঞ্চাশৎ বৎসরের পিতা পত্নী-বিয়োগে কাতর হইয়া অশৌচ অন্তেই পুনরায় দার-পরিগ্রহ করিবেন কি না বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন! তাঁহার গৃহেই পঞ্চদশ বর্ষীয়া বিধবা কন্যা নীরবে রোদন করিতেছে!! সন্তান সন্ততির জনক হইয়া পঞ্চাশৎ বৎসর বয়সেও যাহা সহ্য করিতে বৃদ্ধ ইতস্ততঃ করেন, সেই কঠোর ব্রহ্মচর্য্য পালন করিবার জন্য বালিকা-বিধবাকে সমাজের তপ্ত-লৌহ-কটাহে বল পূর্ব্বক জীয়ন্তে দগ্ধ করা কত শোচনীয় সামাজিক দুর্নীতি, তাহা সকলেই বুঝি! কিন্তু সমাজ? তাহার উচ্চ-শির দেখিয়া ভয়ে মুখে কথা সরে না, তাঁহার উৎপীড়ন-কারী শাসন-দণ্ড দেখিয়া আতঙ্কে সহৃদয়তা শুকাইয়া যায়; মনে মনে বুঝিলেও মুখে বলিতে পারি না; মুখে বলিবার সাহস হইলেও কার্য্যে পরিণত করিতে একেবারেই

* ব্রহ্মচর্য্যের কোন অপরাধ নাই। আদৌ বালিকাবিধবা হইতে পায় কেন? যে দাম্পত্যের কিছুই জানে না, তাহার ঘাড়ে ব্রহ্মচর্য্যের গুরু ভার কেন? সামাজিক কোন মঙ্গল-বিধানে একটি কুফল ফলিলে তাহার প্রতিবিধান কর্ত্তব্য, তাহার মূলোচ্ছেদ উচিত নহে। যদি ব্রহ্মচর্য্যের স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য দেখিতে চাও, তবে বালিকা যাহাতে বিধবা না হয় তাহাই কর, এবং পুরুষকে সংযত, সংস্কৃত, ব্রহ্মচর্য্য-পরায়ণ কর। পঞ্চাশৎ-বর্ষীয় পুরুষ বিবাহ করিতেছে, সুতরাং বিধবা ব্রহ্মচারিণী হইবে কেন;—তুমি চুরি করিতেছ, সুতরাং আমি সাধু হইয়া থাকিব কেন? এরূপ তর্ক খুব উচ্চ নীতির অনুমোদিত নহে। যাহা হউক, বিদ্যাসাগর যে দয়ার সাগর ছিলেন, বিধবার বৈধব্য মোচনের প্রয়াস তাঁহার অন্যতম প্রমাণ।

"বালবিধবার জন্য বিবাহের দ্বার উন্মুক্ত হইলে পুত্র পৌত্রবতী প্রৌঢ়া বিধবাও যে নিশ্চেষ্ট থাকিবে না, বর্ত্তমান সময়ের কোন কোন ঘটনা দর্শন করিয়া সংস্কারকদিগের চক্ষুঃ সে বিষয়েও প্রস্ফুটিত হওয়া উচিত।"

শিঃ পঃ সঃ।

অক্ষম! সুশিক্ষিত সুমার্জ্জিত উপাধি-ভূষিত স্বাধীনতা-প্রিয় বর্ত্তমান সমাজ-পতি গণেরই এই দশা,—আর ৪০ বৎসর পূর্ব্বে যখন বিদ্যাসাগর প্রথমে এই সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে দণ্ডায়মান, তখনকার অবস্থা একবার কল্পনা কর দেখি! মহা-পুরুষদিগের একটি প্রধান লক্ষণ এই যে, যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবেন মুখে সেইরূপ বলিবেন; যাহা সত্য বলিয়া প্রচার করিবেন তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পশ্চাৎপদ হইবেন না। সুতরাং বিদ্যাসাগর কাহারও ভ্রূকুটির দিকে না চাহিয়া সত্যের বিমল-জ্যোতিকে চক্ষের সম্মুখে রাখিয়া বীর-প্রতাপে অগ্রসর হইলেন। তাঁহার বিধবা-বিবাহ-বিষয়ক পুস্তক দেশের মধ্যে তুমুল আন্দোলন উঠাইল, তাঁহার যত্ন-চেষ্টায় আইন বিধি-বদ্ধ হইল, এবং তাঁহার ভবনে, তাঁহার পরিবারে, তাঁহার পুত্রের বিধবা-বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গেল। পদাহত কাল-সর্পের ন্যায় হিন্দু-সমাজ গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, সে ভীষণ গর্জ্জন শুনিয়া সভয়ে বন্ধুগণ দূরে পলায়ন করিলেন। একাকী বিদ্যাসাগর সমাজ-চ্যুত, বিপর্য্যস্ত, উৎ-পীড়িত এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়া অচল অটল হিমালয়ের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। সে তুমুল সমাজ-বিপ্লবে বিদ্যাসাগরের ৮০ হাজার টাকা ঋণ হইয়াছিল, তাহা একাকী আজীবন ভরিয়া কষ্ট সঞ্চিত অর্থ দ্বারা পরিশোধ করিয়াছেন; কপটাচারী ধনি-সন্তানগণের সাহায্য গ্রহণ করিয়া উচ্চ-উদ্দেশ্যকে কলুষিত করেন নাই! দশ জনে চারি দিক্ হইতে হাত তুলিয়া যখন প্রশংসা করিতে থাকে, বিপদে না পড়িতে সহস্র বাহু আসিয়া যখন উদ্ধার করিবার জন্য ব্যাকুল থাকে; যে দিকে চাই সেই দিকেই সহানুভূতির অনুকূল পবন যখন বহিতে থাকে, তখন কোন দেশ-হিত-কর সদনুষ্ঠানে তুমি আমিও যোগ দিতে পারি; আবশ্যকমত যোগ দিয়াও আসিয়াছি। কিন্তু প্রতিকূল-স্রোতের মধ্যে দাঁড়াইয়া, ঘৃণা, নিন্দা, অপমান, নির্য্যাতন, মৃত্যু-শঙ্কা পর্য্যন্ত মস্তকে ধারণ করিয়া; একমাত্র সত্যের দিকে, ঈশ্বরের দিকে, আত্ম-হৃদয়ের কর্ত্তব্য-বুদ্ধির দিকে চাহিয়া সংকল্পিত কার্য্যে অগ্র-সর হইতে কেবল মহাপুরুষদিগেরই অধি-কার। এই খানে আসল এবং নকলের অগ্নি-পরীক্ষা। বিদ্যাসাগর এই কঠোর অগ্নি-পরীক্ষায় গৌরবের সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়া-ছেন বলিয়াই তাঁহার চরিত্র এত উজ্জ্বল!

বিধবা-বিবাহের ন্যায় বহু বিবাহও এদেশের আর একটি শোচনীয় সামাজিক কলঙ্ক। একজন পুরুষ শতাধিক বিবাহ করিলে যে কি কুফল ফলে, আজ আর তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। বিদ্যা-সাগরের বহুবিবাহ-বিষয়ক গ্রন্থ দেশের মধ্যে এই কুরীতির কুকীর্ত্তি এমন করিয়া প্রচার করিয়াছে যে, যদিও প্রতিকূল ঘটনাচক্রে পড়িয়া বিদ্যাসাগর বহুবিবাহ-সম্বন্ধে আইন বিধি-বদ্ধ করাইতে পারেন নাই, তথাপি এই কুরীতি ধীরে ধীরে সমাজ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া যাইতেছে।

পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যাসাগর বিদ্যার গৌরবে গৌরবান্বিত; ঐতিহাসিকের নিকট তিনি স্বদেশ-হিতৈষী সমাজ-সংস্কারক বলিয়া উচ্চ সম্মানের অধিকারী; শিক্ষা-বিভাগের

নিকট তিনি অদ্বিতীয় জাতীয়-শিক্ষক বলিয়া চিরদিন সুপরিচিত। কিন্তু মূর্খ, দরিদ্র, অসভ্য, বন্য সাঁওতাল পল্লীতে আজ একবার দেখিয়া আইস; সেখানে বালক-বালিকা, স্ত্রী-পুরুষ, সকলে মিলিয়া কি হৃদয়-ভেদী উচ্চ হাহাকার তুলিয়াছে! তাহারা যে গুণে মুগ্ধ হইয়া সভ্য-জগতের সঙ্গে সম-স্বরে রোদন করিতেছে, তাহার নাম দয়া। তাহাদের নিকট বিদ্যাসাগর "দয়ার সাগর" বলিয়া পরিচিত। বিদ্যাসাগরের দয়ার পরিচয় দিতে হইলে একখানি স্বতন্ত্র পুস্তক লিখিতে হয়, অথচ তাঁহার দয়া লোক-চক্ষুর অগোচরে গোপনে গোপনে পরদুঃখ বিমোচন করিত! আজ কাল বার্ষিক ৪০ হাজার টাকা তাঁহার আয় হইয়াছিল; ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ দয়া-বৃত্তির চরিতার্থতায় ব্যয়িত হইত। দেশের কোন্ রাজা এত দান করিয়াছেন? শুধু দানে দয়ার পরিচয় হয় না। অনেকে রাজসম্মান-পাইবার প্রত্যাশায় লুব্ধ হইয়া দান করে, কেহ বা সমাজে প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য অনিচ্ছাসত্বেও দান করিতে বাধ্য হয়; বিদ্যাসাগরের দান সে শ্রেণীর ছিল না। দরিদ্রের দুঃখকষ্ট দেখিলে দুঃখ-যন্ত্রণার ইতিহাস পাঠ করিলে দরবিগলিত ধারায় তাঁহার নয়ন-জল বহিয়া পড়িত; বালকের ন্যায় পর-দুঃখে বিদ্যাসাগর উচ্চ-চিৎকার করিয়া কাঁদিতেন। তাই অন্ন-কষ্টের কথা শুনিলে সেখানে অন্ন-ভাণ্ডার খুলিতেন, পীড়িতের আর্ত্ত-নাদ শুনিলে ঔষধ পথ্য লইয়া দুঃখীর কুটীরে গিয়া মলমূত্র পর্য্যন্তও কত সময়ে স্বহস্তে পরিষ্কার করিতেন, অনাথ ছাত্রগণের দুর্দ্দশার কথা শুনিলে প্রাণপণে অর্থ, পুস্তক ও শিক্ষার ব্যয় প্রদান করিতেন। ইহাতে জাতি-ধর্ম্মের বিচার ছিল না;— তাঁহার উদার-হৃদয়ে সে সংকীর্ণতা কখনও প্রবেশ করিতে পারে নাই। যাঁহারা বিখ্যাত বাহাত্তুরে মন্বন্তরের সময়ে বীরসিংহ ও চতুঃ-পার্শ্বস্থ গ্রামগুলি দেখিয়াছেন, তাঁহারা জানেন যে বিদ্যাসাগরের কৃপায় ঐ সকল স্থানের নর-নারী একদিনের জন্যও উপবাস করে নাই; যাঁহারা বর্দ্ধমানের মারীভয়ের সময়ে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা দেখিয়াছেন ঔষধ পথ্য ও চিকিৎসক লইয়া "দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর" ঘরে ঘরে পর্য্যটন করিয়া বেড়াইয়াছেন, এবং দুর্ভিক্ষের সময়ে অন্ন ব্যঞ্জন লইয়া কলিকাতার গোলদিঘিতীরে স্বহস্তে দীন দুঃখীকে পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়াছেন। কয়জনকে দরিদ্রের জন্য শরীর-মন ও অর্থ দিয়া এমন করিয়া খাটিতে দেখিয়াছ?

যশস্বী আজ যশের মন্দিরে উচ্চ সিংহাসনে বসিয়া শোকাকুল স্বদেশবাসিগণের আর্ত্ত-নাদ শুনিতেছেন; তাঁহার পুণ্য-নাম লইয়া আজ ঘরে ঘরে আলোচনা হইতেছে, হিংসা বিবাদ ভুলিয়া আজ হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান সমস্বরে তাঁহার জন্য কাঁদিতেছে;— ইহা অপেক্ষা উচ্চ স্বর্গ কোথায়? স্বর্গ-গত বিদ্যাসাগরের চিতাভস্মে পবিত্র-সলিলা ভাগীরথী ধন্য হইয়াছে, তাঁহার ন্যায় সুকৃতী সন্তান বক্ষে ধরিয়া বঙ্গভূমি কৃতার্থ হইয়াছে; তাঁহার পবিত্র মূর্ত্তি যাঁহারা জীবনে একবারও দর্শন করিয়াছেন, তাঁহারা আজ উদ্দেশে প্রীতি ও ভক্তির সঙ্গে তাঁহাকে প্রণাম করিতেছেন।

গত ১৩ই শ্রাবণ মঙ্গলবার রজনী দুই ঘটিকা ২২ মিনিটের সময়ে কলিকাতাস্থ নিজ ভবনে বিদ্যাসাগরের অমর আত্মা অমৃতধামে চলিয়া গিয়াছে। সে শোকের রজনী প্রভাত হইয়াছে, কিন্তু বিদ্যাসাগরের অভাবে বঙ্গভূমি যে আঁধারে ঢাকিয়া পড়িল, বহু বৎসরেও তাহার অবসান হইবে না!

শিক্ষা ও সংবাদপত্র।

বাল্যকাল শিক্ষার কাল। বাল্যকালে আমরা ভাল মন্দ যাহা কিছু শিখি, সমুদায় জীবন তাহার ফলাফল উপভোগ করিতে হয়। এই জন্য সভ্যজাতিমাত্রেই শিক্ষা-বিষয়ে নানাবিধ সদুপায় উদ্ভাবন করিয়া থাকে। বালক-বালিকাগণের শিক্ষা যে কেবল বিদ্যালয়ের কয়েক ঘণ্টার অধ্যাপনার উপরই সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাহা নহে। তাহাদের শিক্ষার ফলাফলের জন্য পিতামাতা, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় প্রতিবেশী, শিক্ষক অভিভাবক এবং অল্লাধিক পরিমাণে সমাজের সকল লোকেই দায়ী। এরূপ অবস্থায় বর্ত্তমান সময়ে আমাদের দেশের সংবাদপত্রগুলিও যে বালক-বালিকার শিক্ষার উপর স্বতঃপরতভাবে কথঞ্চিৎ হস্তক্ষেপ করিতেছে না তাহা কেমন করিয়া বলিব? সংবাদপত্র সমাজের মধ্যে অলক্ষ্যভাবে অনেক শিক্ষা প্রচার করিয়া থাকে, সুতরাং বালক-বালিকাদিগের মধ্যে যে কিয়ৎপরিমাণে সেই শিক্ষা প্রবেশ লাভ করিতেছে তাহাতে সন্দেহ কি? এখন জিজ্ঞাসার কথা এই যে, আমাদের বালক-বালিকাদিগকে সংবাদপত্র পাঠ ও আলোচনা করিতে দেওয়া উচিত কি না? চিন্তাশীল অভিভাবক, শিক্ষক ও পিতামাতা এই গুরুতর প্রশ্নটি নিজে নিজে আলোচনা করিয়া, ভাল মন্দ বিচার করিয়া, সুফল কুফল তুলনায় সমালোচনা করিয়া এই প্রশ্নের মীমাংসা করিলেই ভাল হয়। তথাপি আমাদিগের নিকট এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া কর্ত্তব্যবোধে আমরা যথাসাধ্য উত্তর দিতে অগ্রসর হইলাম।

সংবাদপত্র যে লোক-শিক্ষার নিদান এবং দেশ-কাল-বিশেষে এই শিক্ষার প্রসর যে অনেকদূর বিস্তৃত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই অবগত আছেন। বালক-বালিকাদিগকে সংবাদপত্র পড়িতে দেওয়া উচিত কি না, তাহা মীমাংসা করিবার পূর্ব্বে সংবাদপত্রের শিক্ষা কিরূপ, তাহা বালক-বালিকাদিগের উপযোগী কি না, এবং তাহাতে শিশু-জীবনে সুফল কি কুফল ফলিবার সম্ভাবনা, আগে তাহার মীমাংসা করা উচিত। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করিবার পূর্ব্বেই বলিয়া রাখি যে, সর্ব্বথা বালক-বালিকাদিগের উপযোগী ও কল্যাণকর সংবাদপত্র থাকিলে তাহা পাঠ করিয়া যে তাহারা উপকৃত হইবে, তাহাতে আমাদের সন্দেহ নাই, এবং সংবাদপত্র মাত্রই যে তাহাদের অপাঠ্য, ইহা আমরা স্বীকার করি না।

আজ কাল সাধারণতঃ সংবাদপত্র যে সকল বিষয় আলোচনা ও সর্ব্বদা যাহা লইয়া বিবাদ বিসম্বাদ করিতেছে, তাহাতে দেশের মধ্যে কয়েক শ্রেণীর শিক্ষা প্রচারিত হইতেছে। প্রথমতঃ সংবাদপত্র মাত্রেই সমালোচনা প্রিয়, পরকার্য্য সমালোচনা করা এবং অযাচিতভাবে নিন্দা-প্রশংসা বিতরণ করাই তাহার জীবনের ব্রত হইয়াছে। অনেক স্থলেই দেখা যায় যে, একটি বিশেষ কার্য্য দেখিয়া সাধারণ সিদ্ধান্ত প্রচার করা

হইয়া থাকে। ইহা ন্যায়শাস্ত্রের নিকট হেয় হইতে পারে, কিন্তু সংবাদপত্রের ইহাই প্রাণ! এই সমালোচনাস্ত্র-নিক্ষেপের পাত্রাপাত্র নাই, দেশের যত বড় লোকই হউন না কেন, এই সমালোচনার হাত হইতে কাহারও মুক্তি নাই। এই সমালোচনায় রাজনৈতিক জগতে কিছু কিছু উপকার হইলেও সাধারণ লোকের মনে গণ্যমান্য লোকের উপর শ্রদ্ধার হ্রাস হইয়া থাকে। মানুষ সম্পূর্ণ জীব নহে, যিনি যেমন উদারচেতাই হউন, তাঁহার মধ্যেও অনুদারতা থাকিতে পারে। সংবাদপত্র সময়ে সময়ে সেই সকল তিল-প্রমাণ দোষ তাল-প্রমাণ করিয়া বর্ণনা করিতে ত্রুটি করে না। সংবাদপত্র পাঠ করিলে এই শ্রদ্ধা-হীনতা ও ন্যায়-বিগর্হিত সমালোচনা-প্রবৃত্তি কিয়ৎপরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। আমাদের বিবেচনায় বালকগণকে এই শ্রেণীর শিক্ষা হইতে দূরে রাখা প্রয়োজন।

যাহার যাহা কর্ত্তব্য সে যদি তাহা না করিয়া অন্য কার্য্য করে, জগতে বিশৃঙ্খলার সীমা থাকে না। বহুদর্শী বৃদ্ধদিগের উপর সমাজের মঙ্গলামঙ্গলের ভার চিরদিনই রহিয়াছে, তাহার ভাল মন্দ সমালোচনার ভারও তাঁহাদের হস্তে থাকাই প্রার্থনীয়। বালকগণকে সেই সকল অনধিকার চর্চ্চার মধ্যে প্রবেশ করিতে দিলে তাহাদের চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হইতে পারে। বৃদ্ধেরা চিত্তসংযম করিতে সক্ষম, বিক্ষিপ্ততা উপস্থিত হইলেও সহজেই তাঁহারা প্রকৃতিস্থ হইতে পারেন। কিন্তু বালকগণের চিত্ত-বিক্ষেপ উপস্থিত হইলে যে কত অনিষ্ট হয়, তাহা একমুখে বলা যায় না। সংবাদপত্র পাঠকদিগের মনে এই বিক্ষিপ্ততা আনয়ন করে বলিয়া আমরা বালকদিগকে ইহা হইতে দূরে রাখিতে ইচ্ছা করি।

দ্বিতীয়তঃ সংবাদপত্রে যে সকল বিষয়ের আলোচনা হইয়া থাকে, তাহার সকল গুলিই যে রুচি, ভাষা ও বিষয় সম্বন্ধে বালকদিগের উপযোগী, তাহা বলা যাইতে পারে না। সংবাদপত্র বালকদিগের মনে সুশিক্ষা বিস্তার না করিয়া অনেক সময়ে কুশিক্ষাই বিস্তার করে। আমরা দেখিয়াছি, একখানি সংবাদ-পত্রে শিক্ষার উপযোগী সযত্ন-লিখিত সুরুচি-সম্পন্ন দশটি প্রবন্ধ থাকিলেও বালকগণ তাহার একটিও আদ্যোপান্ত পড়ে না; কিন্তু তাহার নিভৃত এক পার্শ্বে যদি রঙ্গ-রস বা সুরুচি-বিরুদ্ধ কিছু দেখিতে পায়, তাহা কণ্ঠস্থ করিয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, সর্ব্বদা রুচি-সম্মত পাঠ্য পুস্তক পড়িতে পড়িতে রুচি-বিরোধী সাহিত্যের জন্য বালকগণের উৎসাহ ও কৌতূহল জন্মে। আমাদের দেশের সংবাদপত্র যখন রুচি বিষয়ে এখনও মার্জ্জিত হইতে পারে নাই, তখন শিক্ষার্থীদের হাতে তাহা প্রদান না করাই যেন অধিকতর বুদ্ধিমানের কার্য্য।

শিক্ষালাভ করা সহজ কথা, শিক্ষা প্রদান করা বড়ই কঠিন। দুঃখের বিষয় এই যে, যাঁহারা আজ কাল সংবাদপত্র প্রচার করিয়া লোক-শিক্ষা বিধান করিতেছেন, তাঁহাদের মধ্যে অনেকেরই এখনও শিক্ষা-প্রদান-কার্য্য স্থগিত রাখিয়া স্বয়ং শিক্ষালাভ করা প্রয়োজন। সপ্তাহে সপ্তাহে মাসে মাসে সংবাদ-পত্র-স্তম্ভে যে সকল গরল-রাশি শিক্ষা নামে উদ্গীরিত হয়, লেখকগণ সুশিক্ষিত হইলে

সেরূপ কখনও হইতে পারিত না। প্রায় প্রতি সপ্তাহের সংবাদপত্রেই এমন অনেক কথা থাকে, যাহা লেখকগণও পিতাপুত্রে একত্র বসিয়া পাঠ করিতে পারেন কি না সন্দেহ! সেই সকল গরল-রাশি অপরিপক্ক-মতি, বালক-বালিকাদিগকে পান করাইলে যে পরিণাম-ফল অশুভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই গুরুতর প্রশ্নের মীমাংসা অভিভাবকগণ আপনারা করিলেই ভাল হয়, আমরা সংবাদপত্রের নিরপেক্ষ সমালোচনা করিতে পারি না। যদি নিতান্তই বালকদিগকে সংবাদপত্র পড়িতে দেওয়া কেহ আবশ্যক জ্ঞান করেন, তাহা হইলে বালকদিগের উপযোগী সংবাদপত্রই তাঁহারা যাহাতে পাঠ করে সে দিকে দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। আমরা বেশী কিছু বলিব না; পিতা মাতা অভিভাবক ও শিক্ষক মহাশয়দিগের নিকট বিনীত অনুরোধ, তাঁহারা পরীক্ষা-স্থলে একবার যদি অনুসন্ধান করেন তাঁহাদের অধীনস্থ বালকেরা কোন্ শ্রেণীর সংবাদপত্র গোপনে ও প্রকাশ্যে পাঠ করিয়া থাকে, তাহা হইলে আমাদিগের কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। যদি বাস্তবিকই এ বিষয়ে কাহারও মত-দ্বৈধ থাকে, আমরা জানিতে পারিলে বারান্তরে বিস্তৃত আলোচনা করিতে প্রস্তুত রহিলাম।

রাম ও যদু।

ঈশ্বর সৎলোকের সহায় এবং অসৎ লোকের শাস্তিদাতা। কোন এক গ্রামে রাম ও যদু নামে দুইটি বালক ছিল। তাহারা উভয়ে এক গুরুর নিকট লিখাপড়া করিত। রাম ভালরূপে পড়া শিক্ষা করিত, গুরুমহাশয় তাহাকে যাহা বলিতেন সে তাহাই করিত, সকলের সহিত সদ্ব্যবহার করিত, কখনও মিথ্যা কথা বলিত না, কাহারও সহিত ঝগড়া করিত না, পড়ার সময় খেলিত না, এবং সমর্থ থাকিলে কখনও পাঠশালায় অনুপস্থিত হইত না। গুরুজনেরা তাহাকে যাহা করিতে নিষেধ করিতেন, সে কদাপি তাহা করিত না। সুতরাং সে সকলেরই প্রিয় ছিল। কেবল যদুর ন্যায় লোকে তাহাকে ভালবাসিত না। যদু সর্ব্বদা তাহার অনিষ্ট করিতে সচেষ্ট থাকিত। সে অনেক সময় রামের কুৎসা করিয়া লোকের নিকট নানা কথা প্রচার করিত, কিন্তু তাহাতে তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইত না—অনেকেই তাহার কথা বিশ্বাস করিত না। যদুর এইরূপ করিবার অনেকগুলি কারণ ছিল। যদু লিখাপড়া করিত না, বিদ্যালয় হইতে বাড়ী যাইয়া পুস্তক কোথায় ফেলিয়া রাখিত, তাহার স্থির থাকিত না, পর দিন পাঠশালায় যাইবার সময় আর তাহা খুঁজিয়া পাইত না; সুতরাং বিদ্যালয়ে যাইয়া পড়া দিতে না পারায়, গুরুমহাশয়ের ভৎর্সনা ও প্রহার সহ্য করিতে হইত। সে বাড়ীতে 'আদুরে যাদু' ছিল না। বাড়ী হইতে বিদ্যালয়ে যাইবার জন্য গুরুজনেরা বিশেষ তাড়না করিতেন; সুতরাং যদু বাড়ী হইতে পুস্তক লইয়া পাঠশালায় রওয়ানা হইত। কিন্তু

অনেক সময় স্কুলে না যাইয়া পথে পথে খেলা করিত, গাছে গাছে উঠিয়া ফল খাইত, ফুল ছিঁড়িত, ও পাখীর বাসা ভাঙ্গিত; এবং পক্ষীর ছানা ও ডিম্ব নষ্ট করিয়া আপনার নিষ্ঠুর ক্রীড়ার উপসংহার করিত। তাহার এই সমস্ত কার্য্যে রাম সময় সময় গুরুতর অন্তরায় হইয়া পড়িত। যদু যাহা যাহা করিত রাম তাহার অনেকই জানিতে পারিত এবং পাঠশালায় গুরুমহাশয় কিম্বা বাড়ীতে যদুর অভিভাবক রামকে জিজ্ঞাসা করিলে, রাম তৎক্ষণাৎ সমস্ত বলিয়া দিত। সুতরাং বাধ্য হইয়া, এই সমস্ত আমোদ ত্যাগ করতঃ যদুকে পাঠশালায় যাইতে হইত। এইজন্য যদু রামকে পরম শত্রু মনে করিত। যদু রামকে, বিনীত ভাবে, উগ্রভাবে, নানারূপে বলিয়া ও তাহার হাত হইতে রক্ষা পাইতে পারিত না, সুতরাং সর্ব্বদা তাহার অপকারের চেষ্টায় থাকিত।

একদিন স্কুল হইতে ছুটির অনেক পূর্ব্বে যদু বিদায় লইয়া আসিয়া পথে বালুকাময় একস্থানে সুতীক্ষ্ণ কতকটা খর্জ্জুর-কণ্টক গুপ্তভাবে ঊর্দ্ধমুখে পুতিয়া রাখিয়াছে। তাহার উদ্দেশ্য, আসিবার সময় ঐ অদৃশ্য কণ্টকগুলি রামের পায়ে বিদ্ধ হইবে। যদু তাহার পরম শত্রুর শাস্তি দেখিবার জন্য গুপ্ত ভাবে একটা ঝোপের আড়ালে বসিয়া ছিল। ইতি মধ্যে ঐ ঝোঁপ হইতে একটা আরণ্য জন্তু গেংড়াইয়া উঠে। তাহা শুনিয়া যদু ভয়ে বিহ্বল হয় এবং আত্মরক্ষার্থে প্রাণপণে দৌড়িতে আরম্ভ করে। সে এত ভীত হইয়াছিল যে তাহার পা যে কোথায় ফেলি-তেছে তাহা আর সে দেখিতেছে না। যে জন্য এতক্ষণ সে প্রতীক্ষা করিতেছিল তাহাও সে ভুলিয়া গিয়াছিল, সুতরাং সে নিজে যে সমস্ত কণ্টক পুতিয়া রাখিয়াছে তাহার কথাও—তাহার মনে ছিল না। ঐ রাস্তা দিয়া যাইতে হঠাৎ উহার একটি কাঁটা আমূল তাহারই পায়ে বিদ্ধ হইল। যদু অমনি বসিয়া পড়িল। এমন সময় রাম ঐ পথে আসিয়া উপস্থিত হইল। যদুর অবস্থা দেখিয়া রামের দয়া হইল। রাম কণ্টক ধরিয়া জোরে —আকর্ষণ করায় তাহা বাহির হইল এবং তৎক্ষণাৎ ক্ষত স্থান হইতে তীর-বেগে রক্ত ছুটিল ও চতুর্দ্দিকস্থ স্থান রঞ্জিত করিয়া ফলিল। ইহা দেখিয়া যদু অস্থির হইয়া পড়িল। তখন রাম তাড়াতাড়ি স্বীয় কাপড় ছিঁড়িয়া যদুর পা বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে লইয়া ধীরে ধীরে আলয়ে পৌঁছিল। যদুর ইহা হইতে আরোগ্য লাভ করিতে বড় অধিক দিন লাগিয়াছিল না; কিন্তু ইহাতে যদু যে শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিল, জীবনে কখন তাহা বিস্মৃত হয় নাই। ইহার পর যদু আর কখনও অনর্থক কাহারও অপকারের চেষ্টা করে নাই, এবং রামকেও আর শত্রু বলিয়া ভাবে নাই। এই হইতে যদু ক্রমশঃ ভাল হইতে থাকে, এবং অবশেষে বেশ উন্নতিও করে। অতঃপর যদু সর্ব্বদা সকলের নিকট বলিত "অনর্থক অন্যের অপকারের চেষ্টা করিলে নিজের সে ফল ভোগ করিতে হয়, অন্যের জন্য কূপ খনন করিলে নিজেরই তাহাতে পতিত হইতে হয়। নির্দ্দোষ লোকের অপকার করিবার চেষ্টা বৃথা, কারণ তাহার সহায় স্বয়ং পরমেশ্বর।" আমরা যদুর এই শেষ কথাটী সর্ব্বদা সকলকে স্মরণ রাখিতে অনুরোধ করি।

স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

যাঁহার অভাবে সমস্ত বঙ্গদেশ আজ ক্রন্দন করিতেছে, যাঁহার মৃত্যু-সংবাদ সর্ব্বত্র প্রচার হইলে সমগ্র সভ্য জগৎ হায় হায় করিবে, বঙ্গের সেই অন্যতম রত্ন রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র সুঁড়ানিবাসী বাবু জন্মেজয় মিত্রের তৃতীয় পুত্র। বঙ্গীয় মিত্র-কুলের আদি-পুরুষ কালিদাস মিত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই বংশের অনেকের বৃত্তান্তই অবগত হওয়া যায়, কিন্তু দুঃখের বিষয়, যে রত্ন-গর্ভা রমণী এই পুত্র-রত্ন গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম আজিও আমরা জানিতে পারি নাই।

১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ফেব্রুয়ারি তারিখে রাজেন্দ্রলাল ভূমিষ্ঠ হন। ক্ষণ-জন্মা পুরুষের জন্মের মাস, তিথি, বার, নক্ষত্র, ক্ষণ প্রভৃতি সমস্তই জানিতে সাধারণের ইচ্ছা হয়, কিন্তু আজিও আমাদের সে ইচ্ছা পরিতৃপ্ত করিবার সুযোগ হয় নাই। যাহা জানিতে পারিলাম, তাহাও ইংরাজী নামে, ইংরাজী হিসাবে।

যথাসময়ে রাজেন্দ্রলালের বিদ্যারম্ভ হইলে প্রথমেই পারস্যভাষার বর্ণমালা তাঁহাকে শিক্ষা দেওয়া হয়। আমরা "হাতে খড়ির" উল্লেখ দেখিতেছি; বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী দেবতার আরাধনা করিয়া বিদ্যারম্ভের যে প্রথা হিন্দু-সমাজে প্রচলিত আছে, ইহা কি তাহাই? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে দেবনাগর বা বাঙ্গালার পরিবর্ত্তে পারসিক বর্ণমালায় তাঁহার বিদ্যারম্ভ কিরূপে হইল বুঝিলাম না। তবে তৎকালে পারস্য-ভাষার যে কিরূপ আদর ছিল, বাঙ্গালীর ঘরে বৈদেশিক পারস্য-ভাষা যে কিরূপ প্রাধান্য লাভ করিয়াছিল, এই ঘটনা হইতে তাহা বিলক্ষণরূপে বুঝা যাইতেছে।

ভাগ্যে প্রতিবাসী রাজা বৈদ্যনাথ রায়ের পরিবারে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন, রাজেন্দ্রলাল তাঁহার নিকট তিন বৎসরকাল বাঙ্গালা শিক্ষা করেন। ভবিষ্যতে তাঁহার লেখনী প্রাকৃতিক ভূগোল, বিবিধার্থ-সংগ্রহ এবং রহস্য-সন্দর্ভ প্রভৃতি যে সমস্ত রত্ন প্রসব করিয়াছিল, তাহাতে এই গুরুমহাশয়ের কৃতিত্ব কতদূর আছে তাহা জানিবার উপায় নাই; কিন্তু সেজন্য তাঁহার স্বকীয় প্রতিভার নিকটে যে তিনি বিশেষরূপে দায়ী ছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। ফলতঃ রামমোহন রায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রভৃতি যে সকল মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষাকে গড়িয়া পিটিয়া আমাদের জন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের এ দুরূহ কার্য্যের প্রবর্ত্তক আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র প্রবর্ত্তক স্বদেশ-প্রীতি।

যাহা হউক, যে ইংরাজী ভাষার উপরে তাঁহার যশের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত, যাহাতে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁহার নাম দিগন্ত-বিশ্রুত, পাথুরিয়া ঘাটায় ক্ষেম বসুর স্কুলে তিনি সেই ইংরাজী ভাষার অধ্যয়ন আরম্ভ করেন, এবং একাদশ বর্ষ বয়স পর্য্যন্ত তথায় অধ্যয়ন করিয়া গোবিন্দ বসাকের স্কুলে

প্রবেশ করেন। তাঁহার বুদ্ধিমত্তা, একাগ্রতা, এবং শিক্ষানুরাগ-দর্শনে তাঁহার শিক্ষকেরা তাঁহাকে অতিশয় ভালবাসিতেন, তাঁহার সহাধ্যায়িগণ তাঁহাকে বিশেষ সম্মান করিতেন। বাঁচিয়া থাকিলে তিনি যে একজন বিখ্যাত লোক হইবেন, তাঁহার বাল্যকালে একথা অনেকেই বলিয়াছিলেন।

১৫ বৎসর বয়সে রাজেন্দ্রলাল গুরুতর পীড়াক্রান্ত হইয়াছিলেন; আরোগ্য লাভ করিয়াই তিনি চিকিৎসা-শাস্ত্র শিখিতে আরম্ভ করেন, কিন্তু নানা কারণে তাহা সমাধা করিতে পারেন নাই। তাহার পর তিনি ওকালতী দিয়া ব্যবসায় আরম্ভ করেন, কিন্তু অভাবনীয় অন্তরায় উপস্থিত হওয়াতে তাহাও ছাড়িতে বাধ্য হন। বিলাতে যাইয়া অধ্যয়ন করিতে একবার তাঁহার ইচ্ছা হইয়াছিল, কিন্তু জাতি-নাশের ভয়ে পিতার অনুমতি পাইলেন না।

যাহাকে যে জন্য ঈশ্বর পৃথিবীতে পাঠাইয়াছেন, চারিদিকের অবস্থা-পরম্পরা যেন তাঁহাকে সেইদিকেই চালাইতে থাকে। রাজেন্দ্রলাল চিকিৎসা এবং ওকালতীতে বিফল-মনোরথ হইয়া অবশেষে ভাষা-শিক্ষায় মনোনিবেশ করিলেন। মেডিক্যাল কলেজে অধ্যয়ন-কালেই গ্রীক, লাটিন, এবং ফরাসী ভাষা শিক্ষা করেন, তদ্ভিন্ন পারস্যভাষায় ইতিপূর্ব্বেই তাঁহার ব্যুৎপত্তি জন্মিয়াছিল। এখন তিনি সংস্কৃত ভাষা বিশেষরূপে অধ্যয়ন এবং প্রাচ্য-প্রত্ন-তত্ত্বের বিশেষ গবেষণা-আরম্ভ করিলেন। ইহাতে অল্পকাল-মধ্যেই তিনি এরূপ প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন যে, ২৩ বৎসর বয়সের সময় তিনি প্রসিদ্ধ এসিয়াটিক্ সোসাইটির সহকারী সম্পাদকের পদে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় হইতে রাজেন্দ্রলালের যশের দ্বার খুলিয়া গেল। তিনি অক্লান্ত পরিশ্রমে সাহিত্যের সেবা করিতে লাগিলেন, সেই সঙ্গে তাঁহার খ্যাতি দেশে বিদেশে প্রচারিত হইতে লাগিল। তাঁহার বিপুল গবেষণা-পূর্ণ এক এক খানি গ্রন্থ বাহির হয়, আর জগতের বিদ্বন্মণ্ডলী আনন্দের করতালী সহ তাহা গ্রহণ করে। তাঁহার সরস, সতেজ, সুযুক্তিপূর্ণ ইংরাজী রচনা পাঠ করিয়া ইংরাজেরাও বিমোহিত হইলেন, সুসভ্য ইউরোপের নানা-দেশ হইতে তাঁহার উপরে সম্মান বর্ষিত হইতে লাগিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র ভিন্ন ভিন্ন দেশের বিদ্বৎসমিতি হইতে যত উপাধি এবং যত সম্মান পাইয়াছেন, ভারতবর্ষের আর কোন ব্যক্তির ভাগ্যে বোধ হয় তত সম্মান-লাভ কখনও ঘটে নাই। তিনি যে সকল গ্রন্থ লিখিয়াছেন, এস্থলে তাহার তালিকা দেওয়া অসম্ভব। তিনি অন্যূন পঞ্চাশখানি পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার পরিমাণ ৩০।৪০ হাজার পৃষ্ঠার কম হইবে না।

রাজা রাজেন্দ্রলাল অনেক ভাষা শিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইংরাজী এবং সংস্কৃতের জন্যই তিনি প্রসিদ্ধ। সময়ানুসারে বিচার করিলে তিনি বঙ্গভাষার জন্যও বিশেষরূপে খাটিয়াছেন বলিতে হইবে। তিনি বঙ্গভাষায় একখানি মাসিক কাগজ বাহির করেন; প্রথমতঃ তাহার নাম ছিল বিবিধার্থ-সংগ্রহ, তৎপরে তাহার নাম হয় রহস্য-সন্দর্ভ। পাঁচ বৎসর এই কাগজ চলিয়াছিল। বঙ্গভাষার এই টুকু সেবার জন্য বঙ্গবাসী তাঁহার প্রতি

কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন কি না জানি না, কিন্তু করা উচিত।

১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে রাজেন্দ্রলাল বাঙ্গালার এসিয়াটিক সোসাইটির সভা-পতিত্বে প্রতিষ্ঠিত হন,—ভারতবাসীর মধ্যে এই সম্মান সর্ব্বাগ্রে তিনিই লাভ করেন। এই স্থলেই বিদ্বন্মণ্ডলীর নিকট সম্মান-লাভের একরূপ চূড়ান্ত হইয়া গেল।

রাজেন্দ্রলাল বিদ্যা-চর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিয়াও অন্যান্য বিষয়ে উদাসীন ছিলেন না। তিনি কলিকাতার নাগরিক (মিউনিসিপাল) সভার একজন উৎসাহী সভ্য ছিলেন, কৃষ্ণদাস পালের একজন প্রধান পরামর্শদাতা এবং এক সময়ে হিন্দুপেট্রিয়টের সর্ব্বময় পরিচালক ছিলেন। দেশে যত সভাসমিতি আছে, বৃটিস্ ইণ্ডিয়ান্ সভার সম্মান ও প্রতিপত্তি তাহাদের সকলের অপেক্ষা অধিক; রাজেন্দ্রলাল এই সভার সভাপতি ছিলেন। মহারাজ্ঞী ভারতেশ্বরী প্রথমতঃ তাঁহাকে রায় বাহাদুর, তৎপরে সি, আই, ই, এবং সর্ব্বশেষে রাজা উপাধিতে ভূষিত করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁহাকে এল্, এল্, ডি উপাধি দিয়া সম্মানিত করিয়াছিলেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল বাহাদুরের মৃত্যুতে বঙ্গমাতা একটী সর্ব্বতোমুখী-প্রতিভা-বিশিষ্ট সুসন্তান হারাইলেন।

ছোট কথা।

পরের মুখের দিকে চাহিয়া চলিতে গিয়া আপন পথ দেখিতে পাই না, তাই অনেক সময়ে কণ্টক-বনে পদ-যুগল ক্ষতবিক্ষত হইয়া যায়। যাহা বুঝি তাহা বলিতে পারি না, পাছে তোমরা দশজনে তাহাতে সায় না দেও! যাহা বলি তাহা করিতে পারি না, পাছে তোমরা দশজনে তাহার জন্য আমাকে নির্য্যাতন কর? আমি সুখের পথ ছাড়িয়া দুঃখের পথে দাঁড়াইয়া "সুখ, সুখ" বলিয়া কাঁদিতেছি, বুঝিতেছি না যে "সর্ব্বং পরবশং দুঃখম্।"

আমি ভিন্ন আমার প্রকৃত শত্রু কেহ নাই! আমি আমার যত শত্রুতা করিয়াছি পৃথিবীর সকল লোকে মিলিয়াও তাহার শতাংশের একাংশ করিতে পারিত না! তুমি যখন আমাকে প্রলোভনের জাঁকজমকের পথে ডাকিতেছিলে, আমি যদি তোমার সঙ্গে না যাইতাম, তুমি আমার কি করিতে পারিতে? আমি যদি আত্ম-বলি না দিতাম, তুমি কি আমার কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে পারিতে? আমি যখন প্রলোভনের দাস ছিলাম, তখন বাতাসের ভিতর দিয়াও প্রলোভন আসিত, প্রলোভন না আসিতেই

আমি তাহার চরণে শরণাগত হইতাম! এখন তুমি কি আকাশের বজ্রবিদ্যুৎ আনিয়াও তোমার পথে আমাকে ধরিয়া লইতে পার? আমি প্রাণের প্রিয়তম বন্ধু পাইয়াছি—আমিই আমার প্রকৃত সুহৃৎ!

আমি অন্ধ ছিলাম, তোমরা দশজনে যেমন করিয়া বুঝাইয়াছ তাহাই বুঝিয়াছি। এখন একবার আমাকে বুঝাইতে পার কি? আমি সুখ দুঃখের প্রহেলিকা বুঝিয়াছি, তাহাদের প্রকৃত পথ দেখিয়াছি; অন্ধের নয়ন খুলিয়াছে—তোমরা দূরে সরিয়া দাঁড়াও, আমি প্রাণ ভরিয়া সুখের মুখ দর্শন করি!

তোমরা আমাকে কত ভুলই না বুঝাইয়াছিলে? তুমি ত সর্ব্বদাই বলিতে এই সংসারে স্থায়ী সুখ নাই, ইহার সকলই দুই দিনের সুখের ছায়া, তাহার পশ্চাতেই চিরদুঃখের অন্ধকার! তাই ত তোমাদের সঙ্গে মিশিয়া আমিও দুই দিনের সুখের জন্য কত ছুটাছুটি করিয়াম! কিন্তু আর তোমাদের মিথ্যা কথা শুনিতে চাহি না; আমি স্থায়ীসুখের আলোক দেখিয়াছি!

"যে চায়, সে পায়"—ইহাই জগতের নিয়ম। তুমি যদি স্থায়ীসুখ চাও, তুমিও পাইবে। কিন্তু পাইবার আগে কল্পিত সুখের আশা ত্যাগ করিতে হইবে; যদি আসল চাও, নকল ছাড়িতে হইবে। সুখ অমূল্য ধন, কিন্তু তাই বলিয়া বিনা মূল্যে তাহা বিকায় না। যদি সুখের মুখ দেখিতে চাও, সর্ব্বস্ব তাহার জন্য বিকাইতে হইবে! তুমি কি সুখী হইতে চাও? আগে ভাল করিয়া তাহা ভাবিয়া দেখ, দশজন বন্ধু বান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস! তুমি কি সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়াছ? উত্তর দিবার পূর্ব্বে আর একবার ভাবিয়া দেখ। যদি সত্যই সুখের ভিখারী হইয়া সুখের জন্য ব্যাকুল হইয়া থাক, তবে আশার সঙ্গে অপেক্ষা কর।

যদি স্থায়ী সুখ চাও, ক্ষুদ্রতা ছাড়। ক্ষুদ্রতাই দুঃখ, ভূমাই সুখের অনন্ত প্রস্রবণ! ক্ষুদ্র আশা, ক্ষুদ্র প্রাণ, ক্ষুদ্র কার্য্য লইয়া স্থায়ী সুখ পাইবে না। আকাশের মত হৃদয়কে বিস্তৃত করিতে পারিবে কি? পর্ব্বতের মত প্রাণকে অটল রাখিতে পারিবে কি? সমুদ্রের মত মনকে অতলস্পর্শ করিতে পারিবে কি? যদি পার, তবেই তুমি অনন্ত সুখ-লাভ করিয়া ধন্য হইবে!

তৃতীয় ভাগ।] আশ্বিন [৬ষ্ঠসংখ্যা।

(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল,।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,

৯০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশার্থ প্রবন্ধ ও বিনিময়ার্থ পত্রিকা পুঠিয়ায় সম্পাদকের নিকট, সমালোচনার্থ পুস্তকাদি শিক্ষা-পরিচর-সমিতি সম্পাদকের নিকট রামপুর বোয়ালিয়ায় প্রেরিতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের মূল্যাদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট কলিকাতায় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য এবং বিজ্ঞাপনের নিয়ম তথায় জ্ঞাতব্য।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। } আশ্বিন ১২৯৮ সাল। { ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১৮

অনন্তের দ্বারে বসি ডাকিতেছি বার বার,
কোথা গো করুণাময়ি! কৃপা করি খুল দ্বার।
দেখিতেছি অনিবার অনন্ত ভিক্ষুক-চয়,
আসিছে ভিক্ষার তরে গাইয়া তোমার গান,
তোমার কৃপায় লভি স্বর্গের সম্পদ-রাশি,
ছাড়িছে ভিক্ষুক-বেশ, আনন্দে পূরিছে প্রাণ!
আমিও ত সেই আশে আসিয়াছি, জননি গো!
আমিও ডাকিছি তোমা পাইতে স্বর্গের দান,
জীর্ণ কন্থা শীর্ণ-বেশ আমিও ভিক্ষুক বটে,
লভিতে তোমার কৃপা কাঁদিছে আমারো প্রাণ!
কিন্তু মা! জানি না আমি কেমনে ডাকিতে হয়,
কি নামে ডাকিতে হয়, যেতে হয় কোন্ দ্বারে;
আছে ত অনন্ত দ্বার,—কোথা গিয়া দাঁড়াইলে,
কাঙ্গালের আর্ত্তনাদ পশে গো তোমার ঘরে?
শুনিয়াছি, দয়াময়ি! যেখানে সেখানে থাকি,
যে যা ব'লে ডাকে তোমা, সকলি শুনিতে পাও,
তাই বড় আশা ক'রে আসিয়া ব'সেছি দ্বারে,
কাঙ্গালে, করুণাময়ি! দ্বারটি খুলিয়া দাও।

অদ্ভুত জনপদ।

রজনী প্রভাত হইল, সাহস এবং ব্রহ্মানন্দ প্রত্যুষে প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিয়া দেবপুরের পথে চলিলেন। আজ ব্রহ্মানন্দের মনে ভারি স্ফূর্ত্তি। প্রভাতের শীতল সমীরণ প্রবাহিত হইতেছে, আর তাহার সঙ্গে অনাঘ্রাত-পূর্ব্ব কুসুম-সুবাস তাঁহার নাসিকাকে পরিতৃপ্ত করিতেছে। সময়ে সময়ে তাঁহার মনে হইতে লাগিল, বুঝি অদূরেই দেবপুর, তাই বায়ু এত মধুর, মনে এমন স্ফূর্ত্তি।

ক্রমে বেলা হইল, গন্তব্য প্রদেশের শোভাও বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাস্তার দুই পার্শ্বে বিস্তীর্ণ অরণ্য; কিন্তু তাহা এতই সুন্দর যে সহসা দেখিলে যত্ন-পালিত উদ্যান বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। ফল-বৃক্ষ এবং পুষ্প-বৃক্ষ থরে থরে সাজান রহিয়াছে, পুষ্পের মনোহর গন্ধে-বন আমোদিত হইতেছে, মধু-পান-মত্ত ভ্রমর গুন্ গুন গান করিতেছে, ফলাস্বাদে হৃষ্ট-চিত্ত বিহগ-কুল বৃক্ষ-ডালে বসিয়া মধুর কূজনে বন-ভূমি আন্দোলিত করিতেছে। সন্ন্যাসীর মনের আনন্দ ক্রমেই বাড়িতে লাগিল, তদ্দর্শনে সাহস অলক্ষিত-ভাবে ঈষৎ হাসিতে লাগিলেন। এতক্ষণ উভয়ের মধ্যে কোন কথা ছিল না, কিন্তু এখন ব্রহ্মানন্দের কৌতূহল আর থামিল না। তিনি সাহসকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"এ উদ্যানটি কাহার?"

সাহস। "এটি উদ্যান নহে। এদেশের সমস্ত বন জঙ্গলই এইরূপ সুন্দর।"

সন্ন্যাসী। "বটে! এদেশের রাজা কে? তিনিত দেখিতেছি বড় ভাগ্যবান্।"

সাহস। "এদেশের রাজা বড় সৌখীন পুরুষ বটে। রাজাটির নাম সুখ।"

সন্ন্যাসী। "এসকল অরণ্য কি প্রকৃতির অনুগ্রহে এত সুন্দর?"

সাহস। "প্রকৃতির অনুগ্রহ থাকিতে পারে, কিন্তু ইহাত দেবপুর নহে যে প্রকৃতি হইতেই এমন সুন্দর অরণ্য জন্মিবে। মনুষ্যের যত্নেই এসকল অরণ্য এত সুন্দর হইয়াছে।"

সন্ন্যাসী। "যে দেশের অরণ্যের উপর এত যত্ন, না জানি সেদেশের প্রজাগণ কতই সুখী!"

সন্ন্যাসীর শেষ কথা শুনিয়া সাহস আবার একটুকু হাসিলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী তাহা লক্ষ্য করিতে পারিলেন না। এই সময়ে সন্ন্যাসীর কর্ণে অতি মনোহর সঙ্গীত এবং বাদ্য-ধ্বনি প্রবেশ করিল। সন্ন্যাসী উৎকর্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"এ বাদ্য-ধ্বনি কোথা হইতে আসিতেছে?"

সাহস। "আমরা রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইয়াছি, রাজধানী হইতে এ সঙ্গীত ও বাদ্য-ধ্বনি আসিতেছে।"

সন্ন্যাসী। "কোন বিশেষ উৎসব আছে বলিয়া বোধ হয়, নতুবা এই মধ্যাহ্ন-সময়ে গান-বাদ্যের কারণ দেখি না।"

সাহস। "পূর্ব্বেই বলিয়াছি রাজাটি বড় সৌখীন। রাজার আদেশ আছে, শোক-দুঃখের ক্রন্দন কর্ণে প্রবেশ করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিতে না পারে, এজন্য নর্ত্তন, কীর্ত্তন, ও বাদ্যোদ্যমে নগরকে অবিরাম কোলাহলময় রাখিতে হইবে। চতুর নামে রাজার একটি মন্ত্রী আছেন, তিনি বড়ই বুদ্ধিমান্। রাজা যখন যাহা আদেশ করেন, চতুরের বুদ্ধি-কৌশলে তাহাই তখন সম্পাদিত হয়। রাজার আজ্ঞা পাইবামাত্র চতুর অবিরাম সঙ্গীত ও বাদ্যোদ্যমের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন, যে কোন কারণে কেহ যেন কাঁদিয়া রাজার শান্তিভঙ্গ না করে।"

সন্ন্যাসী। "যে রাজা এত সুখের ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাঁহার প্রজারা কেন কাঁদিবে বুঝিতে পারি না।"

সাহস অলক্ষিতভাবে আবার ঈষৎ হাসিলেন।

এইরূপ কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে উভয়ে নগরে উপস্থিত হইলেন। নগরটি দেখিলে মানবের বাস-স্থান বলিয়া বোধ হয় না, যেন ইন্দ্র-পুরী। নগরের কোথাও একটি বালক কি বৃদ্ধ, একটি অন্ধ কি খঞ্জ দৃষ্ট হইল না, সর্ব্বত্রই প্রফুল্ল-মুখ-কমল তরুণ ও তরুণীগণ সানন্দে বিচরণ করিতেছে। কোথাও গোলাপ জলে পরিপূর্ণ বিস্তীর্ণ সরোবর শোভা পাইতেছে, কোথাও কৃত্রিম উৎস হইতে গোলাপী আতর উৎসারিত হইতেছে, কোথাও নানাবিধ সুগন্ধ এবং সুপেয় মদিরার কৃত্রিম নদী প্রবাহিত হইতেছে! এই সকল সরোবর ও নদী এবং রাস্তা ঘাট ও লোকালয় ছাড়া যেখানে যে স্থান টুকু আছে, তাহাই পুষ্পোদ্যান। দেখিয়া শুনিয়া সন্ন্যাসীর হৃদয়ে আনন্দের আর সীমা নাই! তিনি সাহসকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—

"এ নগরের নাম কি?"

সাহস। "ইহার নাম প্রমোদ-ক্ষেত্র, শ্রীক্ষেত্র অপেক্ষাও ইহা লোকের অধিক চিত্তাকর্ষক।"

সন্ন্যাসী। "স্বর্গে অনেক থাকিতে পারে বটে, কিন্তু পৃথিবীতে এমন স্থান আমি আর কখনও দেখি নাই। আচ্ছা বলুন দেখি, এ নগরে কি বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, খঞ্জ, ভিক্ষুক প্রভৃতি কেহই নাই? নগরে প্রবেশ করিয়া অবধি যত লোক দেখিলাম, সকলই সুন্দর-মূর্ত্তি তরুণ বা তরুণী। এবিষয়টা জানিতে আমার বড়ই কৌতূহল হইতেছে।"

সাহস। "চিরযৌবন, অভঙ্গস্বাস্থ্য এবং অক্ষুণ্ণসৌন্দর্য্য কেবল দেবপুরেই সম্ভব; তবে সুখ এবং চতুরের বুদ্ধি-কৌশলে দেব-পুরের অনেকটা অনুকরণ এখানে হইয়াছে। রাজার আদেশ-ক্রমে অন্ধ, খঞ্জ, কুরূপ, কদাকার কেহ এ নগরে প্রবেশ করিতে পারে না। কেহ বৃদ্ধ বা রুগ্ন হইলেই নগর হইতে নিষ্কাশিত হয়। কোন রমণী গর্ভবতী হইলে তাহাকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হয়; নগরের বাহিরে সন্তান প্রসব করিয়া তবে সে আবার নগরে প্রবেশ করিতে পায়। সন্তান ডোম, মেথর প্রভৃতি নীচ-জাতীয়া ধাত্রীর যত্নে প্রতিপালিত হইতে থাকে, সুতরাং তাহাদের আভ্যন্তরিক সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র জন্মিতে পারে না, কেবল শারীরিক সৌন্দর্য্য লইয়াই তাহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এই সকল সন্তান যৌবন-

প্রাপ্ত হইলে নগরে প্রবেশ করিতে পায় বটে, কিন্তু পিতা মাতার সঙ্গে বাস করা তাহাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না; কারণ, তাহারা যখন যৌবনপ্রাপ্ত হয়, তখন বার্দ্ধক্য-বশতঃ তাহাদের পিতা মাতাকে নগর ছাড়িয়া যাইতে হয়।”

সাহসের মুখে এই বিবরণ শুনিয়া ব্যবস্থাটি ভাল হইয়াছে কি মন্দ হইয়াছে সন্ন্যাসী তাহা ঠিক করিতে পারিলেন না, কাযেই কোন উত্তর করিলেন না।

বেলা ঠিক দুই প্রহর হইয়াছে, এমন সময়ে উভয়ে একটি রমণীয় স্থানে উপস্থিত হইলেন। স্থানটির এক পার্শ্বে একটি গোলাপ-জলের সরোবর, তাহার চারি ধারে চারিটি সুন্দর ঘাট। এই স্থানের অপর পার্শ্বে একটি কৃত্রিম সুরা-নদী, কয়েকটি কৃত্রিম উৎস হইতে আতর-রাশি উৎসারিত হইয়া ঐ নদীতে পড়িতেছে। সরোবর এবং নদীর মধ্যস্থলে পুষ্প বৃক্ষ-পরিবৃত একটি লতা-মণ্ডপ, তাহাতে মৃদু বায়ু সঞ্চরণ করিতেছে, কিন্তু রৌদ্র প্রবেশ করিতে পারিতেছে না। লতা-মণ্ডপের ভিতরে বসিবার নানারূপ আসন, শয়নের বিবিধ শয্যা, এবং পান-ভোজনের নানাবিধ সামগ্রী প্রস্তুত রহিয়াছে।

ব্রহ্মানন্দ সেই লতা-মণ্ডপের সন্নিহিত ঘাটে একটি বৃক্ষ-চ্ছায়াতে বসিয়া গেলেন। তাঁহাকে তদবস্থায় দেখিয়া সাহস বলিলেন, “এখানে বসিয়া প্রয়োজন নাই, প্রমোদ-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া বিশ্রাম করা যাইবে।” সন্ন্যাসীর কাছে একথা ভাল লাগিল না। তিনি উত্তর করিলেন, “আমার বড় ক্লান্তি বোধ হইয়াছে, এখানে একটুকু বিশ্রাম না করিলে আর চলিতে পারিতেছি না।” সাহস আর কি করেন, অগত্যা তিনিও ব্রহ্মানন্দের একপার্শ্বে উপবেশন করিলেন। পথ-শ্রমে উভয়েই ক্লান্ত; পূর্ব্বরজনীতে উভয়েরই নিদ্রা হয় নাই; তাহার উপরে সরোবরের শীকর-সিক্ত শীতল বায়ুর সংস্পর্শ, সুতরাং উভয়েরই শরীর যেন অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। সন্ন্যাসীর ইচ্ছা সরোবরে নামিয়া স্নান করেন; কিন্তু সেখানে বসিতে সাহসের আপত্তি স্মরণ করিয়া আর সে কথার উত্থাপন করিলেন না। কিন্তু কিছু-কাল উপবেশনের পর সাহসের একটুকু তন্দ্রা বোধ হইল, ইত্যবসরে ব্রহ্মানন্দ সরোবরে নামিয়া পড়িলেন।

মুহূর্ত্ত-মধ্যেই সাহসের তন্দ্রা ভাঙ্গিল, তখন তিনি সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি দেখিয়া অবাক্ হইলেন! সন্ন্যাসী কখন সাঁতার দিতেছেন, কখন ডুব দিতেছেন, কখন আকণ্ঠ নিমজ্জিত হইয়া স্থিরভাবে থাকিতেছেন। উঠিবার জন্য সাহস পুনঃপুনঃ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন, অগত্যা নিতান্ত অনিচ্ছার সহিত তিনি সরোবর হইতে উঠিলেন। উঠিয়া তীরে দাঁড়াইয়াছেন, এমন সময়ে সেই লতা-মণ্ডপ হইতে একটি যুবতী একখানি সুন্দর বস্ত্র লইয়া বাহির হইল, এবং বস্ত্র-পরিবর্ত্তনের জন্য ব্রহ্মানন্দকে অনুরোধ করিল। সাহস বলিলেন, “আমরা দেব-পুরের যাত্রী, বিশেষতঃ ইনি সন্ন্যাসী, বিলাসীর উপযোগী বস্ত্রাদি ইনি ব্যবহার করিবেন না। আমাদের ইচ্ছা আছে নগর অতিক্রম করিয়া বিশ্রামাদি করিব।”

যুবতী বলিল, “এখানে স্নান করিলেই

বিশ্রাম ও জলযোগ করিতে হইবে, ইহা আমাদিগের রাজার আদেশ। কোন পথিক যদি স্নান করিয়া এখান হইতে বিনা অভ্যর্থনায় চলিয়া যায়, তাহা হইলে আমাদিগকে দণ্ডিত হইতে হয়, সুতরাং আমরা কাহাকেও ছাড়িয়া দিতে পারি না।”

সন্ন্যাসীর ইচ্ছা হইয়াছে বিশ্রামটি উপভোগ করেন, সুতরাং তিনি বলিলেন, “ইহাতে আর দেব-পুর-গমনের কি বিঘ্ন হইবে? যখন এত আদর করিতেছে, তখন আতিথ্যটা গ্রহণ করাই যাউক।” এই বলিয়া বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিলেন, এবং সাহসের জন্য অপেক্ষা না করিয়াই যুবতীর সঙ্গে লতা-মণ্ডপে বিশ্রামার্থ চলিলেন।

সাহস সন্ন্যাসীর অবস্থা-দর্শনে ভীত হইলেন, এবং আহূত না হইলেও তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইয়া লতা-মণ্ডপের বাহিরে একস্থানে উপবেশন করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ লতা-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া একখানি মনোরম আসনে উপবেশন করিলেন, অভ্যর্থনা-কারিণী যুবতী একখানি সুগন্ধি-জল-কণ-বর্ষী পাখা দিয়া বাতাস করিয়া তাঁহার স্নান-শ্রম অপনয়ন করিতে লাগিল। এইরূপে কিছুকাল অতিবাহিত হইলে একজন যুবক কতকগুলি কিঙ্কর ও কিঙ্করী লইয়া সেই লতা-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন, এবং সন্ন্যাসীকে সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া বলিলেন, “এই লতা-মণ্ডপে উপভোগের যে সকল বস্তু আছে, সে সমুদায়েই আপনার অধিকার। এই সকল কিঙ্কর ও কিঙ্করীগণ পরিচর্য্যার জন্য সর্ব্বদা আপনার নিকট হাজির থাকিবে, আপনি যখন যাহা আদেশ করিবেন, ইহারা অগৌণে তাহাই সম্পাদন করিবে।”

সন্ন্যাসী। “এখানে আদর এবং আতিথ্য-ব্যবস্থায় বড় প্রীত হইলাম, আমার আর কিছুরই প্রয়োজন হইবে না। মহাশয়ের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি?”

যুবক উত্তর করিলেন, “আমার নাম প্রমোদ, আমার নামানুসারেই এই নগরের নাম হইয়াছে। রাজধানীতে সমাগত আগন্তুকদিগের অভ্যর্থনার ভার আমার প্রতিই অর্পিত আছে। এই সকল দাস দাসী আমার অধীন থাকিয়াই আগন্তুকদিগের পরিচর্য্যা করে।”

এই বলিয়া প্রমোদ আবার সন্ন্যাসীকে অভিবাদন করিয়া বিদায় লইলেন, কারণ তাঁহাকে সর্ব্বত্র অতিথিদিগের অভ্যর্থনা এবং ভৃত্যদিগের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতে হইবে। প্রমোদ চলিয়া গেলে সন্ন্যাসীর পরিচর্য্যা পূর্ণমাত্রায় আরম্ভ হইল। কেহ বায়ুব্যজন করিতেছে, কেহ সুগন্ধি জলের ফুয়ারা উড়াইতেছে, কেহ সন্ন্যাসীর উপরে সুবাস কুসুম বর্ষণ করিতেছে, কেহ কুসুমের মালা তাঁহার গলায় পরাইয়া দিতেছে, কেহ কুসুম দিয়া তাঁহার শয্যা সাজাইতেছে, কেহ বিবিধ উপকরণযুক্ত আহার্য্য তাঁহার মুখে তুলিয়া দিতেছে, কেহ গাইতেছে, কেহ বাজাইতেছে, কেহ বা নৃত্য করিতেছে। সন্ন্যাসী আজ আনন্দে বিভোর; ক্রমে আলস্যে তাঁহার শরীর অবসন্ন হইয়া আসিল, তিনি আসন ছাড়িয়া শয্যায় দেহ-ভার রাখিলেন, এবং দেখিতে দেখিতে গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া গেলেন।

সন্ন্যাসীর দিবা-নিদ্রার অভ্যাস ছিল না, কিন্তু আজ অপূর্ব্ব আতিথ্য-ভোগের ফল-স্বরূপ দিবা-নিদ্রা হইল, পূর্ব্বরাত্রির অনিদ্রা-বশতঃ নিদ্রার সময়টাও কিছু অধিক হইয়া গেল। বেলা প্রায় শেষ হইয়াছে, এমন সময়ে সন্ন্যাসীর নিদ্রা ভাঙ্গিল। তিনি জাগিয়া দেখিলেন পূর্ব্ববৎ নৃত্য গীত হইতেছে, পুষ্প ও সুগন্ধ-বর্ষণ সেইরূপই চলিতেছে। নিদ্রাবসানে গাত্রোত্থান না করিয়া সন্ন্যাসী নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, "এদেশটিত দেখিতেছি বড় সুখের স্থান। অনেক দেশ এ পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু কৈ এমন সুখের স্থানত আর দেখি নাই। যে রাজ্যের রাজা স্বয়ং সুখ, সেখানে সুখ মিলিবে বিচিত্র কি? এখন কি করি; এ সমস্ত সুখ ছাড়িয়া দেব-পুরে যাই কি না, এখন ইহাই বিচার্য্য। দেব-পুরে যে সুখের বা আনন্দের কথা শুনিয়াছি, তাহা অপ্রত্যক্ষ, আর এখানে যাহা দেখিতেছি, তাহা প্রত্যক্ষ; প্রত্যক্ষ ছাড়িয়া অপ্রত্যক্ষের আদর করা—অনিশ্চিতের জন্য নিশ্চিত পরিত্যাগ করা নিতান্তই নির্ব্বোধের কার্য্য। এত দুর্লভ ভোগ্য বস্তু দেব-পুরে আমাকে কে যোগাইবে? এত আজ্ঞাবহ দাস দাসী দেবপুরে আমাকে কে দিবে? দেবপুরের সুখ যে প্রকারই হউক, তাহা যে এ সুখের মত নহে, একথা একরূপ নিশ্চয়ই বলা যায়। এখানকার সুখ-ভোগের একটা বিশেষ অসুবিধা এই যে, বার্দ্ধক্য-বশতঃ শরীর জীর্ণ শীর্ণ হইলে এখানে থাকিতে দেয় না। তা সে জন্য আমার ভয় কি? আমি তপোবলে শরীরটি এমন করিয়াছি যে, বহু বয়স্ হইলেও শরীর যৌবনোচিত লাবণ্য-শূন্য হইবে না। তবে চিরদিন যে শরীরের অবস্থা এইরূপই থাকিবে, এমন নহে। কিন্তু ততদিনের মধ্যে কবে কাহার কি হইবে, তাহা কে জানে? কবে বার্দ্ধক্য আসিবে, তবে সুখের রাজ্য হইতে তাড়িত হইব! সে অনেক দূরের কথা। বুদ্ধিমান মনুষ্য উপস্থিত অবস্থা বিবেচনা করিয়াই কার্য্য করে, আমিও তাহাই করিব; ইহার পরে বার্দ্ধক্য আইসে দেবপুরে যাইবার চেষ্টা দেখা যাইবে।"

এই সময়ে সাহস লতা-মণ্ডপের বাহির হইতে ব্রহ্মানন্দকে ডাকিলেন। লতা-মণ্ডপে প্রবেশ করিয়া অবধি সাহসের কথা ব্রহ্মানন্দের মনে ছিল না। এখন তাঁহার ডাক শুনিয়া ব্রহ্মানন্দ লজ্জিত হইলেন, এবং বলিলেন, "এখানে এত ভোগ্য বস্তু থাকিতে সমস্ত দিনটা আপনার অনাহারে গেল, বড়ই দুঃখের কথা। যাহা হউক, কিছু জলযোগ করুন।"

সাহস। "আমার জলযোগের জন্য আপনাকে উদ্বেগ পাইতে হইবে না, আপনার আশীর্ব্বাদে, আমি দুই চারি দিন বিনা আহারে এবং বিনা বিশ্রামে অতিবাহিত করিতে পারি। আমার নিয়ম আছে, এ নগর-মধ্যে যতক্ষণ থাকি, ততক্ষণ আহার পানীয় কিছু গ্রহণ করি না। আর অধিক বেলা নাই, এখন চলুন যাওয়া যাউক।"

সন্ন্যাসী। "আহার ও বিশ্রামের পর শরীরটা বড় অবসন্ন হইয়াছে। আজকার মত এখানেই বিশ্রাম করা যাউক। আগামী কল্য যদি শরীর ভাল বোধ হয়, তবে চলা যাইবে।"

সাহস। "এ নগরের মধ্যে যতদিন থাকিবেন, ততদিন এ অবসন্নতা ঘুচিবে না। আমার তন্দ্রাবস্থায় সরোবরে ডুব দিয়াই এ সর্ব্বনাশটা করিয়াছেন, আমার জ্ঞাতসারে হইলে কখনই আপনাকে সরোবরে নামিতে দিতাম না। সরোবরে স্নান করাতেই এ সকল সুখে আপনার এত রুচি হইয়াছে।"

সন্ন্যাসী। "সংসারে সকলেই সুখের বিরোধী। পুণ্য-কার্য্যের সঙ্গে সুখের বিরোধটা কি? সুখী লোক কি ধার্ম্মিক হইতে পারে না? ধর্ম্ম পুণ্য করিতে হইলেই সমস্ত সুখ-ভোগে জলাঞ্জলি দিতে হইবে, সে সব শাস্ত্র আর এখনকার দিনে আদর পাইবে না, লোকে এখন শাস্ত্রকারদিগের চতুরতা বেশ বুঝিতে পারিয়াছে? সুখ-ভোগ এবং ধর্ম্ম-সাধন একযোগেই হইতে পারিবে, এই শিক্ষা এবং এই বিশ্বাসেই বর্ত্তমান যুগের মহত্ত্ব। ধর্ম্ম-সাধনের জন্য এখন আর সুখ-ভোগ পরিত্যাগ করিয়া অরণ্যে যাইতে হইবে না। আপনাকে বাধা দিতে চাই না, আপনি দেবপুরে যাইয়া পুণ্য সঞ্চয় করুন। ইহার পরে আমার যদি দেবপুরে যাইবার প্রয়োজন হয়, সঙ্গী পাওয়া যাইবে।"

লিপি-কৌশল।

১

বড় বড় সংবাদ-পত্র ছাপাইয়া, জাঁকাল জাঁকাল বিজ্ঞাপন বিতরণ করিয়া, একটাকা মূল্যে দশ টাকার উপহার উপঢৌকন দিবার প্রলোভন দেখাইয়া সপ্তাহে সপ্তাহে, মাসে মাসে জগতের ছাই ভস্ম ঘরে ঘরে বহন করিবার জন্য বহুসংখ্যক ছোট্ট বড় সাহিত্যের হাট বসিয়া গিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যের হাটে এতই কলরব যে, ভাল করিয়া কাহারও কথা কাণে তুলিবার অবসর নাই! তথাপি সাহিত্য-ব্যাপারে ক্রেতা অপেক্ষা বিক্রেতাই অধিক দেখিতে পাইতেছি। সহস্রের মধ্যে একজনও ক্রেতা আছেন কি না সন্দেহ, কিন্তু সেই একজন ক্রেতাকে ঘিরিয়া সহস্র সহস্র সাহিত্য-বিক্রেতা আপন আপন পণ্য-দ্রব্যের গুণগান করিতে করিতে নিজ নিজ পণ্যবীথিকার দিকে আকর্ষণ করিতেছেন। চারিদিকের কলরব শুনিয়া, বিক্রেতাগণের হাব ভাব ও আকর্ষণ-কৌশল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিতে ইচ্ছা হয়, এতাধিক সাহিত্য ব্যবসায়ীর মধ্যে প্রকৃত সুলেখক কয় জন? কাহারও ছাপা ভাল, কাহারও কাগজ পরিষ্কার, কাহারও বহিরাবরণ চাকচিক্যময়,

কাহারও বা বিজ্ঞাপন ও প্রশংসাপত্র যোজন-ব্যাপী; কিন্তু সমুদায় দিন হাটে হাটে বেড়াইয়াও দুই চারিটির অধিক প্রকৃত সুলেখক খুঁজিয়া পাওয়া ভার! যাহা পড়ি তাহাতে প্রাণ জুড়ায় না, যাহা দেখি তাহাতে আশা হয় না;—মনে হয় বুঝিবা যাহার যাহা নাই সে তাহার ভাণ করিবার জন্যই সাহিত্য-সংসারে প্রবেশ করিয়াছে!

কালি কলম কাগজ হাতে করিয়া লিখিতে বসিলেই সুলেখক হওয়া যায় না। জগতের সকল কার্য্যই নিয়মাধীন; লিপি-কৌশলেরও সেইরূপ ধরাবাঁধা রীতি নীতি আছে। তাহা না মানিয়া চলিলে তোমার লেখা অনর্গল ছুটিতে পারে, কিন্তু তাহা ভাল লেখা না হইতেও পারে। এইরূপ দায়িত্ব-হীন অঙ্গুলি-কণ্ডূয়নে সাহিত্য বা মাতৃ-ভাষার বিশেষ উন্নতি হইতেছে বলিয়া মনে হয় না। যিনি দশবার কাটিয়া, পাঁচবার ছিঁড়িয়া, দশ ছত্রে পোনের বার ব্যাকরণ ও পঁচিশ বার বর্ণবিন্যাস বধ করিয়া কায়ক্লেশে না ইংরাজি না বাঙ্গলা একটা কিম্ভূত কিমাকার প্রবন্ধ দাঁড় করাইতে পারিলেন, অমনি সম্পাদক মহাশয় তাঁহাকে একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ সুলেখক বলিয়া জন-সমাজে তাঁহার অজ্ঞাত নামের বিজয়দুন্দুভি বাজাইয়া প্রবন্ধটি যোগেজাগে সুমার্জ্জিত আকারে প্রকাশ করিয়া দিলেন। সম্পাদকের আশা—লেখক মহাশয় লিখিতে লিখিতেই কালে একজন সুলেখক হইয়া উঠিবেন! এই আশা যে কতদিনে পরিপূর্ণ হয়, অথবা সম্পাদকের সীমা-বিশিষ্ট জীবন-কালে কখনও হয় কি না, ভুক্তভোগী সম্পাদক মহাশয় ভিন্ন তাহার গূঢ় রহস্য অন্যের জানিবার কোন উপায় নাই! *

এমন করিয়া তিলকে তালে পরিণত করিবার চেষ্টা না করিয়া বরং যাহাতে লেখক মহাশয়েরা যথার্থই সুলেখক হইতে পারেন, তাহার কোন উপায় উদ্ভাবন করা আবশ্যক; তাহাতে সাহিত্যের আদর বাড়িবে, মাতৃভাষার উন্নতির আশা জন্মিবে, স্বদেশের মলিন মুখ উজ্জ্বল হইবে! সেরূপ চেষ্টা করিবে কে? হাতে কলমে দেখাইয়া দিতে না পারিলে, কেবল কতকগুলি ধরা-বাঁধা নিয়ম বলিয়া দিয়া লিপিকৌশল শিখান অসম্ভব;—আর সম্ভব হইলেই বা তেমন শিক্ষক কোথায়? যাঁহারা শিখাইতে পারেন তাঁহাদের কথা কেহ মানিবে না, এই ভাবিয়া তাঁহারা একে একে লেখনী সংকোচ করিয়াছেন!

---

* সম্পাদকের প্রতি লেখক মহাশয়ের ইঙ্গিত যথাপ্রযুক্ত হইলেও সম্পাদকদিগের এ প্রথা একেবারে অযৌক্তিক নহে। শ্রদ্ধেয় বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শনকে উপলক্ষ করিয়া কিরূপে কয়েকজন সুলেখক প্রস্তুত করিয়াছিলেন, লেখক তাহা শুনিয়া থাকিবেন। সম্পাদকেরা এই উপায়ে প্রচ্ছন্ন শক্তিকে সাহিত্য-সমাজে আহ্বান করেন মাত্র, কিন্তু তাহা গড়িতে পারেন না। দুঃখের বিষয়, অনেকে কাগজ কলম হাতে লইয়াই ব্যাস-বাল্মীকির প্রতিষ্ঠা চাহেন, কাযেই সম্পাদকদিগের আশা পূর্ণ হয় না। সম্পাদকেরা সকলকেই যথাসাধ্য উৎসাহ দেন, তবে যেখানে প্রকৃত শক্তি আছে, কেবল সেইখানেই ফল ধরে।

শিঃ পঃ সঃ।

কাহাকেও শিখাই এমন স্পর্দ্ধা আমাদের নাই, কাহাকেও পথ দেখাইয়া দিতে পারি এমন আলোক-স্তম্ভ আমাদের নাই; আমরা ক্ষুদ্র খদ্যোত, আপন আঁধার আপনিই দূর করিতে পারিতেছি না। তবে সাহিত্য-কাননে একসঙ্গে হাত ধরাধরি করিয়া চলিতে চলিতে সহযাত্রীদিগকে সময়ে সময়ে দুই চারিটি মনের কথা বলিতে চাই; যাঁহারা বঙ্গভাষার শিক্ষাগুরু, তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য কাতরকণ্ঠে দুই একটি আর্ত্তনাদ করিতে চাই! আমাদের এই ক্ষুদ্র চেষ্টাকে অহঙ্কারের উচ্চ আস্ফালন বলিয়া মনে করিলে বড়ই দুঃখ পাইব। আমরা কি লইয়া অহঙ্কার করিব?—আমাদের আয়তন ক্ষুদ্র, কণ্ঠ ক্ষীণ, লেখনী দুর্ব্বল! তমসাচ্ছন্ন পল্লী কুটীর আমাদের কার্য্যালয়, অপরিচিতনামা জনকতক সাহিত্যানুরাগী বন্ধুবান্ধব আমাদের সহৃদয় লেখক ও আশ্রয়দাতা; তাঁহারাও আবার বর্ত্তমান সাহিত্যবিভ্রাটের দিনে আত্ম-পরিচয় দিতে নিতান্ত অসম্মত। আমরা যদি লিপি-কৌশল শিখাইবার জন্য শিক্ষকের উচ্চাসন অধিকার করিতে হস্ত-প্রসারণ করি, তাহা অপেক্ষা আর বিড়ম্বনা কি হইতে পারে? আমরা সে উচ্চাশা করি না; আমরা শিক্ষা-সেবক, যাহাতে সাহিত্যের গৌরব হয়, মাতৃভাষার উন্নতি হয়, সুশিক্ষা বিস্তৃত হয়, প্রাণপণে তাহার সাহায্য করা আমাদিগের জীবন-গত আকাঙ্ক্ষা। সেই জন্য আমরা দায়িত্বহীন লেখকদিগের চিন্তাশক্তিকে উত্তেজিত করিবার জন্য লিপিকৌশল সম্বন্ধে কতকগুলি প্রধান প্রধান কথা বলিতে চাহিতেছি, আশা করি সহযোগিগণ এবং সাহিত্যব্যবসায়িগণ এবিষয়ে যথোপযুক্ত আলোচনা করিয়া প্রকৃত উপায় উদ্ভাবন করিবেন।

সরলতা। এক হৃদয়ের ভাব অন্য হৃদয়ে ঢালিয়া দিবার জন্য ভাষারূপ মহাযন্ত্রের আবির্ভাব; সুতরাং একজনের মনের কথা আর একজনকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেওয়াই তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য কার্য্য। ভাষা সেই আত্ম-কর্ত্তব্য কতদূর পালন করিতেছে সর্ব্বাগ্রে সেই দিকে চাহিয়া দেখা আবশ্যক। আমরা সেই জন্য সর্ব্বদা সরল ভাষার পক্ষপাতী। যদি তোমার মনের কথা আমাকে বলিবার জন্য নিতান্তই তোমার ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তাহা এমন সরল ভাষায় বল, যেন বুঝিতে গিয়া আমাকে ইতস্ততঃ করিতে না হয়। বলিবার দোষে অনেক সময়ে হিতে বিপরীত বুঝিয়া ফেলিতে পারি, অথবা তুমি যতদূর বুঝাইতে চাও, ততদূর না বুঝিতেও পারি। সুতরাং লিখিতে বসিলে সর্ব্বদা সরল ভাষা ব্যবহার করিতে চেষ্টা করিও। সরল ভাষার শত্রু নাই, পণ্ডিত মূর্খ সকলেই তাহা অনায়াসে বুঝিতে পারে। "পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল" বলিলে কাহাকেও অভিধান খুঁজিতে হয় না! অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন—সরলতার সীমা আছে কি? যাহা আমার নিকট সরল তাহা তোমার নিকট জটিল বোধ হইতেও পারে, সুতরাং লিখিবার সময়ে কোন্ শ্রেণীর সরল ভাষা ব্যবহার করিব? ইহা জিজ্ঞাসার মত কথা বটে। আমাদের বিবেচনায় পাঠকগণের বুঝিবার যোগ্যতা অনুসারে ভাষার সরলতা নির্ণয় করিয়া লওয়াই ভাল। যে শ্রেণীর পাঠকের জন্য যে

বিষয় লিখিত হইতেছে, সেই শ্রেণীর পাঠক যাহাতে অতি সহজে তাহা বুঝিতে পারে, এইরূপ সরল ভাষা হইলেই যথেষ্ট হয়। পাঠকগণ প্রাণপণে চেষ্টা করিলে তবে বুঝিতে পারিবেন—এরূপ সরলতাকে সরলতা মনে করা অনুচিত। মানুষ সহসা পরের কথায় কাণ দিতে চায় না, নিতান্ত কৌতূহল বশতঃ যদিই বা শুনিতে আসিল, তথাপি অধিকক্ষণ মনোনিবেশ করিয়া শুনিতে চায় না,—ইহা মানুষের স্বভাব। বক্তৃতা-গৃহে গিয়া দেখিও, কতজন বক্তার হাবভাব দেখিতেছে, আর কতজন বা মনোযোগের সঙ্গে তাঁহার কথা শুনিতেছে। ভজনালয়ে গিয়া দেখিয়াছি, ধর্ম্মাচার্য্যের সার-গর্ভ উপদেশের সময়ে কত শ্রোতা ঘুমাইয়া পড়িয়াছে! যাত্রাগানের সময়ে দেখিয়াছি, কত লোকে গান শুনিতে বসিয়াও পার্শ্ববর্ত্তী শ্রোতৃগণের সঙ্গে জল বায়ু, চাউলের বাজার দর, অথবা পরিবারের মঙ্গলামঙ্গলের গল্প যুড়িয়া দিয়াছেন! মানুষ একসঙ্গে অনেকক্ষণ ধরিয়া মনপ্রাণ নিবিষ্ট করতঃ পরের কথা শুনিতে চায় না। সুতরাং নিজের কথা পরকে শুনাইতে হইলে তাহা এমন করিয়া বলা উচিত, যেন সকলেই অক্লেশে তাহা বুঝিতে পারে।

তুমি যাহা লিখিতেছ, লিখিবার পূর্ব্বে একবার ভাবিও, যে দশজনের হাতে সেই লেখা পড়িবে। তাহারা সকলেই সমান দরের বোদ্ধা হইতে পারে না। তুমি বক্তৃতাই কর আর প্রবন্ধই লিখ, তাহার শ্রোতা এবং পাঠক নানা শ্রেণীর হইবেই হইবে। কেহ হয়ত আরম্ভ না করিতেই তোমার মনের কথা বুঝিয়া ফেলিবে; কেহ আবার তোমার সকল কথা ফুরাইয়া গেলেও পার্শ্বচরদিগকে বিস্ময়ের সঙ্গে জিজ্ঞাসা করিবে, "লোকটা এতক্ষণ কি বলিল?" সুতরাং কোন ব্যক্তি বা সম্প্রদায়ের দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া সাধারণতঃ সকলেই যাহাতে তোমার লেখা বুঝিতে পারে, সেইরূপ ভাষা ব্যবহার করিবে। এমন কতকগুলি পাঠক আছেন যে, যতই অস্পষ্ট লেখা হউক না কেন, বুঝিতে তিলার্দ্ধও বিলম্ব হয় না; আবার এমন পাঠকও কপালগুণে যুটিয়া থাকেন, যাঁহারা জলের মত সরল করিয়া লিখিলেও এ জন্মে তোমার লেখা বুঝিবেন না। এই দুই শ্রেণীর লোকের দিকে লক্ষ্য না রাখিলেও চলে।

সংক্ষিপ্ততা। সরলতার সঙ্গে সংক্ষিপ্ততা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু সরল সংক্ষিপ্ত ভাষার যেমন অনেক গুণ, সেইরূপ কতকগুলি দোষও আছে; সেই দোষগুলি যত্নপূর্ব্বক পরিহার করা আবশ্যক। যাহাদের শিক্ষা যৎসামান্য, তাহারা সংক্ষিপ্ত ভাষা ভাল করিয়া বুঝিতে পারে না; তাহাদিগকে কোন তত্ত্ব বুঝাইতে হইলে, ডালপালা লাগাইয়া এককথা দশবার দশ রকম করিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়। এই দোষ পরিহার করিবার জন্য অনাবশ্যক মাত্রায় শব্দবাহুল্য প্রকাশ করিতে নাই, তাহাতে বুঝিবার সুবিধা না হইয়া অনেকেরই ধৈর্য্য-চ্যুতি হইবার সম্ভাবনা। মনঃসংযোগের সঙ্গে পরের কথা শুনিবার প্রবৃত্তির স্বভাবতই বিশেষ অভাব আছে, তুমি ভাষার আড়ম্বর করিয়া সেই অভাব বাড়াইয়া তুলিও না। শব্দবাহুল্যের প্রধান দোষ এই যে, উপক্রম মনে

করিয়া রাখিতে গেলে উপসংহার ভুল হইয়া যায়; ক্ষণেক এইরূপ মনঃসংযোগের পুনঃ পুনঃ চেষ্টা করিতে গিয়া শেষে মনঃসংযোগের প্রবৃত্তি শিথিল হইয়া পড়ে;—তখন কত-ক্ষণে প্রবন্ধ শেষ হইবে তাহাই প্রধান লক্ষ্য হইয়া উঠে! সুতরাং অন্যমনস্ক হইয়া শেষ পর্য্যন্ত পাঠ করিতে গিয়া দেখা যায় যে, যাহা অন্যমনস্ক হইয়া পাঠ করা গিয়াছে তাহা ভাল করিয়া বুঝা হয় নাই! তুমি কত যত্ন করিয়া যাহা লিখিলে, কত অর্থব্যয় করিয়া যাহা ছাপাইলে, কত উপহার উপ-ঢৌকনের সঙ্গে যাহা ঘরে ঘরে পাঠাইলে, কেবল ভাষার দোষে কেহ যদি তাহা ভাল করিয়া বুঝিতে না পারে, সে কি কম দুঃখের কথা? যদি সুলেখক হইতে চাও, তবে "যেন তেন প্রকারেণ" মনের ভাব প্রকাশ করিতে পারিলেই যথেষ্ট হইল মনে করিও না; অথবা যদি কেহ মন দিয়া পড়ে তবে অবশ্যই বুঝিবে বলিয়াও নিশ্চিন্ত থাকিও না। লোকে তোমার লেখা কতটুকু মনোযোগের সঙ্গে পড়িবে তাহা ভাবিয়া দেখিও, এবং যাহাতে মন দিয়া পড়িবার প্রবৃত্তি জন্মে এরূপ ভাষা ব্যবহার করিও। এই সকল দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিতে শিখিলে তাহার পাঠক আপনিই জন্মিয়া যাইবে।

কেহ কেহ অতিমাত্রায় সংক্ষিপ্ততা ভাল বাসেন। ঠিক যে কয়টি কথা নিতান্ত না বলিলে ভাব প্রকাশ হইবার উপায় নাই, তাহার অধিক একটি কথাও ইহাঁরা ব্যবহার করিতে চাহেন না। এই শ্রেণীর লেখকগণ যথাসম্ভব অল্পাক্ষর খুঁজিয়া বেড়ান, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের লেখা বুঝিবার পক্ষে অনেকেরই অসুবিধা হইয়া থাকে। শরীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে সুসার খাদ্য দ্রব্য সুন্দররূপে পাকস্থলীতে পরিপাক করাইতে হইলে, তাহার সঙ্গে কিছু কিছু খোশা ভুষিও মিশাইয়া দিতে হয়,—ভাষা-প্রয়োগ-কালেও কিয়ৎপরিমাণে এই নিয়ম প্রতিপালন করা আবশ্যক। ডালপালা না থাকিলে ভাবের গাছে আরোহণ করা সক-লের পক্ষে সহজ হয় না; সেইজন্য অতি-মাত্রার সংক্ষিপ্ততা পরিহার করাই ভাল।

অনেকে হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, আমা-দের পরামর্শ অনুসারে কেমন করিয়া কায চলিবে?—আমরা সরলতাও চাই, শব্দ-বাহুল্যও চাই, আবার সংক্ষিপ্ততাও ছাড়িতে চাহিতেছি না। ইহার একটিমাত্র সদুত্তর শুনিয়াছি। যে কোন ভাব প্রকাশ করিতে চাও, তাহাকে নানা কথায় নানা প্রকারে প্রকাশ কর, কিন্তু দীর্ঘ-পদ-বিন্যাস করিও না। এক কথাই পাঁচ রকমে বুঝাও; কিন্তু সকল রকম বুঝানই যেন সরল ও সংক্ষিপ্ত হয়। এরূপ করিয়া লিখিতে পারিলে তাহা বুঝিতে অসুবিধা বা আলস্য জন্মিতে পারে না। ইহাকে অনেকে পুনরুক্তি দোষ বলিতে পারেন; কিন্তু ইহা প্রকৃতপক্ষে ভাবগত পুনরুক্তি হইলেও ভাষাগত পুনরুক্তি নহে। ইহা এমন সুকৌশলে লিখা যাইতে পারে যে, সহজে ইহাকে পুনরুক্তি বলিয়া ধরিতে পারা যায় না। ইহাতে অবশ্যই যোগ্যতা চাই—পড়িবামাত্রই যাহাতে পুনরুক্তি বলিয়া ধরা না পড়ে, সেদিকে বিলক্ষণ দৃষ্টি চাই। সুলেখকমাত্রেই এই শ্রেণীর পুনরুক্তি দোষে দোষী, কিন্তু তাঁহাদের লিপি-কৌশ-

লের যোগ্যতাগুণে দোষও সদ্গুণে পরিণত হইয়া থাকে।

শব্দ নির্ব্বাচন। ভাষা শব্দময়ী—কতকগুলি শব্দই তাহার অস্থি-মজ্জা এবং প্রাণ। শব্দ আবার ভাবের ভারবাহী ভৃত্য। প্রত্যেক ভাষাতেই সহস্র সহস্র শব্দ আছে, তাহারা আপন আপন শক্তি অনুসারে ভাবের বোঝা বহন করিয়া থাকে। কিন্তু কতকগুলি শব্দ সচরাচর শুনিতে শুনিতে আমাদের নিকট চিরপরিচিত হইয়া গিয়াছে, আর কতকগুলি ব্যবহারাভাবে নিতান্ত অপরিচিতের মত অন্ধকার কোণে মুখ লুকাইয়া পড়িয়া রহিয়াছে! একটি ভাবপ্রকাশ করিতে হইলে একাধিক শব্দ ও প্রতিশব্দ পাওয়া যায়, তাহার সকলগুলিই যদি একার্থবাচক হয়, তবে কাহাকে ব্যবহার করিব, আর কাহাকে পরিত্যাগ করিব? আমাদের বিবেচনায় পরিচিত শব্দগুলিই ব্যবহার করা উচিত; তাহাদের গুণ এই যে, তাহারা রাজপ্রাসাদ হইতে দরিদ্রের পর্ণকুটীর পর্য্যন্ত বেড়াইয়া বেড়াইয়া সকলেরই নিকট চিরপরিচিত হইয়াছে, তাহাদের দ্বারা ভাবের বোঝা পাঠাইয়া দিলে নিরাপদে তাহা সকল স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবে। যে সকল শব্দ সচরাচর ব্যবহৃত হয় না, আমরা তাহাদের অর্থও ভাল করিয়া বুঝি না, মুখচেনা অপরিচিত লোকের মত আভাসে আভাসেই তাহাদিগের অর্থ ধরিয়া লইয়া থাকি। সেরূপ শব্দ ব্যবহার করিলে লোকে আমাদের মনের ভাব কখনই পরিষ্কাররূপে বুঝিতে পারিবেনা।

আমরা সচরাচর যে সকল শব্দ ব্যবহার করিতেছি, তাহার সকলগুলিই পরিচিত বটে, কিন্তু সকলগুলিই বিশ্বাসী আত্মীয় নহে;—অনেকগুলি বিজাতীয় বিধর্ম্মাক্রান্ত, বিদেশজাত, এবং অল্পদিনের পরিচিত। যদিও উঠিতে বসিতে সর্ব্বদাই তাহাদের সঙ্গে ঘেঁষাঘেঁষি হইতেছে, তথাপি তাহাদিগকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিতে পারি না, তাহাদিগের হাতে ভাবের বোঝা সমর্পণ করিয়া একেবারে নিশ্চিন্ত হইতে পারি না। যদি স্বদেশীয় ভাষায় নিতান্তই শব্দাভাব হয়, তাহা হইলে অগত্যা ইহাদিগকে ধরিয়া কায চালাইয়া লইতে হয়; নচেৎ সাধ্যমত ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিলেই ভাল। ইহাতে যে কেবল ভাষার বিশুদ্ধতা রক্ষা হয় তাহা নহে, কতকাংশে ইহাতে ভাষার শক্তিও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যাহাদের ভাষায় আবশ্যকানুযায়ী শব্দ নাই, তাহাদিগকে বাধ্য হইয়াই অন্যের নিকট ঋণ গ্রহণ করিতে হয়; কিন্তু যেখানে ঋণ গ্রহণের সেরূপ আবশ্যকতা নাই, সেখানে এই সকল অনাত্মীয় শব্দ ব্যবহার করা আমরা প্রার্থনীয় মনে করি না—ঘরে ধন-রত্ন পুঁতিয়া রাখিয়া পরের ঋণ-জালে জড়িত হওয়া আমরা ন্যায়-সঙ্গত মনে করিনা।

ছাত্রজীবন।

৩

রোগ নির্ণীত হইলে ঔষধ নির্ব্বাচন ও চিকিৎসা প্রয়োগ করিতে অধিক বিলম্ব হয় না; নচেৎ অনুমানে ঔষধ প্রয়োগ করিলে কেবল পণ্ড-শ্রমই সার হইয়া থাকে। সামান্য একটি 'মুষ্টিযোগে' যাহার প্রতিকার হইতে পারে, রোগের মূল না জানিতে পারিয়া তাহারই উপশমের জন্য অনেক সময়ে সুবিজ্ঞ চিকিৎসককেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। আমাদের বর্ত্তমান ছাত্রজীবনে যে শত শত শারীরিক, মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক মহারোগ প্রবেশ করিয়াছে, পিতা মাতা শিক্ষক ও শাসনকর্ত্তাগণ নিয়ত তাহা একবাক্যে স্বীকার করিতেছেন। কেহ শারীরিক ব্যাধি-জরা দূর করিবার জন্য ব্যায়ামশালা প্রতিষ্ঠিত করিতেছেন, কেহ নৈতিক দুর্ব্বলতা দূর করিবার জন্য নীতি-পুস্তক লিখিত, মুদ্রিত ও অধ্যাপিত হইবার উপদেশ দিতেছেন, কেহ বা একালের সমুদায় শিক্ষা-প্রণালী পরিবর্জ্জন করিয়া সে কালের ব্রহ্মচর্য্যের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছেন। অনেকে কথা লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছেন, দুই চারি জন স্বদেশ-হিতৈষী নীরবে কার্য্যক্ষেত্রেও অগ্রসর হইয়াছেন। যুবকদিগের "উচ্চশিক্ষা-সমিতি" নামে কলিকাতায় একটি সভা সংস্থাপিত হইয়াছে;—মাননীয় বিচারপতি টটেনহাম ও ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রদ্ধাভাজন ধর্ম্মপ্রচারক প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও স্বদেশবৎসল সুরেন্দ্রনাথ, কালীচরণ, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি দেশের গণ্যমান্য মহাত্মাগণ তাহাতে যোগদান করিয়াছেন। চারিদিকেই যখন ছাত্রজীবন লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে, তখন কথঞ্চিৎ উপকারজনক সুশিক্ষার প্রচলন হইবার আশা করা যাইতে পারে। এই সুসময়ে রোগনির্ণয় ও তাহার মূল কারণ নির্ব্বাচনের জন্য আমরা পিতা, মাতা, শিক্ষক ও শাসনকর্ত্তাদিগকে বিশেষরূপে অনুরোধ করি; আমাদের ক্ষুদ্র যত্ন-চেষ্টায় যতদূর জানিয়াছি, আমরাও তাহার আলোচনা করিতেছি। আশা করি ছাত্রজীবনের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষিগণ আমাদিগের এই ক্ষুদ্র আলোচনায় উপেক্ষা না করিয়া বিশেষভাবে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইবেন।

আজ কাল যে কোন বিদ্যালয়ে প্রবেশ কর, দেখিবে ছাত্রদিগের শারীরিক অবস্থা প্রীতিজনক নহে। কাহারও মুখেই যৌবন-সুলভ লালিত্য-জড়িত স্বাভাবিক প্রফুল্লতা নাই, কেমন এক উদ্যম-হীনতার কালিমা-রেখা যেন যৌবনেই ললাটদেশ আকুঞ্চিত করিয়াছে! যদি নিম্ন হইতে সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী পর্য্যন্ত সমুদায় বালকের মস্তকের পরিধির পরিমাপ কর এবং তাহাদিগকে একে একে দাঁড়ি-পাল্লায় উঠাইয়া যদি তাহাদের দৈহিক ভারত্বের পরিমাণ নির্ণয় কর, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, যে বয়সে যাহার যে পরিমাণ উন্নতি হওয়া স্বাভাবিক তাহা হয় নাই,

এবং যে পরিমাণ অবনতি হওয়া অস্বাভাবিক তাহারই সূচনা হইয়াছে! যদি তাহাদের মানসিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে অধিকাংশ ছাত্রেরই মানসিক চিত্ত-বিক্ষেপ আরম্ভ হইয়াছে, গভীর মনঃসংযোগের পরিবর্ত্তে উপরে উপরে ভাসিয়া বেড়াইবার প্রবৃত্তি উৎকর্ষ লাভ করিতেছে! মনের বলই মানসিক স্বাস্থ্যের পরিচায়ক। মনের বল থাকিলে একটু আধটু প্রলোভন কুসংসর্গে মানুষকে পদ-দলন করিতে পারে না। কিন্তু ছাত্রজীবনের প্রারম্ভ হইতেই মনের বলের শোচনীয় অভাব পরিদর্শন করিলে হৃদয় অবসন্ন হইয়া পড়ে। বিদ্যালয়ে থাকিয়া যাহারা সত্যের সম্মান করিতে পারিতেছে না, হৃদয়ের স্বাভাবিক স্বাধীনতাকে পদে পদে বলি-দান দিতেছে, তাহারা যখন সংসার-পরীক্ষায় পতিত হইবে, তখন তাহাদিগের নিকট কি শুভ-ফল আশা করিব? ছাত্রগণের বাহিরের ও ভিতরের আচার অনুষ্ঠান এবং কথোপকথন দীর্ঘকাল পরীক্ষা করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে তাহারা নীতি ও ধর্ম্মের সম্মান প্রায় ভুলিয়া গিয়াছে; কুক্রিয়া ও কদভ্যাস পরিত্যাগ করা দূরে থাকুক, তাহা সমর্থন করিবার জন্য যুক্তি-জাল বিস্তার করিতেছে। মিথ্যা ক্ষুদ্রতার জননী, নীচাশয়তার আশ্রয়, কাপুরুষতার প্রবর্ত্তক। ইহাতে আত্ম-মর্য্যাদা একেবারে বিনষ্ট হইয়া যায়, আপনার চক্ষেই আপনাকে হেয় হইতে হয়! অথচ এই মিথ্যা ছাত্রজীবনেই তাহাদের সুকোমল হৃদয় অধিকার করিয়াছে! "বিদ্যা দদাতি বিনয়ং"—ইহা ক্রমেই পুস্তকের কথামাত্রে পর্য্যবসিত হইতেছে! নদীতীরে, রাজ-পথে, বিশ্রাম-সময়ে ছাত্রগণ যে সকল কথোপকথন ও আচরণ করিয়া থাকে, আমরা তাহার আদর্শ সংগ্রহ করিয়া আপনারাই লজ্জিত হইয়াছি। পাঠকগণের সম্মুখে তাহা উদ্ধৃত করিতে অক্ষম! যদি কাহারও কৌতূহল হয়, পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন যে, তাহারা ভাষা ও ব্যবহারে সুনীতি ও সুরুচিকে মানিয়া চলা সকল সময়েই আবশ্যক জ্ঞান করে না। ধর্ম্ম তাহাদিগের নিকট প্রিয়তম পদার্থ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে না,—ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাহারা যাহা চিন্তা করে, সকল সময়ে মুখ ফুটিয়া বলিতে পারে না বলিয়া আমরা মনে করি তাহারা ধর্ম্ম-প্রিয়। তাহারা গুরুজন-ভয়ে বাহিরে বাহিরে যতটুকু ধর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহার মধ্যেও কপটতা কতখানি তাহা সহজে নির্ণয় করা যায় না! সকল বিদ্যালয়েই দুই চারিজন সাধু-স্বভাব নীতি-পরায়ণ ধর্ম্মভীরু সুশীল ও বিনয়ী ছাত্র আছেন—তাঁহারা দেশের আশা-প্রদীপ। আমরা এ প্রবন্ধে ছাত্রজীবনের রোগ-নির্ণয় করিতেছি, সুতরাং আমাদের বর্ত্তমান আলোচনার সহিত তাঁহাদের কোন সংস্রব নাই। আমরা দুই চারিটির স্থানে এইরূপ শত শত ছাত্র দেখিতে চাই, সেই জন্যই রোগ-নির্ণয়ের আবশ্যক হইয়াছে!

ছাত্রজীবনের রোগের মূল নির্ণয় করিতে বসিলেই পিতা মাতা, শিক্ষক, বিশ্ববিদ্যালয়, এবং ছাত্রগণকে অংশানুসারে দোষের ভাগ বিতরণ করিতে হইবে। যাহা সত্য তাহা চিরদিনই সত্য,—রামের বিরুদ্ধ হইলেও তাহা যেমন সত্য, শ্যামের প্রতিকূল হইলেও সেইরূপ। সত্য কাহারও মুখাপেক্ষা করে

না, সুতরাং সত্য কারণ নির্ণয় করিতে হইলে কাহারও মুখের দিকে চাহিলে চলিবে না। সত্যের অনুরোধে সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, ছাত্রজীবনের সকল দোষের জন্যই ছাত্রগণ ও বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালীকে অভিসম্পাত করা যাইতে পারে না—আমাদিগকেও অংশানুসারে কিয়ৎপরিমাণে তাহার ফলভোগ করিতে হয়। শিক্ষাপ্রণালীতে শত দোষ আছে, ছাত্রজীবনে তদপেক্ষাও শত শত কুঅভ্যাস আছে—তাহার কথা আজ তুলিয়া রাখ। আগে বিচার করিয়া দেখ, আমাদের দায়িত্ব কতদূর। ছাত্র ও শিক্ষাপ্রণালীকে দোষী না করিয়া কেবল নিজেরা চেষ্টা করিলে আমরাই কতদূর উন্নতি বিধান করিতে সক্ষম, আজ তাহারই আলোচনা করিব।

আমরা শিক্ষার উচ্চলক্ষ্য হারাইয়া শিক্ষাকে উপার্জ্জনের উপায়-স্বরূপ গণনা করিয়া থাকি; এবং তজ্জন্য অল্পব্যয়ে অধিক লাভ পাইবার বাণিজ্য-নীতি আমাদের পরিবারবর্গের মূলমন্ত্র হইয়াছে। গৃহিণীর সর্ব্বাঙ্গে স্থান না থাকিলেও অলঙ্কার সংযোগ করিবার আয়োজনের অভাব নাই, গৃহের ভিতর-বাহিরে অনাবশ্যকীয় অপব্যয়ের ভূরি ভূরি নিদর্শন বর্ত্তমান রহিয়াছে, অথচ সেই সকল গৃহের ছাত্রগণের শিক্ষাকার্য্যে কিরূপ ব্যয় হইতেছে, তাহার দিকে চাহিয়া দেখ। একটি ছাত্রকে উচ্চশিক্ষা প্রদান করিবার জন্য রাজা দশ হাজার টাকার উপর ব্যয় করেন; কিন্তু যাঁহার পুত্র, তাঁহার সঙ্গতি সত্ত্বেও তিনি তিন হাজার টাকা ব্যয় করেন কি না সন্দেহ। রাজা যে পরিমাণ ব্যয় করিতেছেন তাহাতে শিক্ষা-দান-কার্য্যের সহায়তা হইতেছে, কিন্তু ছাত্রগণের শারীরিক উন্নতির জন্য পিতা মাতার প্রদত্ত অর্থই একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু আমাদের ছাত্রগণ কি খাইয়া কি পরিয়া সাহিত্য, গণিত, বিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্রের জটিল সমস্যা অধ্যয়ন করিতেছে, তাহার দিকে কখন চাহিয়াছ কি? যে পরিমাণ মানসিক শ্রম, তদুপযোগী আহারাদি আবশ্যক। আহার নাই, অধ্যয়ন আছে; প্রতিকার নাই, ক্ষয় আছে; ইহাতে যাহা হইতে পারে, আমরা সেইরূপ ফলই লাভ করিতেছি। বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বেই ছাত্রগণ অকর্ম্মণ্য, ক্ষীণ, রোগ-জীর্ণ দেহ-যষ্টি বহন করিতেছে! ইহাতে জাতীয় দীর্ঘায়ু নষ্ট হইতেছে, গৃহস্থাশ্রমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য দুঃখময় হইতেছে, এবং সংসার-কাহিনী যন্ত্রণার বিলাপে পূর্ণ হইতেছে। অনেকে বলেন, এইরূপ খাইয়া পরিয়াই পিতৃপিতামহেরা শতবর্ষজীবী হইয়াছেন, আমাদের অল্পায়ু কেবল কলির যুগধর্ম্ম! যাঁহারা উনবিংশ শতাব্দীতে জন্মিয়াও সপ্তদশ শতাব্দীর স্মৃতি-গহ্বরে বাস করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া বুঝাইব তাহার ভাষা নাই!

আমরা কথায় কথায় যে আর্য্য পিতামহদিগের দোহাই দিয়া সকল তর্কের মীমাংসা করিয়া ফেলি, সেই পূজনীয় আর্য্যপদবী হইতে আমরা কত নিম্নে না অবতরণ করিয়াছি! আর্য্যত্ব কি শূন্য-গর্ভ, অর্থ-হীন, শব্দময় নাম? তবে সে নামে আজ আর হিমাচল বিচলিত হয় না কেন, সাগর সসম্ভ্রমে সঙ্কুচিত হয় না কেন, পৃথিবীর নরনারী গললগ্নী-

কৃত্তবাসে আমাদের চরণতলে দণ্ডবৎ করে না কেন? আর্য্যত্ব—জীবন! সে জীবন নাই, তাই শূন্য-গর্ভ নাম আমাদের নামের সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া জগতের নিকট উপহাসের সামগ্রী হইতেছে! শিক্ষাই আর্য্যত্বের বিজয়-নিশাণ, মানবের দেবত্বলাভই তাহার জ্বলন্ত গৌরব! আর্য্য-ধর্ম্মনীতি উদ্‌ঘাটন কর, তত্ত্ব-নিপুণ পণ্ডিতগণ তাহার ছত্রে ছত্রে এই কথার প্রমাণ-শ্লোক দেখাইয়া দিবেন। যথা-কালে উপনয়ন দিয়া নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত শিক্ষাবিধান করিয়া সংসারাশ্রমের উপযুক্ত হইলে তবে আর্য্যগণ আর্য্যযুবককে গার্হস্থ্য-ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে দিতেন। তাঁহারা সংসারকে পুণ্যতপোবন বলিয়া দর্শন করিতেন, তাঁহা-দিগের আশৈশব নীতিও সেই উচ্চলক্ষ্য সাধন করিত! আমরা কোন্ ধর্ম্ম, কোন্ শাস্ত্র, কোন্ নীতির উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা সমাধা হইবার পূর্ব্বে বালকবিবাহের অনুষ্ঠান করিতেছি? অষ্টমবর্ষে গৌরী-দানের শাস্ত্র আছে, ব্যবস্থা আছে, দেশাচারও বর্ত্ত-মান, কিন্তু অশিক্ষিত, অসমাবর্ত্তিত, দুগ্ধ-পোষ্য বালকদিগের বিবাহ দিবার বিধান এবং অনুমোদন কোন্ আর্য্যশাস্ত্রসম্মত বিধি? এই কুক্রিয়ামূলক দেশাচার কি আর্য্য-ধর্ম্ম-বিরোধী নহে, আর্য্য আদর্শের অবমাননা-কারী নহে?—অথচ এই বাল্য-বিবাহের শৃঙ্খলে ছাত্রগণকে বাঁধিয়া আমরা কত অপ-কার না করিতেছি? আমরা অনার্য্যজুষ্ট দেশাচার ও কুশিক্ষালব্ধ চিরন্তন (!) প্রথার বশবর্ত্তী হইয়া, কখন বা বৃদ্ধা পিতামহীর অসার কৌতূহল-চরিতার্থতার জন্য বালক-দিগকে উদ্বাহ-সূত্রে আবদ্ধ করিয়া ইন্দ্রিয়-সংযমের পরিবর্ত্তে, আর্য্যজনোচিত ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষার পরিবর্ত্তে, তাহাদিগকে কি ধ্বংসের পথে আনয়ন করিতেছি না? ছাত্রজীবনের দৈহিক ও নৈতিক অধিকাংশ রোগের মূলেই বাল্যবিবাহের বিষময় কীট!—তাহার জন্য অপরাধ কাহার?

মানসিক দুর্ব্বলতা কোথা হইতে আসিল? শরীর এবং মনের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ যে, শারীরিক দুর্ব্বলতার উপরে মানসিক দুর্ব্বলতা অনেক পরিমাণে নির্ভর করিয়া থাকে। ইহা ব্যতীতও, এক সময়ে বহুবিষয়ে চিন্তা করিতে গিয়া ছাত্রগণ কোনটিই ভাল করিয়া ভাবিতে পারে না। দেশাচার তাহাকে পুত্রকন্যার জনক করিয়াছে, বিশ্ববিদ্যালয় তাহার স্কন্ধে সাধ্যাতীত পাঠ্যপুস্তকের বোঝা চাপাইয়া দিয়াছে, দুর্ভাগ্যক্রমে হয়ত সাংসা-রিক অন্নবস্ত্রের চিন্তাও তাহার প্রাণকে সময়ে সময়ে আকুল করিয়া তুলিতেছে;—এ অব-স্থায় চিত্ত-বিক্ষেপ স্বাভাবিক। মানসিক দুর্ব্বলতার মূলেও ছাত্র এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতকার্য্যতা অপেক্ষা আমাদিগেরই অধিক দায়িত্ব বর্ত্তমান রহিয়াছে!

নৈতিক দুর্দ্দশা কেমন করিয়া ছাত্র-জীবনে প্রবেশ করিল? যে দেশে আহার, বিহার, শয়ন, উপবেশন, জীবনের সকল কার্য্যই ধর্ম্মমূলক বলিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিতেছেন, সে দেশের ছাত্রজীবন নীতি-হীন হইল কেন? ইহার দুই শ্রেণীর উত্তর সচরাচর শুনিতে পাই;—এক শ্রেণীর উত্তর এই যে, বিপ্লব-কারিণী পাশ্চাত্য-শিক্ষা ছাত্রজীবনকে ধর্ম্মহীন করিয়া ক্রমে নীতি-হীন করিয়াছে; আর এক শ্রেণীর উত্তর

এই যে, দেশজ কুসংস্কার ও কপটতা দূর না হইলে নৈতিক উন্নতি হওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আমরা কেবল কারণ অনুসন্ধান করিতেছি, ঔষধ ব্যবস্থা করিতেছি না, সুতরাং অদ্য ইহার বিস্তৃত আলোচনার স্থান নাই। আমাদের মতে উভয় উত্তরের মূলেই কথঞ্চিৎ সত্য আছে। ইংরাজি শিক্ষা যে কুশিক্ষা, তাহা আমরা স্বীকার করি না; বরং ইহাই যে সময়োপযোগী উৎকৃষ্ট শিক্ষা, তাহা বিশদরূপে প্রমাণ করিতে প্রস্তুত *। কিন্তু ইংরেজী শিক্ষাপ্রণালীর মধ্যে ধর্ম্মশিক্ষার ব্যবস্থা না থাকায় ধর্ম্মকে ছাত্রগণ কুসংস্কার বলিয়া বুঝিতেছে। ছাত্রগণের ধারণা এইরূপ, যাহা বিদ্যালয়ে অধীত হয় না, তাহা অধ্যয়নের অযোগ্য। সুতরাং ধর্ম্মকে তাহারা বিদ্যালয়ে অনাদৃত, অনধীত দেখিয়া, তাহার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া পড়ে। তাহার পর বিদ্যালয়ে যে শিক্ষা পায়, দেশের আচার ব্যবহার তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত দেখিয়া ধীরে ধীরে কপটতা অভ্যাস করিতে বাধ্য হয়। বিদ্যালয়ে যুক্তি, তর্ক ও প্রমাণের সঙ্গে পড়িয়া আসিল যে জগতের সকল জাতিই সমান, ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ভেদ-বিচার কেবল কুসংস্কারমাত্র! বাড়ীতে আসিয়া দেখিল তাহার বিপরীত,—কেবল তাহাই নহে; কেন যে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-ভেদ-বুদ্ধি ও তদনুরূপ আচরণ করিতে হইবে, তাহা কেহ তাহাকে বুঝাইল না, অথবা যে পণ্ডিতম্মন্য পুরোহিত বুঝাইতে আসিলেন, তিনি তর্কে পরাস্ত হইয়া যুগধর্ম্মকে অভিসম্পাত করিতে করিতে গৃহে প্রস্থান করিলেন। ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে স্বাধীন অনুসন্ধানের উপদেশ পাইল, যাহা সত্য তাহাকে অবলম্বন করিবার যুক্তি ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিল; কিন্তু গৃহে আসিয়া তাহার বিপরীত দৃষ্টান্ত এবং বিপরীত অনুষ্ঠান করিতে বাধ্য হইল, অথচ তাহার কোন যুক্তি পাইল না। কপটতা ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল; আকাশে প্রস্তর নিক্ষেপ করিলে তাহা যেমন নিশ্চয়ই ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হইবেই হইবে, এইরূপ আচরণের প্রশ্রয় দিলেও সেইরূপ কপটতা জন্মগ্রহণ করিবেই করিবে।

এই সকল শারীরিক, মানসিক এবং নৈতিক অবনতির স্রোতে পড়িয়া একালের ছাত্রজীবন আশানুরূপ শুভফল প্রসব করিতে পারিতেছে না। বিদ্যালয়ে যাহাদিগকে দেখিয়া মনে কত আশা পোষণ করিতেছি, সংসারের কার্য্যক্ষেত্রে আসিয়া তাহাদিগের কার্য্যের দিকে ফিরিয়া চাহিতে প্রবৃত্তি হইতেছে না! এরূপ অবস্থার প্রতিকার না হইলে দেশের প্রকৃত উন্নতি সাধিত হইতে পারে না। আমরা নির্ব্বন্ধ সহকারে পিতা, মাতা, অভিভাবক, শিক্ষক এবং শিক্ষাবিধাতা গবর্ণমেণ্টকে অনুরোধ করি, তাঁহারা ইহার প্রতিকারের প্রকৃত সদুপায় নির্দ্ধারণ করিয়া দেশের প্রকৃত কল্যাণ সাধন করুন।

* ইংরাজের ভাষা-শিক্ষায় আপত্তি নাই; ইংরাজ-প্রবর্ত্তিত প্রণালীতেই অমঙ্গল, সুতরাং আপত্তি।

শিঃ পঃ সঃ।

গল্প নহে।

বিগত কয়েক মাসের মধ্যে রাজসাহীর অন্তর্গত লালপুর থানা এবং আড়ানি আউট্ পোষ্টের অধীন ৪।৫ ক্রোশ স্থানের মধ্যে যত লোক ব্যাঘ্র কর্ত্তৃক নিহত হইয়াছে, তাহার যথাপ্রাপ্ত বিবরণ ;—

হত ব্যক্তির নাম।	বয়স—বৎসর।	গ্রামের নাম।	যে সনের যে তারিখে হত হয়।
১। শঙ্কর	৭	বাগাতবাড়ী	১৮৯০।১৭ই জুলাই।
২। কল্যা	২	হাসনপুর	১৮৯১।২রা জানুয়ারী।
৩। ছবিলাল	১২	ঐ	ঐ ঐ ঐ
৪। দুখু	৩	পাঁচুবাড়িয়া	ঐ ১৭ই ঐ
৫। মনোমোহন	৮	বাগাতবাড়ী	ঐ ১১ই ঐ
৬। পাঁচু	৭	কৃষ্ণরামপুর	ঐ ২১এ ঐ
৭। মাধব	১৩	পাঁচুবাড়িয়া	ঐ ২৩এ ঐ
৮। সদয়	১১	কচুয়া	ঐ ১লা ফেব্রুয়ারি
৯। নাছের	৮	বড়বড়িয়া	ঐ ১৬ই ঐ
১০। তমেজ	১৬	বিদিরপুর	ঐ ২৮এ ঐ
১১। সাধুচরণ	৬	ঢুসপাড়া	ঐ ১১ই মার্চ্চ
১২। ছেফাৎ	৫	ইশ্‌মানীপুর	ঐ ১৩ই ঐ
১৩। রাজেন্দ্র	১০	জয়কৃষ্ণপুর	ঐ ২৯এ ঐ
১৪। আছরপী	৫০	ধরবিলা	ঐ ১৮ই এপ্রিল
১৫। ছেদাৎ	১৬	শেরপাড়া	ঐ ২রা মে
১৬। সীতারাম	১১	হাসনপুর	ঐ ৩রা ঐ
১৭। কুতব	৯	সুবর্ণপুর	ঐ ২০এ ঐ
১৮। ছাবের	১১	হাসনপুর	ঐ ২১এ ঐ
১৯। গোকুল	১১	পাঁচুবোড়	ঐ ১৪ই জুন
২০। দিয়ানৎ	১৭	বাঁশবেড়ে	ঐ ১৫ই ঐ
২১। লছমী	৫০	ঐ	ঐ ১৬ই ঐ
২২। ঠাণ্ডা	৫	ধরবিলা	ঐ ২৪এ ঐ
২৩। খুদী	৯	বোয়ালিয়াপাড়া	ঐ ২৭এ ঐ
২৪। বাছের	১৪	মোড়দহ	ঐ ১১ই জুলাই

হত ব্যক্তির নাম।	বয়স—বৎসর।	গ্রামের নাম।	যে সনের যে তারিখে হত হয়।	
২৫। কছের	২৫	বড়রড়িয়া	ঐ	২রা আগষ্ট
২৬। অবরী	৫	রামপাড়া	ঐ	৪ঠা ঐ
২৭। ফুলছন	৪	নখনবেড়ে	ঐ	৮ই ঐ
২৮। রদাৎ	৫	সাইদপাড়া	ঐ	৯ই ঐ
২৯। রজনীকান্ত	৫	হাসনপুর	ঐ	১১ই ঐ
৩০। বাছের	৫	কামারহাটী	ঐ	১৪ই ঐ
৩১। ছায়রন	২॥	জোতছাতান	ঐ	২৪এ ঐ
৩২। নাছের	১১	ছালামপুর	ঐ	২৫এ ঐ

এই ৩২ জন হত ব্যক্তির মধ্যে ২৫ জন পুরুষ ও ৭ জন স্ত্রী। এতদ্ব্যতীত আড়ানি ও তৎসন্নিহিত গ্রাম-সমূহে ১১ জন পুরুষ ও ১২ জন স্ত্রীলোকের মৃত্যু-সংবাদ আমরা পাইয়াছি, কিন্তু তাহাদের বিশেষ বিবরণ এ পর্য্যন্ত পাই নাই। এই তালিকায় দেখা যাইতেছে, এ পর্য্যন্ত ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক ৫৫ জন লোকের হত্যার সংবাদ আমরা সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি। কিন্তু ইহাই যে প্রকৃত সমষ্টি, তাহা বলা যায় না। আমাদের বিশ্বাস, পুলিশকর্ত্তৃক গবর্ণমেণ্টে যে সকল রিপোর্ট প্রেরিত হইয়াছে, তাহার তদন্ত করিলে এ সমষ্টি আরও বাড়িয়া যাইবে।

উপরে যে তালিকাটি প্রদত্ত হইল, তাহা পাঠ করিয়া পাঠক একটিবার ভাবিয়া দেখুন। শিক্ষা-পরিচয়ে এরূপ প্রবন্ধের অবতারণা বৈধ কিনা, এবিষয়ে অনেকের সন্দেহ হইতে পারে; কিন্তু আমাদের হৃদয়ের ব্যাকুলতার নিকটে যুক্তি তর্ক স্থান পায় নাই, তাই আমরা পাঠককে এই অপ্রত্যাশিত উপহার দিলাম। জগদম্বার আগমনে আজ বঙ্গ ভূমি আনন্দে নিমগ্ন; এই আনন্দের সময়ে শত শত অশ্রু-সিক্ত মুখ-মণ্ডলের চিত্র হৃদয়ে একবার অঙ্কিত করিতে পারিলে তাহাতেও এক প্রকার উচ্চ শ্রেণীর শিক্ষালাভ হইতে পারে। না হয় তাহাও বা নাই হইল; কিন্তু মনে করিয়া দেখ, আত্ম-রক্ষা আগে, না শিক্ষা আগে? আত্ম-রক্ষার জন্য শিক্ষার প্রয়োজন বটে, কিন্তু অনিবার্য্য নহে। অসভ্য বন্য জাতিরা শিক্ষার নামও শুনে নাই; কিন্তু ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু হইতে আত্ম-রক্ষা করিতে তাহাদের ন্যায় আর কেহ পটু নহে। সভ্য দাস-ব্যবসায়ী ইউরোপবাসীর হাতে নিগ্রো কাফ্রি প্রভৃতি অসভ্য জাতির নিস্তার নাই বটে, কিন্তু আফ্রিকার ভয়ানক সিংহ-ব্যাঘ্রের ভীষণ দণ্ড হইতে তাহারা চিরদিন বাঁচিয়া আসিতেছে।

বঙ্গদেশে যতগুলি প্রধান জেলা আছে, তন্মধ্যে রাজসাহী অন্যতম। এ জেলায় রাজোপাধি-বিশিষ্ট বহুতর জমিদার আছেন, উচ্চশিক্ষার জন্য রাজসাহী কলেজ আছে, সাধারণের স্বার্থ-রক্ষা, স্থানীয় উন্নতি, এবং রাজ-নৈতিক আন্দোলনের জন্য রাজসাহী এসোসিয়েশন নামে রাজসাহীর সমবেত শিক্ষিত এবং ধনীদিগের সভা আছে, শিক্ষার সংস্কার এবং সাহিত্যের সেবা কল্পে শিক্ষা-

পরিচয়-সমিতি * প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, চারি পাঁচটি মুদ্রা-যন্ত্র বর্ত্তমান আছে, এবং চারি পাঁচখানি সংবাদ ও সাময়িক পত্র নিয়মিত-রূপে চলিতেছে। এ হেন রাজসাহীর বুকের উপর, দিবা দুই প্রহরে, ইংরাজ-প্রতাপের মধ্যাহ্ন-তপনে ব্যাপারটা কি হইতেছে? না, দীর্ঘে ৪।৫ ক্রোশ এবং প্রস্থে ৩।৪ ক্রোশ ব্যাপিয়া একটি ক্ষুদ্র গণ্ডীর ভিতরে (লোকের অনুমান, একটি বা দুইটিমাত্র) বাঘে দিনের পর দিন জীবন্ত মানুষ ধরিয়া খাইতেছে, অথচ তাহার কোন প্রতিবিধান হইতেছে না!! শাসন-যন্ত্রের ঊর্দ্ধস্তরে এসংবাদ উঠিয়াছে কি না, তাহা জানিবার উপায় আমাদের নাই; কিন্তু সাধারণে যে ইহার কোন সংবাদ রাখেন না, সংবাদপত্র তাহার প্রমাণ দিবে।

এরূপ হইল কেন? মান্দ্রাজে কোথায় কয়েক জন লোক অন্নাভাবে মরিয়াছিল, তাহার তদন্তে স্বয়ং গবর্ণর বাহাদুর ব্যাপৃত! একটা লোক উদ্বন্ধনে বা গাড়ির চাপে মরিলে প্রত্যেক সংবাদপত্রে অন্ততঃ একবার করিয়া তাহার নাম কীর্ত্তন হইতে দেখি; কিন্তু দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া এই সর্ব্বনাশের কাণ্ড ঘটিতেছে, অথচ এই অন্ধকারের সংবাদ আলোকে আসিল না, এই নীরব ক্রন্দন সাধারণের কর্ণে উঠিল না! শ্রীযুক্ত লেফ্টেনাণ্ট গবর্ণর বাহাদুর রাজসাহীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, রাস্তা, ঘাট, স্বাস্থ্য প্রভৃতি অনেক বিষয়ই তিনি অবগত হইয়া থাকিবেন, কিন্তু এ ব্যাঘ্র-পীড়িত নিভৃত কোণের কোন সংবাদ তিনি পাইয়াছেন বলিয়া বোধ হয় না,—তিনি এ সংবাদ পাইলে হয়ত প্রতিবিধান হইত। প্রতিবিধান যে একেবারেই হয় নাই, একথা বলিতে পারি না। শুনিয়াছি জেলার কর্ত্তা দয়ার্দ্র হৃদয় মাজিষ্ট্রেট্ সাহেব ব্যাঘ্র শিকার করিতে গিয়াছিলেন; কিন্তু নির্ব্বোধ লোকেরা ব্যাঘ্র দেখাইয়া দিল না, কাযেই তিনিও শিকার করিতে পারিলেন না। ব্যাঘ্রটা একে সচল পদার্থ, তাহাতে আবার নর-রক্তাস্বাদী, কাযেই প্রদর্শক এবং শিকারী উভয়ের পক্ষেই কিছু অসুবিধা আছে। ব্যাঘ্র যদি স্থাণুবৎ হইত, তাহা হইলে এত অসুবিধা থাকিত না!

দুঃখের বিষয়, যাঁহাদের অনুগ্রহে এ বিপদের প্রতিকার হইতে পারে, অনেক সময়ে তাঁহারা অনুগ্রহ-প্রদর্শনে কৃপণতা দেখান,—অনেক সময়ে তাঁহারা প্রজার দুঃখকে সুখরূপে পরিচিত করিতে চেষ্টা পান! একজন পুলিশ কর্ম্মচারীর সম্মুখে একদিন এই ব্যাঘ্র-ভীতির কাহিনী উঠিয়াছিল। কর্ম্মচারী মহাশয় বলিলেন, "লোকগুলি এত হুজুগ-প্রিয়, কোথায় কবে ২।১ টা মানুষ বাঘে মারিয়াছিল, তাহার এত নাম হইয়াছে, বাঘে দেশ নির্ম্মনুষ্য করিল বলিয়া রব পড়িয়া গিয়াছে।" আমি ঐ ব্যাঘ্র-পীড়িত প্রদেশে প্রায় একমাস কাল থাকিয়া জানি

* শিক্ষা-পরিচয়-সমিতির জনৈক সভ্য দেশের আভ্যন্তরীণ অবস্থা অবগত হইবার জন্য, এবং শিক্ষা ও সাহিত্য-সম্বন্ধে সমিতির উদ্দেশ্য প্রচার করিবার জন্য বিগত গ্রীষ্মকালে রাজসাহীর দক্ষিণাঞ্চলে পল্লী-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রমণ-বিবরণ সমিতির হস্তগত হইয়াছে। বর্ত্তমান প্রবন্ধটি তিনিই লিখিয়াছেন।

শিঃ পঃ সঃ।

ঐ ব্যাঘ্র-ভীতি অমূলক নহে, এই বলিয়া আপত্তি করিলাম; কিন্তু ঐ সকল ব্যাঘ্র-হত ব্যক্তির মৃতদেহ স্বচক্ষে দেখি নাই, এই অপূর্ব্ব যুক্তির বলে আমাকে নিরস্ত হইতে হইল! কর্ম্মচারী মহাশয়কে ধন্যবাদ যে, তাঁহার সঙ্গে তর্ক হইয়াছিল বলিয়াই উপরের লিখিত বিবরণ পাঠকের গোচর করিতে পারিলাম, নতুবা এ কষ্ট স্বীকার করিতাম কি না সন্দেহ।

ব্যাঘ্রটা কি রকম, কেমন করিয়া এত মানুষ মারিল, ইত্যাদি বিষয় জানিবার জন্য সকলেরই কৌতূহল জন্মিতে পারে, অতএব সে সম্বন্ধে কিছু বলিতেছি। গত জ্যৈষ্ঠে প্রায় সমস্ত মাসটাই আমি ঐ ব্যাঘ্র-ভীতি-সঙ্কুল স্থানে ছিলাম; সেই সময়ে যাহা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি, এস্থলে তাহাই লিপিবদ্ধ হইল।

দেখিলাম, স্থানীয় লোকেরা সর্ব্বদাই ব্যাঘ্র ভয়ে তটস্থ! মাঠে, ঘাটে, হাটে, বাজারে,—যে কেহ যে কোন স্থানে যাউক, সে নিরাপদে বাড়ীতে ফিরিয়া না আসিলে তাহার জীবনের প্রতি কাহারও বিশ্বাস নাই। দিনের বেলায় এই অবস্থা, রাত্রির কথা অনুমান করিয়া লইতে হইবে। বেলা থাকিতেই লোক জন ঘর দাখিল,—নিতান্ত বিপদ না ঘটিলে সন্ধ্যার পরে এক বাড়ী হইতে অন্য বাড়ীতে যাওয়া বন্ধ। যাহাদের অল্প বয়স্ক বালক বালিকা আছে, তাহাদের ভয় এবং কষ্টের সীমা নাই;—সংসারের কাজ কর্ম্ম করিতে হইবে, আবার বালক-বালিকাদিগকে অষ্ট প্রহর চক্ষের উপরে রাখিতে হইবে; শিশুগণ একবার চক্ষের আড়াল হইলেই ডাকের উপর ডাক পড়িতে থাকে, উত্তর না পাইলেই কান্নাকাটি লাগিয়া যায়! লোকের বাড়ী ঘর চারিদিকে দৃঢ়রূপে আবৃত, তথাপি রাত্রিতে নিশ্চিন্ত হইয়া কেহ গৃহ হইতে গৃহান্তরে যাইতে পারে না,—কখন কোন্ দিক হইতে যম আসিয়া ঘাড়ে পড়ে, এই ভয়ে প্রাণ সর্ব্বদা সশঙ্ক! রজনীতে দ্বার অর্গল-বদ্ধ না হওয়া পর্য্যন্ত ঘরে থাকিয়াও ভয় হইতে নিস্তার নাই; গ্রীষ্মের জ্বালায় দুইদণ্ড বাহিরের বাতাসে শয়ন করা যে কি, এবার এ প্রদেশের লোকে তাহা জানিল না!

একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়িতেছে। একজন ব্রাহ্মণ একদিন স্নানান্তে জল-যোগ করিয়া মাঠে ধান্য-ক্ষেত্র দেখিতে গিয়াছিলেন, তথা হইতে কিছু দূরবর্ত্তী কোন প্রজার বাড়ীতে যাইতে হয়, কিন্তু বাড়ীতে সংবাদ দিয়া যাইতে পারেন নাই। বাড়ী ফিরিয়া আসিতে কাযেই তাঁহার বিলম্ব হইয়া গেল, এদিকে গ্রামশুদ্ধ লোক তাঁহার জন্য চিন্তিত হইয়া পড়িল। ঘরে অন্ন-ব্যঞ্জন প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহার চিন্তায় পরিবার আকুল, স্ত্রী-পুত্র উপবাসী। ভাগ্যে তিনি বেলা থাকিতেই বাড়ীতে পঁহুছিলেন, তাই প্রকাশ্যভাবে কান্নাকাটি হইল না! এখন পাঠক চিন্তা করিয়া দেখুন, এভাবে সংসারে বাস করা কেমন বিড়ম্বনা!

পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, বাঘত অনেক স্থানেই থাকে, কিন্তু এখানে এত ভয়ের কারণ কি? কারণ প্রচুর আছে। শিশুটি কাহারও বাড়ীতে খেলিতে গিয়াছিল, আর ফিরিয়া আসিয়া মা বলিয়া ডাকিল

না! রাখাল গরু লইয়া মাঠে গিয়াছিল; বেলা শেষে গরুগুলি একে একে ফিরিয়া ঘরে আসিল, কিন্তু রাখাল আর ফিরিল না! মুক্ত-দ্বার গৃহে শিশু সন্তানকে নিদ্রিত রাখিয়া জননী রন্ধন-শালায় গিয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া আর সে সন্তানের চাঁদ-মুখ দেখিতে পাইলেন না! দাসী রজনীতে গৃহের বারান্দায় শুইয়াছিল, আর তাহাকে জাগিয়া নিদ্রা-জাগরণের সুখ-দুঃখ ভোগ করিতে হইল না! আর কত বলিব? এক একটি মৃত্যু এক একটি বর্ণনীয় বিষয়। যেখানে এমন বিপদ, সেখানকার লোকে ভীত না হইয়া করে কি? ঐ প্রদেশটিতে করুণ রস এবং ভয়ানক রস যেন জীবন্তভাবে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া রহিয়াছে!

বাঘটি দেখিতে কেমন? সে কেমন করিয়া মানুষ মারে? আশ্চর্য্য এই, এসম্বন্ধে একটা বিশ্বাস-যোগ্য বিবরণ পাইলাম না। কেহ বলে বাঘটা বড় একটা কাল কুকুরের মত। কেহ বলে কুকুরের মতই বটে, কিন্তু কাল নহে; তাহার শরীরটা লাল, কেবল গলাটা শাদা। বাঘটা আবার মানুষবাঘা কি না, তাই কেহ কেহ বলেন তাহার কপালে সিন্দূর আছে, নাকে নোলক আছে,—যেন সে একটা স্ত্রীলোক ছিল, কেবল মন্ত্রের বলে বা বিধাতার নির্ব্বাতনে বাঘ হইয়াছে!!

ফলকথা যাহারা এইরূপ বর্ণনা করে, তাহারা সকলেই অন্যের মুখে শুনিয়াছে; জিজ্ঞাসা করিলে স্বচক্ষে দেখিয়াছে বলিয়া কেহই স্বীকার করে না। ইহাতে বোধ হয়, বাঘটাকে সজ্ঞানে কেহ কখন দেখে নাই;—যখন কে দেখিয়াছে, তখন তাহার আয়ু ফুরাইয়াছে। শুনিয়াছি একটিমাত্র সৌভাগ্যশালী (বলশালীও বটে) কৃষক এই মূর্ত্তিমান যমের হাত হইতে বাঁচিয়াছে; কিন্তু তাহার সঙ্গে আমি সাক্ষাৎ করিতে পারি নাই।

বাঘের মূর্ত্তি যেমন কেহ দেখে নাই, তাহার ডাকও সেইরূপ কেহ শুনে নাই। ঐ সকল স্থানে বাঘের ডাক সচরাচর শুনা যায় বটে; কিন্তু সে ডাক যে ঐ বাঘের, তাহা লোকে বিশ্বাস করে না। চারিদিকে সাড়া শব্দ কিছু নাই, সমুদায় নিস্তব্ধ,—এমন সময়ে কোথা হইতে ঝোপ করিয়া বাঘ আসিয়া ঘাড়ের উপর পড়িল, আর জীবন্ত মানুষটা লইয়া গেল! ইহাই তাহার শিকারের রীতি। কাহাকে কখন বাঘে ধরে, তাহা জানিবার উপায় নাই; কারণ, এই যমে যখন যাহাকে ধরে, তখনই তাহার মৃত্যু—স্পর্শমাত্রই যেন মৃত্যু; ইহা দ্বারা আক্রান্ত হইয়া একটি লোকও চিৎকার করিবার অবসর পাইয়াছিল, এমন কথা এ পর্য্যন্ত শুনা যায় নাই।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব আসিয়াছিলেন, কিন্তু কেহ দেখাইয়া দিতে পারিল না বলিয়া তিনি বাঘটি শিকার করিতে পারিলেন না, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কেমন করিয়া দেখাইয়া দিবে? বাঘটা নিতান্ত নির্ব্বোধ নহে। অদ্য যেখানে শিকার ধরিল, কল্য সে সেই খানে বসিয়া থাকিবার পাত্র নহে,—শিকার ধরিয়া রাতারাতিই দুই চারি ক্রোশ তফাতে চম্পট! বল দেখি, এ অবস্থায় কে দেখাইয়া দিবে? লোকে খোরাক বাঁধিয়া বাঘটাকে

মারিতে চেষ্টা করিয়াছে, এবং তাহাতে দুই চারিটা গোবাঘা মারাও পড়িয়াছে; কিন্তু এ-বাঘ সামান্য ছাগল বা কুকুরের লোভী নহে,—মানুষ ব্যতীত অন্য জন্তুতে ইহার তৃপ্তি হয় না। মধ্যে একবার শুনিয়াছিলাম ঘাগাতবাড়ীর এক জন কৈবর্ত্ত নিজেই খোয়াড়ে ছিল, বাঘও তাহারই কৌশলে মারা পড়িয়াছে; কিন্তু পরে জানা গেল সব মিথ্যা। ফলতঃ যেদিন এরূপ নির্ভীকতা এবং নিঃস্বার্থতা বাঙ্গালীর জীবনে প্রদর্শিত হইবে, সেদিন দেশের এ দুর্দ্দশা থাকিবে না।

এ বিবরণ পাঠ করিয়া পাঠক হয়ত সমস্ত দোষটা অস্ত্র-আইনের ঘাড়েই চাপাইবেন, এবং সে জন্য গবর্ণমেণ্টের নিন্দা করিবেন। অবশ্য অস্ত্র-আইনের জন্য আমিও গবর্ণমেণ্টের প্রশংসা করিতেছি না; তবে ন্যায় এবং সত্যের অনুরোধে একথা আমাকে বলিতে হইতেছে যে, আমি ঐ স্থানের অবস্থা যতদূর বুঝিয়াছি, তাহাতে অস্ত্র-আইন প্রচলিত না থাকিলেও এখানকার লোকে আত্ম-রক্ষা করিতে পারিত বলিয়া বোধ হয় না,—ইহারা সকলেই যে অস্ত্র-আইনের অস্তিত্ব অবগত আছে, সে বিষয়েও বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

এখন প্রশ্ন হইতেছে, দেশের শিক্ষিতসাধারণ, সংবাদপত্র এবং গবর্ণমেণ্ট, এই দুর্দ্দশাগ্রস্ত লোকের প্রতি ইহাঁরা কে কতদূর কর্ত্তব্যপালন করিয়াছেন? জাতীয় সমিতির উদ্যোগিগণ সাধারণের অবস্থা জানেন, এবং গবর্ণমেণ্টের নিকটে সাধারণের প্রতিনিধি গ্রহণে কেবল তাঁহারাই উপযুক্ত বলিয়া দর্প করেন; জিজ্ঞাসা করি, উপরিবর্ণিত স্থানের দুরবস্থা তাঁহারা অবগত আছেন কি? আর অবগত থাকিলে তাহার কোন প্রতিবিধান করিয়াছেন কি?

সংবাদপত্র বড় বড় স্থানের সংবাদ প্রকাশ করেন, বড় বড় স্থানে টাকা দিয়া সংবাদ-দাতা রাখেন; কিন্তু এ রকম নগণ্য স্থানের সংবাদ পাইবার তাঁহারা কি বন্দোবস্ত করিয়াছেন? এত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে না হউক, এ সংবাদ যে মোটামুটিভাবে সংবাদপত্রে প্রেরিত হইয়াছে, তাহা আমরা জানি; কিন্তু সংবাদপত্রগণ সম্মতি-আইন, মণিপুর, বঙ্গবাসীর মোকদ্দমা প্রভৃতি বড় বড় কথা লইয়া ব্যতিব্যস্ত, সুতরাং এত ছোট কথায় কর্ণপাত করিবার সময় কই!

যাহা হউক, সংবাদপত্র এবং শিক্ষিতসাধারণ এ সম্বন্ধে কোন সংবাদ পান নাই, কাযেই কোন আন্দোলন করেন নাই। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট যে সংবাদ পাইয়াও কোন প্রতিকার করিলেন না, ইহার কারণ কি? মাননীয় মাজিষ্ট্রেট সাহেব যাহা করিয়াছেন, তাহা কি যথেষ্ট হইয়াছে? হতভাগ্য অধিবাসিগণ বাঘ দেখাইয়া দিতে পারিল না বলিয়া কি বাঘের হাতে অমন করিয়া নির্ম্মূল হইবে? একটা মানুষ আর একটা মানুষকে খুন করিলে গবর্ণমেণ্ট কি করেন—পাতালে প্রবেশ করিলেও গবর্ণমেণ্ট তাহাকে বাহির করেন না কি? একটি দুইটি নর-হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্য নাগা, কুকী, লুসাই প্রভৃতি অসভ্য জাতির বিরুদ্ধে কত বড় বড় অভিযান হইয়া গেল,—কৃষ্ণ পর্ব্বতের অগ্নি বুঝি এখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই!

কিন্তু এই সংকীর্ণ স্থানটীতে কয়েক মাসের মধ্যে ৫৫টি লোক ব্যাঘ্রকর্ত্তৃক নিহত হইল, অথচ এই হতভাগ্যদিগের জীবন-রক্ষার জন্য তেমন বড় উদ্যোগ দূরে থাকুক, স্থানটি ব্যাঘ্র-শূন্য করিবার জন্য দুই একটি শিকারীর ব্যবস্থাও হইল না!!

রাজ-ধর্ম্ম প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত, প্রজার শাসন, পালন, এবং উন্নতি-সাধন। কিন্তু কেবল শাসন-কার্য্যে মূর্ত্তিমান হইয়া পালন এবং উন্নতি-সাধনে উদাসীন থাকিলে রাজ-ধর্ম্ম যথোচিতরূপে প্রতিপালিত হয় না। রাজা অস্ত্র-আইন করিয়াছেন প্রজাকে ভয় এবং অবিশ্বাস করিয়া। ইহা সরলতা এবং বলবত্তার চিহ্ন বটে! যাহা হউক, গবর্ণমেণ্ট যদি অস্ত্র-আইন বিধিবদ্ধ করিবার যথেষ্ট কারণ পাইয়া থাকেন, তবে যাহারা হিংস্র জন্তুর হাতে আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ, তাহাদিগকে আত্ম রক্ষার্থ অস্ত্র-ধারণে বাধ্য করিবার কোন কারণ কি গবর্ণমেণ্ট দেখিতে পান না? রাজবিধি প্রয়োজন বুঝিয়া প্রবর্ত্তক এবং নিবর্ত্তক দুই প্রকারেরই হওয়া উচিত, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ আমাদের গবর্ণমেণ্ট নিবর্ত্তক বিধিরই অধিক পক্ষপাতী।

নিজে যাহা জানিয়াছি, স্বচক্ষে যাহা দেখিয়াছি, কর্ত্তব্য-বোধে সাধারণে প্রকাশ করিলাম; এখন সংবাদপত্র এবং গবর্ণমেণ্টের এ সম্বন্ধে কোন কর্ত্তব্য থাকে করুন, না থাকে না করুন, আমাদের সে বিষয়ে কোন বক্তব্য নাই। এইক্ষণে একটি প্রস্তাব করিয়া এই শোকাবহ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

প্রস্তাবটি এই ;—

গবর্ণমেণ্ট প্রতি গ্রামে গ্রাম-রক্ষার জন্য একজন করিয়া শিকারী রাখুন। এই ব্যক্তি নিজের ব্যয়ে একটি করিয়া বন্দুক, বর্ষা, তরবারী ও বারুদ গোলা প্রভৃতি সরঞ্জাম রাখিবে, এবং ব্যাঘ্র, কুম্ভীর, শূকর, ক্ষিপ্ত শৃগাল-কুক্কুর ও বিষধর সর্প প্রভৃতি প্রাণনাশক হিংস্র জন্তু বধ করিয়া প্রত্যেকের জন্য চৌকীদারী কর হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট-পরিমাণে পুরস্কার পাইবে। অস্ত্র-আইনের কঠোরতা যেন এই ব্যক্তিকে স্পর্শ না করে।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

প্রতিদিন যার মূর্ত্তি কর দরশন,
তাহারে দেখিলে আর চমকে না মন।

তোমা হ'তে আছে যার অধিক উপায়,
তার সঙ্গে প্রতিযোগ রক্ষা করা দায়।

আর্থিক উন্নতি যদি চাও সাধিবারে,
মিতব্যয় শিক্ষা তবে দেও আপনারে।

সাহসের বাহু-বলে যত প্রয়োজন,
দর্শন-ইন্দ্রিয়ে তার তত প্রয়োজন।

তৃতীয় ভাগ।] কার্ত্তিক [৭ম সংখ্যা।

(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,

৯০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

[illegible] ১॥৵০। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত পত্রিকা প্রদত্ত হয় না।

প্রকাশার্থ প্রবন্ধ ও বিনিময়ার্থ পত্রিকা প্রভৃতি সম্পাদকের নিকট, সমালোচনার্থ পুস্তকাদি শিক্ষা-পরিচর-সমিতি সম্পাদকের নিকট রামপুর বোয়ালিয়ায় প্রেরিতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের মূল্যাদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট কলিকাতায় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য এবং বিজ্ঞাপনের নিয়ম তথায় জ্ঞাতব্য।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। } কার্ত্তিক ১২৯৮ সাল। { ৭ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

১৯

যবনিকা-অন্তরালে কে গো তুমি প্রিয়জন,
হাতে ল'য়ে সুধা-ভাণ্ড দাঁড়াইয়া অনুক্ষণ ?
দিবা নিশি ভেদ নাই, লক্ষ্য নাই আত্মপর,
বিশ্ব-প্লাবি অবিরাম ঢালিছ সুধার ধারা,
করিয়া সে সুধাপান যক্ষ, রক্ষঃ, সুর, নর,—
ব্রহ্মাণ্ডের অধিবাসী সবে মিলি আত্মহারা !
জনম অবধি আমি করিতেছি সুধা পান,—
অনন্ত সুধার ধারা জানে না সে ফুরাইতে,—
মাতার বচনে সুধা, হৃদয়ে অমৃত-সিন্ধু,
পিতার অপার স্নেহে কি আছে তুলনা দিতে !
কত ধারে বহে সুধা, কে জানে গো অন্ত তার,—
অনল, অনিল, আলো, সুরস শীতল জল,—
অসীম উদ্ভিজ্জ-রাজ্য নিয়ত আমারি তরে
সাদরে মাথায় বহি যোগাইছে ফুল ফল !
কে গো তুমি অন্তরালে দাঁড়ায়ে দিতেছ সুখ,—
অনুক্ষণ বাঁচিতেছি এত প্রেম লভি যার,
এত দয়া এত স্নেহ পাইতেছি যার হাতে,
মন কি মানে গো তারে না দেখিলে একবার ?

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

হার্বার্ট স্পেন্‌সার।

(পূর্ব্বানুস্মৃতি।)

"প্রচলিত নিয়মে অভিভাবক এবং সন্তান উভয় পক্ষই যেরূপ মানসিক উদ্বেগ ভোগ করে, প্রাকৃতিক নিয়মে সেরূপ করিতে হয় না। যেরূপ অপরাধের যেরূপ ফল, তাহার পরিবর্ত্তে অন্য শাস্তি দিলে দ্বিগুণ অনিষ্ট জন্মে। অভিভাবক নানা প্রকার পারিবারিক নিয়মের সৃষ্টি করিয়া তৎসমুদায়ের পরিপালনে আপন প্রভুত্ব বজায় রাখেন, নিয়ম অবহেলা করিলে অভিভাবকের প্রতি অপরাধ হইল বলিয়া তাঁহার ক্রোধের উদ্রেক হয়; আবার প্রাকৃতিক নিয়মানুসারে অপরাধ-জনিত অনিষ্ট-সংশোধনের যে ভার অপরাধীর উপর পড়িত, প্রচলিত নিয়মে অভিভাবকই সে ভার লইয়া নিজের অর্থ এবং শ্রম অনর্থক নষ্ট করেন। প্রাকৃতিক শাসন অর্থাৎ নিজের কর্ম্মানুযায়ী ফল কোন ব্যক্তি-বিশেষের হাত হইতে আইসে না, সুতরাং তাহাতে বালকের উদ্বেগ বা কষ্ট হইলেও তাহা গভীর অথবা দীর্ঘস্থায়ী হয় না; কিন্তু অপ্রাকৃতিক দণ্ড ব্যক্তি-বিশেষের হস্ত হইতে আইসে, এবং পিতা মাতাকে সেই দণ্ডের কারণ মনে করিয়া বালকের ক্রোধ এবং দ্বেষ অপেক্ষাকৃত অধিক গভীর এবং স্থায়ী হয়। সৌভাগ্য এই যে সর্ব্ববিষয়ে প্রাকৃতিক-নিয়ম-লঙ্ঘন অসম্ভব। সর্ব্বত্র সন্তানের অপরাধের ফল স্বয়ং গ্রহণ করিয়া সন্তানের প্রতি অন্য রূপ দণ্ডবিধান করিবার শক্তি যদি পিতা মাতার থাকিত, তাহা হইলে দুর্দ্দশার অবধি থাকিত না। মনে কর, মায়ের নিষেধ না শুনিয়া কোন বালক কড়াইর গরম জল লইয়া খেলিতে খেলিতে তাহা পায়ে ঢালিয়া ফেলিল, কিন্তু মা গরম জলের ফোঁশাটি আপন গায়ে লইয়া বালকের পায়ে অস্ত্রদ্বারা একটি ক্ষত করিয়া দিলেন। অবোধ বালক মার এই আচরণে নিশ্চয়ই ক্রুদ্ধ হইবে, অধিকন্তু একজনের পরিবর্ত্তে দুইজনকেই শারীরিক যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইবে। এ অবস্থা কি শোচনীয় নহে? কিন্তু বালকের প্রতি পিতামাতার আচরণে এইরূপই ঘটিয়া থাকে। বালক তাহার ভগিনীর একটি খেলনা ভাঙ্গিয়াছে; পিতা তাহাকে প্রহার করিলেন, এবং নিজে পয়সা দিয়া কন্যাকে আর একটি খেলনা কিনিয়া দিলেন,—অর্থাৎ প্রাকৃতিক দণ্ডটি নিজে গ্রহণ করিয়া অপ্রাকৃতিক শাস্তি দ্বারা নিজের প্রতি বালকের ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিলেন। যদি জলখাবার পয়সা হইতে আর একটি খেলনা কিনিয়া দিতে পিতা বালককে বাধ্য করিতেন, তাহা হইলে পিতার উপর তাহার এত রাগও হইত না, পরন্তু অভাব প্রত্যক্ষ করিয়া এই কার্য্যের যে এই ফল, তাহাও তাহার বিলক্ষণ শিক্ষা হইয়া যাইত।

প্রাকৃতিক শাসন প্রণালীতে পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ ক্রমেই প্রীতিকর এবং শুভকর হইয়া দাঁড়ায়। ক্রোধের উৎপত্তি যে কারণেই হউক, পিতা পুত্রের মধ্যে ইহা ভয়ানক অনিষ্টকর; কারণ ইহাতে সহানুভূতি নষ্ট করিয়া শুভকর শাসনে অন্তরায় ঘটায়। ভাব-সংহতির নিয়ম এই যে, একবার যাহার সঙ্গে অপ্রীতিকর ভাবের সংস্রব জন্মে, তাহার উপর একটা বিরাগ থাকিয়াই যায়। যাহার প্রতি অনুরাগ ছিল, ইহাতে তাহার প্রতিও বিরাগ বা ঘৃণা পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে। কটু বাক্য এবং প্রহার দ্বারা সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করিলে পিতার প্রতি পুত্রের ভক্তি থাকে না, আবার পুত্রকে সর্ব্বদা অসন্তুষ্ট ক্রোধাবিষ্ট দেখিলে পিতার মন হইতেও তাহার প্রতি ভালবাসা চলিয়া যায়। এই জন্যই অনেক পিতার প্রতি সন্তানের অশ্রদ্ধা জন্মে, এই জন্যই অনেক পিতা সন্তান-লাভ ঈশ্বরের এক প্রকার নিগ্রহ মনে করেন। অপ্রাকৃতিক শাসনে যখন এই প্রকার কুফল ফলে, তখন যথাসম্ভব প্রাকৃতিক শাসন অবলম্বন করাই সকল পিতামাতার উচিত।

অতএব দেখা যাইতেছে, কার্য্যের স্বাভাবিক প্রতিফল প্রত্যক্ষ করিয়া নীতি-শিক্ষার ঐশ্বরিক নিয়ম জীবনের বাল্য, যৌবন প্রভৃতি সর্ব্বাবস্থাতেই প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। নীতি-শিক্ষার এই প্রণালীতে কয়েকটি বিশেষ লাভ আছে, যথা;—(১) ইহা দ্বারা কার্য্যের সুফল ও কুফল স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়া ভাল মন্দ সদসৎ কার্য্যের জ্ঞান জন্মে। (২) ইহাতে বালক আপন অপরাধের অনিবার্য্য অপ্রীতিকর প্রতিফল ভোগ করিয়া তাহার ঔচিত্যও অনেক পরিমাণে বুঝিতে পারে। (৩) বালক শাস্তির ঔচিত্য বুঝে, অথচ তাহা অন্যের হস্তদ্বারা প্রযুক্ত হয় না, সুতরাং সে অধিক বিরক্ত হইতে পারে না; এদিকে পিতামাতাও নিজে কিছু না করিয়া কেবল প্রাকৃতিক শাস্তিকে অপ্রতিহত রাখেন, কাযেই তাঁহাদের মানসিক অশান্তি তেমন ভুগিতে হয় না। (৪) এই প্রণালীতে পরস্পরের প্রতি অসন্তোষ জন্মিতে পারে না, কাযেই তাহাদের পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ অধিক সুখকর এবং শুভকর হয়।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে, চৌর্য্য, মিথ্যাবাদ, অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক বালক বালিকার প্রতি প্রহার প্রভৃতি গুরুতর অপরাধ-সম্বন্ধে কি হইবে? এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বে কয়েকটি বাস্তব ঘটনা দেখা যাউক।

গ্রন্থকার বলেন, তাঁহার কোন আত্মীয় ভগিনীর বাড়ীতে থাকিতেন, এবং এই প্রণালীতে তিনি নিজের ভাগিনেয় এবং ভাগিনেয়ীকে শিক্ষা দিতেন। ঘরে তাহারা তাঁহার ছাত্র ছিল, বাহিরেও তাঁহার সঙ্গে ভ্রমণ করিতে যাইত। ফলতঃ তাহাদের পিতা মাতার স্থানটি যেন তিনিই অধিকার করিয়াছিলেন। একদিন তিনি বালকটিকে অন্য ঘর হইতে একটি দ্রব্য আনিতে বলেন; বালক তখন কোন খেলায় মত্ত ছিল, সুতরাং তাঁহার আদেশ অবজ্ঞা করিয়া খেলিতে লাগিল। মাতুল নিজে যাইয়া দ্রব্যটি আনিলেন এবং কতকটা অসন্তোষের ভাব প্রকাশ করিলেন, কিন্তু নিজে কিছু বলিলেন না। বালক বৈকালে আবার যখন খেলার প্রস্তাব করিল, তখন তিনি অসন্তোষের সহিত

তাহাতে অস্বীকার করিলেন। পরদিন প্রত্যুষে শয্যা হইতে না উঠিতেই তিনি ভাগিনেয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া চাহিয়া দেখিলেন, সে তাঁহার জন্য গরম জল লইয়া ঘরে প্রবেশ করিল, এবং এইরূপ অন্যান্য কার্য্য দ্বারা নিজের অসদাচরণের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করিতে লাগিল। সে যাহা করে নাই, তাহার ক্ষতিপূরণের জন্য তদপেক্ষা অধিক শ্রম-সাধ্য কার্য্য করিতে লাগিল, তাহার উচ্চভাবের নিকট ক্ষুদ্র ভাবগুলি পরাস্ত হইতে লাগিল, এবং আবার যখন এই প্রকার আচরণ দ্বারা মাতুলের ভালবাসা পাইল, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকরূপে তাহার আদর করিতে শিখিল।

এখন সেই ভদ্র লোকটি নিজে সন্তানের পিতা হইয়াছেন। সন্তানদিগের সঙ্গে তাঁহার বন্ধুতা অসীম। বৈকালে কখন তিনি গৃহে আসিবেন, এজন্য তাহারা উদ্গ্রীব হইয়া থাকে, রবিবারে তাঁহাকে অন্যত্র যাইতে হইবে না বলিয়া তাহাদের আনন্দের সীমা থাকে না। এই প্রকারে তাঁহার প্রতি তাহাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস এবং ভালবাসা থাকাতে অতি সামান্য নিন্দা-প্রশংসা দ্বারা তিনি তাহাদিগকে সুন্দররূপে শাসনে রাখিতে পারেন। বাড়ীতে আসিয়া কাহারও কোন অসদাচারের কথা শুনিলে তিনি তাহার প্রতি কিছু অপ্রসন্ন ভাব দেখান, ইহাতেই তাহার প্রচুর শাস্তি হইয়া যায়। তিনি প্রত্যহ যেরূপ সোহাগ করিয়া থাকেন, এক দিন তাহার অন্যথা হইলে আর ক্রন্দনের সীমা থাকে না,—প্রহার করিলেও বুঝি বালক এত কাঁদিত না। এই নৈতিক শাসনের ভয় মনে এত বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, পিতার অসাক্ষাতেও তাহারা প্রাণপণে সদাচরণ করে, এবং পিতার নিকট তাহা সন্তোষজনক হইবে কি না, কেবল কোন দিন মাকে তাহা জিজ্ঞাসা করে। একদিন পঞ্চবর্ষীয় জ্যেষ্ঠ বালকটি পিতা-মাতার অসাক্ষাতে পিতার দেরাজ হইতে একগাছি ক্ষুর বাহির করিয়া ছোট ভাইটির চুল কাটিয়া দেয়, তাহার নিজেরও হাত কাটিয়া ফেলে। পিতা বাড়ীতে আসিয়া এই সকল কথা শুনিলেন, এবং দুই দিন তাহার সঙ্গে কথা কহিলেন না। ইহাতে তাহার এত কষ্ট হইল যে, আর একদিন তাহার মা যখন কোথাও যাইতে চাহিলেন, তখন বালক তাঁহাকে নিষেধ করিতে লাগিল,—পাছে তাঁহার অনুপস্থিতিতে কোন অকার্য্য করিয়া পিতার বিরাগ উৎপাদন করে, এই তাহার ভয়।

পিতা-পুত্রের সম্বন্ধ যত মধুর হইবে, এই সকল গুরুতর অপরাধের শাসন তত সহজ হইবে। কেবল প্রাকৃতিক শাসনই এই সম্বন্ধকে মধুর করিতে পারে।

"বর্ত্তমান কালের সন্তানেরা পিতা-মাতাকে বন্ধু-বেশধারী শত্রু বলিয়া মনে করে। বালকেরা যাহার নিকট যেরূপ ব্যবহার পায়, তাহার প্রতি তাহাদের সেইরূপ ভাব জন্মে। পিতা মাতা তাহাদিগকে কখন ভয় দেখান, কখন ঘোষ দেন; কখন গালি দেন, কখন সোহাগ করেন; কখন ক্ষমা করেন, কখন প্রহার করেন; সুতরাং পিতা-মাতা বন্ধু কি শত্রু তাহারা ঠিক বুঝিতে পারে না। মা মনে করেন, তিনি যে সন্তানের বড় হিতৈষিণী, এ কথা বলিলেই যথেষ্ট হইল," সে তাঁহার

কথায় বিশ্বাস করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিবে। "আমি যাহা করি তাহা তোমারই ভালর জন্য;" "যাহাতে তোমার মঙ্গল হইবে, তাহা তোমা অপেক্ষা আমি ভাল বুঝি;" "তুমি এখন বুঝিতে পারিতেছ না, কিন্তু বড় হইলে যখন বুঝিতে পারিবে, তখন আমাকে ভাল বাসিবে;"—ইত্যাদি কথা আমরা প্রতিদিন শুনিতে পাই। এদিকে বালক কিন্তু প্রতিদিন শাস্তি পাইতেছে, প্রায় প্রতি কার্য্যেই বাধা পাইতেছে। কথায় সর্ব্বদা শুনিতে পায় যে তাহার সুখই সকল কার্য্যের উদ্দেশ্য, কিন্তু ব্যবহারে যাহা পায় তাহাতে দুঃখ বই সুখ হয় না। মাতা যে ভবিষ্যৎ সুখের কথা বলেন, বালক তাহা বুঝিতে অসমর্থ; কার্য্যতঃ ব্যবহারে যাহা প্রত্যক্ষ করে, তাহাতে মাতার কথায় আর তাহার বিশ্বাস থাকে না। ইহাতে বালককে দোষ দেওয়া যায় না। মাতা যদি এই অবস্থায় পড়িতেন, তবে তাঁহার মনেও ঐরূপ ভাবই হইত।

মাতা যদি নিজে শাস্তি না দিয়া কেবল কার্য্যের ফল দেখাইয়া সাবধান করিয়াই নিরস্ত হইতেন, তাহা হইলে এরূপ ঘটিত না। এবিষয়ের একটি সহজ দৃষ্টান্ত লইয়া দেখা যাউক। নূতন বিষয়ের পরীক্ষায় বালকেরা বড় আমোদ পায়। মনে কর কোন বালক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ড আগুণে পোড়াইয়া তামাসা দেখিতেছে। সাধারণতঃ যে রকম দেখা যায়, মাতা সেই প্রকৃতির হইলে তিনি বালককে কাগজ ফেলিয়া দিতে বলিবেন, কথা না শুনিলে কাগজগুলি হাত হইতে টানিয়া লইয়া ফেলিয়া দিবেন। কিন্তু বালকের সৌভাগ্য-ক্রমে মাতা যদি বুদ্ধিমতী হন, তাহা হইলে তিনি বালকের কৌতূহল-বৃত্তির প্রবলতা অনুভব করিয়া সেরূপ করিবেন না। তিনি হয়ত মনে মনে এইরূপ যুক্তি করিবেন;—"যদি আমি এখন বাধা দেই, তাহা হইলে বালকের একটি প্রয়োজনীয় জ্ঞান-লাভে বাধা পড়িবে। হয়ত আমি বাধা দিলে ছেলের হাত না পুড়িতে পারে; কিন্তু তাহাতে লাভ কি? আজ না হউক, একদিন অবশ্যই পুড়িবে; জীবনে নিরাপদ থাকিতে হইলে আগুণের গুণ তাহার অবগত হওয়া উচিত। যদি আজ তাহাকে এই অভিজ্ঞতা লাভ করিতে না দেই, তাহা হইলে একদিন এমন বিপন্ন হইতে পারে যে, তাহাকে রক্ষা করে এমন কেহ তখন তাহার নিকটে থাকিবে না; কিন্তু আজ যদি এই আগুন হইতে আমার সম্মুখে তাহার কোন বিপদ হয়, তবে আমি অনায়াসে তাহাকে বাঁচাইতে পারিব। সে যাহা করিতেছে, তাহাতে তাহার কোন ক্ষতি হইতেছে না, বরং সে আমোদ পাইতেছে; যদি এখন আমি বাধা দেই, আমার উপর সে বিরক্ত হইবে। অগ্নি-দাহের কষ্ট সে জানে না, কিন্তু আমার এই বাধায় তাহার যে ইচ্ছা-ভঙ্গ হইবে, তাহাতে সে অবশ্যই কষ্ট পাইবে, এবং আমাকেই সে কষ্টের কারণ বলিয়া জানিবে। সে যে কষ্ট অনুভব করিতে পারে না, তাহার নিকট সে কষ্টের অস্তিত্বই নাই; আমার আচরণ-জনিত কষ্ট সে তীব্ররূপে অনুভব করিবে, এবং আমিই তাহার কষ্টের কারণ হইব। অতএব আমার কর্ত্তব্য তাহাকে সাবধান করিয়া দেওয়া, আর যাহাতে তাহার

বিপদ না ঘটিতে পারে, সে বিষয়ে সতর্ক থাকা।” এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি বালককে বলিবেন, “আমার ভয় হইতেছে তুমি অমন করিলে হাত পোড়াইয়া ফেলিবে।” মনে কর বালক সে কথা শুনিল না, অবশেষে হাতখানি পোড়াইয়া ফেলিল। ইহার ফল কি হইল? প্রথমতঃ যাহা একদিন না এক দিন জানিতেই হইবে, আর যাহা যত শীঘ্র জানা যায় ততই ভাল, বালক এমন একটি জ্ঞানলাভ করিল। দ্বিতীয়তঃ বালক বুঝিতে পারিল যে, মাতা তাহারই উপকারের জন্য তাহাকে নিষেধ করিয়াছিলেন,—মাতা যে বেশী বুঝেন এবং তিনি যে বালককে প্রকৃতই ভাল বাসেন, তাঁহার এই নিষেধই তাহার প্রমাণ। তাঁহার কথায় তখন বালকের আরও অধিক বিশ্বাস হয়, তাঁহার প্রতি তাহার আরও অধিক ভালবাসা জন্মে।

অবশ্য যে স্থলে হাত পা ভাঙ্গিবার বা অন্য কোন গুরুতর অনিষ্ট ঘটিবার সম্ভাবনা আছে, সেখানে বলপূর্ব্বকই বালককে নিরস্ত করিতে হইবে; কিন্তু যেখানে তেমন অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, সেখানে সাবধান করিয়াই বালককে ছাড়িয়া দেওয়া উচিত, সে আপন অভিজ্ঞতা আপনি ঠেকিয়া শিখুক। ঘরে বাহিরে সর্ব্বত্রই কোন গুরুতর অনিষ্ট না ঘটে এই মাত্র সাবধান থাকিয়াই যদি পিতা-মাতা সন্তানকে প্রাকৃতিক শাসনে ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের প্রতি তাহার ভক্তি এবং বিশ্বাস ক্রমেই বাড়িতে থাকিবে।

অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধে প্রাকৃতিক প্রণালী কতদূর কার্য্যকরী হইতে পারে, এখন তাহাই দেখা যাউক।

প্রথমতঃ মনে করা উচিত, প্রচলিত অপ্রাকৃতিক প্রণালী অপেক্ষা প্রাকৃতিক প্রণালীতে অপরাধের সংখ্যা এবং গুরুত্ব উভয়ই অল্প হইবে। অনেক বালকের অশিষ্টাচার অপকৃষ্ট শাসন-প্রণালীর ফল-স্বরূপ কোপনতা ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতিমাত্র শাসন-বশতঃ সহানুভূতি নষ্ট হইয়া যায়, সুতরাং সহানুভূতি থাকাতে যে সকল অপরাধ অনুষ্ঠিত হইত না, সহানুভূতির অভাবে তাহা অবাধে ঘটিতে থাকে। এক পরিবারের বালক বালিকা যে পরস্পরের সঙ্গে গালাগালি মারামারি এবং অন্যান্য অসদ্ব্যবহার করে, পরিবারের বয়ঃস্থদিগের নিকটেই তাহারা তাহা শিক্ষা করে। প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসৃত হইলে এরূপ হইবার সম্ভাবনা থাকে না। মিথ্যাকথন এবং চৌর্য্য প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত গুরুতর অপরাধের সংখ্যাও এইরূপে কমিয়া যাইতে পারে। পারিবারিক প্রীতির অভাবেই এই সকল অপরাধ ঘটে। প্রণিধান করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, যাহারা উচ্চ শ্রেণীর আমোদে বঞ্চিত হয়, তাহারা নীচ আমোদ খুঁজিয়া লয়; আমোদ-ভোগে যাহারা অন্যের সহানুভূতি পায় না, তাহারা স্বার্থপর হইয়া উঠে; ইহা প্রাকৃতিক নিয়ম। সুতরাং ইহার বিপরীত পন্থা অবলম্বন করিলে, অর্থাৎ সন্তানের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রাখিলে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রাকৃতিক-শাসন-প্রণালীতে গুরুতর অপরাধ একেবারে তিরোহিত না হইলেও সেই প্রণালীই অবলম্বনীয়; জনক-জননী এবং সন্তানের মধ্যে বিশ্বাস ও স্নেহ যত অধিক

থাকিবে, এ প্রণালী ইতত সুফল-প্রসূ হইবে। চৌর্য্যের প্রাকৃতিক প্রতিফল দুই প্রকার,—মুখ্য এবং গৌণ। মুখ্য ফলটি ন্যায়ের কার্য্য,—যাহা লইয়াছ, তাহা প্রত্যর্পণ কর বা তাহার ক্ষতিপূরণ কর। প্রত্যেক নিরপেক্ষ শাসনকর্ত্তার উচিত, যাহাতে ভাল কার্য্য দ্বারা মন্দ কার্য্যের প্রতিবিধান হইতে পারে, তাহারই উপায় অবলম্বন করা। অপহৃত বস্তুর প্রত্যর্পণ বা ক্ষতিপূরণ এই প্রতিবিধান মাত্র। যদি বালক অপহৃত বস্তু নষ্ট করিয়া থাকে, তবে তাহার জলখাবার পয়সা দ্বারা ক্ষতিপূরণ করিতে তাহাকে বাধ্য করা উচিত। চৌর্য্যের গৌণফল পিতা মাতার বিরাগ। ভৎসনা বা প্রহারে এই বিরাগ প্রকাশ পায়। অবশ্য এই শাসন উভয় প্রণালীতেই তুল্যরূপ; কিন্তু প্রভেদ এই যে, পিতা-পুত্রের মধ্যে ভালবাসার মাত্রা যত অধিক হইবে, এই ভর্ৎসনা বা প্রহার তত সুফল প্রসব করিবে। ইচ্ছা করিলে সকলেই এ সকল কথার সত্যতা প্রত্যক্ষ করিতে পারেন।

কেহ কাহারও প্রতি অসদ্ব্যবহার করিলে তাহার মনে যে অনুতাপ হয়, তাহার পরিমাণ পূর্ব্ববর্ত্তী ভালবাসার পরিমাণানুসারে অল্প বা অধিক হয়। কোন অপরিচিত ব্যক্তি একটা অন্যায় কায করিলে মনে তাহা অধিক কাল স্থান পায় না; শত্রুকে কোন রূপে কষ্ট দিতে পারিলে অনেকের মনে এক প্রকার সুখই জন্মিয়া থাকে; কিন্তু যাঁহাকে বন্ধু বলিয়া জানি, যাঁহার ভালবাসাকে অতি মূল্যবান্ বলিয়া মনে করি, তাঁহার মনে কোনরূপে কষ্ট দিলে আক্ষেপের আর সীমা থাকে না। পিতা মাতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা যে পরিমাণ, তাঁহাদের অসন্তোষে তাহার মানসিক কষ্টও সেই পরিমাণ। যে স্থলে পিতার প্রতি সন্তানের ভালবাসা নাই, সে স্থলে অপরাধী সন্তান কেবল পিতার শাসন মনে করিয়াই ভয় পায়; শাসন হইয়া গেলে তাহার বিরাগের আরও বৃদ্ধি হয়। পিতার ভালবাসায় যে সন্তানের বিশ্বাস আছে, সেই ভালবাসা হইতে বঞ্চিত হইবার ভয়ই তাহার পক্ষে প্রচুর শাস্তি,—অন্ততঃ প্রহার অপেক্ষা ইহা নিকৃষ্ট নহে। ইহাতে বালকের মনে ভয় এবং ক্রোধের পরিবর্ত্তে অনুতাপ উপস্থিত হয়, এবং পিতার ভালবাসা আবার পাইবার জন্য সে নানা প্রকারে যত্ন করিতে থাকে। ফলতঃ যে সকল ভাব অন্তরে জাগরূক থাকিয়ে অপরাধ করিতে ইচ্ছা হয়, প্রাকৃতিক প্রণালীতে সে সকল ভাব তিরোহিত হইয়া যায়, এবং তৎপরিবর্ত্তে যে সকল ভাব অপরাধের বিরোধী তাহাই বদ্ধমূল হইতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে লঘু গুরু সকল প্রকার অপরাধেই প্রাকৃতিক প্রণালী কার্য্যকরী; ইহাতে কেবল অপরাধের দমন হয় না, ইহার প্রভাবে অপরাধের কারণ পর্য্যন্ত নির্ম্মূল হয়।

ফলকথা, পারুষ্যে পারুষ্য জন্মে এবং সৌজন্যে সৌজন্য জন্মে। যে সকল বালক নির্দ্দয় ব্যবহার লাভ করে তাহারা নির্দ্দয় হয়; যাহারা সদ্ভাব লাভ করে তাহারা নিজেও সদ্ভাব-সম্পন্ন হয়। রাজ্য-শাসনে যেমন গৃহ-শাসনেও সেইরূপ, শাসনের কঠোরতা যেখানে, অপরাধের বৃদ্ধিও সেইখানে; শাসন যেখানে মৃদু এবং সদয়ভাবে চালিত,

সেখানে শাস্তা এবং শাসিতের মনোভঙ্গ হয় না, অপরাধের কারণও ক্রমে তিরোহিত হইতে থাকে। জন্‌লক্ বলেন, "শিক্ষাতে কঠোর শাসনে কোনই উপকার হয় না, বরং অশেষ অপকারই হয়; বাল্যকালে যাহারা কঠোর শাসন-লাভ করে, কদাচিৎ তাহারা ভাল লোক হয়।" পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, যে সকল যুবক অপরাধী বেত্রাঘাতে দণ্ডিত হয়, তাহাদের অধিকাংশই পুনঃ পুনঃ কারাগারে যায়। ফরাসী বিদ্যালয় অপেক্ষা ইংরাজী বিদ্যালয়ের শাসন অপেক্ষাকৃত মৃদু, এজন্য কোন কোন ফরাসী বালককে ইংলণ্ডীয় বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ উপকার লাভ করিতে দেখা গিয়াছে।

আমাদের দুরবস্থা।

আমাদের দুরবস্থা আমরা বুঝিতে পারি না, তাই আমরা নিশ্চিন্ত-ভাবে বসিয়া আছি। কিন্তু আর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিবার সময় নাই। কাল-চক্রের ভীষণ পরিবর্ত্তনে ভারতের আর সেদিন নাই—রত্ন-প্রসবিণী ভারতের আর সে গৌরব নাই। রাজ-রাণী আজ ভিখারিণী সাজিয়াছে—আমরা আজ কড়ার ভিখারী হইয়াছি। পেটে ভাত নাই, গায়ে বস্ত্র নাই। ভাত-কাপড়ের কাঙ্গাল হইয়া আমরা আজ পথে পথে, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছি, চাকরীর জন্য কতজনের খোসামোদ করিতেছি, তবুও চাকরী পাইতেছি না। হিতাহিত-বিবেচনায় জলাঞ্জলি দিয়া, পেটের দায়ে কত কি অধর্ম্ম করিতেছি—তবুও অন্ন-বস্ত্রের যোগাড় হইতেছে না। পেটের ক্ষুধা পেটেই থাকিতেছে,—বস্ত্রাভাবে জানু, ভানু, কৃশানু-সার হইতেছে। চারিদিক্ অন্ধকার, ভবিষ্যৎ অন্ধকার। হরি, হরি, ইহার উপায় কি?

আর নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া থাকিলে চলিবে না। লক্ষ্মী-সরস্বতীর বর-পুত্রগণ! আসুন, আপনারা একত্র হউন, একটা যুক্তি স্থির করুন, নতুবা উপায় নাই—গত্যন্তর নাই। আমাদের দুরবস্থার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন,—কি ছিলাম, কি হইয়াছি, একবার ভাবিয়া দেখুন। আপনারা দেশের অগ্রণী; বিদ্যা-বলে, বুদ্ধি-বলে, ধন-বলে আপনারা দেশের মুখ-পাত্র। আপনারা যাহা স্থির করিবেন, বিদ্যা-হীন, বুদ্ধি-হীন, ধন-হীন দীন দুঃখীগণ একবাক্যে তাহা গ্রহণ করিবে, আপনাদের পদানুসরণ করিয়া চলিবে। আপনারা তাহাদিগের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিন, প্রাণপণে তাহারা খাটিবে, কিন্তু দেখিবেন, তাহাদিগের পরিশ্রম যেন বৃথা না হয়। শুধু রাজ-নীতি লইয়া থাকিলে চলিবে না। রাজ-জাতির সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে গেলে যে শুভফল হইবে, এবিষয়ে আমাদিগের সন্দেহ আজিও দূর হয় নাই। লাখ লাখ অর্থ ব্যয় হইবে, বহ্বারম্ভে লঘু-

ক্রিয়া হইবে, হস্তী প্রসব করিতে গিয়া মূষিক প্রসূত হইবে। রাজ-জাতির সহিত প্রতি-দ্বন্দ্বিতা করিয়া ফল নাই—বরং দেশের অর্থ যাহাতে দেশে থাকে তাহার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য *। অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকা অপেক্ষা নিজের পুরুষকারের উপর নির্ভর করা সহস্রগুণে শ্রেয়ঃ। কিরূপে দেশের অর্থ দেশে থাকে; কৃষি-বাণিজ্যের কিরূপে উন্নতি হইতে পারে; কিরূপে দেশের লোকে এক-সন্ধ্যা আহার করিয়াও জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারে; আজ কাল কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন;—এসব বিষয়ের আলোচনা করা আমাদের বিবেচনায় সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদে, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, অর্থ আপনাদিগের আয়ত্ত। আপনারা ইচ্ছা করিলে শত শত লোক খাটাইতে পারেন—শত শত লোকের জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দিতে পারেন। অন্ধ, খঞ্জ, আতুর, দীন দুঃখীদিগকে এরূপ কার্য্যে নিয়োগ করিতে পারেন, যাহাতে তাহারা নিজ নিজ জীবিকা নিজেরাই নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইবে; অথচ, আপনাদিগেরও বড় বেশী ত্যাগ-স্বীকার করিতে হইবে না। কিঞ্চিৎ মূলধনের প্রয়োজন। দেশীয় ধন-কুবেরগণ থাকিতে, ভরসা করি, মূলধনের অপ্রতুল হইবে না।

* বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ইহা সম্ভব কি? ভারতের পোড়া ভাগ্যে রাজার স্বার্থ যে আজিও প্রজার স্বার্থ হইতে স্বতন্ত্র! যতদিন দুই স্রোতঃ একখাতে না বহিবে, ততদিন এই স্বার্থ-সংগ্রাম এবং সবলের জয় অনিবার্য্য।

শিঃ পঃ সঃ।

সে কালে আর এ কালে তুলনা করিতে গেলে বিস্তর প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। সে কালে এত বিলাসিতা ছিল না, এত বাহ্যাড়ম্বরও ছিল না। সে কালের লোক চাকরী চাকরী করিয়া এত লালায়িত হইত না। সামান্য অশন ভূষণে সে কালের লোক পরিতৃপ্ত থাকিত। ইংরাজী শিখিব, বেশী উপার্জ্জন করিব, সুখ স্বচ্ছন্দে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করিব, হাকিম হইয়া দশের উপরে ক্ষমতা চালাইব,—এরূপ ধারণা সে কালের লোকদিগের আদৌ ছিল না। তাহাদিগের জীবন সম্পূর্ণরূপে আড়ম্বর-শূন্য ছিল। সে কালের লক্ষ-পতি, আর এ কালের কড়ার ভিখারীর পোষাক পরিচ্ছদে বড় বেশী প্রভেদ দেখিতে পাইবে না। সে কালের লোক-দিগের প্রায় সকলেরই হাল লাঙ্গল ছিল, কৃষি ও তেজারতি কারবার দ্বারা সকলেরই একরূপ করিয়া দিন গুজরান হইত। কাহা-কেও ঋণ করিতে হইত না—'হা অন্ন, হা অন্ন' করিয়া কাহাকেও বেড়াইতে হইত না। সে কালের লোক মজুরদিগের সঙ্গে খাটিতে অপমান বা লজ্জা বোধ করিত না। সে কালের লোকদিগকে চাষাই বল, আর অসভ্যই বল, তাহাদিগের পেটে ভাত ছিল;—এ কালের লোকদিগের মত তাহারা পরা-ধীন ছিল না, চাকরীকে একমাত্র সার বলিয়া মনে করিত না। পাশ্চাত্য সভ্যতার ফলে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে, সত্য বটে, আমা-দের অনেকটা অসভ্যতা ঘুচিয়া গিয়াছে। সভ্যতার খাতিরে, কুলি মজুরদিগের সঙ্গে কায করা দূরে থাকুক, এখন আমরা স্বহস্তে এক ছিলিম তামাক সাজিয়া খাইতেও অপ-

মান বোধ করি,—বাজার হইতে এক বিড়া পান হাতে করিয়া আনাও মজুরের কাষ মনে করি। আমাদের গৃহিণীরা উল, কার্পেট বুনিতে শিখিয়াছেন—স্বহস্তে রান্না-বান্না করা তাঁহারা দাসীর কাষ মনে করিয়া ঘৃণায় ভ্রূ-কুঞ্চিত করেন। যেদিকে তাকান যায় সেই দিকে খরচ, সেইদিকে বাবুগিরি, সেইদিকে বিলাসিতা। শিক্ষিত লোকের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, অথচ চাকরীর সংখ্যা সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতেছে না। ত্রিশ টাকা বেতনের চাকরী খালি হইল, চারিদিক হইতে দরখাস্ত পড়িতে আরম্ভ হইল। একশত জন দরখাস্ত করিল, একজনমাত্র কায পাইল, অবশিষ্ট নিরানব্বই জন হতাশ্বাস হইল। চাকরীর দুর্দ্দশা এইরূপ, তবু লোকে চাকরী চাকরী করে, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ভদ্রলোক-দিগের মধ্যে হাল লাঙ্গল রাখিয়া চাষ আবাদ করা আজ কাল খুব কম দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে অধিকাংশ ভদ্রলোকেরই হাল লাঙ্গল ছিল—লোক জন রাখিয়া চাষ আবাদ করা একরূপ প্রথা ছিল। 'বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীঃ তদর্দ্ধং কৃষি-কর্ম্মণি' এই প্রবাদ-বাক্য একদিন ভারতের ঘরে ঘরে প্রচলিত ছিল। জনক-প্রমুখ রাজর্ষিগণ স্বহস্তে হল-চালন করিতে লজ্জা বোধ করিতেন না। কিন্তু, আজ আমরা চাষ আবাদ করা চাষার কার্য্য বলিয়া ঘৃণা করি। অধঃপতনের আর বাকি কি? পেটে ভাত নাই, অথচ অভিমানটুকু পূর্ণমাত্রায় আছে। নির্ব্বোধ আমরা বুঝিতে পারি না যে এ অভিমানটুকু আর বেশী দিন স্থায়ী হইবে না। যে কায আজ আমাদিগের নিকট ঘৃণিত, পেটের দায়ে সে কায আর দশ বৎসর পরে আমাদিগকে করিতে হইবে। জাতি-শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের দুর্দ্দশা দেখিলে বাস্তবিক বিস্মিত হইতে হয়। যাঁহারা এত কাল যাবৎ হিন্দুসমাজের উপর একাধিপত্য করিয়া আসিতেছিলেন, আজ তাঁহাদিগের বংশধরগণ উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতেছেন। জানি না এরূপ ভাবে আর কতদিন চলিবে। জানি না এই সামাজিক বিপ্লবে, ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণের কি দুর্দ্দশা না ঘটিবে। ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ অপরা-পর জাতির চক্ষুঃশূল হইয়াছেন—তাঁহাদিগের উপর শিক্ষিত সম্প্রদায় খড়্গ-হস্ত, রাজ-পুরুষ-গণ বীত-শ্রদ্ধ। হিন্দুসমাজের নেতা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতগণ দিন দিন নিঃস্ব হইয়া পড়িতেছেন, —তাঁহাদিগের দুর্দ্দশা দেখিলে বাস্তবিকই আমাদের মনে কষ্ট উপস্থিত হয়!

সকল বিষয়ে রাজপুরুষদিগের উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে চলিবে না। জাতীয় উন্নতির জন্য যে জাতি অপর জাতির উপর নির্ভর করে,—জানিবে, সে জাতির উন্নতি সুদূর-পরাহত। যে নিজের পদের উপর ভর করিয়া দাঁড়াইতে পারে না, তাহাকে অন্যের সাহায্যে দাঁড়াইতে হইলে—জানি না, সে কতক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে! জাতীয় উন্নতি জাতীয় চেষ্টার ফল। আমেরিকা, ইংলণ্ড, ফ্রান্স বা জার্ম্মেনীর উন্নতি অপর জাতির সাহায্যে হয় নাই। জাতীয় সমবেত চেষ্টার ফলে ইংলণ্ড, আমেরিকা প্রভৃতি আজ সভ্য জগতের শীর্ষ-স্থান অধিকার করিয়াছে। জাতীয় চেষ্টার ফলেই, ভারতের উন্নতিও একদিন হইবা-

ছিল, আবার জাতীয় চেষ্টার অভাবেই ভারতের এই বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা। যতদিন ভারত অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিবে, আভ্যন্তরীণ উন্নতির জন্য যতদিন নিজের উপর নির্ভর করিতে না শিখিবে, ততদিন ভারতের মঙ্গল নাই, ততদিন ভারতের দুর্দ্দশা ঘুচিবে না, ততদিন ভারত 'যে তিমিরে সে তিমিরে'ই থাকিবে, ইহা একরূপ স্বতঃসিদ্ধ। আবার, নিরন্ন দীন দুঃখিগণের অন্নের সংস্থান না হইলে প্রকৃত জাতীয় উন্নতি হইতে পারে না। তোমার বা আমার উন্নতিতে জাতি-সাধারণের উন্নতি হইবে না। যদ্যপি দেশের প্রকৃত উন্নতি দেখিতে চাও, প্রকৃতরূপে দেশের মুখোজ্জ্বল করিতে চাও, তাহা হইলে সাধ্যমত চেষ্টা কর—যাহাতে দেশের শত সহস্র ভ্রাতা ভগিনীর কষ্টের লাঘব হয়, যাহাতে তাহারা অন্নাভাবে অকালে কাল-কবলে পতিত না হয়। তুমি সুখে আহার বিহার করিতেছ—আর তোমার ভ্রাতা ভগিনীগণ ক্ষুধার জ্বালায় ছট্‌ফট্ করিতেছে! জানি না, এ দৃশ্য দেখিয়া কেমন করিয়া তুমি নিশ্চিন্তভাবে বসিয়া আছ? যদি প্রকৃত পক্ষে বড় হইতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে জাতি-সাধারণের উন্নতিতে মন দাও। বিদ্যা-সাগর ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন—রাজেন্দ্রলাল ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। উভয়ই মহৎ ব্যক্তি। দেশের হিতের জন্য তাঁহারা প্রাণ-পণে খাটিয়াছেন—দেশের মুখোজ্জ্বল তাঁহারা করিয়াছেন। এজন্য দেশের লোক তাঁহা-দিগের মৃত্যুতে আজ হাহাকার করিতেছে। প্রকৃত মহৎ ব্যক্তির মৃত্যুতে দেশের যে ক্ষতি হয়, বোধ করি, লক্ষ টাকা ব্যয় করিলেও, সে ক্ষতির পূরণ হয় না। পূজ্যপাদ বিদ্যা-সাগরের, ও স্বনাম-প্রসিদ্ধ রাজেন্দ্রলালের স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্নের জন্য গ্রামে গ্রামে সভা-সমিতি হইতেছে—ইহা গৌরবের বিষয় মনে করিতে হইবে। প্রকৃত মহৎ ব্যক্তির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা জাতীয় মহত্ত্বের পরি-চায়ক, সন্দেহ নাই। কিন্তু উক্ত মহাত্মা দ্বয়ের স্মৃতি-চিহ্নের জন্য আমাদের মতে প্রস্তর-খোদিত প্রতিমূর্ত্তি বা অয়েল পেন্‌টিঙের প্রয়োজন নাই। বিদ্যা-সাগরের স্মৃতি-চিহ্নের জন্য "অনাথ আশ্রম" এবং রাজেন্দ্র-লালের জন্য "শিল্প-বিদ্যালয়" স্থাপন করিলে আমরা বোধ করি মৃত মহাত্মাদ্বয়ের প্রতি বেশী সম্মান দেখান হইবে। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুতে শত শত অনাথ পরিবার আশ্রয়-শূন্য হইয়াছে—গরীব দুঃখিগণ পিতার আদর ও মাতার স্নেহ হারাইয়াছে। বিদ্যাসাগরের স্মরণার্থে 'অনাথ আশ্রম' এই কলিকাতা মহানগরীতে প্রতিষ্ঠিত হইলে বিদ্যাসাগরের প্রতি উপযুক্ত সম্মান দেখান হইবে, অথচ দেশের একটি প্রকৃত অভাব মোচন হইবে। শিল্প-বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে আমা-দের বেশী কিছু বক্তব্য নাই; কারণ, ইতি-পূর্ব্বে এ বিষয়ের অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে, এবং সকলেই একবাক্যে ইহার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এই মহানগরীতে আজিও ইহার সূত্রপাত দেখিতে পাইলাম না। মফঃ-স্বলে দুই একটি শিল্প-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে—ফল আশা-প্রদ না হইলেও শুভ লক্ষণ মনে করিতে হইবে। কলিকাতা মহা-নগরীতে একটি শিল্পবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইলে

দেশের প্রভূত মঙ্গল সাধিত হইবে—এবিষয়ে আমাদের অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এই মহাত্মা দ্বয়ের নামে 'অনাথ আশ্রম' এবং 'শিল্প বিদ্যালয়' প্রতিষ্ঠিত হইলে দেশের দুইটি গুরুতর অভাব পূর্ণ হইবে, সহস্র সহস্র দীন দুঃখীর অন্নবস্ত্রের যোগাড় হইবে। আমাদের বর্ত্তমান দুরবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়া যাহাতে দেশের প্রকৃত উন্নতি হয়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি না রাখিলে দেশের প্রকৃত মঙ্গল হইবে না—ইহা একরূপ ধ্রুব সত্য। ভরসা করি, দেশের মুখপাত্রগণ আমাদের প্রস্তাবে মনোযোগী হইবেন।

আলো ও ছায়া।

জগতের চারিদিকেই আলো ও ছায়ার রাজ্য। আলো ও ছায়া লইয়াই সংসার,—সুখ আলো, দুঃখ ছায়া। আলো ও ছায়া লইয়াই ব্রহ্মাণ্ডের রচনা,—যেটুকু বুঝি তাহাই আলো, অবশিষ্ট সকলই ছায়া! এই আলো ও ছায়ার কথা যখনই ভাবিতে বসি, কখন আশা হয়, কখন আবার নৈরাশ্য আসিয়া মনপ্রাণ অবসন্ন করিয়া ফেলে!

আলো কোথায়? জ্ঞানকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলে মূর্খতাই আলো, জ্ঞান ছায়া হইতেও ছায়া! যে কিছু বুঝে না, বুঝিবার দাবি সর্ব্বাপেক্ষা তাহারই বেশী, যে কিছু বুঝে, সে কেবল দেখে আলোকের পশ্চাতে ছায়া, ছায়ার পশ্চাতে আলোক। বুঝি বুঝি বলিয়া ধরিতে চায়, আবার ছায়া দেখিয়া হতাশ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করে! আলো ও ছায়া মানব-জ্ঞানের সঙ্গের সঙ্গী; ইহা কেমন করিয়া ছাড়িব?

দিনের সঙ্গে রাত্রি কোলাকুলি দিয়া চলিয়াছে—এই দিন, আবার দেখিতে না দেখিতে এই রাত্রি! শুধু তাই নয়, দিনের মধ্যে রাত্রি, রাত্রির মধ্যে দিন মিশিয়া রহিয়াছে। কোথায় দিনের অবসান, আর কোথায় রাত্রির আরম্ভ, তাহা দেখাইয়া দিতে পার কি? বিজ্ঞান পরাজয় স্বীকার করিয়াছে,—দিন রাত্রির সন্ধিস্থল কোথায় তাহা বিজ্ঞান জানে না, দেখাইয়া দিতে পারে না!

কুসুম-কলিকার মধ্যে জীবন ও মৃত্যু কেমন কোলাকুলি দিয়া দাঁড়াইয়া আছে, কখন ভাল করিয়া দেখিয়াছ কি? এই কলিকা, এই ফুল্লফুল, এই আবার স্নেহের পরাগগুলি ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতেছে। জন্ম দেখিলাম, যৌবন দেখিলাম, মরণও দেখিলাম;—কিন্তু কোথায় তাহার জীবন ফুরাইল আর মরণের আরম্ভ হইল, তাহাত খুঁজিয়া পাইলাম না!

কবে শীত ফুরাইয়া গ্রীষ্ম আরম্ভ হয়, এতদিন ধরিয়া দেখিয়া দেখিয়া আজিও তাহার কোন মীমাংসা করিতে পারিলাম না! শীত গ্রীষ্ম আর কিছুই নহে—আলো ও

ছায়া; শীতের মধ্যে গ্রীষ্ম, গ্রীষ্মের মধ্যেই শীত। এ জগতে নিরবচ্ছিন্ন আলো অথবা নিরবচ্ছিন্ন ছায়া কোথায়ও দেখিলাম না। অজ্ঞান-বর্জ্জিত জ্ঞান অথবা জ্ঞান-বর্জ্জিত অজ্ঞান নাই; সত্যের সঙ্গে মিথ্যা, মিথ্যার সঙ্গে সত্য মিশিয়া রহিয়াছে। তবে কে বলিল আমি চোক্ বুজিয়া কেবল নিরবচ্ছিন্ন অন্ধকার দেখি? আঁধারের মধ্যে যে আলোক আছে, আঁধার না দেখিলে সে আলোক-রেখা কেমন করিয়া দেখিতে পাইব?

যদি আলো দেখিতে চাও ত ছায়া দেখিয়া চক্ষু ফিরাইও না; যদি আলো বুঝিতে চাও ত আঁধার দেখিয়া ভয় খাইও না। যদি আশা পাইতে চাও ত নৈরাশ্য দেখিয়া শিহরিও না;—শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা কর, নৈরাশ্যের মধ্যেই আশার আলোক ফুটিয়া উঠিবে।

আলো ও ছায়া কোথা হইতে আসিল তাহা জানি না; অনেক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াও সে তর্ক-সাগরের কূল কিনারা মিলে না। যদি কখন দূর হইতে একটু আভাসের মত কূল দেখিতে পাওয়া যায়, অমনি পরক্ষণেই দেখি তাহার চারিদিক্ ঘিরিয়া অনন্ত ছায়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। যাহা কেহ জানে না, যাহা কেহ বুঝে না, তাহা বুঝাইবার ভাষা কোথায় মিলিবে?

বুঝি আর না বুঝি, আলো ও ছায়া যে জগতের নিয়ম তাহা প্রত্যক্ষ সত্য। যদি ছায়ার মধ্যে আলো না থাকিত, বৃক্ষ লতা বাঁচিত না। বিজ্ঞান বলেন, বৃক্ষলতার জীবন রক্ষার জন্য আলো চাই। আলো তাহাদের অস্থিমজ্জা পরিপুষ্ট করে, আলো আছে বলিয়া তাহারা বায়ু হইতে জীবনপ্রদ নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া থাকে। কিন্তু শুধু আলোকে কি কুলায়? আঁধার না আসিলে প্রশ্বাস ছাড়িতে পারে না, দমবন্ধ হইয়া একদিনের মধ্যেই বৃক্ষলতা মরিয়া যায়। বাঁচিবার জন্য আলো চাই, ছায়াও চাই; ইহা বিজ্ঞানের কথা।

মানুষের বাঁচিবার জন্যও আলো এবং ছায়া দুইয়েরই আবশ্যক। সুখ চাই—নিশ্বাস টানিবার জন্য; দুঃখ চাই—প্রশ্বাস ফেলিবার জন্য। শ্বাস প্রশ্বাস না চলিলে কি জীবন বাঁচে? আশা মানব-জীবনের নিশ্বাস, নৈরাশ্য প্রশ্বাস। নৈরাশ্য প্রাণ খালি করিয়া না ফেলিলে আশা সেখানে কেমন করিয়া প্রবেশ করিবে?

নদী-সৈকতে কখন ভ্রমণ করিয়াছ কি? নদীর এ পার ভাঙ্গেত ওপার গড়ে, একসঙ্গে দুপারই ভাঙ্গে না। যদি এক পারও ভাঙ্গিতে না দেও, কোন পারই গড়িবে না—জীবন মৃত্যুতে মিশিয়া যাইবে। আমাদের প্রাণেরও এক পার না ভাঙ্গিলে আর এক পার গড়ে না, দুঃখ না পাইলে সুখের মূল্য বুঝিতে পারি না। তুমিত ভাবিতেছ সুখ দুঃখ, আলো ছায়া, জীবন মৃত্যু পরস্পরের পরম শত্রু; কিন্তু তাহারা যে এক বৃন্তের যুগল-কুসুম, এক জনকে ছাড়িয়া আর এক জন থাকে না।

সংসারে কি কেবলই দুঃখ পাইয়াছ? তবে আর হতাশ হইতেছ কেন? আলো—আশা। আশার জন্য সাধনা করিতে হয়, তার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিতে হয়। আশা বড় আদুরে বালিকা, আদর ভিন্ন সে আসিতে চায় না। আদর করিয়া বুক পাতিয়া দেও, সে বসিয়া বসিয়া দোল

খাইবে; তখন কত আরাম! যদি আশার আরাম চাও, নৈরাশ্য দেখিয়া পলায়ন করিও না।

সব কথা একসঙ্গে বুঝিয়া ফেলিতে চাওত কিছুই বুঝিতে পারিবে না। যাহা অনন্ত অপার, তাহা তিল তিল করিয়া ক্রমে বুঝিতে হয়। মা একবাটি দুধ লইয়া ছেলেকে খাওয়াইতে বসিয়া একসঙ্গে একবাটি দুধই তার গলায় ঢালিয়া দেন না। শিশু যেমন খাইতে পারে তেমনি ঢোকে ঢোকে ঝিনুকে করিয়া খাওয়াইতে হয়। যদি খাইতে চাওত ঢোকে ঢোকে খাইতে হইবে; উৎকট কৌতূহলকে চাপিয়া রাখিয়া ধীরে ধীরে জীর্ণ করিতে হইবে। ক্ষুধা হইয়াছে বলিয়া দুই হাতে খাইতে নাই; ব্যাকুলতা জন্মিয়াছে বলিয়া একদিনেই সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ হইতে পারি কি?

আলো ও ছায়া মানবপ্রাণের পরমবন্ধু,—কাহাকে বিদায় দিয়া কাহাকে আদর করিয়া বসাইব জানি না। যদি ছায়া না থাকে, আলোর জন্য প্রাণমন কে ব্যাকুল করিয়া দিবে? যদি আলো না থাকে, তবে ছায়ার রাজ্য ছাড়িবার জন্য প্রাণকে কে আকর্ষণ করিবে? আলো ও ছায়া না থাকিলে মনুষ্যত্ব বাঁচে না।

আলো ও ছায়া দুই পক্ষপট, তাহার উপর ভর দিয়া প্রাণপিঞ্জরের পাখী অনন্ত আকাশে উড়িতে পারে। কেমন করিয়া পাখী উচ্চ আকাশে ভাসিয়া বেড়ায় তাহা দেখিয়াছ কি? পৃথিবী তাহাকে আপন বুকের উপর টানিবার জন্য সর্ব্বদা আকর্ষণ করিতেছে, আর পক্ষপুট দিয়া বাতাস ঠেলিয়া পাখী সেই অনন্ত আকর্ষণ এড়াইয়া উড়িয়া চলিয়াছে। তোমাকেত ধূলা মাটির আকর্ষণ পৃথিবীর খুঁটার সঙ্গে বাঁধিবার জন্য টানিতেছে; যদি নৈরাশ্যের ছায়া না আসে, এ আকর্ষণ ছুটাইবে কে? কাচ ফেলিয়া কাঞ্চন চাওত ছায়ার পূজা কর।

আলো! তোমাকে নমস্কার করি। তুমি না থাকিলে আমি পৃথিবীর ধূলার প্রকৃত রূপ দেখিতে পাইতাম না। ছায়া! তোমাকেও নমস্কার করি। তুমি না থাকিলে আমি পৃথিবীর ধূলাকে ভাল বাসিতে পারিতাম না।

সংসারে থাকিতে হইলে পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে হইবে,—পরকে আপন করিতে হইবে। ইহার জন্য ছায়া চাই। আলো বলে "কেউ কার নয়, মিছা মায়া," ছায়া বলে "আমার সংসার আমার জায়া"। যদি শুধু আলোই থাকিত, পিতা পুত্র ফেলিয়া, স্বামী স্ত্রী ফেলিয়া, ভাই ভগিনীকে ফেলিয়া পলায়ন করিত। তোমরা দশজন যদি আমার কেহ নহ, তবে তোমাদের জন্য আমি খাটিয়া মরিব কেন? আলো আমাদিগকে স্বার্থপরতা শিখাইয়া দেয়, আপনার দিকে বেশী করিয়া চাহিতে বলে। আবশ্যক হইলে আত্মকল্যাণের জন্য পরকে ভাসাইয়া দিতে একমুহূর্ত্তও ইতস্ততঃ করে না। আলোকের আহ্বানে চৈতন্য সন্ন্যাসী হইলেন, শচীমাতা কাঁদিয়া ধরণী লুটাইতেছেন! কেন, গর্ভে ধারণ করিয়া মাতা কি এতই পর? ছায়া এই স্বার্থপরতা সহিতে পারে না; সে পরকে আপন করিতে চায়, যাহা আজ আছে কাল নাই, তাহাকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে প্রাণের মধ্যে বসাইবার জন্য যত্ন করে, পরের জন্য জীবন উৎসর্গ করিতে উপদেশ করে। ছায়া

আত্ম-ত্যাগের শিক্ষাগুরু—নিঃস্বার্থতার প্রতিমূর্ত্তি! আলো চাই, কিন্তু ছায়া ছাড়া নিরবচ্ছিন্ন আলো চাহি না। আলো ও ছায়া! তোমরা জীবনের গুরু; কে বড় কে ছোট জানি না, আমার নিকট উভয়ই সমান, উভয়কেই কোটী নমস্কার করি।

আলো নিবৃত্তি, ছায়া প্রবৃত্তি—আলো মন প্রাণকে শূন্য-পথে উড়াইয়া দেয়, ছায়া তাহাকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানিয়া রাখে। ছায়া যদি পৃথিবীর দিকে টানিয়া না রাখিত, মানুষ কর্ত্তব্যপালন করিতে পারিত না। আলোকের রাজ্যে কর্ত্তব্য নাই, কেবল সম্ভোগ; ছায়ার রাজ্যে সম্ভোগ নাই, কেবল সহিষ্ণুতা! আলো চলিবার পথ, কিন্তু ছায়ার হাত ধরিয়া চলিতে হয়।

আমরা যখন আলোকে থাকি, তখন আপনার পানে চাহিবার অবসর পাই না। জগতের এত পদার্থ চক্ষের নিকটে সারি বাঁধিয়া দাঁড়ায় যে আপনার দিকে চাহিবার অবসর হয় না। আর ছায়া? বাহ্য জগৎ যখন গভীর আঁধারে ডুবিয়া পড়ে, চাহিয়া চাহিয়া যখন সম্মুখে পশ্চাতে ঊর্দ্ধে অধোলোকে আঁধার ভিন্ন কিছুই দেখিতে পাই না; মন তখন বাহির ছাড়িয়া ভিতরে প্রবেশ করে, আপনার দিকে চাহিতে আরম্ভ করে, আপনার সঙ্গে পরিচয় করিতে আরম্ভ করে। ছায়া না থাকিলে সারাদিন বাহিরের আলোকে ছুটাছুটি করিয়া আত্মদৃষ্টিহীন হইয়া পড়িতে হয়। বাহিরের দিকে চাহিবার জন্য আলো,—আপনার দিকে চাহিবার জন্য ছায়া! আলো ও ছায়া না থাকিলে জ্ঞানের পূর্ণতা হয় না।

আঁধারের মধ্যে কখন একাকী বেড়াইয়াছ কি? কত গম্ভীর বিরাটমূর্ত্তিতে স্তরে স্তরে অনন্ত আঁধার দাঁড়াইয়াছে! সেই আঁধারের দিকে স্থিরনেত্রে চাহিয়া থাকিতে পারত তাহারই মধ্য হইতে জ্যোতির রেখা ফুটিয়া উঠিবে! ছায়া অনন্তের আবরণ; সেই আবরণ ছুটিলেই অনন্তদর্শন। যদি অনন্তকে দেখিতে চাও, ছায়া দেখিয়া চক্ষু ফিরাইওনা।

ভাষা-বিজ্ঞানের রহস্য।

রো সাহেবের যে ইংরাজী ব্যাকরণখানি প্রবেশিকা-পরীক্ষার্থী-বালকেরা পড়িয়া থাকে, তাহাতে তিনি নিম্ন-লিখিত প্রণালীতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইংরাজেরা যাহাকে হিস্‌টরি বলিয়া থাকেন, হিন্দুরা তাহাকেই বেদ বলে; অর্থাৎ বেদ এবং হিস্‌টরি দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ নহে, একই শব্দমাত্র। তিনি বলেন,—"হিস্‌টর্ শব্দ গ্রীক্ ফিস্‌টর্ শব্দের রূপান্তর মাত্র। এই শব্দের শেষাংশ টর্ বাদ দিলে অবশিষ্ট থাকে ফিস্; এই ফিস্‌এর স্ অক্ষরটি দ্ অক্ষরটির রূপান্তর ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব ফিদ্ এই মূল ধাতুটি পাওয়া গেল,

ইহাই সংস্কৃত বিদ্‌ধাতু, এবং ইহাই ইংরাজী জ্ঞানার্থক উইট ধাতু।”

যে যুক্তির বলে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা স্থির করিয়াছেন যে, হিন্দুরা আদৌ ভারতবর্ষে ছিল না, তাহারা মধ্য এসিয়া হইতে এদেশে আসিয়াছে; সংস্কৃত, লাটিন এবং গ্রীক্ ও আধুনিক ইংরাজী প্রভৃতি মূলতঃ একই ভাষা; আর হিন্দু, পারসী, ইংরাজ, জর্মান্ প্রভৃতি প্রকৃত পক্ষে একই জাতি; সে যুক্তি কি এবম্প্রকার?

এই প্রমাণটি পাঠ করিয়া সুরসিক কবি গোল্‌ড্‌স্মিথের লিখিত গ্রন্থের একটি স্থান আমাদের মনে পড়িয়া গেল। ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠকদিগের অবগতির জন্য আমরা সেই স্থানটি এখানে অনুবাদ করিয়া দিলাম। চীনদেশীয় একজন ভ্রমণকারী পণ্ডিত বিলাতে থাকিয়া দেশে তাঁহার বন্ধুকে পত্র লিখিতেছেন;—

“ইউরোপবাসিগণ চীনরাজ্যের অনেক কথা শুনিয়াছে বটে, কিন্তু তথাপি চীনের শিল্প, বাণিজ্য, রীতি, নীতি, আইন কানুন সম্বন্ধে ইহাদের জ্ঞান অতি সঙ্কীর্ণ। ইহারা যেখানে ভারতীয় দ্রব্যজাত রাখে, সেখানে এখনও এমন অসংখ্য বাসন, উদ্ভিদ্, ধাতুদ্রব্য এবং যন্ত্রাদি আছে, যাহার নাম পর্য্যন্ত ইহারা জানে না, এবং যাহার ব্যবহারের বিষয় ইহারা কল্পনাও করিতে পারে না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, চীনের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধে ইহারা নিতান্ত অনভিজ্ঞ হইলেও, দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে চীনের অবস্থা কি ছিল, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার জন্য এখানকার পণ্ডিতেরা অতি বাদানুবাদে ব্যস্ত। চীনের সঙ্গে ইউরোপের সুখ দুঃখের সম্বন্ধ বর্ত্তমান সময়ে অতি অল্পই আছে; দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বোধ হয় সে সম্বন্ধ কিছুই ছিল না। তথাপি এখানকার পণ্ডিতেরা পুরাতত্ত্বের জটিল ঘোর-ফেরের মধ্য দিয়া সে বিষয়ের অনুসন্ধানে ব্যস্ত আছেন; এবং শিকারের অনুধাবন করিবার জন্য বিশ্বাস-যোগ্য কোন চিহ্ন না থাকিলেও অনির্দ্দিষ্ট গন্ধের পশ্চাতে ইহারা দৌড়িতেছেন। কিন্তু এই শিকারে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন পথে চলিতেছেন। একজন বলিতেছেন, চীনদেশ মিসরবাসীদিগের দ্বারা উপনিবিষ্ট হইয়াছিল। তিনি বলেন, মিসরের রাজা সিসষ্ট্রিস্ গঙ্গানদী পর্য্যন্ত সসৈন্যে গিয়াছিলেন; সুতরাং এতদূর যখন গিয়াছিলেন, তখন অবশ্য চীনেও তিনি গিয়াছিলেন, কারণ তথা হইতে চীন হাজার মাইল মাত্র দূর; সুতরাং তিনি চীন দেশে গিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার চীনদেশে যাইবার পূর্ব্বে তথায় লোক জন ছিল না; সুতরাং চীনদেশকে তিনিই উপনিবিষ্ট করিয়াছেন। এবিষয়ের আরও প্রমাণ এই যে, মিসরীদিগের পিরামিড্ আছে, চীনদিগেরও চীনা মাটির মন্দির আছে; মিসরবাসিগণ উৎসবের সময়ে দীপ প্রজ্বালিত করিত, চীনেরাও তাহা করে; মিসরবাসীদিগের বড় নদী ছিল, চীনদিগেরও তাহা আছে। কিন্তু যখন আমরা জানিতে পাই যে মিসর এবং চীনের প্রাচীন রাজগণ একই নামে পরিচিত ছিলেন, তখন এবিষয়ে আর সন্দেহ মাত্রও থাকে না। সম্রাট্ ক-ই রাজা এ-টি-ও-ই-স্ ভিন্ন এক স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন না; আর ইকে এতে, এবং ইকে ট-ও-ই-ম্নে

পরিবর্ত্তিত করিলে অতি সহজেই দেখা যাইবে যে, ক্-ই যাহা, এ-ট্-ও ই-স্‌ও তাহাই। এইরূপে রাজা ম্-ই-ন্-ই-স্ যে সম্রাট্ য়-উ, তাহাও অতি সহজেই প্রমাণ করা যাইতে পারে। অতএব চীন জাতি মৈসর জাতির উপনিবেশিক মাত্র।

কিন্তু আর একজন পণ্ডিত স্বতন্ত্র যুক্তি দেখাইয়া বলেন, মহাপ্লাবনের পরে নওয়া কর্ত্তৃক চীনদেশ উপনিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথমতঃ চীন-সম্রাট্‌দিগের আদি পুরুষ ক্-ও হ্-ই এবং মহাপ্লাবন হইতে মানবজাতির রক্ষাকর্ত্তা ন্-ও-আ-হ্ (নওয়া—বাইবেলের মনু), এই উভয়ের নাম-গত সাদৃশ্য অতি প্রবল; প্রত্যেক নামে চারিটি করিয়া অক্ষর আছে, তাহার দুইটি মাত্র স্বতন্ত্র। কিন্তু এই যুক্তিকে দৃঢ় করিবার উপযুক্ত প্রমাণ আরও আছে। চীনের ইতিহাস বলে, ক্-ও-হ্-ইর পিতা ছিল না। বাইবেলের বর্ণনানুসারে ন্-ও-আ-হ্‌র এক পিতা ছিল বটে, কিন্তু যখন সেই পিতা খুব সম্ভবতঃ মহা-প্লাবনে ডুবিয়া মরিয়াছিল, তখন সে ছিল না মনে করা যাইতে পারে; সুতরাং ক্-ও হ্-ই এবং ন্-ও আ-হ্ একই ব্যক্তি। মহা-প্লাবনের পরে পৃথিবীর গাত্র অবশ্যই কর্দ্দমময় হইয়াছিল; কিন্তু সেই কর্দ্দম অবশ্যই কঠিন আস্তরণে আবৃত ছিল; যদি তাহাই হয়, তবে ঐ আস্তরণের উপরে অবশ্যই তৃণাদি জন্মিয়াছিল; অবাধ্য সন্তান-দিগের নিকট হইতে ন্-ও-আ-হ্‌র পালাইবার ইহা প্রশস্ত পথ বটে; অতএব তিনি পালাইয়া প্রাণের সথে দুই হাজার মাইল হাটিয়া চীনে গিয়াছিলেন; সুতরাং ন্-ও-আ-হ্ এবং ক্-ও-হ্-ই একই ব্যক্তি।

আর এক শ্রেণীর পণ্ডিতেরা—(অজ্ঞ লোকেরা ইহাদিগকে পণ্ডিত বলিয়াই বিশ্বাস করে)—বলেন যে, চীনেরা ইহাদের কাহারও বংশ নহে, তাহারা মেগগ্, মেষেক্ এবং টুবেলের বংশধর, সুতরাং শিসষ্ট্রিস্, ন্-ও-আ-হ্ এবং ক্-ও-হ্-ই, এক ব্যক্তি নহে।

বন্ধুবর! এইরূপে এদেশের অলস লোকেরা জ্ঞানী বলিয়া পরিচয় দেয়, আর তাহাদের এই বালকোচিত নির্ব্বুদ্ধিতাকে লোকে বিদ্যা এবং বিজ্ঞান বলিয়া গ্রহণ করিবে বলিয়া আশা করে।"

বাস্তবিক ভাষা-বিজ্ঞানের এই সকল যুক্তি বড়ই রহস্য-জনক। কেহ ইচ্ছা করিলে একখানি বাঙ্গালা এবং একখানি ইংরাজী অভিধান লইয়া আলোচনা করিতে পারেন, অশেষ আমোদ পাইবেন। মনে করুন 'গ্রাস' একটি শব্দ আছে। বাঙ্গালায় ইহার অর্থ আহার—মানবের খাদ্য; ইংরাজীতে ইহার অর্থ তৃণ—গবাদির খাদ্য। অর্থাৎ যে শব্দে এদেশে মানবের খাদ্য বুঝায়, ইংরাজের দেশে সেই শব্দে গরুর খাদ্য বুঝায়। একটুকু টানিয়া ধরিয়া মীমাংসা করিলে বলা যাইতে পারে যে, এদেশে যাহারা মানুষ, ইংলণ্ডে তাহারা গরু। কেহ যদি গরুর পরিবর্ত্তে ভেড়া বলিতে চাহেন, আমাদের তাহাতে আপত্তি নাই।

শব্দ-সাদৃশ্যের অনুসরণ করিলে ইতর জন্তুর সঙ্গেও মানুষের সজাতিত্ব প্রমাণ করা যাইতে পারে। গভীর রজনীতে মনুষ্যের সাড়া পাইলে কুকুর "কেউ কেউ" করিয়া ডাকিতে থাকে, গৃহস্থও "কে ও?" বলিয়া পরিচয়

জিজ্ঞাসা করে; তাই বলিয়া কুকুর কি মানুষের স্বজাতি? শৃগালের মুখে "ক্যা হুয়া" এবং কোন কোন পক্ষীর মুখে "বউ কথা কও" ও "চোখ্ গেল" শুনিতে পাওয়া যায়; শুক প্রভৃতি কোন কোন পক্ষী অবিকল মানুষের মত আলাপ করিয়া থাকে; কিন্তু তাই বলিয়া ইহাদিগকে একজাতীয় বলা খুব তীক্ষ্ণ বুদ্ধির কাম নহে। অনেক আরব্য পরিবার ভারতে বাস করিয়া ভারতের ভাষায় কথা কহিতেছেন; অনেক নিগ্রো ইংরাজী ভাষাকে মাতৃভাষা করিয়াছে; যদি ঘটনা-বশতঃ ইহাদের ইতিহাস কখনও বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে ইহাদিগকে একজাতীয় বলিতে কি আপত্তি থাকিবে?

শিক্ষানুশীলন।

[যিনি কুড়িটি প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর করিবেন, তিনি শিক্ষা-পরিচর-সমিতি হইতে এক খান প্রশংসাপত্র পাইবেন। বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা-পরিচর তৃতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। প্রাপ্ত উত্তরের সার-সঙ্কলন মাত্র প্রকাশিত হইবে, সবিস্তার প্রকাশ অসম্ভব। শিঃ পঃ সঃ।]

---

১ সংখ্যা উত্তর (শিঃ পঃ ৩য় ভা ২১ পৃষ্ঠা দেখুন)। যে যে কারণে বিদ্যালয়ের প্রতি রামের বিরাগ জন্মিয়াছে, তাহা দূর করিতে হইবে। ঐ সকল কারণ (১) শিক্ষকের দুর্ব্ব্যবহার, (২) সহপাঠীর দুর্ব্ব্যবহার, (৩) মাতার দুর্ব্ব্যবহার, (৪) বিষয়ান্তরে প্রলোভন, (৫) আলস্য, বা (৬) প্রকৃতি-সিদ্ধ বিরাগ। প্রথমোক্ত পাঁচটি কারণ দূর করা যাইতে পারে; কিন্তু এই বিরাগ যদি প্রকৃতি-সিদ্ধ হয়, তবে বালকের প্রকৃতি পরীক্ষা করিয়া যে বিষয় তাহার প্রকৃতির অনুকূল তাহাই শিক্ষা দিতে হইবে। ব্যবহার-পর্য্যবেক্ষণে প্রকৃতি জানা যায়।

---

২ সং উঃ (ঐ দেখুন)। শিক্ষকের প্রথম কর্ত্তব্য, স্বাস্থ্য-ভঙ্গের বিশেষ সম্ভাবনা না থাকিলে তামাক খাওয়া পরিত্যাগ করা। দ্বিতীয় কর্ত্তব্য, আত্ম ব্যবহারের নিন্দা করা। তৃতীয় কর্ত্তব্য, পরিণত-বয়স্কের যাহা সহ্য হয়, বালকের যে তাহাতে বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা, প্রচুর দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বুঝাইয়া দেওয়া। চতুর্থ কর্ত্তব্য, বালকেরা ভাল বিষয়ে শিক্ষকের অনুকরণ না করিয়া কেবল মন্দ-বিষয়ের অনুকরণেই যে পটু, এবিষয় হৃদয়ঙ্গম করিয়া দেওয়া। পঞ্চম কর্ত্তব্য, যাহা দোষাবহ, তাহা গুরুজনের অনুষ্ঠিত হইলেও তৎপরিহারে তাঁহাদের উপদেশ শিরোধার্য্য, বালককে একথা বুঝাইয়া দেওয়া।

---

৩ সং উঃ (ঐ দেখুন)। প্রথমতঃ গোপালের মার অনুচিত মনোবেদনার দিকে লক্ষ্য না করিয়া গোপালকে মৃদু-কঠোর শাসনে শিষ্টতা শিক্ষা দিতে হইবে। ইহাতে সুফল না ফলিলে গোপালকে প্রাকৃতিক শাসনের অধীন করিতে হইবে;—অর্থাৎ যে কার্য্যের

যে ফল অবশ্যম্ভাবী, গোপালকে অবাধে তাহা ভোগ করিতে দিতে হইবে। চুরির জন্য শাস্তি-ভোগ, দুর্ব্ব্যবহারের জন্য প্রতিবাসীদিগের নিকট লাঞ্ছনা-ভোগ, দ্রব্য-জাতের অপব্যবহারের জন্য অভাব-সহন, ইত্যাদি নৈসর্গিক উপায়ে গোপালের সংশোধনের চেষ্টা সফল হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা।

---

৪ সং উঃ (ঐ দেখুন)। যে বালকটি ৫ এর পূর্ব্বে ১ বসাইয়াছে, তাহাকে ধরিবার জন্য নিম্নলিখিত পরীক্ষাগুলি আবশ্যক;—(১) বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান করিয়া ধুক্‌ধুকি দেখা, (২) সকলের হস্তাক্ষর পরীক্ষা করা, (৩) সকলকেই ধমকাইয়া মুখের চেহারা পরীক্ষা করা, (৪) অলক্ষিত থাকিয়া বালকদিগের স্বাধীন আলাপ শ্রবণ করা, (৫) উপস্থিত মত ২।১টি ফাকি করিয়া তাহাদের কার্য্য পরীক্ষা করা।

---

৫ সং উঃ (ঐ ২২ পৃষ্ঠা দেখুন)। যে সকল বালক গালি দিতে অভ্যস্ত, তাহারা প্রায়ই গালির কোন অর্থ জানে না, কেবল অন্যের মুখে শুনিয়াই গালি অভ্যাস করে, সুতরাং অন্যের গালি শুনিয়াও মনে বিশেষ কষ্ট পায় না। গালি দেওয়া যাহাদের অভ্যাস, এমন লোকের নিকটে কোন বালককেই যাইতে দেওয়া উচিত নহে। গালি দেওয়া যে বালকের অভ্যাস হইয়াছে, তাহাকে অন্য বালকের সঙ্গ-সুখ হইতে কিছুদিন বঞ্চিত রাখা কর্ত্তব্য। যখন অন্য কেহ তাহার সঙ্গে মিলিবে না, তখন নিশ্চয়ই তাহার অনুতাপ হইবে, আর সুযোগ না পাওয়াতে গালি দেওয়ার অভ্যাসও ক্রমে কমিয়া যাইবে।

লিপি-কৌশল।

২

অর্থবোধ। এক জনের মনের ভাব আর একজনকে বুঝাইয়া দেওয়াই লিপি-কৌশলের সর্ব্বপ্রধান আবশ্যকতা। তাহার জন্য শব্দের সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু শব্দ নির্ব্বাচন করিতে বসিলেই দেখিতে পাইবে যে, এক শব্দের একাধিক অর্থ হইতে পারে। সুতরাং শব্দ-নির্ব্বাচন-কালে অর্থবোধের দিকে বিশেষ দৃষ্টি থাকা প্রয়োজন। যেমন এক শব্দের বহু অর্থ হওয়া সম্ভব, সেইরূপ বহু শব্দের এক অর্থ হওয়াও অসম্ভব নহে। যে 'হরি' শব্দে নারায়ণ বুঝায় সেই হরি শব্দেই সিংহ বুঝাইতে পারে, ইহা যেমন সম্ভব, সেইরূপ 'জল' এই কথাটি বুঝাইতে হইলে জল, বারি, সলিল প্রভৃতি অনেকগুলি পৃথক্ পৃথক্ শব্দ ব্যবহার করাও সম্ভব। অর্থবোধের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া শব্দগুলিকে দুই ভাগে বিভাগ করা যাইতে পারে; যথা, একার্থবাচক বহুশব্দ, এবং বহু অর্থবোধক এক শব্দ। এখন জিজ্ঞাস্য এই যে, লিখিবার সময়ে এই সকল শব্দ কিরূপে ব্যবহার করিতে হইবে? ইহার যদিও কোন ধরাবাঁধা নিয়ম সংস্থাপন করা অসম্ভব, তথাপি মোটের

উপর অর্থবোধের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া শব্দ প্রয়োগ করিলেই কোন গোলযোগ হইবার আশঙ্কা থাকে না। যে সকল শব্দ বহু অর্থ-বাচক, তাহাদের সকল অর্থগুলিই সমানরূপ সুপরিচিত নহে। 'জীবন' বলিতে যে প্রাণ বুঝায় তাহা সকলেই জানি, কিন্তু জীবন বলিলে যে 'জল' বুঝাইতে পারে তাহা অনেকে জানি না। বহু অর্থবাচক শব্দগুলির কতক-গুলি অর্থ সরল ও সর্ব্বজন-পরিজ্ঞাত, এবং কতকগুলি অর্থ কষ্টকল্পনা-সাপেক্ষ। সুতরাং বহু অর্থবাচক কোন শব্দ ব্যবহার করিতে হইলে তাহার যে অর্থটি সুপরিজ্ঞাত, সেই অর্থে ব্যবহার করাই নিরাপদ। যে সকল একার্থবোধক বহু শব্দ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের মধ্যেও সকলগুলিই সমান পরি-চিত নহে, এবং যদিও সেই সকল শব্দ একার্থবোধক হউক, তথাপি স্থলবিশেষে সেই একার্থের মধ্যেও তারতম্য থাকে। সমীরণ, প্রভঞ্জন, পবন, বায়ু, সমীর, মলয়জ, মারুত প্রভৃতি অনেকগুলি শব্দেই বাতাস বুঝাইয়া থাকে। ইহার মধ্যে বায়ু অথবা বাতাস কথাটা সকলেই জানে, সকলেই বুঝে। পবন, সমীর, এবং সমীরণ কথাও অনেকেই শুনিয়া থাকে, কিন্তু মলয়জ, মারুত, প্রভঞ্জন প্রভৃতি শব্দ তত সর্ব্বজন-পরিচিত নহে। আবার প্রভঞ্জন বলিতে যে অবস্থার বাতাস বুঝায়, সমীরণ বলিতে তাহা না বুঝাইতেও পারে। এরূপ অবস্থায় একার্থবোধক বহু শব্দ থাকিলে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত এবং আবশ্যকীয় অর্থবোধক শব্দটিকে ব্যবহার করাই ভাল। অনেকের বিশ্বাস আছে যে, যত গুরুগর্জ্জনশীল শব্দ প্রয়োগ করা যায়, ততই লিপিকৌশল প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই জন্য অনেকে শ্রুতিপ্রসাদন শব্দ প্রয়োগ করিতে গিয়া এমন অপূর্ব্ব ভাষার সৃষ্টি করেন যে, তাহার টীকা টিপ্পনি না থাকিলে সাধারণ পাঠকের দন্তস্ফুট হইয়া উঠে না! ইহাকে লিপিকৌশল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। চিত্রকরের চিত্রে সৌন্দর্য্য চাই, চিত্রিত কুসুমস্তবকে কেহ সুগন্ধের প্রত্যাশা রাখে না; কিন্তু স্বাভাবিক ফুলে সৌন্দর্য্যের সঙ্গে সুগন্ধ চাই, তাহা না থাকিলে কে তাহার আদর করিবে? সুলিখিত প্রবন্ধে শব্দবিন্যাসের সৌন্দর্য্য চাই, কিন্তু তাহার অনুরোধে অর্থবোধের সুগন্ধ পরিত্যাগ করিতে পারি না। আগে অর্থবোধ, তাহার পর শব্দবিন্যাসের সৌন্দর্য্য। লিখিবার সময়ে অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া লিখিও; মনে রাখিও যে অর্থবোধ না হইলে শব্দাড়ম্বর শুনিয়া কাহারও কোন ফল নাই। সরল, সহজ, এবং শ্রুতিমধুর শব্দ প্রয়োগ করাই লিপিকৌশলের শ্রেষ্ঠ গৌরব, একটু যত্ন চেষ্টা করিলেই তাহা অভ্যাস করা যাইতে পারে।

পদ-বিন্যাস। একটিমাত্র কথায় অতি অল্প পরিমাণ ভাব প্রকাশিত হইতে পারে, সুতরাং ক্রমাগত ভাব প্রকাশ করিতে হইলে ক্রমাগত শব্দ প্রয়োগ করিতে হয়। এইরূপে কতকগুলি বিভিন্ন শব্দ একত্র গ্রথিত হইলে তাহাকে 'পদ' বলিয়া থাকে। ভাবানু-সারে এইরূপ কতকগুলি পদ একত্র বিন্যস্ত হইলে তাহা প্রবন্ধ বা বক্তৃতা হয়। শব্দসকল বাছিয়া বাছিয়া একত্র গাঁথার নাম পদবিন্যাস। ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। বাগানের কুটন্ত

ফুলের কলিকাগুলি উঠাইয়া আনা বরং সহজ, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গুছাইয়া মালা গাঁথায় গুণীপণা চাই। এই জন্য ফুল এবং সূতা লইয়া মালা গাঁথিতে বসিলেই সকলের মালা সমান সুন্দর হয় না। লিপিকৌশলেরও সেই দশা। তোমার মানসকাননে সুন্দর ভাবের ফুল ফুটিল, সযত্নে তাহাদিগকে চয়ন করিয়া একত্র করিলে, কিন্তু তোমার যদি লিপিকৌশল না থাকে, কাহার পর কোন্ ভাবের ফুলটি বসাইতে হইবে তাহা যদি না জান, তোমার ভাবের মালা সৌন্দর্য্য-বিহীন হইয়া পড়িবে। এইরূপে কত সুন্দর সুন্দর ভাবের ফুল কেবল সাজাইবার দোষে লোকচক্ষু আকর্ষণ করিতে পারিতেছে না। লিপি-কৌশল অভ্যাস করিতে বসিয়া ইহা সর্ব্বদা প্রত্যক্ষ করিতে পারা যায়। যিনি নূতন লেখক, কখনও লিপিকৌশল শিক্ষা করেন নাই, তাঁহার লেখা হাতে পড়িলেই সমালোচক তাহার মধ্যে এই গুণীপণার অভাব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। মাসিক পত্রিকার সম্পাদকদিগের হাতে এই শ্রেণীর কত প্রবন্ধ, কত কবিতা, কত উপন্যাস যে আসিয়া উপনীত হয়, তাহা বিস্তৃতরূপে আলোচনা করিবার স্থান নাই। অনেক সুন্দর সুন্দর ভাব এইরূপে বিনষ্ট হইতেছে। যদি তোমার মনের ভাব আমাকে বুঝাইতে চাও, তাহা হইলে এমন স্তরে স্তরে বুঝাইতে হইবে যেন বুঝিতে কোন গোলযোগ না হয়। ইহাই পদ-বিন্যাসের কৌশল; কিন্তু ইহা বড়ই কঠিন, ধরাবাধা নিয়ম নাই যে ইহা শিখাইয়া দেওয়া যায়। মোটের উপর একটি কথা স্মরণ রাখিও—তাহা হইলেই হইবে। মনে রাখিও যে, আমি তোমার মনের ভাব কিছুই জানি না, কোথায় আরম্ভ কোথায় শেষ কিছুই দেখি নাই; সুতরাং একজন অপরিচিত লোককে নূতন বাড়ীর সকল স্থান যেমন পর্য্যায়ক্রমে দেখাইতে হয়, তোমার মনের সকল ভাবগুলিই সেইরূপ পর্য্যায়ক্রমে আমাকে দেখাইও। আধখানা বলিয়া আধখানা লুকাইয়া রাখিও না, অথবা যে টুকু সর্ব্বাগ্রে বলা উচিত তাহার জন্য শেষ পর্য্যন্ত আমাকে বসাইয়া রাখিও না। তাহা হইলেই মোটের উপর তোমার কথা আমি সহজে বুঝিতে পারিব।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

মহৎ উদ্দেশ্যে যেই আত্মা করে বশ,
তাহারই হৃদয়ে আছে প্রকৃত সাহস।

বিবেক সতত যার থাকে পরিস্কার,
মনেতে প্রকৃত শান্তি সম্ভবে তাহার।

একত্র ভোজন পান করিলেই নয়,
বহু ভাগ্য-ফলে তবে বন্ধু-লাভ হয়।

যেই করে অপরাধ সেই শাস্তি পায়,
দেখিয়া অন্যের মন ভাল পথে ধায়।

নিন্দা কিম্বা তোষামোদ কিছু ভাল নয়,
উভয়েরে সমভাবে লোকে মন্দ কয়।

ক্ষমাতে নীচতা কিছু আসিতে না পারে,
কিছুমাত্র লজ্জা নাই ভ্রান্তির স্বীকারে।

সংযত হইয়া কর আপন শাসন,
সহজে শাসিত তবে হবে সর্ব্বজন।

সাধুসহ সদালাপে যত শিক্ষা হয়,
বিজন চিন্তার ফল তত শিক্ষা নয়।

ঈশ্বর-মহিমা চিন্তা যতই করিবে,
আপন ক্ষুদ্রতা-বোধ ততই জন্মিবে।

সন্তোষের কুটীরেতে যত সুখ মিলে,
দুশ্চিন্তার তত সুখ নহে হর্ম্ম্য-তলে।

সংসারে বিবেক রহে বিশুদ্ধ যাহার,
ন্যায়ের সুদৃঢ় দুর্গ অন্তরে তাহার।

যাহারা সহজে করে বিশ্বাস অপরে,
পড়িয়া ধূর্ত্তের জালে তাহারাই মরে।

সময় বুঝিয়া যদি সতর্কে চালায়,
প্রশংসা ভৎর্সনা দুই শোভে বন্ধুতায়।

বন্ধুতার সুখ যদি লভিবারে চাও,
পরস্পরে আগে তবে সদ্ভাব বাড়াও।

তোমার নিজের বস্তু না হয় যে ধন,
করিও না তার তরে লোভ কদাচন।

সতত আশ্চর্য্য কথা যে রসনা বলে,
তাহারে বিশ্বাস না করিবে কোন কালে।

বুদ্ধির উৎকর্ষ-লাভে যদি থাকে মন,
নিপুণ চিন্তার সঙ্গে কর অধ্যয়ন।

কুপ্রথায় সায় দেয় দুর্ব্বল যে জন,
পরিণামে হয় তার চরিত্র-স্খলন।

যাহাতে উভয় দিকে লাভালাভ দেখে,
সেই সন্ধি চিরদিন অব্যাহত থাকে।

আমোদ প্রমোদ কর যত মনে লয়,
মদ্যাদিতে তাহা যেন দূষিত না হয়।

—০:০:০:০:০—

প্রাপ্তগ্রন্থাদি।

(শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি হইতে প্রাপ্ত।)

আদর্শ।—ক্ষুদ্র-উপন্যাস ঢাকা স্যমন্তক প্রেস হইতে মুদ্রিত। মূল্য ।৵০ আনা। গল্পচ্ছলে গুটিকত হিন্দু-ধর্ম্ম-সম্বন্ধীয় উপদেশ দেওয়া গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য। "Fiction to please, should wear the fall of truth" এই মহাবাক্যটী উপন্যাস লেখকমাত্রেরই মনে রাখা কর্ত্তব্য। চতুর্থ পরিচ্ছেদে গ্রন্থকার নিজ বক্তব্য ধর্ম্মমত বিবৃত করিয়া গ্রন্থের

অবশেষ ভাগ তাহারই উদাহরণ স্বরূপ একটী উপন্যাস লিখিয়াছেন। প্রথম পরিচ্ছেদের সহিত পুস্তকের কোন সম্বন্ধ দেখা যায় না, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পরিচ্ছেদ সূচনা মাত্র। হিন্দু ধর্ম্মের সার মত ও গভীরভাবপূর্ণ সার্ব্বজনিক উপদেশ সমূহ সংগ্রহ করা ও তাহা সর্ব্বসাধারণের হৃদয়ঙ্গম করাইবার চেষ্টা ও উদ্যম সর্ব্বথা প্রশংসনীয় সন্দেহ নাই; কিন্তু গ্রন্থকার তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তিনি যেভাবে সমাজ ধর্ম্ম বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, আমরা সকল স্থলে তাঁহার সহিত ঐক্য হইতেও পারি না। তিনি ৫৭ পৃষ্ঠায় পাপের শাস্তি বিধান সম্বন্ধে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন যোগেশ ও শঠেন্দ্রের যে পরিণাম দেখাইয়াছেন সমাজ তাহা অনুসরণ করিতে পারে না; আমরা তাহাতেই বলি যাহা অস্বাভাবিক তাহা "আদর্শ" হইতে পারেনা।

২। ছাত্রসখা।—মাসিক সন্দর্ভ ও সমালোচন কতিপয় ছাত্র প্রবর্ত্তিত। কাছাড় হাইলকান্দি ছাত্রসখা সমিতি হইতে প্রকাশিত। বার্ষিকমূল্য মায় ডাকমাশুল ১।০আনা।

উক্ত পত্রিকার ১ম খণ্ড ২য় সংখ্যা আমরা পাইয়াছি। কাছাড়ে শিক্ষা প্রচারের যেরূপ অল্পতা তাহাতে ছাত্রবর্গের এই উদ্যম অতি প্রশংসনীয়। এ সংখ্যার প্রবন্ধগুলি পড়িয়া যদিও আমরা আশানুরূপ সন্তোষলাভ করিতে পারিলাম না কিন্তু আশা করা যায় ক্রমে ইহার উন্নতি হইবে এবং সহযোগী ছাত্রজীবনের কর্ত্তব্যানুষ্ঠান সকলের হৃদয়ঙ্গম করাইয়া দেশের পরম মঙ্গলসাধন করিবেন। সহযোগীর দীর্ঘ জীবন আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি।

৩। An Introduction to the study of Geometry compiled by P. Chaudhery Price one anna. গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলাম। অতি সংক্ষেপে কয়েকটী আবশ্যকীয় অবতারণা করা হইয়াছে; সুতরাং কিছু জটিল হইয়াছে। এণ্ট্রান্স ও এলএ পরীক্ষার্থী ছাত্র মাত্রকেই ইহা একবার পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি।

শোকোচ্ছ্বাস বা অশ্রুজল—ক্ষুদ্র কবিতা। ভিখারী বালক প্রণীত। মূল্য ৵১৫। ঢাকা বাঙ্গালা যন্ত্রে—একে বালকের কবিতা, তাহাতে সহপাঠীর অকাল মৃত্যুর শোকোচ্ছ্বাস—ইহার সম্বন্ধে সমালোচনা না করাই ভাল!

প্রাথমিক ব্যাকরণ—দীনবন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ।/০ আনা আকার ৯৭ পৃষ্ঠা।

সুকুমারমতি বালকদিগের পাঠোপযোগী হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থের প্রচলন বাঞ্ছনীয়। সন্ধি সূত্রাদির মধ্যে নূতনত্ব আছে।

ফরিদপুর হিতৈষিণী।—মাসিক পত্র ও সমালোচন। বার্ষিক মূল্য ১৲ টাকা। আকার ক্ষুদ্র, ছাপা ও কাগজ মন্দ; সর্ব্বথা মফস্বলের প্রথম চেষ্টার অনুরূপ। সংবাদ প্রকাশ না করিয়া সুলিখিত প্রবন্ধসহ অধিকতর যত্নের সঙ্গে সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নব সহযোগীর উন্নতি ও দীর্ঘজীবন দেখিলে সুখী হইব। যেরূপ ভাবে এক্ষণে চালিত হইতেছে ইহা শীঘ্রই পরিবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন।

বৈষ্ণব। ভক্তি-প্রচারক মাসিক

পত্র, ৯ম সংখ্যা পাইয়াছি। ইহার অঙ্গাবরণ ও মুদ্রণ কার্য্য পরিপাটী হইয়াছে, যদিও লেখকগণের নাম প্রকাশিত হয় নাই এবং তজ্জন্য সম্পাদক "নামাবলী" গায়ে দিয়া সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ না করার কারণ দর্শাইয়াছেন, তবুও আমরা ইহাকে সমুচিত আদরের সহিত অভ্যর্থনা করি। আমরা উচ্চনাম চাই না, উচ্চশ্রেণীর প্রবন্ধ দেখিতে চাই। এই সংখ্যায় যে কয়েকটী প্রবন্ধ দেখিলাম তন্মধ্যে 'রসকীর্ত্তনের' বর্ত্তমান প্রণালী সম্বন্ধে লেখক যাহা লিখিয়াছেন তাহা বৈষ্ণব পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করিলে ভাল হয়। যেখানে একবিন্দুও ভাব নাই সেখানে এক সিন্ধু পরিমাণ ভাবুকালী দেখাইতে গিয়া অনেকে মহাভাবের অভিনয় পর্য্যন্ত করিতেছেন—ইহা বড়ই ক্লেশের কথা! গীতার দ্বাদশ অধ্যায়ের ভক্তিযোগাত্মক ১৩শ হইতে ২০শ শ্লোকের বাঙ্গলা কবিতার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে; গীতা যেমন গভীর ভাবপূর্ণ তত্ত্বকথার ভাণ্ডার, অনুবাদে অনেক পরিমাণে সে গাম্ভীর্য্য রক্ষিত হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। অনুবাদের তৃতীয় পদের দুই ছত্র মূলের অনুরূপ হয় নাই। মূলে আছে "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।" অনুবাদক লিখিয়াছেন—

"লোকের উদ্বেগ নাহি করে উৎপাদন।
অথবা যে নয় লোক উদ্বেগ-কারণ॥"

আমাদের বিবেচনায় 'কিম্বা লোক নহে যার উদ্বেগ-কারণ' লিখিলে অধিকতর মূলানুরূপ হইত। গীতাদি শাস্ত্রের অনুবাদে বৈষ্ণবের ভ্রম হওয়া প্রার্থনীয় নহে। আমরা বৈষ্ণবকে ভালবাসি বলিয়া ভ্রমটির উল্লেখ করিলাম।

প্রকৃতি। বিজ্ঞান ও (হোমিওপ্যাথি) চিকিৎসা প্রচারক মাসিক পত্র ১ম ভাগ ১ম সংখ্যা ফরিদপুর স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনেস্‌পেক্টার শ্রীপ্রভাতচন্দ্র সেন সম্পাদিত। প্রভাত বাবু বিজ্ঞানালোচনার সঙ্গে চিকিৎসা তত্ত্ব প্রচারে নিযুক্ত হইয়াছেন ইহা বড়ই সুখের বিষয়। আশঙ্কা এই যে বঙ্গসাহিত্যে উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞানবিষয়ক পত্রিকা নাই, প্রকৃতি তাহার স্থান পূরণ করিবে কি না নমুনা দেখিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না। ক্রমশঃ প্রকাশ্য কতকগুলি প্রবন্ধের সূচনামাত্র বাহির হইয়াছে, শেষ না দেখিলে ভালমন্দ বিচার হইতে পারে না। সাধারণের বোধগম্য করিয়া প্রবন্ধগুলি লিখার চেষ্টা হওয়া উচিত। আমরা প্রকৃতির বিনাশ চাই না—ক্রমোন্নতি দেখিলে সুখী হইব।

বঙ্গ-নিবাসী। বৃহদায়তনের সাপ্তাহিক সুলভ সংবাদপত্র। সহযোগী কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যে সকল গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছেন তাহা সাহিত্যজগতে অজ্ঞাত নাই। নূতন সম্পাদকের তত্ত্বাবধানে নূতন উৎসাহে সহযোগীকে নববর্ষে প্রবেশ করিতে দেখিয়া সুখী হইলাম। সহযোগী হিন্দুর মুখপাত্র, সংবাদপত্র সাম্প্রদায়িক মুখপাত্র হইলে অনেক আপদ বিপদ হইবার কথা। নূতন সম্পাদক আশা দিয়াছেন যে 'সত্যই তাঁহার লক্ষ্য' হইবে, কথা কার্য্যে পরিণত হইলে বঙ্গনিবাসী বাঙ্গলার একখানি উৎকৃষ্ট সংবাদপত্র বলিয়া পরিগণিত হইবে। আমরা সহযোগীর দীর্ঘজীবন প্রার্থনা করি।

[illegible] । অগ্রহায়ণ [illegible] ।

(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,

৯০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশার্থ প্রবন্ধ ও বিনিময়ার্থ পত্রিকা প্রভৃতি সম্পাদকের নিকট, সমালোচনার্থ পুস্তকাদি শিক্ষা-পরিচর-সমিতির সম্পাদকের নিকট রামপুর বোয়ালিয়ায় প্রেরিতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের মূল্যাদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট কলিকাতায় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য এবং বিজ্ঞাপনের নিয়ম তথায় জ্ঞাতব্য।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১।৶০। অগ্রিম মূল্য ব্যতীত পত্রিকা প্রদত্ত হয় না।

গ্রাহকগণের অবশ্য পাঠ্য।

অনেক গ্রাহক টাকা পাঠাইবার সময় আপন আপন নাম ও নম্বর লিখিতে বিস্মৃত হইয়া, আমাদেরকে গোলে ফেলিয়া থাকেন এবং নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত না হউন, অসুবিধা ভোগ করিয়া থাকেন। গত বৎসর এ, ভট্টাচার্য্য, এই নামে একটি গ্রাহক টাকা পাঠাইয়াছেন, তাহা আমরা নম্বর অভাবে জমা করিয়া লইতে পারি নাই।

এ বৎসর দুইটি গ্রাহক ঐরূপ টাকা পাঠাইয়াছেন, তাঁহার একটির নাম নম্বর কিছুই নাই, প্রাপ্তির তারিখ আছে, ১২৯৮ সাল ১১ই ভাদ্র ৩।০। আর একটি গ্রাহক গিরিশচন্দ্র চৌধুরী ১২৯৮। ১৯শে ভাদ্র ৩।০ পাঠাইয়াছেন, তিনিও ঠিকানা বা নম্বর লেখেন নাই, ঐ নামে অনেকগুলি গ্রাহক আছেন, এখন যিনি পাঠাইয়াছেন, তাঁহার পত্র ভিন্ন এ টাকাও জমা করা হইতেছে না। অনুগ্রহ করিয়া গ্রাহকগণ এবিষয়ে দৃষ্টি রাখিবেন, এই প্রার্থনা।

যাঁহারা এখনও টাকা পাঠান নাই, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক স্ব স্ব দেয় শীঘ্র পরিশোধ করিয়া বাধিত করুন।

তত্ত্বাবধায়ক।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। | অগ্রহায়ণ ১২৯৮ সাল। | ৮ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

২০

পর্ব্বত-প্রমাণ বুকে লইয়া বাসনা-রাশি,
দিগ্‌ভ্রান্ত মতিচ্ছন্ন ঘুরিতেছি দিবানিশি!
ধরার কলুষ-জাল ছাড়িয়া, স্বাধীন চিতে
অনন্ত গগন-পথে উড়িয়া যাইতে চাই,—
মাটির জঘন্য কীট, পাতকেব ক্রীতদাস!—
কেমনে উড়িব প্রভো! পাপীর যে পাখা নাই!
কখন বাসনা হয় ধরার দারিদ্র্য-ভার,
দুঃখ-ভার, পাপ-ভার মাথায় তুলিয়া লই,—
যে ভারে ধরণী যুড়ি ব্যথিত মানব-প্রাণ,
ঘুচাইয়া হাহাকার সে ভার আপনি বই!
বৃথা সে বাসনা হরি! আপনার পাপ-তাপে,
বিষাদ-মালিন্য-ভারে আপনি ভাঙ্গিয়া পড়ি,
আপনার ক্ষুদ্রতায় বিশ্বগ্রাসী অন্ধকার,
আপন কলুষ-পঙ্কে যাইতেছি গড়াগড়ি!
সখাহে! অমন করি কাঙ্গালে দিও না ছাড়ি,
উদ্দাম বাসনা যেন যায় না বিপথে চলি,
বারি-গর্ব্ভে মীন কিবা মার কোলে শিশু যথা,
তোমারি ইচ্ছার মাঝে বাসনা বেড়া'ক খেলি।

ছাত্রজীবন।

৪

আজ যাহারা পাঠশালার বালক, সময়ে তাহারাই সমাজের পরিচালক হইবে। আজ যাহাদের ক্ষীণ কণ্ঠের অস্ফুট কথায় সহজে কেহ কর্ণপাত করিতে চাহেন না, কালে তাহাদিগের কথাই দেশের নরনারী অবনত মস্তকে শ্রবণ করিবে, তাহাদের কার্য্যই, ভাল হউক আর মন্দ হউক, পরবর্ত্তী বংশাবলী অনুকরণ করিবে। আমরা তখন অনন্ত-শয্যায় চিরনিদ্রায় নিমগ্ন থাকিব, আমাদিগের আদর্শ, আমাদিগের উপদেশ, আমাদিগের প্রবর্ত্তিত শাস্ত্র, নীতি, ধর্ম্ম ও দেশাচার তখন তাহাদিগের আদেশ, তাহাদিগের রুচি ও তাহাদিগের শিক্ষার অনুবর্ত্তন করিবে। সুতরাং দেশের ভবিষ্যৎ ভাগ্যের দিকে চাহিয়া চির-স্থায়ী কোন সদনুষ্ঠান করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে ছাত্রজীবনে তাহার বীজ বপন করিতে হইবে। যদি জাতীয়তা জীবিত রাখিতে হয়, ছাত্র-গণকে জাতীয় শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে; যদি স্বদেশ-প্রেম সঞ্জীবিত করিতে হয়, তরুণ হৃদয়ে তাহা সঞ্চারিত করিতে হইবে; যদি জগতের সম্মুখে স্বজাতি-স্বধর্ম্মের উচ্চ পতাকা উড্ডীন করিতে হয়, ছাত্রগণকে সেই গৌরব-পতাকা বহন করিবার উপযুক্ত করিতে হইবে।

শিক্ষা যেমন মানব-জীবনকে নিয়মিত করে, এমন আর কিছুতেই করে না। "যেমন বীজ বপন করা যায় সেইরূপ ফলই ফলিয়া থাকে", একথা কৃষিশাস্ত্রে যেমন সত্য, শিক্ষা-কার্য্যেও সেইরূপ। স্বাধীন অনুসন্ধানের প্রবৃত্তি বিলুপ্ত করিয়া অবিশ্রান্ত পরানুকরণ করিতে শিখাও, স্বজাতিপ্রেম বিলুপ্ত করিয়া স্বদেশের নিন্দামূলক গ্রন্থাদি পাঠ করাও, স্বধর্ম্মের উজ্জ্বল তত্ত্বকথা ঢাকিয়া রাখিয়া ছাত্রগণকে ধর্ম্মহীন সাংসারিক শিক্ষা প্রদান কর,—একপুরুষের মধ্যেই দেখিবে বঙ্গদেশ কৃষ্ণকায় সাহেবের আবাসভূমি হইয়াছে, আর্য্যধর্ম্মনীতি অসভ্যের বন্যসঙ্গীতে পরিণত হইয়াছে, গৌরবমণ্ডিত উচ্চশির পরপাদুকাচাপে অবনত হইয়া গিয়াছে! বাহ্যজগতে বাহুবলের সঙ্গে বাহুবলের সংগ্রাম হইয়া থাকে, যে পরাজিত হয় তাহার স্কন্ধে চড়িয়া বিজেতা বিজয়-দুন্দুভি বাজাইতে থাকে। রাজ্যবিব-র্ত্তনের ইতিহাসে ইহার নিদর্শন দেখিতে পাইবে। অন্তর্জগতেও এইরূপ সংগ্রাম চলিয়া থাকে। যে জাতির ভাষা নাই, সাহিত্য নাই, ধর্ম্ম নাই, জাতীয় শিক্ষা নাই, তাহারা নিরস্ত্র দুর্ব্বল ভীরু কাপুরুষের ন্যায় সুসভ্য জাতির পদানত হইয়া পড়ে—এইরূপে আফ্রিকা, নিউজিলণ্ড, ভারতের সাঁওতাল কুকি প্রভৃতি বর্ব্বর জাতিরা সাহেব সাজি-তেছে! কিন্তু যেখানে উভয় জাতিরই মান-সিক বল সমান, সেখানে পরস্পর পরস্পরকে পরাজয় করিতে পারে না, বরং তাহাদের মধ্যে মহত্ত্বের বিনিময় চলিতে থাকে। এই বিনিময়ে একজাতি আর একজাতির মহত্ত্ব শিক্ষা করে, কিন্তু তৎসঙ্গে আপনার জাতী-

য়তা বলিদান করে না। আমাদের এখন তাহাই আবশ্যক। আমরা বর্ব্বর পার্ব্বত্য জাতি নহি যে, স্বদেশের সকল শিক্ষাই ত্যাগ করিতে হইবে। আমাদের জাতি আছে, ধর্ম্ম আছে, সাহিত্য আছে, দর্শন আছে, পূর্ব্ব-গৌরবের ইতিহাস কীট-দষ্ট হইলেও একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আমরা স্বদেশের যাহা কিছু ভাল তাহা পরিত্যাগ করিব কেন? পাশ্চাত্য শিক্ষা বড় উদার শিক্ষা—সে তোমাকে জাতিধর্ম্ম বিসর্জ্জন দিতে বলে না। যদি জাতীয়ভাবে সেই শিক্ষা প্রদত্ত হয়, তাহাতে উপকার ভিন্ন অপকার হইতে পারে না।

শিক্ষাই আর্য্যত্বের নিদর্শন। শিক্ষার জন্যই শিক্ষা—অর্থোপার্জ্জন তাহার একটি অবশ্যম্ভাবি গৌণফল হইতে পারে, কিন্তু মুখ্য উদ্দেশ্য নহে। এই জন্য যাবজ্জীবনব্যাপী মহাশিক্ষাই আর্য্যজীবনের অবলম্বন ছিল। বিদ্যালয়ের সঙ্গে শিক্ষা শেষ হইত না। দৈনিক পঞ্চযজ্ঞের মধ্যে অধ্যয়ন-অধ্যাপন পরিগণিত হইত। বর্ত্তমান শিক্ষা যাহাতে সেই লক্ষ্য স্থির রাখিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন। কিন্তু শিক্ষা-বিভাগ তাহা সম্পাদন করিতে অক্ষম। তুমি বিদ্যালয় ছাড়িয়া যখন সংসারাশ্রমে প্রবেশ করিবে, তখন বেত্রহস্তে শিক্ষক মহাশয় ত আর ঘরে ঘরে বেড়াইয়া দেখিতে যাইবেন না যে, তুমি লেখা পড়া কর কি দিবারাত্রি তাস পাশা খেলিয়াই সময় কর্ত্তন কর। ইহার জন্য সামাজিক শাসন অথবা লোকনিন্দার শাসন প্রবর্ত্তিত হওয়া প্রয়োজন। নিন্দা মন্দ কথা, কিন্তু লোকচরিত্র গঠনের প্রধান সহায়। লোকনিন্দা ভয়ে আমরা কত কুকার্য্য না করিয়া থাকি? জানিয়া শুনিয়াও লোকনিন্দা ভয়ে কত সদনুষ্ঠানে যোগদান করিতে ইতস্ততঃ করিয়া থাকি? লোকনিন্দা যদি সৎপথে চালিত হয়, তাহাতে জাতীয় চরিত্র নিশ্চয়ই উন্নতিলাভ করে। যদি সাংসারিক জীবনে লেখা পড়ার চর্চ্চা পরিত্যাগ করা লোকনিন্দার কারণ হয়, সাংসারিক লোকে তাস পাশায় সময় নষ্ট করিতেছে ইহা দেখিলে লোকে যদি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ বিরক্তিব্যঞ্জক ঘৃণা প্রদর্শন করিতে পারে, তবে অধ্যয়ন-অধ্যাপন আবার এদেশে দৃঢ় প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে।

আমরা যেমন করিয়া দিন কাটাইতেছি, আমাদের পুত্র-কন্যারা তাহা দেখিতেছে। বালকদিগের স্বভাবই বৃদ্ধের অনুকরণ করা। তাহারাও সুযোগ পাইলেই তাস পাশা লইয়া বসে, যদি তাদৃশ সুযোগ না পায়, তবে ভবিষ্যৎ জীবনে যে নিরাপদে তাহার অনুষ্ঠান করাই চরম সুখ, মনে মনে তাহা কল্পনা করিয়া রাখে; সংসারে আসিবামাত্র সেই পুরাতন কল্পনা কার্য্যে পরিণত হয়। অধ্যয়ন নিপুণতাই ছাত্রজীবনের শ্রেষ্ঠ অলঙ্কার—নিপুণতা ভিন্ন কখনও জ্ঞানার্জ্জন হইতে পারে না। প্রকৃত জ্ঞানী হইতে হইলে নিপুণ ভাবে অধ্যয়নশীল হইতে হইবে। ছাত্রগণকে কে, তাহা শিখাইবে? পিতা মাতা অভিভাবক এবং শিক্ষক-মহাশয়গণ কি তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকেন?

ছাত্রগণকে অধ্যয়ন-নিপুণ করিতে হইলে গৃহে, সমাজে ও বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন-নিপুণতার

আদর্শ প্রতিষ্ঠিত থাকা প্রয়োজন। আর্য্য-ধর্ম্মে আর্য্যশাস্ত্রে সে আদর্শের অভাব নাই। কিন্তু আমরা আর্য্যজীবনের সেই শ্রেষ্ঠ আদর্শ পরিত্যাগ করিয়াছি বলিয়া আমাদের বালক-পল্লবগ্রাহী হইতেছে, অধ্যয়ন-নিপুণ মহা পণ্ডিত হইতে পারিতেছে না।

সৎসাহস।

ঈশ্বর-সৃষ্ট প্রাণি-জগতের মধ্যে মনুষ্য সকল জাতির শীর্ষস্থানীয়। কেন যে মানব প্রাণি-জগতের শীর্ষস্থানীয়, ইহার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে সহজেই উপলব্ধি হয় যে, মনুষ্য-জাতির মধ্যে কয়েকটী বিশিষ্ট গুণ বিদ্যমান রহিয়াছে, ঐ সমস্ত বিশিষ্ট গুণাবলীই মনুষ্যের মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। যদি মানবের ঐ সমস্ত সদ্‌গুণ না থাকিত, তাহা হইলে মনুষ্যে ও পশুতে কোনও প্রভেদ থাকিত না; মানব আর মানবপদবাচ্য হইত না; অধিকন্তু পশু-ভাবাপন্ন এক প্রকার অভিনব জন্তুরূপে পরিণত হইত।

যে সমস্ত গুণের কথা উল্লিখিত হইল, তাহাদের মধ্যে সৎসাহস শ্রেষ্ঠতম। যে গুণ থাকিলে মানব মিথ্যা ও কপটতা প্রভৃতি অসৎ প্রবৃত্তিকে দূরে রাখিয়া সত্য ও সরলতা প্রভৃতি সৎপ্রবৃত্তি দ্বারা আত্মাকে অলঙ্কৃত করিতে পারে, তাহারই নাম সৎসাহস। উক্ত সংজ্ঞা হইতেই ইহা প্রতীয়মান হইতেছে যে, মানসিক বলই সৎসাহসের উৎপত্তি-স্থান। যাহাদের মন দৃঢ় ও সবল, তাহাদের মধ্যেই এই সাহস দৃষ্ট হয়; আবার যাহাদের মন দুর্ব্বল, তাহাদের মধ্যে ইহার অভাব পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। শারীরিক বল সৎসাহসের উৎপত্তি-স্থল নহে; শারীরিক বল হইতে পাশব সাহসের উৎপত্তি। পাশব সাহস প্রাণি-জগতের সকল প্রাণীতেই অল্পাধিক পরিমাণে দৃষ্ট হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ইহার আধিক্য পশুতেই পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু সৎসাহস মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রাণীতে পরিলক্ষিত হয় না। এই সৎসাহসই মানব-প্রকৃতির একটী বিশেষত্ব।

সৎসাহসকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে। (১) সত্যের প্রতি আদর, (২) যাহা ভাল তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়া, (৩) যাহা ভাল তাহার পোষকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা, (৪) বলবান কর্ত্তৃক কোন অন্যায় কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তৎসম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করা, (৫) কোন অন্যায় কার্য্য সম্পাদিত হইতেছে দেখিতে পাইলে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তৎপ্রতিকারের চেষ্টা।

১। সত্যের প্রতি আদর;—"বাক্য ও মনের যথার্থতার নাম সত্য; মিথ্যা বাক্য প্রয়োগ ও অযথার্থ চিন্তা পরিত্যাগ করিলেই সত্যব্রত পালন করা হয়।" মিথ্যা নানা প্রকার হইতে পারে। শ্রীযুক্ত জ্ঞানানন্দ সরস্বতী মিথ্যা কথাকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা, (১) প্রচলিত মিথ্যা কথা, (২) অপ্রচলিত মিথ্যাকথা। যে সমুদায় মিথ্যা কথা

সমাজে সমাদৃত ভাবে প্রচলিত আছে, এবং সভ্যতা ও শিষ্টাচার সর্ব্বপ্রকারে যাহার অনুমোদন করিতেছে, তিনি তাহারই নাম দিয়াছেন 'প্রচলিত মিথ্যা কথা'; যেমন "ভাল আছি", "কিছু না", ইত্যাদি। এবং যে-গুলি শিষ্টাচার বিরুদ্ধ ও লোক-গর্হিত, তাহার নাম "অপ্রচলিত মিথ্যা কথা"।

এই দুই প্রকার মিথ্যা ব্যতীত আরও অনেক প্রকার মিথ্যা আছে, যথা;—

(১) জিজ্ঞাসিত হইয়া কোন উত্তর না দেওয়া। আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম "তুমি অমুক বিষয় সম্বন্ধে কোন খবর জান কি?" এই সম্বন্ধে সব কথা অবগত থাকিয়াও নিরুত্তর থাকিলে প্রকারান্তরে মিথ্যা বলা হয়।

(২) কোন কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া পশ্চাৎ সেই কার্য্য সম্পাদনে ত্রুটি করা। এই শ্রেণীর মিথ্যা সমাজে খুব অধিক পরিমাণে প্রচলিত আছে। অনেকে কার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত ও অঙ্গীকৃত হইয়া প্রায়ই সেই কার্য্য সম্পাদনে ত্রুটি প্রকাশ করেন। যাঁহাদের সত্যে অত্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহারা কখনই এরূপ করেন না। সকলেই অবগত আছেন যে, অঙ্গীকার-পালনের জন্য রাজা দশরথ রঘুকুল-তিলক ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রকে বনে নির্ব্বাসন দিয়া স্বয়ং পুত্র-বিরহে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। বুদ্ধদেব প্রতিশ্রুত কার্য্য পালন করিবার জন্য লিচ্ছবিশ বংশীয় রাজন্যবর্গকে অসন্তুষ্ট করিতেও ত্রুটি প্রকাশ করেন নাই। যখন বুদ্ধদেব সশিষ্যে 'বৈশানির উপস্থিত হন, তখন সেই নগর-বাসিনী অম্বপালি নাম্নী একটী বারাঙ্গনা তাঁহাকে নিজ গৃহে আহার করিবার নিমন্ত্রণ করে। দয়াল বুদ্ধ সেই বারাঙ্গনার নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইহার অব্যবহিত পরে 'বৈশানিরের' লিচ্ছবিশ বংশীয় রাজন্যগণ অতি সমারোহে বুদ্ধের নিকটে উপস্থিত হন, এবং পর দিবস রাজ ভবনে আহারের নিমন্ত্রণ করেন; কিন্তু সত্য-পরায়ণ বুদ্ধ তাঁহাদের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে অস্বীকৃত হইলেন; তিনি বলিলেন "আমি অম্বপালির নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছি।" রাজন্যবর্গ বিষণ্ণ বদনে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য ভীলবংশীয় "বালীয়" ও "দেব" আত্মীয় স্বজন সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া বাপ্পার সহিত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করিয়াছিলেন।

যাহারা মুখে খুব উচ্চদরের কথা বলিয়া কার্য্যতঃ তাহার কিছুই করে না, এবং প্রকৃত পক্ষে কোন গুণ না থাকা সত্ত্বেও যাহারা গুণের পরিচয় প্রদান করে, এই উভয়বিধ লোক এই শ্রেণীর মিথ্যাবাদী।

(৩) আবার কল্পনা; ইহাই অযথার্থ চিন্তা এবং ইহাও অসত্যের একটী অঙ্গ; যেমন উদ্বেগের বা দুঃখের লঘু কারণ থাকিলে তাহাকে গুরু বলিয়া কল্পনা করা।

কোন অবস্থায়ই অসত্যের আদর করা উচিত নহে; কারণ, মনুষ্য-সমাজ সত্যের উপরই স্থাপিত। যে সমাজে সত্যের যথেষ্ট আদর ও অসত্যের ঘোরতর নিগ্রহ, সেই সমাজেই মনুষ্যের সদ্‌বৃত্তিনিচয় পূর্ণ বিকাশ প্রাপ্ত হয়। অতএব সকল অবস্থায় সত্যকে মূল মন্ত্র করিয়া সংসার-ক্ষেত্রে বিচরণ করা উচিত।

নম্রতার সহিত দোষ স্বীকার সত্যের একটী মহৎ অঙ্গ। ইহা দ্বারা যে কেবল সত্যের প্রতি আস্থা প্রদর্শন করা হয়, এমন নহে; ইহা সমাজে শান্তি ও সদ্ভাব-স্থাপনের একটী প্রকৃষ্টতম উপায়। কোন বিশেষ দোষের কার্য্য করিয়াও যদি দোষ স্বীকার পূর্ব্বক ক্ষমা প্রার্থনা করা যায় তাহা হইলে উৎপীড়িত ব্যক্তির তখনই মনের পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু হৃদয়ের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া এইরূপ দোষ স্বীকার করা উচিত, নতুবা ইহা দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। অল্প-বয়স্ক বালক বালিকাকে বাধ্য করিয়া ঐরূপ দোষ স্বীকার করাইলে কোন উপকার হওয়া দূরে থাকুক, বরং ইহা দ্বারা প্রকারান্তরে মিথ্যারই প্রশ্রয় প্রদান করা হয়। কেবল কলহ-নিবারণের জন্য তাহাঁকে দোষ স্বীকার করিতে বাধ্য করা নিতান্ত মূঢ়তার কার্য্য। কেহ কেহ এইরূপে দোষ স্বীকার করিতে অপমান বোধ করেন; কিন্তু ইহাতে অসম্মানের কোন কথা নাই, পরন্তু ইহাদ্বারা সত্যনিষ্ঠা ও সরলতার পরিচয় প্রদান করা হয়।

কোন কোন ব্যক্তির মিথ্যা বলা এতদূর অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, মিথ্যা বলিবার ইচ্ছা না থাকিলেও তাহারা সময় সময় বিষয়-পরবশ হইয়া অলক্ষিত ভাবে সত্যের অপলাপ করে। যাহাদের মিথ্যা বলা এইরূপে অভ্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে, তাহারা আবার অভ্যাসের বলেই এই অসৎপ্রবৃত্তির হস্ত হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিবে। প্রস্তাবান্তরে উক্ত হইয়াছে যে, অভ্যাস সৎকার্য্যে প্রয়োগ করিলে যেমন সুফল উৎপাদন করে, সেইরূপ অসৎকার্য্যে প্রয়োগ করিলে ইহা কুফল উৎপাদন করে। সুতরাং এমত স্থলে যদি সর্ব্বদা সত্য বলিতে সচেষ্ট হওয়া যায়, তাহা হইলে অভ্যাসের মোহিনী শক্তি দ্বারা সত্য বলিবার সংস্কার মনের মধ্যে বার বার স্ফুরিত ও উদ্দীপিত হইতে থাকিবে, এবং কালে এই সংস্কারই দৃঢ়মূল ও বলবান্ হইয়া মিথ্যা বলিবার সংস্কারকে দূরীভূত করিবে।

২। নানারূপে উৎপীড়িত হইয়াও যাহা ভাল তাহা হইতে প্রত্যাবৃত্ত না হওয়া দ্বিতীয় প্রকারের সৎসাহসের কার্য্য। ধর্ম্মবীর শিখ-গুরু বন্দু ও ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ এই শ্রেণীর সাহসী। যখন মোগল-সম্রাটের আদেশে গুরু বন্দু সাত শত অনুচর সহ বন্দী হইয়া দিল্লিতে প্রেরিত হন, তখন তাহাদিগকে মোসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিবার জন্য নানারূপ প্রলোভন দেখান হয়। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে না পারিয়া মোসলমানেরা তাহাদের উপর নানারূপ অত্যাচার ও উৎপীড়ন আরম্ভ করে। ইহাতেও শিখজাতিকে অচল ও অটল দেখিয়া তাহারা সাত দিবসে সাত শত শিখের শিরশ্ছেদ করে। শিখ-গুরু বন্দুকে একটী লৌহ-পিঞ্জরে বদ্ধ করিয়া পথে পথে প্রদর্শন করা হয়। বন্দুর একটী শিশু সন্তান ছিল, দুর্দ্ধর্ষ মোসলমানেরা স্বীয় সন্তানকে ছুরিকাঘাতে বধ করিতে তাহার প্রতি আদেশ করে; কিন্তু বন্দু উক্ত পৈশাচিক আদেশ পালনে অস্বীকৃত হওয়ায় তাহারা শিশুটীকে হত্যা করিয়া বন্দুর মুখে তাহার শোণিত প্রদান করে। এইরূপ নানাবিধ উৎপীড়ন ও অত্যাচার সহ্য করিয়াও বন্দু স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন নাই।

ধার্ম্মিক-শ্রেষ্ঠ প্রহ্লাদ পিতৃ-শত্রু হরির উপাসক ছিলেন। এইজন্য তিনি স্বীয় পিতা কর্ত্তৃক উত্তপ্ত তৈলে নিক্ষিপ্ত হন, বিষধর দ্বারা দংশিত হন, এবং আরও এবম্বিধ নানারূপ অত্যাচার সহ্য করেন, কিন্তু তথাপি স্বীয় বিশ্বাসের বিরুদ্ধে হস্তক্ষেপ করেন নাই। যখন হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে অভয় দিতে চাহিলেন, তখন প্রহ্লাদ বলিলেন, "যিনি সকল ভয়ের অপহারী, যাঁহার স্মরণে জন্ম জরা প্রভৃতি সকল ভয়ই দূর হয়, সেই অনন্ত ঈশ্বর হৃদয়ে থাকিতে আমার ভয় কিসের?"

৩। উপহাসাস্পদ হইয়াও যাহা ভাল তাহার পোষকতা করিতে প্রাণপণে চেষ্টা করা। সাহসের এই অঙ্গটীর অভাব আমাদের সমাজ-উন্নতির একটী প্রধান অন্তরায়। সময় সময় আমাদের মনে অনেক ভাল ভাবের উদয় হয়, কিন্তু ঐ মত প্রচলিত পদ্ধতির প্রতিকূল বলিয়া আমরা তাহা প্রকাশ করিতে সাহসী হই না।* বস্তুতঃ এই রীতি অবলম্বন করিয়া আমরা কেবল আমাদের নিজেরই অনিষ্ট সংসাধন করি। উদ্দেশ্য যদি সৎ হয়, তাহা হইলে স্বীয় মত প্রচার করাই কর্ত্তব্য। লোক সমাজে যদি ইহা সমীচীন বলিয়া প্রখ্যাত হয়, তাহা হইলে আজ হউক আর দুই দিবস পরেই হউক, নিশ্চয়ই লোক-সমাজে ইহা গৃহীত হইবে। এই সাহসের বলেই অনেক ধর্ম্মবীর কুসংস্কারের অন্ধকার ভেদ করতঃ মানব-সমাজের উন্নতির পথ ও ধর্ম্মের পথ প্রশস্ত করিয়া গিয়াছেন। চৈতন্য, শাক্যসিংহ ও মহাম্মদ প্রভৃতি ধর্ম্মবীরগণই ইহার দৃষ্টান্ত। চৈতন্য যখন প্রথমতঃ হরি-সংকীর্ত্তনে মত্ত হন, তখন চতুর্দ্দিক হইতে দুষ্ট লোক তাঁহাকে উপহাস ও ব্যঙ্গোক্তি করে; এমন কি, জিগীষু ব্যক্তি কর্ত্তৃক তিনি সময় সময় অপমানিত এবং উৎপীড়িতও হন, কিন্তু তথাপি স্বীয় সংকল্প পরিত্যাগ করিয়া ভীরুতার কার্য্য করেন নাই। এই সাহসের বলে শাক্যসিংহও নানা প্রলোভনের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিয়া ছাগ-বলী ইত্যাদি কয়েকটী ঘৃণিত প্রথা দেশ হইতে বিদূরিত করেন। ইসলাম-ধর্ম্ম-প্রচারক মহম্মদও নানারূপ উপহাস ও দুষ্ট লোকের উৎপীড়ন অম্লান-বদনে সহ্য করিয়াছেন, তবুও যে মূলমন্ত্র লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহা হইতে স্খলিত হন নাই। কতবার শত্রুর শাণিত অসির আঘাতও সহ্য করিয়াছেন, তবু মূলমন্ত্র ত্যাগ করেন নাই। অবশেষে এই সাহসের বলেই আরব প্রভৃতি ভূভাগে সত্যের জয়-পতাকা উড্ডীন করিয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

৪। বলবান্ কর্ত্তৃক কোনরূপ অন্যায় কার্য্য করিতে অনুরুদ্ধ হইলে তৎসম্পাদনে অসম্মতি প্রকাশ করা। ভীরু কাপুরুষ ভীমসিংহ যখন নিজ রাজ্য রক্ষার্থ আমির খাঁর ঘৃণিত পরামর্শে স্বীয় দুহিতার প্রাণ-হননে উপস্থিত হন, তখন দৌলত সিংহ নামক শিশোদীয় কুলের জনৈক সামন্ত এই শ্রেণীর সৎসাহসের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করেন। ছুরিকাঘাতে কৃষ্ণকুমারীর প্রাণনাশ

* দুঃখের বিষয়, প্রচলিত পদ্ধতির প্রতিকূল মত "সমীচীন" কি না, তাহা বিচার করিয়া দেখিবার উপযুক্ত ধৈর্য্য অনেকেরই নাই।

শিঃ পঃ সঃ।

করিবার জন্য রাণা প্রথমতঃ উক্ত দৌলত সিংহকে নির্ব্বাচিত করেন। সৎস্বভাবসম্পন্ন দৌলতসিংহ যখন সেই লোমহর্ষণ অনুষ্ঠানের কথা শ্রবণ করিলেন, তখনই তাঁহার হৃদয় ঘৃণায় পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি রাণাকে এই জন্য শত ধিক্কার দিয়া সেই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন।

৫। কোন রূপ অন্যায় কার্য্য অবাধে সম্পন্ন হইতেছে দেখিতে পাইলে প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়া তৎপ্রতিবিধানের চেষ্টা। ইহাই সৎসাহসের প্রধান অঙ্গ এবং ইহাই পরোপকারের চরম সীমা। ইতিহাসে এতৎ-সম্বন্ধে অনেক দৃষ্টান্ত আছে; এই স্থলে সে সম্বন্ধে কেবল মাত্র দুইটী দৃষ্টান্ত সন্নিবেশিত হইল। একদা মৃগয়ায় যাইয়া প্রতাপসিংহ ও শক্তসিংহের মধ্যে লক্ষ্য সম্বন্ধে ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হয়। বিবাদ ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে উভয় ভ্রাতা শেল হস্তে পরস্পরকে আক্রমণ করিলেন। শিশোদীয়-কুলের সর্ব্বনাশ উপস্থিত দেখিয়া শুভাকাঙ্ক্ষী পুরোহিত বিবদমান ভ্রাতৃ-যুগলের মধ্যস্থলে উপস্থিত হইলেন, এবং বিবাদ হইতে বিরত হইবার জন্য উভয় ভ্রাতাকে নানারূপ অনুনয় বিনয় করিলেন; কিন্তু ভ্রাতৃযুগল কিছুতেই প্রকৃতিস্থ হইলেন না দেখিয়া স্বীয় বক্ষে ছুরিকাঘাত করিয়া সেই স্থানে পুরোহিত প্রাণত্যাগ করিলেন। এই লোমহর্ষণ ব্যাপার দেখিয়া উভয় ভ্রাতার চিত্ত আর্দ্র হইল। তাঁহাদেরই জন্য একজন পরম হিতৈষী পুরোহিত প্রাণত্যাগ করিলেন দেখিয়া, তাঁহারা শাণিত অস্ত্র হস্ত হইতে নিক্ষেপ করিলেন এবং বিষণ্ণ বদনে ও অশ্রু-পূর্ণ লোচনে স্ব স্ব ভবনে প্রত্যাগমন করিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ পুরোহিত সৎসাহস ও পরোপকারের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখাইয়া ইহ সংসার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন। খৃষ্টের জন্মের প্রায় পাঁচ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন রোমের অধিবাসিগণ অন্যের জীবন লইয়া ক্রীড়া করিতেন, তখনও এইরূপে একজন সন্ন্যাসী নিজ জীবন উৎসর্গ করিয়া সেই পৈশাচিক আমোদ রোম রাজ্য হইতে বিদূরিত করেন।

যাঁহাদের এই সাহস আছে, তাঁহারাই এ জগতে ধন্য; তাঁহারাই প্রকৃত মনুষ্য নামের অধিকারী; তাঁহারাই প্রকৃতপক্ষে স্বাধীন ও জিতেন্দ্রিয়। তাঁহারা কখনই কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হন না, লোক ভয়ে প্রবঞ্চনার আশ্রয় গ্রহণ করেন না, এবং পরার্থে প্রাণ পর্য্যন্তও উৎসর্গ করিতে কুণ্ঠিত হন না। যাহাদের ঐ সাহস নাই, তাহাদের আত্মার স্বাধীনতা নাই; স্বাধীন ইচ্ছা পরিচালনা করিবার শক্তি তাহাদের নিকট হইতে অন্তর্হিত হয়, এবং সদ্‌বৃত্তিগুলি অপবিত্রতার অধীনতা প্রাপ্ত হয়। এক কথায়, যাহাদের সৎসাহস নাই, তাহারাই পরাধীন। পক্ষান্তরে, যাহাদের ঐ সাহস আছে, তাহাদের মানসিক সদ্‌বৃত্তি সমূহ বিকশিত হয় ও কুপ্রবৃত্তিগুলি লয় প্রাপ্ত হয়। সৎসাহসের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা; যাহার ঐ সাহস আছে সেই প্রকৃত স্বাধীন। সাম্রাজ্যের উপর আধিপত্য স্থাপন প্রকৃত স্বাধীনতা নহে; যথেচ্ছা অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পরিচালন এবং ভোগ-লালসার পরিতৃপ্তি-সাধনও প্রকৃত স্বাধীনতা নহে। এই উভয়বিধ স্বাধীনতাই বাহ্যিক,

ইহা অচিরস্থায়ী; জল-বুদ্বুদের ন্যায় ইহা ক্ষণে উদয় ও ক্ষণে লীন হয়। মনের স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা; ইহাই চিরস্থায়ী। বাহ্য জগতের যতই পরিবর্ত্তন হউক না কেন, এই স্বাধীনতার পরিবর্ত্তন নাই; ইহার ধ্বংস নাই।

সৎসাহসের অভাব আমাদের অশান্তি ও অসুখের একটী মূলীভূত কারণ। ইহার অভাব বশতই সংসারে নানাবিধ দুঃখ করাল মূর্ত্তি ধারণ করিয়া অবিরত মানব-হৃদয়ের শোণিত শোষণ করিতেছে। সৎসাহসের অভাবে সরলতা ও উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের অভাব হয়, এবং কপটতা ও মিথ্যা প্রভৃতি অসদ্‌গুণের বিকাশ হয়। মনুষ্য-সমাজে যদি ইহার সম্যক্ আদর থাকিত, তাহা হইলে এই দুঃখ দারিদ্র্য-পূর্ণ বসুন্ধরা অমরাবতীর ন্যায় শোভান্বিত এবং নন্দনের রম্য কানন বলিয়া অনুভূত হইত, কেহ কাহারও প্রতি লোভ-কটাক্ষ করিত না, হিংসা, স্বার্থপরতা ও কপটতা প্রভৃতি রিপু সমূহ দেশ হইতে পলায়ন করিত, এবং চতুর্দ্দিকে সুখ ও শান্তি বিরাজ করিতে থাকিত।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

হার্বার্ট স্পেন্সার।

(পূর্ব্বানুস্থতি।)

উপরে যাহা কথিত হইল, তাহা হইতে নিম্নলিখিত নিয়মগুলি প্রতিপাদিত হইতে পারে।

বালকের নিকট হইতে খুব অধিক সাধুতার প্রত্যাশা করিও না। সকল সভ্য জাতিই এক সময়ে অসভ্য ছিল; এখনও প্রত্যেককেই বাল্যকালে অসভ্য অবস্থা অতিক্রম করিতে হয়। শিশুর আকৃতি অনেক পরিমাণে অসভ্যদিগের অনুরূপ; তাহার মানসিক অবস্থাও তদপেক্ষা অধিক উন্নত নহে। চৌর্য্য, মিথ্যা-কথন প্রভৃতির দিকে বালকের যে ঝোঁক থাকে, তাহার আকৃতির পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিনা শিক্ষাতেও সে ঝোঁক অনেকটা কমিয়া যায়। লোকে শিশুকে নির্দ্দোষ বলিয়া থাকে; জ্ঞান-সম্বন্ধে সে কথা সত্য হইলেও ইচ্ছা-সম্বন্ধে তাহা সত্য নহে। বিশ্বাস না হয়, শিশুদিগের সঙ্গে অর্দ্ধ ঘণ্টা কাল থাকিয়া দেখ। বিদ্যালয়ে শিক্ষক সম্মুখে না থাকিলে বালকেরা পরস্পরের উপরে যেরূপ অত্যাচার করে, বয়স্ক বালকেরা তাহা কখনই করে না। অপেক্ষাকৃত অল্প বয়স্ক শিশুদিগের পরস্পরের উপরে অত্যাচার আরও অধিক।

সাধুব্যবহারের জন্য অতিমাত্র প্ররোচনাও কর্ত্তব্য নহে। মানসিক অকাল-পক্কতার দোষ অনেকেই বুঝিয়াছেন; নৈতিক অকাল-পক্কতাও দোষাবহ। আমাদিগের উন্নত মানসিক বৃত্তির ন্যায় উন্নত নৈতিক বৃত্তিগুলিও জটিল। সুতরাং উভয় শ্রেণীর বৃত্তিগুলিই বিলম্বে স্ফূর্ত্তি লাভ করে। অনে-

সর্গিক উত্তেজনা দ্বারা এই সকল বৃত্তিকে অকালে স্ফূরিত করিলে পরে তাহারা একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়ে। এই জন্যই সচরাচর দেখা যায়, বাল্যকালে যাহারা সাধুতার আদর্শ ছিল, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তাহারা খারাপ হইয়া পড়ে, আবার শেষকালে যাহারা প্রসিদ্ধি লাভ করে, বাল্যে তাহাদের সাধুতা তেমন উজ্জ্বল থাকে না।

অতএব অল্পে অল্পে উপায় অবলম্বন কর, আবার অল্প ফলেতেই সন্তুষ্ট থাক। মানসিক উন্নতির ন্যায় নৈতিক উন্নতিও যে সময়-সাপেক্ষ, এই কথাটি মনে রাখ, তাহা হইলেই বালকের অনেক উৎপাত তুমি সহ্য করিতে পারিবে। তখন তুমি কথায় কথায় বালককে ধমক বা গালি দিবে না, সকল কাযেই তাহাকে নিষেধ করিবে না;—অনেক নির্ব্বোধ পিতা মাতা কিন্তু এই সকল উপায়েই সন্তানকে ইচ্ছামত ভাল করিবার প্রয়াস পান।

এইরূপ যে পারিবারিক শাসন-প্রণালী হক না হক সকল বিষয়ে বালককে অযথা শাসন করিতে চায় না, তাহা প্রাকৃতিক শাসন-প্রণালীরই অন্তর্ভূত। বালক আপন কার্য্যের প্রাকৃতিক প্রতিফল যাহাতে পায় তাহাই কর, তাহাকে দণ্ডে দণ্ডে শাসন করিবার জন্য তোমাকে ব্যস্ত থাকিতে হইবে না। যাহাতে কার্য্যের ফল সে প্রত্যক্ষ করিতে পারে, এমন ব্যবস্থা করিয়া দিয়া তুমি নিরস্ত থাক, তাহা হইলে তাহার অকাল-পক্কতাও জন্মিবে না, অথবা অবাধ্যতাও অভ্যস্ত হইবে না।

বালকের সকল কার্য্যে প্রাকৃতিক প্রতিফলের দিকে লক্ষ্য রাখিলে আর একটি উপকার এই হইবে যে, তোমার ক্রোধের পরিচালনা হইতে পারিবে না। অনেক পিতা মাতাই যে সে প্রকারে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া নৈতিক শাসন সম্পাদন করেন। মাতৃগণ সন্তানের সামান্য সামান্য অপরাধে যেরূপ ঝাঁকি ঝুঁকি দেন, যেরূপ ঠুক ঠাক মারেন, যেরূপ কটুকথা বলেন, তাহাতে সন্তানের হিত-কামনা অপেক্ষা তাঁহার ক্রোধই অধিক প্রকাশ পায়। একটা অপরাধ দেখিয়াই যদি তাহার প্রাকৃতিক প্রতিফল কি, এবিষয় চিন্তা করিতে পারেন, তাহা হইলে মাতার ক্রোধটা সহজেই মাটি হইয়া যায়, তিনি প্রকৃত ব্যাপারটাও ভাল করিয়া বুঝিতে পারেন।

বোধশূন্য যন্ত্রের ন্যায় ব্যবহার করিও না। প্রাকৃতিক প্রতিফল ছাড়া তোমার মুখের নিন্দা এবং প্রশংসাও যে বালকের শিক্ষায় বিশেষ কার্য্যকর, একথা ভুলিও না। প্রাকৃতিক প্রতিফলের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম শাসন এবং পিতার ক্রোধ যেন ব্যবহৃত না হয়, ইহা বলাই আমাদের উদ্দেশ্য; পিতা সন্তানের আচরণে সন্তোষ বা অসন্তোষ কিছুই প্রকাশ করিবেন না, এরূপ বলা আমাদের উদ্দেশ্য নহে। বরং প্রাকৃতিক শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পিতার সন্তোষ বা অসন্তোষ যে প্রকাশ হওয়া উচিত, ইহাই আমাদের উক্তির উদ্দেশ্য। সন্তানের আচরণে ঘৃণা, দুঃখ প্রভৃতি যে কোন ভাবের উদয় হউক, বিশেষ বিবেচনার সহিত তাহা প্রকাশ করাই উচিত। হৃদয়ে যে ভাবেরই উদয় হউক, তাহার গাঢ়তা এবং স্থায়িত্ব-সম্বন্ধে কিন্তু

বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। অজ্ঞ জননীদিগের ন্যায় যে মুহূর্ত্তে গালি দিবে সেই মুহূর্ত্তেই আবার সোহাগ করিও না। আবার রাগ করিয়া অনুচিত দীর্ঘকালও থাকিও না; কারণ ইহাতে তোমার প্রতি বালকের অনুরাগ শিথিল হইয়া যাইতে পারে, সুতরাং তাহার শাসনও কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে।

কথায় কথায় হুকুম করিও না। যখন অন্য উপায়ে কায না পাইবে, কেবল তখনই হুকুম করিবে। কথায় কথায় হুকুম করিলে বালকের হিত অপেক্ষা পিতা-মাতার স্বার্থই অধিক প্রকাশ পায়। অসভ্য সমাজে কোন রাজ-নিয়ম লঙ্ঘন করিলে নিয়মলঙ্ঘনের জন্য যত না হউক রাজার প্রভুত্ব বজায় রাখিবার জন্য যেমন নিয়ম-ভঙ্গকারীকে শাস্তি দিতে হয়, সেইরূপ অনেক পরিবারে সন্তানের অপরাধ দমনের জন্য যত না হউক পিতা-মাতার ক্রোধের জন্য সন্তানের শাসন হইয়া থাকে। "কোন্ সাহসে আমার কথা অমান্য করিলে?" "তোমাকে একায যেমন করিয়াই হউক করিতে হইবে।" "দেখা যাবে কাহার কথা কে শুনে।"—ইত্যাদি ভয়প্রদর্শনের কথা প্রায় সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। এই সকল কথার অর্থ এবং বলার ধরণটা একবার ভাবিয়া দেখ। সন্তানের হিত অপেক্ষা তাহাকে শাসন করিবার জেদটাই যেন এস্থলে প্রবল দেখা যাইতেছে। অবাধ্য প্রজাকে বশীভূত করিতে অসভ্য রাজার যেমন জেদ, এখানেও প্রথমতঃ সেই রূপ জেদই প্রত্যক্ষ হয়। সুবোধ পিতা কিন্তু সুবোধ রাজ-বিধি-প্রণেতার ন্যায় বল-প্রয়োগ হইতে দূরে থাকিবেন; যেখানে অন্য উপায়ে সুশাসন চলিতে পারে, সেখানে তিনি নিয়মের বশবর্ত্তী হইবেন না; নিতান্ত পক্ষে যেখানে নিয়মের বশবর্ত্তী না হইলে শাসন চলে না, সেখানেও তজ্জন্য তিনি দুঃখপ্রকাশ করিবেন।

যখন আদেশ না করিলে চলে না, তখন তাহা দৃঢ়তার সহিত করিবে, তোমার ব্যবস্থিত-চিত্ততার যেন ব্যাঘাত না হয়। আদ্যোপান্ত ভালরূপে বিচার করিয়া আদেশ বা নিয়ম প্রচার কর, এবং যেরূপেই হউক বালককে তাহাতে বাধ্য কর। প্রকৃতি-প্রদত্ত দণ্ডের ন্যায় তোমার দণ্ডও অপরিবর্ত্তনীয় এবং অপরিহার্য্য হউক। দগ্ধ কাষ্ঠখণ্ড বালক যতবার হাতে লইবে, ততবারই তাহার হস্ত দগ্ধ হইবে। তখন সে তাহা আর হাতে লইতে চাহিবে না। তুমিও যদি ব্যবস্থিত-চিত্ত হও,—কোন বিশেষ অপরাধ যখনই করিবে তখনই কোন নির্দ্দিষ্ট দণ্ড পাইবে বলিয়া যদি তাহাকে অবগত কর, আর যখন সেই অপরাধ করে তখনই সেই নির্দ্দিষ্ট দণ্ড যদি তাহাকে প্রদান কর, তাহা হইলে সে প্রাকৃতিক দণ্ডকে যেমন ভয় করিবে, তোমার দণ্ডকেও সেইরূপ ভয় করিবে। বালকের মনে এই ভয় একবার বদ্ধমূল হইয়া গেলে অসংখ্য অনর্থ নিবারিত হইবে। শিক্ষাতে যত প্রকার দোষ আছে, অব্যবস্থিত-চিত্ততা তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। ন্যায় বিচারের স্থিরতা না থাকিলে রাজ্য-মধ্যে যেমন অপরাধের সংখ্যা বর্দ্ধিত হয়, শাসনের নিশ্চয়তা না থাকাতেও সেইরূপ পরিবার-মধ্যে অসংখ্য অবাধ্যতা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। যিনি সর্ব্বদাই ভয় প্রদর্শন করেন, কিন্তু একবারও

শাস্তি দেন না, যিনি ক্রুদ্ধ হইলেই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, কিন্তু ক্রোধের উপশম হইলেই সে নিয়ম রহিত করেন, যিনি নিজের খাম খেয়াল অনুসারে একই অপরাধের জন্য এক সময়ে গুরুদণ্ড আর এক সময়ে লঘুদণ্ড প্রদান করেন, সেই দুর্ব্বল-চরিত্রা মাতা নিজের জন্য এবং সন্তানের জন্য অশেষ কষ্ট সঞ্চয় করিয়া রাখেন। এরূপ মাতা আপনাকে সন্তানের চক্ষে অবজ্ঞার পাত্র করিয়া তুলেন; তিনিই তাহাদিগকে হৃদয়ের অসংযম শিক্ষা দেন; শাসনের সমতা না রাখিয়া প্রকারান্তরে তিনিই তাহাদিগকে অবাধ্য করিয়া তুলেন; তিনি এইরূপে অসংখ্য পারিবারিক কলহের সূত্রপাত করিয়া নিজের এবং সন্তানের মানসিক শান্তি নষ্ট করেন; তিনি তাহাদিগের মনোবৃত্তিতে এরূপ বিশৃঙ্খলা ঘটাইয়া দেন যে, পরবর্ত্তী কালে সমধিক যত্নেও শৃঙ্খলা স্থাপন কষ্টকর হয়। ব্যবস্থিত হইলে অসভ্য-জনোচিত শাসনও বরং ভাল, তথাপি অব্যবস্থিত সভ্য জনোচিত শাসনও ভাল নহে। ফলতঃ বল প্রয়োগ না করিয়া যত কাম চলে ততই ভাল; কিন্তু বলের প্রয়োজন যখন অনিবার্য্য বলিয়া বুঝিবে, তখন দৃঢ়তার সহিত তাহা প্রয়োগ করিবে।

মানুষকে পর-পরিচালিত শাসনে অভ্যস্ত করা নহে, কিন্তু আত্ম-শাসনে সমর্থ করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য, একথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিও। তোমার সন্তানেরা ক্রীতদাস হইয়া আমরণ থাকিবে বলিয়া যদি জানিতে পারিতে, তাহা হইলে বাল্যাবধি তাহাদিগকে দাসত্বে যত অভ্যস্ত করিতে ততই ভাল হইত; কিন্তু কিছুদিন পরেই যখন তাহারা স্বাধীন মনুষ্য হইবে, তাহাদের প্রাত্যহিক কার্য্যে কেহ তাহাদিগকে শাসন করিবার থাকিবে না, তখন বাল্যাবধি আত্ম-শাসন তাহাদের যত অভ্যস্ত হয় ততই মঙ্গল। এই কারণ বশতই ইংলণ্ডের বর্ত্তমান অবস্থানুসারে তথায় শিক্ষার প্রাকৃতিক প্রণালীই অধিক ফলোপধায়িনী। প্রসিদ্ধ কিউবেল্ প্রভুত্বের সময়ে সকলেরই ঊর্দ্ধতন কর্ত্তাদিগকে অসীম ভয় করিয়া চলিতে হইত; সে সময়ে গৃহে বাল্যকালে পিতার কঠোর শাসন মঙ্গলেরই হেতু ছিল। কিন্তু এখন আর সে ভয় নাই,—এখন নিজের সুখ-দুঃখ প্রায়শঃ নিজের আচরণের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে, সুতরাং এখন বাল্যাবধি নিজের আচরণের ফলাফলে যাহাতে প্রত্যক্ষভাবে বোধ জন্মে, তাহাই করা উচিত। অতএব যত শীঘ্র পিতার শাসন তিরোহিত হয়, এবং তাহার পরিবর্ত্তে বালক ভাবি ফলের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আত্ম-শাসন অভ্যাস করিতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য। নিতান্ত শৈশবে ইহা সম্ভব নহে; ফলদ্বারা অভিজ্ঞতা লাভ করুক, এই মনে করিয়া তিন বৎসরের শিশুকে সুতীক্ষ্ণ ক্ষুর লইয়া খেলিতে দেওয়া উচিত নহে। কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি যেমন পরিস্ফুট হইতে থাকিবে, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে পিতার কর্ত্তৃত্ব ক্রমে ক্রমে কমাইয়া অবশেষে বয়ঃপ্রাপ্তির সঙ্গে তাহা একেবারে তিরোহিত করিতে হইবে। সকল প্রকার পরিবর্ত্তনই ভয়ঙ্কর; কিন্তু পারিবারিক শাসন হইতে মুক্ত হইয়া সামাজিক স্বাধীনতায় প্রবেশ করিলে মানব-জীবনে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা সর্ব্বাপেক্ষা ভয়ঙ্কর। প্রাকৃতিক

শাসনের নিয়মে পিতৃ-শাসন ক্রমে ক্রমে শিথিল করিয়া বালককে ধীরে ধীরে আত্ম শাসনে অভ্যস্ত করিলে এই পরিবর্ত্তনের ভয়ানকত্ব থাকে না।

বালকের জেদ দেখিলে বিরক্ত হইও না। বলের শাসন অন্তর্হিত হইলে এই জেদ কতকটা যে হইবে, তাহা অনিবার্য্য। পিতৃ-শাসন যত অল্প হইবে, বালক স্বাধীনতা-প্রকাশে ততই উৎসুক হইবে। বালক যে প্রাকৃতিক ফল প্রত্যক্ষ করিয়া আত্ম-শাসনে তৎপর হইবে, ইহা তাহারই সূচনা। ইংরাজের বালক স্বাধীন বলিয়াই ইংরাজ-জাতি স্বাধীন; একটা না থাকিলে অন্যটা অসম্ভব। জর্ম্মন্ শিক্ষকেরা বলেন, তাঁহারা বরং দ্বাদশটি জর্ম্মন্ বালককে শাসনে রাখিতে পারেন, তথাপি একটি ইংরাজ বালককে শাসনে রাখিতে পারেন না। স্পেন্সার সাহেব বলেন, এরূপ হইলেও ইংরাজ-বালক জর্ম্মন্-বালকের ন্যায় নিরীহ হউক, এমন ইচ্ছা তিনি করেন না; কারণ, ইংরাজ-বালক দুর্দ্দান্ত বলিয়াই ইংরাজ-জাতি স্বাধীন। ভারতের ছাত্রবৃন্দ বোধ হয় জগতের মধ্যে নিরীহতার দৃষ্টান্ত-স্থল, কিন্তু দুঃখের বিষয়, তাহাদের বিরুদ্ধে আজি কালি অনেক কথা শুনা যাইতেছে, তাঁহাদের ঈষদুদ্গত স্বাধীন ভাবকে নিষ্পেশিত করিবার নানা উপায় অবলম্বিত হইতেছে!!

সর্ব্বশেষ কথা এই যে, প্রকৃতরূপে শিক্ষা দেওয়া নিতান্ত সহজ মনে করিও না; মানবের স্কন্ধে যে সকল কার্য্যের ভার ন্যস্ত হইতে পারে, তন্মধ্যে ইহা সর্ব্বাপেক্ষা জটিল এবং কঠিন। সচরাচর পারিবারিক শাসন যে ভাবে চলে, তাহাতে নিতান্ত নির্ব্বোধ মূর্খও পারগতা দেখায়। প্রহার এবং কটূক্তি, এ উভয়ই মানব-সমাজের অতি অসভ্য অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়। এরূপ শাসন করিতে পশুরাও সমর্থ;—কুক্কুর তাহার শাবকদিগকে কি ভাবে শাসন করে, একবার ইচ্ছা করিলেই দেখিতে পার। কিন্তু যদি যুক্তি এবং সভ্যতার অনুমোদিত প্রণালীতে শিক্ষা দিতে চাও, তবে অধ্যয়ন, কৌশল, ধৈর্য্য এবং আত্ম-সংযম, এই সকল বিষয়ে মনকে নিবিষ্ট করিয়া খাটিতে হইবে। পরিণত বয়সে কে কি কায করিলে তাহার ফল কিরূপ দাঁড়ায়, ইহা সর্ব্বাগ্রে তোমাকে জানিতে হইবে; ইহার পরে বালকের কৃত সেই শ্রেণীর কার্য্যের যেরূপ ফল হওয়া উচিত, তাহা তোমাকে উদ্ভাবন করিতে হইবে। সকল কার্য্যেই বালকের উদ্দেশ্য বুঝিতে হইবে। যে কার্য্যে কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, তাহার জন্য বালককে অবাধ্য বলা, অথবা যাহাতে বালকের অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না, এমন কার্য্যে তাহার প্রতি অসৎ উদ্দেশ্য আরোপ করা নিতান্ত অকর্ত্তব্য। প্রত্যেক বালকের মানসিক অবস্থা বুঝিয়া যথোচিতরূপে শাসন-প্রণালীর পরিবর্ত্তন করিতে হইবে; আবার প্রত্যেকের মনোবৃত্তির যেমন পরিবর্ত্তন হইবে, সেই সঙ্গে সঙ্গেও এই প্রণালীকে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হইবে। এই প্রণালীর ফল এতই অল্পে অল্পে এবং ধীরে ধীরে প্রত্যক্ষ হইবে যে, ইহাতে অধ্যবসায় স্থির রাখা অত্যন্ত কঠিন হইয়া দাঁড়াইবে। যে বালকের শিক্ষায় কু-প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছিল, তাহাকে সুপ্রণালীর অধীন করিতে আরও অধিক পরিমাণে

ধৈর্য্য এবং অধ্যবসায়ের প্রয়োজন; কারণ আগে কুপ্রণালীর ফল বিনষ্ট হইলে তবে ত সুপ্রণালী কার্য্য করিবে? কেবল বালকের উদ্দেশ্য বুঝিলেই হইবে না, তোমার নিজের উদ্দেশ্যও বিশ্লেষণ করিতে হইবে,—অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে বালকের হিতের জন্যই তাহার শাসন করিতেছ, অথবা নিজের সুবিধা, স্বার্থ এবং ক্রোধকে পরিতৃপ্ত করিতেছ, তাহা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। এই সকল নীচ বৃত্তিকে চিনিয়া লওয়া অপেক্ষা তাহাদিগকে দমন করা আরও কঠিন। ফল কথা এই, সন্তানের শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তোমার নিজেরও অতি উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা চলিতে থাকিবে। আপনাতে, সন্তানেতে, এবং সমাজেতে জটিল মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করিয়া বুদ্ধি-বৃত্তিকে উন্নত করিতে হইবে। আবার নিয়ত উচ্চ হৃদয়-বৃত্তির পরিচালনা এবং নীচ বৃত্তির দমন করিয়া নৈতিক উন্নতি লাভ করিতে হইবে। কি পুরুষ কি রমণী কেহই যথাযথরূপে সন্তান পালন করিতে না পারিলে যে চরম মানসিক উৎকর্ষ লাভ করিবার সম্ভাবনা নাই, একথা লোকের বুঝিবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যখন ইহা সকলে ভালরূপে বুঝিবে, তখন এই প্রাকৃতিক প্রণালীর সৌন্দর্য্য এবং উপাদেয়ত্বও লোকে উত্তমরূপে উপলব্ধি করিবে।

শিক্ষার এই পরিশুদ্ধ প্রণালী কতদূর সফল হইতে পারে, এবিষয়ে অনেকে সন্দেহ করিতে পারেন বটে, কিন্তু অনেকে আবার এই প্রণালীর প্রদর্শিত অত্যুন্নত আদর্শকেই তাহার বিশুদ্ধতার প্রমাণ বলিয়া গ্রহণ করিবেন সন্দেহ নাই। কোপন-স্বভাব, সহানুভূতি-শূন্য, দূর-দৃষ্টি-হীন, ব্যক্তিগণ যে এ প্রণালীর মর্ম্ম-গ্রহণে অসমর্থ, কেবল উন্নত মনোবৃত্তি কর্ত্তৃক পরিচালনেই যে এ প্রণালী সফল হইবার সম্ভব, ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ইহা মানব-সমাজের উন্নতাবস্থারই উপযোগী। ইহাতে যদিও অত্যন্ত পরিশ্রম এবং স্বার্থ-ত্যাগের প্রয়োজন, তথাপি ইহা হইতে প্রসূত বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ উভয়-বিধ সুখই অসীম। অপকৃষ্ট প্রণালীতে শিক্ষক এবং ছাত্র উভয়েরই যেমন অশেষ অনিষ্ট ঘটে, উৎকৃষ্ট প্রণালীর প্রসাদে সেইরূপ উভয় পক্ষেরই অশেষ মঙ্গল হয়,—ইহাতে দাতা এবং গ্রহীতা উভয়ই লাভবান্।

উৎসাহ।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ডাক্তার আরনল্ড বলিয়াছেন, দুইটি বালকের মধ্যে যেটুকু প্রভেদ তাহা উৎসাহের অভাবে যতটা, বুদ্ধির অভাবে ততটা নহে। পণ্ডিত আরনল্ড বালকদিগের সম্বন্ধে যে কথা বলিয়াছেন, সে কথা যুবক ও বৃদ্ধদিগের সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে। অনেক সুবিখ্যাত লোকের জীবনী পাঠে জানা যায় যে, যাঁহারা বাল্য-জীবনে কোন প্রকার ভবিষ্যদুন্নতির পরিচয় দেন নাই, পক্ষান্তরে যাঁহারা বাল্য-জীবনে মূর্খ বলিয়া অভিহিত হইতেন, তাঁহারা ভবিষ্যৎ জীবনে অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন, স্বনাম-ধন্য

মহাত্মা বলিয়া জগতে পরিচিত হইয়াছেন। জগদ্বিখ্যাত সার আইজাক্ নিউটন পাঠাবস্থায় বিদ্যালয়ের একজন অপকৃষ্ট ছাত্র ছিলেন; তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের কোন প্রকার পরিচয় তৎকালে পাওয়া যায় নাই। কথিত আছে, একবার তিনি বাৎসরিক পরীক্ষায় স্ব-শ্রেণীস্থ ছাত্রদিগের মধ্যে শুধু একজনের উপরে হইয়াছিলেন। কিন্তু পরিশেষে যত্ন ও উৎসাহ-বলে সম-পাঠীদিগের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান লাভ করিয়াছিলেন।

সুবিখ্যাত সেরিডন বাল্যকালে কিছুমাত্র বুদ্ধির পরিচয় না দেওয়ায় তাঁহার জননী তাঁহাকে হস্তীমূর্খ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া জনৈক শিক্ষকের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ওয়াল্টার স্কট্ বাল্যকালে একজন মূর্খ বলিয়া পরিচিত ছিলেন। এডিন্‌বরা বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যখন তিনি অধ্যয়ন করিতেন, তখন জনৈক শিক্ষক তাঁহার সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, তিনি এখনও যেমন মূর্খ, পরেও সেইরূপ মূর্খ থাকিবেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে আলফিরি যে জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন, বিশ্ববিদ্যালয় পরিত্যাগের সময় তদপেক্ষা বড় বেশী জ্ঞান লাভ করেন নাই। নেপোলিয়ন এবং ওয়েলিংটন বিদ্যালয়ে বিখ্যাত ছাত্র বলিয়া পরিগণিত ছিলেন না। ডিউক-পত্নী ডি আব্রেণ্টী নেপোলিয়নের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার খুব ভাল স্বাস্থ্য ছিল, কিন্তু অন্যান্য বিষয়ে তিনি সাধারণ বালকদিগের মত ছিলেন। স্মাইল্‌স্ কৃত বিখ্যাত 'সেল্‌ফ্‌হেল্প' (স্বাবলম্বন) নামক গ্রন্থে 'প্রসিদ্ধ' মূর্খদিগের বিবরণ বিস্তারিতরূপে লিখিত আছে। আমরা তৎগ্রন্থ হইতে কতিপয় 'প্রসিদ্ধ' মূর্খের কথা পাঠকবর্গকে জানাইলাম। ইংরাজি ভাষাভিজ্ঞ পাঠকগণ কৌতূহল চরিতার্থ করিবার জন্য উক্ত গ্রন্থ হইতে উক্ত অংশ পাঠ করিলে জানিতে পারিবেন যে, মূর্খেরাও যত্ন ও উৎসাহ-বলে প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে। বাস্তবিক দেখিতে গেলে উৎসাহই সর্ব্বকার্য্যের মূল। উৎসাহের অভাবে কোন কার্য্যই সুচারুরূপে সম্পন্ন হইতে পারে না। একমাত্র উৎসাহের অভাবে কত শত প্রতিভা-শালী মহাপুরুষ জীবন-সংগ্রামে জয়-লাভ করিতে না পারিয়া হতাশ্বাস হইয়া, দুর্ব্বহ জীবন-ভার অতি কষ্টে বহন করিয়া ইহ সংসার হইতে অবসর গ্রহণ করিতেছেন। ভাবিতে গেলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়, অসাধারণ প্রতিভা-শালী মহাপণ্ডিত বোল্‌রিজ উৎসাহের অভাবে কত না দুর্দ্দশা-গ্রস্ত হইয়াছিলেন। একথা নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে বলা যাইতে পারে যে, একমাত্র উৎসাহের অভাবে লোকে এ জগতে কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। উৎসাহ জীবনের পরিচালক, আত্মোন্নতির পথ-প্রদর্শক। উৎসাহ ব্যতীত এ জীবন বৃথা; তন্ত্রীর অভাবে বাদ্য-যন্ত্রের মত, চক্রাভাবে গাড়ীর মত, স্প্রিং অভাবে ঘড়ীর মত—অসার, অচল, নিস্পন্দ।

উদ্যম-শীলতা—উৎসাহ। উদ্যম-হীনতা—অনুৎসাহ। উৎসাহ—জীবন; অনুৎসাহ—মৃত্যু। উৎসাহ—আলোক; অনুৎসাহ—ছায়া। উৎসাহ অন্তর্নিহিত তেজ বৃদ্ধি করে, নির্জ্জীব বৃত্তিগুলিকে সতেজ করে। উৎসাহ দুর্ব্বলকে সবল করে, শরীর ও মনকে নব বলে বলীয়ান করে। উৎসাহের অভাবে

জীবনে সুখ নাই, শান্তি নাই, উন্নতি নাই। উৎসাহের অভাবে হৃদয়ে তরঙ্গ নাই; মনে বল নাই। উৎসাহ-হীন জীবন তরঙ্গ-হীন নদীর মত নিবাত—নিষ্কম্প—নিশ্চল। উৎসাহ মনকে মধুময় করে, জীবনকে তেজো-ময় করে। উৎসাহ—অনল। অনুৎসাহ—জল। উৎসাহ-বান্ পুরুষ অগ্নি-মন্ত্রে দীক্ষিত; উৎসাহের অগ্নি তাঁহার চতুর্দ্দিকে প্রজ্জ্বলিত। অগ্নির ভিতরে থাকিয়া তিনি কার্য্য করেন। নিত্য-নূতন কার্য্যে তিনি ব্রতী। নিত্য-নবীন তাঁহার জীবন। নিত্য-নবীন জীবনে তাঁহার নিত্য-নবীন তেজ, নিত্য-নবীন উদ্যম। অশীতি বর্ষের বৃদ্ধ হইলেও নবীন যুবকের ন্যায় উৎসাহবান্ পুরুষ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবিষ্ট। কি তেজ! কি সাহস!! কেমন কার্য্য-পটুতা!! কেমন উদ্যম-শীলতা!! ধন্য উৎসাহ-বান্ পুরুষ! ধন্য তোমার জীবন!! শীতলতা তোমার জীবনে নাই, অলসতা তোমাকে আশ্রয় করিতে পারে নাই। নিষ্ক্রিয় ব্যক্তির মত তোমার জীবন উত্তাপ-বিহীন নহে। উত্তাপ না থাকিলে জীবনী-শক্তির হ্রাস হয়। উত্তাপ-হীনতা মৃত্যুর লক্ষণ। উত্তাপ লইয়া, উৎসাহ লইয়া এ সংসারে আসিয়াছ। উৎসাহের অনলে বাধা বিপত্তি দগ্ধ করিতেছ। ধন্য তুমি! ধন্য তোমার জীবনী!!

৮

পৃথিবীতে সামান্য অবস্থা হইতে যত লোক বড় হইয়াছেন, তাঁহাদিগের প্রত্যেকেই উৎসাহ-শীল ছিলেন। অদম্য উৎসাহ এবং অবিচলিত অধ্যবসায় না থাকিলে কেহই এ জগতে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারেন না। উৎসাহ জ্ঞান-লাভের প্রবেশ-দ্বার, উন্নতি-লাভের সোপান, এবং মঙ্গল-লাভের নিদান। জলন্ত উৎসাহ, সানুরাগ পরিশ্রম, এবং অবিচলিত অধ্যবসায় যাঁহার আছে, তাঁহার অসাধ্য এ জগতে কিছুই নাই। তিনি ইচ্ছা করিলে হিমালয় পর্ব্বতকে সমতল ক্ষেত্র করিতে পারেন; উত্তাল-তরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগরকে শুকাইতে পারেন; দিগন্ত ব্যাপী মহারণ্যকে মানবের পরম রমণীয় আবাস-ভূমি করিতে পারেন। তিনি পৃথিবীকে স্বর্গ তুল্য করেন, এবং স্বর্গের দ্বার সাধারণের জন্য উন্মুক্ত করেন। উৎসাহের দ্বারা যিনি পরিচালিত, জীবন-সংগ্রামে তাঁহার জয়-লাভ অবশ্যম্ভাবী।

যে যে কারণে ভারতের বর্ত্তমান্ দুরবস্থা, তন্মধ্যে ভারত-বাসীর উৎসাহের অভাব অন্যতম। বুদ্ধিমত্তায় ও সূক্ষ্ম-দর্শিতায় বোধ করি ভারতবাসী পৃথিবীর অন্য কোন জাতির অপেক্ষা হীন নহে। কিন্তু উপর্য্যুপরি পরাধীনতার জন্যই হউক; অথবা অন্য কোন কারণেই হউক, উৎসাহ-হীনতা সভ্যতার আদি রঙ্গ-ভূমি ভারতকে বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থায় পাতিত করিয়াছে। ভারত-বাসীর আর সে পূর্ব্ব তেজ নাই, অগ্নিময় আর সে পূর্ব্ব জীবন নাই। জড়তা—অলসতা আসিয়া উদ্যম-শীলতার স্থান অধিকার করিয়াছে। জড়-ভরতের ন্যায় ভারতবাসী আজ সর্ব্ব কার্য্যে উৎসাহ-হীন, নিষ্ক্রিয় ও নিশ্চেষ্ট। উৎসাহের অভাবে ভারতবাসীর এ দুর্দ্দশা। যতদিন স্কুল বা কলেজে থাকে, ততদিন ভারতবাসীর কত উৎসাহ, কত যত্ন; কেমন উদ্যম-শীল তাহারা, কেমন অগ্নিময় তাহাদের জীবন। কিন্তু, হায়! যেই তাহারা স্কুল ছাড়িল—একটা অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া

যেই তাহারা সংসারে প্রবেশ করিল, অমনি ছাত্র-জীবনের সেই উৎসাহ, সেই তেজ, সেই উদ্যম-শীলতা, সব যেন একে একে কর্পূরের ন্যায় বাতাসে উপিয়া যাইতে লাগিল। বিলাসিতা আসিয়া তাহাদিগকে আশ্রয় করিল; অলসতা তাহাদের জীবনের নিত্য-সহচরী হইল। আশা, ভরসা, উন্নতি, অভ্যুদয় এইখানেই পর্য্যবসিত হইল। শিক্ষিত লোকদিগের অবস্থা এইরূপ। অশিক্ষিত লোকদিগের ত কথাই নাই। গরীব দুঃখী ক্ষুধার জ্বালায় কাতর। দিন রাত্রি তাহারা খাটে, তবুও উদরান্নের যোগাড় করিতে পারে না। এরূপ অবস্থায় তাহাদের উৎসাহ থাকিতে পারে না। উৎসাহ-হীন পরিশ্রম বৃথা; সিসিফাসের প্রস্তর নিক্ষেপের ন্যায় পণ্ড-শ্রম মাত্র।

ইউরোপ ও নবাবিষ্কৃত আমেরিকার এত উন্নতি, এত গৌরব কিসে? তথাকার প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়ে উৎসাহ-বহ্নি চির প্রজ্বলিত আছে বলিয়া নয় কি? পথে, ঘাটে, মাঠে, কার্য্যালয়ে, প্রাসাদে, কুটীরে, খনির ভিতরে, জলের উপরে—যেখানে যাইবে, সেই খানেই তাহাদের অদম্য উৎসাহ ও অবিচলিত অধ্যবসায়ের পরিচয় পাইবে। উৎসাহ যেন তথাকার প্রত্যেক নর-নারীর হৃদয়-মন অধিকার করিয়া রহিয়াছে। সর্ব্ব শ্রেণীর লোকদিগের অন্তরে যেন যত্ন, উৎসাহ, স্বাবলম্বন, পরিশ্রম, সাহস, অধ্যবসায় পূর্ণমাত্রায় বিরাজমান। দরিদ্রের ইচ্ছা বড় হইব। কাঙ্গালের ইচ্ছা ধনবান্ হইব। ধনবানের ইচ্ছা স্বনাম-প্রসিদ্ধ হইব। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলেই যেন স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিতে বদ্ধ-পরিকর। প্রতিষ্ঠা-লাভের জন্য সকলেই যেন তৎপর। কেহই কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে চাহে না। প্রত্যেকেই আপন আপন কাযে ব্যস্ত। এই সমস্ত সদ্‌গুণে বিভূষিত না হইলে কি ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীরা এতদূর উন্নতি-লাভে সক্ষম হইত?

ভাই ভারতবাসি! তুমি ত বড় অনুকরণপ্রিয়। পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুকরণ করিতে যাইতেছ; ধুতি, চাদর ছাড়িয়া হ্যাট্, কোট্ পরিতেছ; ভাত, দাইল ছাড়িয়া পাঁউরুটি, বিস্‌কুট্ খাইতেছ; শাক, সবজি, দধি, দুগ্ধ ছাড়িয়া মদ্য, মাংস আহার করিতেছ; হাতের ব্যবহার ছাড়িয়া কাঁটা, চামচের ব্যবহার করিতেছ; তামাক ছাড়িয়া চুরট ধরিয়াছ; স্বদেশীয় চাল চলন ভুলিয়া গিয়া বিদেশীয় চাল চলন অনুকরণ করিতেছ; কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সদ্‌গুণগুলি কি ভাই! সঙ্গে সঙ্গে অনুকরণ করিতেছ? ইউরোপ ও আমেরিকাবাসীদিগের অদম্য উৎসাহ, অবিচলিত অধ্যবসায়, স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাতি-প্রিয়তা, সানুরাগ পরিশ্রম, ও সর্ব্বানুবন্ধিনী একতার অনুকরণ করিতে না পারিলে, ভাই! তোমার দেশের ত মঙ্গল নাই; পতিত ভারতের উদ্ধারের ত আর আশা নাই। তুমি কি সেগুলির অনুকরণ করিবে না? বাহ্যাড়ম্বর লইয়াই কি ব্যস্ত থাকিবে? বাহিরের পোষাক পরিচ্ছদকেই কি বহুমূল্য মনে করিবে? বাহিরের চাক্‌চিক্যে কি আসে যায়? সিংহের গুণ যদি অনুকরণ করিতে না পারিলে, তবে সিংহের চর্ম্মে সর্ব্ব শরীর আবৃত করিয়া ফল কি? যে মেষ সে মেষই থাকিবে। লাভের মধ্যে জাতীয়তা হারাইবে। পাশ্চাত্য জাতি-সমূহের নিকট জ্বলন্ত উৎসাহ, অক্লান্ত পরিশ্রম,

অদম্য অধ্যবসায় প্রভৃতি শিক্ষা কর; তাহা হইলে তোমাদ্বারা তোমার দেশের অনেক উপকার হইতে পারিবে। নতুবা, যে 'তিমিরে সে তিমিরে'ই তোমার দেশ মগ্ন থাকিবে; ব্যাস-বাল্মীকির প্রিয় জন্মভূমি এই ভারতবর্ষ কালা ফিরিঙ্গীর বাস-স্থান হইবে। জীবনের কর্ত্তব্য ভুলিও না। ভগ্নোৎসাহ হইও না। উৎসাহ-শীল হও; উৎসাহের সহিত কার্য্য কর। মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইবে—অচিরাৎ মঙ্গল হইবে।

আত্ম-সংযম-শিক্ষা।

সুস্থ শরীরে সুস্থ মন, ইহাই পূর্ণ মানবের প্রকৃত আদর্শ। শরীর ও মনের এই সুস্থতা সম্পাদন জন্য শিক্ষার আবশ্যক। শিক্ষা দ্বিবিধ, সংযমন-শিক্ষা ও প্রসারণ-শিক্ষা। মানবীয় বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে কতকগুলি বৃত্তি সংযমনে ও কতকগুলি বৃত্তি প্রসারণে পূর্ণ সুস্থতা লাভ করে। যে সমস্ত বৃত্তির পরিচালন অপেক্ষা সংযমনের আবশ্যক অধিক, সেগুলিকে আমরা সাধারণতঃ মন্দবৃত্তি বলি, যথা কাম, ক্রোধ, লোভ, আলস্য, ইত্যাদি। যে সমস্ত বৃত্তির পূর্ণ সুস্থতার জন্য প্রসারণেরই আবশ্যকতা অধিক, সে সমস্ত বৃত্তিকে আমরা সদ্‌বৃত্তি বলি, যথা ভক্তি, প্রীতি, দয়া, উদ্যম, ইত্যাদি। মানবীয় বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে কোন্ বৃত্তির কি পরিমাণ সংযম ও কি পরিমাণ পরিচালন আবশ্যক, জ্ঞানদ্বারা তাহা নিরূপণ করিয়া বৃত্তিনিচয়ের গুণের তারতম্যানুসারে শ্রেণীবদ্ধ করাই প্রকৃত শিক্ষা, এবং ইহাই আদর্শমানবের সুস্থ মনের কার্য্য। মন্দবৃত্তিগুলিকে ইচ্ছাশক্তি'দ্বারা সংযত রাখিতে যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহাই সংযমন-শিক্ষা; সদ্‌বৃত্তিগুলির স্ফুরণ করিয়া ক্রমে সেই বৃত্তিগুলির চরম উন্নতি সাধন জন্য যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহাই প্রসারণ-শিক্ষা। প্রসারণ-শিক্ষা অপেক্ষা সংযম-শিক্ষা দুরূহ ও উপকারী। প্রসারণ-শিক্ষা মানুষকে উন্নতির পথে লইয়া যায়, কিন্তু সংযম-শিক্ষা ব্যতীত মানুষ প্রকৃত মানুষই হইতে পারে না। সংযম-শিক্ষা ব্যতীত প্রসারণ-শিক্ষা আত্মার ও শরীরের অতি অল্পই হিত করিতে পারে। এই জন্যই প্রথম ও প্রধান শিক্ষা জ্ঞানে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রথমে মন্দ বৃত্তিগুলিকে দমন করিতে, এবং পরে সদ্‌বৃত্তিগুলির স্ফুরণ করিতে উপদেশ দেয়। সংযম-অভ্যাসই ধর্ম্মজ্ঞানের প্রথম সোপান ও দীর্ঘজীবনের প্রধান উপায়। মানব-চিত্ত স্বভাবতঃ চঞ্চল, ইন্দ্রিয়নিচয় দুর্দ্দমনীয়। সংযম-শিক্ষা দ্বারা চঞ্চল চিত্তকে স্থির ও দুর্দ্দমনীয় ইন্দ্রিয়গণকে আয়ত্ত করিতে না পারিলে মানব অচিরে পাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

সংযম-শিক্ষা দ্বিবিধ, শারীরিক সংযম-শিক্ষা ও মানসিক সংযম-শিক্ষা। শারীরিক ইন্দ্রিয়গুলিকে ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহাই শারীরিক সংযম-শিক্ষা। আর মানসিকবৃত্তিগুলিকে (চিন্তাবৃত্তি, অনুভূতিবৃত্তি, ও ইচ্ছাবৃত্তি)

সংযত রাখিতে যে শিক্ষার আবশ্যক, তাহাই মানসিক সংযম-শিক্ষা। মানসিক সংযমই শারীরিক সংযম-শিক্ষার মূল। মানসিক সংযম ব্যতীত শারীরিক সংযম অসম্ভব। আবার শারীরিক সংযম ব্যতীত মানসিক সংযমও এক প্রকার অসম্ভব। শরীর ও মনের সম্বন্ধ অতি নিকট। শারীরিক ইন্দ্রিয়-সমূহ অসংযত হইলে মানসিক বৃত্তিগুলি স্বতঃই অসংযত হইয়া পড়ে। অতএব এই উভয়বিধ সংযম-শিক্ষাই মানবের পক্ষে অতীব আবশ্যক। কি কি উপায়ে এই উভয়বিধ সংযম-শিক্ষা করা যাইতে পারে, তদ্বিষয়ে চিন্তা করা সকলেরই জীবনের একটী প্রধান কর্ত্তব্য।

শারীরিক ও মানসিক সংযমের মধ্যে মানসিক সংযমই অতীব কঠিন। মানসিক সংযমের গুরুত্ব প্রতিপন্ন করিবার জন্যই মহাত্মা ঈশা বলিয়াছেন, যিনি মানসিক বৃত্তির উপর আধিপত্য স্থাপন করিতে পারেন, তিনি এক জন নগরজেতা অপেক্ষাও মহৎ। যে কার্য্যে আত্মার অক্লান্ত চেষ্টা ও বহুকালব্যাপী নিবেশ আবশ্যক, সেই কার্য্যই সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন। মানসিক সংযম বলিতে চিন্তা-বৃত্তির সংযম, অনুভূতি-বৃত্তির সংযম ও ইচ্ছা-বৃত্তির সংযম বুঝায়। মানসিক সংযম যেমন শারীরিক সংযমের মূল, চিন্তা-বৃত্তির সংযমও সেইরূপ অনুভূতি-বৃত্তির সংযমের মূল। চিন্তা-বৃত্তির সংযমে ও ইচ্ছা-বৃত্তির সংযমে অতি নিকট সম্বন্ধ। ইহাঁদের পরস্পর পরস্পরের সাহায্য অপেক্ষা করে। সাধারণতঃ চিন্তা হইতেই ইচ্ছার উদ্ভব হয়, কাযেই চিন্তা-বৃত্তির সংযমই সকল সংযমের মূল। কিন্তু এ সংযম অতীব কঠিন। এই চিন্তা-বৃত্তির সংযমাভাবে মানব কিরূপে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তাহা ভগবদ্গীতায় সুন্দর রূপে বর্ণিত হইয়াছে। "পাপ চিন্তা হইতে পাপে আসক্তি হয়, আসক্তি হইতে অভিলাষ হয়, অভিলাষের ব্যাঘাত হইলে তাহা হইতে ক্রোধ উপস্থিত হয়, ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য-বিবেচনা শূন্যতা জন্মে", ইত্যাদি। এইরূপে মানুষ নিতান্ত অসার ও অপদার্থ হইয়া যায়। এক্ষণে দেখা যাউক কিরূপে চিন্তা-বৃত্তির সংযম করা যাইতে পারে। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তরে অর্জ্জুনকে দুইটী উপায় বলিয়াছেন। প্রথমটী অভ্যাস, অর্থাৎ মনকে কুৎসিৎ বিষয় হইতে পুনঃপুনঃ প্রত্যাহার করিয়া সদ্বিষয়ে নিবেশ করা, দ্বিতীয়টী বিষয়-বৈরাগ্য অর্থাৎ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে মনের অত্যাসক্তি-ত্যাগ-চেষ্টা। প্রথম উপায়টী সকলেরই পক্ষে, দ্বিতীয়টী অবশ্য সকলের পক্ষে নহে। প্রথমোক্ত উপায় দ্বারা যাহাতে হৃদয়ে পাপ আদৌ স্পর্শ করিতে না পারে তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া প্রকৃত সংযমীর কর্ত্তব্য। কোন পাপ-চিন্তা হৃদয়ে উত্থিত হইয়া হৃদয়েই লয় হইয়া গেলেও প্রকৃত সংযম হয় নাই বলিতে হইবে। এই শিক্ষা বহুকালব্যাপী সাত্ত্বিক চেষ্টা ও সাধনা-সাপেক্ষ। পাপচিন্তা মনে আসিলেই তৎক্ষণাৎ মনকে সে বিষয় হইতে ফিরাইয়া ঈশ্বর-চিন্তায় বা বিষয়ান্তরে নিবিষ্ট করা আবশ্যক। কোন সময়ই চিত্ত শূন্য রাখা কর্ত্তব্য নহে। এক বিষয়ে না এক বিষয়ে ব্যাপ্ত রাখা কর্ত্তব্য। ইংরাজীতে একটী প্রবাদ আছে যে, শূন্যহৃদয় পাইলেই তথায় সয়তান প্রবেশ করে। কথাটী ঠিক। ধর্ম্মপুস্তক-পাঠ, সজ্জন-সঙ্গ, সদালাপাদি দ্বারা মনকে চিন্তায় ব্যাপৃত রাখা

কর্ত্তব্য। প্রতিদিবসই সদ্‌গ্রন্থাদি পাঠ করা আবশ্যক। দিবসের মধ্যে অন্ততঃ একবার করিয়া এই সংযমের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম হইলে এই সংযম-অভ্যাস অনেকটা সহজ-সাধ্য হইয়া আইসে। প্রতিদিবসই পরলোক-বিষয়ে চিন্তা করা আবশ্যক। সুবিধা হইলেই ধার্ম্মিক ও সাধুব্যক্তিদের সহিত আলাপাদি করা আবশ্যক। ইহাতে পাপের প্রতি যথোচিত বিদ্বেষ ও পুণ্যের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি জন্মে। প্রতিদিন যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজের মন ও কার্য্য আলোচনা করা এই শিক্ষা-লাভের একটী প্রকৃষ্ট উপায়।

এক্ষণে দেখিতে হইতেছে ইচ্ছা-বৃত্তিকে কিরূপে সংযম করা যায়। জ্ঞান ও অভ্যাসই ইচ্ছা-বৃত্তি-সংযমের মূল। অনুভূতি-বৃত্তিগুলির সংযম-শিক্ষা কি উপায়ে হয়, তাহাও দেখা যাউক। চিন্তা-বৃত্তির সাহায্যেই অনুভূতি-বৃত্তির উদ্রেক হয়। যতক্ষণ কোন নিরাশার কারণ বালকের মনে থাকে, ততক্ষণই কেবল তাহার রাগ বা বিরক্তির ভাব থাকে। যদি কখন কোন মন্দবৃত্তি হৃদয়কে অধিকার করে, তাহা হইলে সেই বৃত্তির অপসরণ হইলেই অনুশোচনা করা আবশ্যক। অনুশোচনানলে পুনঃ পুনঃ দগ্ধ করিয়া ক্রমে হৃদয়কে বিশুদ্ধ করিতে হয়। যে সমস্ত কার্য্য করিলে রাগ দ্বেষাদি অনুভূতি-বৃত্তিগুলির উদ্রেক হইতে পারে, সে সমস্ত কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে।—যে সমস্ত বিষয় কুপ্রবৃত্তি উত্তেজিত করে, সে সমস্ত বিষয় হইতে যতদূর সম্ভব দূরে থাকা কর্ত্তব্য। যখন কোন মন্দবৃত্তি হৃদয়ে আইসে, তখন তাহার বিপরীত কোন সদ্‌বৃত্তি হৃদয়ে আনিতে হয়। যেমন রাগ হইলে ক্ষমাগুণের বিষয়-চিন্তা। আমি এখানে কয়েকটী মাত্র কুপ্রবৃত্তির বিষয় বিশেষরূপে বলিব। প্রত্যেক ধর্ম্মপুস্তকেই কাম, ক্রোধ, মাৎসর্য্য, এই তিনটী কুপ্রবৃত্তিকে সংযত করিবার জন্য ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ আছে। কাম অতি প্রবল রিপু। অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিলে অগ্নি যেমন ক্রমেই অধিক প্রজ্বলিত হইয়া উঠে, কাম-বৃত্তি উচ্ছৃঙ্খল ভাবে সেই রূপ পরিচালনা করিলে এই দুর্দ্দমনীয় বৃত্তিও অধিক দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠে, এবং শারীরিক ও মানসিক সুস্থতা নষ্ট করিয়া মানুষকে অসার ও অপদার্থ করিয়া ফেলে। যাহাতে এই বৃত্তি অতি সংযতভাবে চালিত হয় তদ্বিষয়ে প্রত্যেক সংযম-শিক্ষার্থীর বিশেষ সতর্কতা আবশ্যক। ক্রোধ একটী ভয়ানক রিপু। ঈশা বলিয়াছেন "যিনি সহজে ক্রুদ্ধ না হন তিনি মহৎ হইতেও মহৎ।" আর এক স্থানে তিনি বলিয়াছেন, "দেখিও যেন সারা দিন ব্যাপিয়া কখনও তোমার রাগ না থাকে।" ষ্টোয়িক সম্প্রদায় রাগকে এক প্রকার উন্মত্ততা বলিতেন। সংযম-শিক্ষার্থীর ক্রোধশূন্য হইবার চেষ্টা সতত কর্ত্তব্য। মাৎসর্য্য অথবা অন্য-শুভ-দ্বেষ অতি নীচ প্রবৃত্তি। দুগ্ধ-পোষিত কাল সর্পের ন্যায় ইহা যে হৃদয়ে পুষ্ট হয় সেই হৃদয়কেই জর্জ্জরিত করে। কাম ও ক্রোধের সাময়িক উপকারিতা আছে, কিন্তু এই বৃত্তির কোনই উপকারিতা দেখা যায় না। পরের ভাল দেখিলে যাহার হৃদয় পুড়ে, তাহার হৃদয়ে সদাই নরকাগ্নি ধুধু করিয়া জ্বলিতেছে। এরূপ বৃত্তির উচ্ছেদ-জন্য সর্ব্বথা চেষ্টা আবশ্যক।

এক্ষণে শারীরিক সংযমের বিষয় কিছু

বলিয়া এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধ শেষ করিব। অনুভূতি-বৃত্তিগুলির সংযম এবং প্রধানতঃ ইচ্ছা-বৃত্তির সংযমই শারীরিক সংযম-শিক্ষার উপায়। কোন এক সংস্কৃত শ্লোক সংগ্রহে লিখিত আছে ;—

"হস্তাবুপস্থমুদরং বাক্‌চতুর্থী চতুষ্টয়ং
এতৎ সুসংযতং যস্য, স বিপ্রঃ কথ্যতে বুধৈঃ।
পরবিত্তং ন গৃহ্লাতি হিংসাং ন কুরুতে তথা,
নাক্ষক্রীড়ারতো যস্তু তস্য হস্তৌ সুসংযতৌ।
পরস্ত্রীবর্জ্জনপর স্তস্যোপস্থং সুসংযতং।
অলোলুপং মিতং ভুঙ্‌ক্তে জঠরং তস্য সংযতং
সত্যং হিতং মিতং ব্রূতে যঃ সদা তস্য বাগযতা।
যস্য সংযতাঙ্গেতানি তস্য কিং তপসাধ্বরৈঃ।"

হস্ত, উপস্থ, উদর ও বাক্য এই চারিটী যাহার সুসংযত সেই প্রকৃত বিপ্র। যে পরবিত্ত গ্রহণ করে না, হিংসা করে না, ও কুক্রীড়াদি করে না, তাহার হস্ত সংযত বলিতে হইবে। যে পরস্ত্রী-গমন করে না তাহার কামেন্দ্রিয় সংযত। যে অলোলুপ হইয়া পরিমিত আহার করে, তাহার উদর সংযত বলিতে হইবে। আর যিনি সত্য কথা ও হিতকথা বলেন ও পরিমিতভাষী হন, তাঁহার বাগেন্দ্রিয় সংযত। মনুতে আছে।—

দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরবাদং তথানৃতং।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষনালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ।

দ্যুতক্রীড়া, বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা, পরনিন্দা, মিথ্যা কথা, অতিরিক্ত স্ত্রীসেবা, স্ত্রীলোকের প্রতি কামদৃষ্টি এবং পরের অপকার পরিহার করিবে। গীতায় আছে।—

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞ-পূজনং শৌচমার্জ্জবং
ব্রহ্মচর্য্য মহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়ং হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যাসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে।

দেবদ্বিজের প্রতি ভক্তি, গুরু ও প্রাজ্ঞদিগের পূজন, শৌচ ও সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, ইহাদিগকে শারীরিক তপ বলে। অনুদ্বেগকর, সত্য, প্রিয় ও হিত-বাক্য-কথন ও বেদাদি সদ্‌গ্রন্থ-পাঠ ইত্যাদিকে বাঙ্ময় তপ কহে। এই সমস্ত শারীরিক সংযম শিক্ষা ও মানসিক সংযম-শিক্ষা অতীব কঠিন। কিন্তু চেষ্টায় ইহা ক্রমে সহজ-সাধ্য হইয়া আইসে। অতি কঠিন সংযমও অভ্যাসগুণে ক্রমে স্বভাব মধ্যে পরিণত হয়। অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তি সংযত হয়, এবং যে সমস্ত বৃত্তি প্রথমে অতীব দুর্দ্দমনীয় বলিয়া বোধ হয়, অভ্যাস-যোগে তাহাও অতি সহজ-সাধ্য হইয়া আইসে। অভ্যাসই আমাদিগকে কুপ্রবৃত্তি-কুলের কঠোর অধীনতা হইতে মুক্ত করে। অভ্যাস গুণেই মানুষ ইচ্ছা-শক্তিকে স্বীয় সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিয়া ধর্ম্ম ও শান্তি উপভোগ করিতে পারে। চেষ্টায় কি না হয়? যত্নে কি না ফলে? "ক ঈপ্সিতার্থ-স্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ।" এ সংযম অক্লান্তভাবে চিরজীবনই অভ্যাস করিতে হয়। জীবন স্বপ্ন নহে, সম্ভোগ নহে, বিলাস নহে। জীবন সুখ নহে, দুঃখও নহে। জীবন যুদ্ধ,—সদ্‌বৃত্তির সহিত মন্দবৃত্তির যুদ্ধ। জীবন ব্রত,—আত্ম-সংযম-ব্রত। জগতে যাঁহাদের জীবন সার্থক হইয়াছে, তাঁহারা চিরকালই সংযমী। উদাহন বুদ্ধদেব, চৈতন্য, যিশু-খ্রীষ্ট।

কর্ত্তব্যানুষ্ঠান।

সংসার কর্ম্মভূমি মাত্র, সেই কর্ম্ম-ক্ষেত্রে পদার্পণ করিবামাত্র সকলকে কর্ত্তব্যের দাস হইতে হয়। সর্ব্বদা কর্ত্তব্য প্রতিপালনের জন্যই জীব এ সংসারে কিছুদিনের নিমিত্ত অবস্থান করে, এবং তাহা সাধন হইলেই নির্দ্দিষ্ট দিনে ইহলীলা শেষ করিয়া চলিয়া যায়। কার্য্যের কাঠিন্য উপলব্ধি করতঃ তুমি যদি কর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া আত্মাভিমতেই সর্ব্বদা চল, তাহা হইলে তোমার শুভ হইবে কি? এখানে সুখেই হউক আর দুঃখেই হউক যেন একরূপে চলিল, কিন্তু তুমি ত জান যে এখানে তুমি চিরদিন থাকিবার জন্য আইস নাই, এ স্থান তোমার চিরবাসের স্থান নহে। যতদিনের মিয়াদ লইয়া এই কর্ম্মভূমিতে আসিয়াছ, তাহা শেষ হইলেই আবার তোমাকে সেই নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাইতে হইবে—যিনি তোমাকে এখানে পাঠাইয়াছেন, পুনরায় তাঁহারই সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে। কিন্তু যখন সেই পরম পিতা পরমেশ্বর তোমাকে "কর্ম্ম-ক্ষেত্রে গিয়া তুমি কি কি কর্ম্ম করিয়াছ", "কর্ত্তব্যের বাধ্য হইয়া ছিলে কি না", "তোমার দ্বারা অকর্ত্তব্যের সেবা হয় নাই ত", ইত্যাদি রূপ প্রশ্ন করিবেন, বল দেখি, তুমি তখন তাঁহার সেই প্রশ্নগুলির কি উত্তর করিবে? যদি তুমি সত্য কথা বলিবে মনে কর, তাহা হইলে তোমাকে বলিতে হইবে, "কর্ম্মভূমিতে গিয়া কর্ম্ম করিয়াছি কেবল কলহ বিবাদ; আর কর্ত্তব্যের বাধ্য না থাকিয়া কাম, ক্রোধ, লোভ, হিংসা, মদ, মাৎসর্য্য প্রভৃতির সেবক এবং অনুগত ভৃত্য ছিলাম।" কিন্তু বলিতে পার কি, তোমার সেই সকল দুষ্কর্ম্মের সমুচিত প্রতিফল কি হইবে? মনে করিও না যে এখানে যেমন দুই দশটা মিথ্যা কথা সাজাইয়া বলিলেই চলিতেছে, তেমনি সেখানেও চলিবে। তিনি পরাৎপর, সর্ব্বভূতে স্থিত, সর্ব্বজ্ঞ, তাঁহার নিকট মিথ্যা কথা আদৌ চলিবে না। এইখানে কর্ত্তব্যের বাধ্য থাকিয়া সর্ব্বদা কার্য্য করিলে ইহকালে শান্তি ও পরকালে সেই পরম পিতার কাছেও সমাদর পাইবে।

মনুষ্য মাত্রেই কর্ত্তব্যের দাস, সুতরাং কর্ত্তব্যের সেবা তাহাদিগের জীবন-গত নিয়মিত কার্য্য, এজন্য তাহার সকলগুলি আদেশই অতিশয় যত্নের সহিত পালন করা সকলেরই উচিত। কোনটিকেই অবজ্ঞা করা কর্ত্তব্য-সাধকের লক্ষণ নহে। একটি কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিলাম, আর একটি পারিলাম না বলিয়া তাহার নিকটেও গেলাম না, তাহা হইলে তাহাকে প্রকৃত কর্ত্তব্যানুগত বা আত্মোৎকর্ষ সাধক বলা যাইতে পারে না। কর্ত্তব্য বলিল তোমার পরিবার তোমাকেই প্রতিপালন করিতে হইবে, তুমিও সে আদেশটি পালন করিতে প্রস্তুত হইলে, কিন্তু হায়! বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তুমি শৈশবাবধি আদৌ লিখা পড়া শিক্ষার প্রতিবাদী, এখনও তোমার নিকট ক অক্ষর গোমাংস তুল্য। যৌবনে তোমার পরিবার-পালনের ভার

তোমার উপর ন্যস্ত হইয়াছে, সুতরাং এখন তোমার সম্পূর্ণ অর্থের আবশ্যক, কিন্তু বাগ্দেবীর কৃপা হইতে বঞ্চিত হইয়া তোমার বুদ্ধি বৃত্তি সকল অতিশয় ভোঁতা হইয়া গিয়াছে, এবং কোনরূপ শিল্প কর্ম্মেও তোমার অভিজ্ঞতা নাই। অতএব লেখা পড়া জান না, কোন রকম শিল্পকর্ম্মও জান না, সুতরাং সদুপায়ে অর্থোপার্জ্জন করিবারও তোমার ক্ষমতা নাই। তখন হয় ত তোমার মনে বারম্বার অসদুপায়ের পন্থা উদিত হইতে লাগিল,—অগত্যা হয় ত চৌর্য্য-বৃত্তি অবলম্বন করাই তোমার মনে স্থির সিদ্ধান্ত হইল। কিন্তু চুরি করা কি কর্ত্তব্য কার্য্য? বাল্যকাল হইতে লেখা পড়া শিক্ষায় শৈথিল্য করতঃ নিজের চরিত্র নিজে গঠন করিতে না শিখিলেই—চরিত্রের উৎকর্ষ সাধনে অক্ষম হইলেই যৌবনে কুপ্রবৃত্তি সকল চাপিয়া ধরে। কুপ্রবৃত্তি সকল যে মূর্খতার সহচর স্বরূপ ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। এইক্ষণে তোমার ধারণা হইয়াছে যে পরিবার পালন না করিলেও উপায় নাই, তাহাতে অপারগ হইলে লোকের নিকট বড়ই ঘৃণিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইবে, এজন্য চুরি করাটাই মনে মনে একমাত্র উপায় নির্দ্ধারিত হইল। আরও ধারণা হইতে পারে যে চুরি করিলে লোকে দেখিতে পাইবে না, অথচ পরিবার প্রতিপালন না করিলে লোকে তাহা দেখিতে পাইবে, এবং তাহা তোমার অতীব লাঞ্ছনার কারণ হইবে। গোপনে যত ইচ্ছা কুকার্য্য করি না কেন, লোকে না দেখিলেই তাহা কর্ত্তব্য-পালন হইল, আর লোকে দেখিয়া তাহার দোষ ব্যাখ্যা করিলেই তাহাতে দোষ। হায় মূর্খ! কুকার্য্য কতদিন গোপনে থাকে? তুমি আরও বল দেখি, কর্ত্তব্য যেন তোমাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে বলিয়াছে, কিন্তু সে কি তোমাকে চুরি করিতে বলিয়াছে? কখনই না। কর্ত্তব্য বলিতেছে চুরি করিও না, চুরি করা অন্যায় এবং পাপ। কিন্তু হায়! এস্থলে তুমি কর্ত্তব্যের উপদেশ শুনিয়াও শুনিতেছ না, সুতরাং তুমি কর্ত্তব্য-সাধক নহ, তুমি নররূপী পশু। ন্যায় অন্যায়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া কার্য্য করাই কর্ত্তব্য-সাধকের লক্ষণ। জীবনের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সকলেরই কর্ত্তব্য-পরায়ণ হইয়া সর্ব্বদা ন্যায় ও সৎপথে চলা উচিত, কস্মিন্‌কালেও অন্যায়-পথে যাওয়া জীবনের উচিত কার্য্য নহে এবং কখনও মনে করা উচিত নহে যে গোপনে অন্যায় কার্য্য করিলে ক্ষতি নাই, লোকে দেখিতে পাইলেই তাহাতে দোষ। সর্ব্বদা সৎপথে থাকিয়া ভগবানের নিরূপিত কার্য্য সম্পাদন করাই একমাত্র কর্ত্তব্যানুষ্ঠান।

শ্রীনীরদবরণী গুপ্তা।

পিতা-পুত্রী।

রাম বাবু বৃদ্ধ হইয়াছে, চুল দাড়ি পাকিয়াছে, কিন্তু শরীরের বল এবং কান্তি নষ্ট হয় নাই। তিনি ঘোর বিষয়ী লোক, সর্ব্বদা বিষয়-চিন্তাতেই মগ্ন থাকেন; পরকালে বিশ্বাস থাকিলেও ধর্ম্মকর্ম্মের অবসর পান না। একদিন তিনি বৈকালে বাগানে বসিয়া বিষয়-

চিন্তায় নিমগ্ন আছেন, এমন সময়ে তাঁহার শিশু কন্যা সুশীলা আসিয়া তাঁহার কোলে বসিল, এবং হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবা! আজ আমি দাদার কাছে একটা গান শিখিয়াছি।"

রামবাবু। "গা ও দেখি মা! কি গান?"

সুশীলা।——

"বেলা অবসান হ'ল কি কর বসিয়া মন?
উত্তরিতে ভব-নদী করিছ কি আয়োজন।
আয়ুঃ-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়া দেখনা তায়,
ভুলিয়া মোহ-মায়ায়, পাশরিছ তত্ত্ব-জ্ঞান।"

রামবাবু। "তুমি কচি মেয়ে, তোমার এ গান কেন?" এই বলিয়া বালিকাকে কোলে লইয়া অনেকক্ষণ বিষণ্ণভাবে বসিয়া থাকিলেন, এবং পরদিন হইতে ঠাকুর-ঘরে বসিয়া প্রায় সমস্ত দিন কাটাইতে লাগিলেন; কিন্তু তাঁহার এ পরিবর্ত্তন হটাৎ কেন হইল, লোকে তাহার কিছুই বুঝিতে পারিল না।

—০:৯:০:০:৪—

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

দান ধর্ম্মে পুণ্যলাভ হয় না কখন,
আপন মুখেতে তাহা করিলে কীর্ত্তন।

———

যত পার কর ত্যাগ সন্তোষের তরে,
এতদর্থে অপব্যয় হইতে না পারে।

———

হউক যতই বড় বাধা বিঘ্ন হয়,
শ্রমশীলতার কাছে হবে পরাজয়।

———

মানবেরে করিতে সুপথ প্রদর্শন,
বিবেক আলস্যে মত্ত নহে কদাচন।

———

প্রতিবাদ করিবার হইলে মনন,
বিনীত ভাষায় কর ভ্রম প্রদর্শন।

———

বন্ধুর হইলে ভ্রম দেখাইয়া দিবে,
পরুষ ভাষায় কিন্তু নিন্দা না করিবে।

———

মানবের তীক্ষ্ণ অস্ত্র যত কিছু আছে,
সকলেই পরাজিত তাচ্ছিল্যের কাছে।

———

সহজ পুণ্যের পথ ছাড়িয়া হেলায়,
দুর্গম পাপের পথে কেন মন ধায়?

———

করিও না আত্ম-দোষ যতনে গোপন,
অনুতপ্ত প্রাণে তার কর সংশোধন।

———

প্রভাতে জলদ-জালে ঢাকিলে গগন,
প্রায়শঃ পরাহ্নে উঠে উজ্জ্বল তপন।

———

মাতালের উপদেশ করিলে শ্রবণ,
কদাচিৎ শুভ ফল হয় সুজ্ঞাটন।

———

তৃতীয় ভাগ।] পৌষ [৯ম সংখ্যা।

(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ।

সহকারী সম্পাদক

শ্রীমোহিনীমোহন সেন, এম, এ, বি, এল।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,
৯০নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশার্থ প্রবন্ধ ও বিনিময়ার্থ পত্রিকা প্রভৃতি সম্পাদকের নিকট, সমালোচনার্থ পুস্তকাদি শিক্ষা-পরিচর-সমিতির সম্পাদকের নিকট বাখরগঞ্জ গোয়ালিয়ায় প্রেরিতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের মূল্যাদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট কলিকাতায় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য এবং বিজ্ঞাপনের নিয়ম তথায় জ্ঞাতব্য।

মুল্যপ্রাপ্তি।

(১২৯৬)

৫৬৩ নং বাবু শ্যামাচরণ দাস গুপ্ত ১৲
৩০২ ,, মহারাজা গিরিজানাথ রায় বাহাদুর ১॥৶০
৬৩৩ ,, বাবু শ্যামাচরণ বসু ১॥৶০
২৯৬ ,, ,, কুমুদনাথ খাঁ ১॥৶০
৪২৫ নং বাবু ব্রজগোপাল সেন ১।৶০
২৭ ,, ,, পূর্ণচন্দ্র গুহ ১॥৶০
৪৬ ,, ,, অবন্তীনাথ দত্ত বি, এল, ১॥৶০
৪৭ ,, ,, মহেশচন্দ্র দত্ত উকীল ১॥৶০
২৯ ,, ,, রমেশচন্দ্র ভদ্র ১॥৶০

(১২৯৭)

৩৬৯ নং বাবু উমাকান্ত মৈত্র ॥৶০
৫৬৩ ,, ,, শ্যামাচরণ দাস গুপ্ত ১॥৶০
১০৭ ,, শ্রীমতী সারদামঞ্জরী দত্ত ১॥৶০
২৮২ ,, বাবু হেমচন্দ্র দাস ১॥৶০
৫৪৩ ,, ,, ব্রজগোবিন্দ নন্দী ১৲
৫৬৬ ,, শ্রীযুক্ত জমিরদ্দী সরকার ১॥৶০
২৯৬ ,, বাবু কুমুদনাথ খাঁ ১॥৶০
৪২৫ ,, ,, ব্রজগোপাল সেন ১॥৶০
২৪ নং বাবু হরিচরণ দাস বি, এল, ১॥৶০
২৭ ,, ,, পূর্ণচন্দ্র গুহ ।৶০
৩৫ ,, ,, মহেশচন্দ্র ঘোষ ১॥৶০
৪৬ ,, ,, অবন্তীনাথ দত্ত বি, এল, ১॥৶০
৪৭ ,, ,, মহেশচন্দ্র দত্ত উকীল ১॥৶০
২৯ ,, ,, রমেশচন্দ্র ভদ্র ১॥৶০
৪৪৮ ,, ,, গোবিন্দনারায়ণ সিংহ খাজাঞ্চী ১॥৶০

(১২৯৮)

৩৭৫ নং শ্রীমতী রাণী মনোমোহিনী দেবী ১০৲
১০২ নং বাবু শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী ১॥৶০
২৬২ ,, ,, আনন্দবিহারী বসু ১॥৶০
৩৬৯ ,, ,, উমাকান্ত মৈত্র ১॥৶০
২৫৪ ,, ,, বিপিনবেহারী সাহা ১॥৶০
৫৪৯ ,, ,, প্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ১॥৶০
৬২৭ ,, ,, ক্ষেত্রমোহন দাঁ ১॥৶০
৬৩৬ ,, ,, মুরারিমোহন সাহা ১॥৶০
১৪৭ ,, ,, শরচ্চন্দ্র পুরকায়স্থ ১॥৶০
২৮২ ,, ,, হেমচন্দ্র দাস ।৶০
৫৮৩ ,, ,, চাঁদ মহম্মদ সরকার ॥/০
৪৩৪ ,, ,, মন্মথনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ১।৶০
৪০৭ ,, ,, রাধানাথ মুখোপাধ্যায় ১।৶০
৪৩৬ ,, ,, প্রমথনাথ সেন ১।৶০
৩৮৪ নং বাবু রাধিকাপ্রসাদ সেন ১॥৶০
৩৮৫ ,, ,, রমেশচন্দ্র সেন ১॥৶০
১২৩ ,, ,, রামচরণ বিশ্বাস ১॥৶০
,, ,, শ্রীগোবিন্দ রায় ১॥৶০
২৬১ ,, ,, রামনাথ বিশ্বাস ১॥৶০
৪৩০ ,, ,, শরচ্চন্দ্র মিশ্র ১।৶০
৬ ,, ,, দুর্গাগোবিন্দ চৌধুরী ১॥৶০
৭ ,, ,, হেড্ পণ্ডিত ছাতনী স্কুল ১॥৶০
১৮ ,, ,, রুদ্রচন্দ্র মৌলিক ১॥৶০
৩৩৫ ,, ,, বিপিনবেহারী রায় ১॥৶০
৮ ,, ,, মনীন্দ্রচন্দ্র নন্দী ১॥৶০
২৪ ,, ,, হরিচরণ দাস বি, এল, ১॥৶০
৪৩ ,, ,, মহানন্দ কর ১॥৶০
২৯ ,, ,, রমেশচন্দ্র ভদ্র ১॥৶০

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। | পৌষ ১২৯৮ সাল। | ৯ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

২১

জল-বিম্ব এ সংসার, কিছু হেথা স্থায়ী নাই,
চঞ্চল গমনশীল সকলি দেখিতে পাই।
মাটির শরীর লয়ে মাটির ধরায় থাকি,
ক্ষুধায় তৃষায় খাই মাটিময় অন্ন জল,
দশটি ইন্দ্রিয় সদা মাটির খেলায় রত,
মাটি ছাড়া কিছু নাই, মাটিপূর্ণ চলাচল!
আছি এ মাটির দেশে, দিন দুই পান্থ-বাসে,
অধ্যাত্ম-দেশের যাত্রী অধ্যাত্ম-দেশেই যাব,
মাটির এ ধূলা মলা, মাটির এ পান্থ-বাস
মাটিতে পড়িয়া রবে, মাটি ছাড়ি দিব্য হব।
এই দুদিনের তরে, মাটির এ পান্থ-বাসে,
এত প্রেম, এত শান্তি, এতদূর ভালবাসা,
এত সুখ, এত ভোগ, এত দয়া, এত স্নেহ,
এত জ্ঞান, এত ভক্তি, এত তৃপ্তি, এত আশা?
অমর আত্মার তরে যে দেশে অক্ষয় ধাম,
জননি! সন্তান লাগি সেথা তব কি বিধান?—
কল্পনে! উন্মত্ত হবে, আর না, নিরস্ত হও,
নিরখিলে সে সম্পদ অধীর হইবে প্রাণ।

লিপি-কৌশল।

৩

দোষ-পরিহার। সুনিপুণ চিত্রকর চিত্রপটে বর্ণসংযোগ করিবার পূর্ব্বে চিত্রিত প্রতিকৃতির অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যথাযথ বিন্যস্ত হইয়াছে কি না তাহা বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া থাকেন। চক্ষু কর্ণ যদি প্রকৃত স্থানে অঙ্কিত না হইয়া থাকে, ভ্রূযুগল যদি পরিমাণ মত আকুঞ্চিত না হইয়া অযত্নবিন্যস্ত হইয়া থাকে, ওষ্ঠপুট যদি স্বাভাবিক প্রফুল্লতা-জ্ঞাপক না হইয়া থাকে, তবে সে চিত্রে যেমন করিয়াই বর্ণসংযোগ কর না কেন, তাহা কখনও সুন্দর হইবে না। লিপিকৌশলের পক্ষেও এইরূপ পরীক্ষা আবশ্যক। পদবিন্যাস করিবার সময়ে লালিত্য ও কৌশল বিস্তার করিবার পূর্ব্বে আগে দোষ-পরিহার করা আবশ্যক—সাজাইবার আগে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখা উচিত যে, যাহাকে বহু মূল্য বসন ভূষণে সাজাইতেছি, তাহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গে কোন স্থানে কোন রূপ অসঙ্গতি থাকিল কি না। দোষপরিহারের দিকে দৃষ্টি না থাকায় অনেক সুললিত পদাবলীও এরূপ বিকৃত হইয়া উঠে যে, তাহা পাঠ করিবার সময়ে সকলেরই ক্লেশবোধ হইয়া থাকে। লেখক নিজেই হয়ত যে সকল দোষ সংশোধন করিতে পারিতেন, উপযুক্ত আলোচনার অভাবে তাহাও পরিত্যক্ত হয় নাই—এরূপ দৃষ্টান্ত বঙ্গসাহিত্যে বড়ই অধিক। সংস্কৃত সাহিত্যে অলঙ্কার দোষ, শ্রুতিকটু দোষ, [illegible] অধিক অনেকগুলি দোষ সময়ে সময়ে লক্ষিত হইলেও ব্যাকরণ দোষ কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। ইংরাজি সাহিত্যেও ব্যাকরণ দোষ বড়ই বিরল। কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যে ব্যাকরণ দোষই সর্ব্ব প্রধান। ইহার অন্যবিধ অনেক কারণ থাকিতে পারে, কিন্তু বঙ্গীয় লেখকগণের অমনোযোগও কিয়ৎ-পরিমাণে এই গুরুতর দোষের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙ্গালা সাহিত্য সমালোচনা করিতে বসিয়া পদে পদে এই শ্রেণীর দোষ দর্শন করিয়া আমাদের মনে অনেক আশ-ঙ্কার উদয় হয়—মনে হয় বুঝি বা উপযুক্ত আলোচনার অভাবে দোষগুলি কালক্রমে ভাষার সঙ্গে একেবারে মিশিয়া যাইবে! লিপিকৌশল অভ্যাস করিবার পূর্ব্বে ব্যাকরণ ও অলঙ্কারশাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি থাকা প্রয়োজন, কিন্তু কার্য্যকালে বঙ্গসাহিত্য-সেবকগণ সে পরিচয় অল্পই প্রদান করিতেছেন।

দোষ অনেক শ্রেণীর—তন্মধ্যে ব্যাকরণ-দোষ, শব্দনির্ব্বাচনদোষ, পদবিন্যাসদোষ, বর্ণনাদোষ, অলঙ্কারদোষ এবং ভাববিন্যাস-দোষই প্রধান। এই সকল দোষের মধ্যে প্রথম তিনটি লিপিকৌশল বিনাশ করে, চতুর্থটি তাহাকে বিকৃত করে, এবং শেষোক্ত দুইটি তেজস্বিতা ধ্বংস করিয়া লেখকের সমু-দায় শ্রম বিফল করিয়া থাকে। আমরা এই সকল দোষগুলি সাধ্যানুসারে পরিত্যাগ করিবার জন্য সকলকেই অনুরোধ করি—ইহাতে সাহিত্যের কলঙ্ক, ভাষার নিন্দা!

ব্যাকরণ-দোষ। শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করিতে পারিলেই হইল না, তাহা বিশেষ নিয়মানুসারে সমাধান করা আবশ্যক। ব্যাকরণ সেই সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করে। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, সম্প্রদান, অপাদান, সম্বন্ধ, অধিকরণ এবং সম্বোধন অনুসারে বাঙ্গালা ভাষা কতকগুলি নিয়মের অধীন হইয়াছে। সেই সকল নিয়মানুসারে কর্ত্তার সঙ্গে ক্রিয়ার সংযোগ, ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ম্মের সম্বন্ধ, বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের সঙ্গতি বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন, তাহা না থাকিলে বাঙ্গালা ভাষা লিখিত হইতে পারে না। যেরূপ ভাষাকে "সাহেবী বাঙ্গালা" বলিয়া সকলেই উপহাস করিয়া থাকেন, সেরূপ ভাষার দোষ এই যে তাহাতে কর্ত্তার সঙ্গে ক্রিয়ার, বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের, ক্রিয়ার সঙ্গে কর্ম্মের প্রায়ই কোনরূপ সংস্রব থাকে না। সাহেবেরা বিদেশী, তাঁহারা সহজে পরভাষা শিখিতে পারেন না, এবং সম্পূর্ণ না শিখিয়াই পরভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হন; সেই জন্যই তাঁহারা 'আমি করি' বলিবার সময়ে 'আমি করে' বা 'আমি করিল' বলিয়া থাকেন। ইহা তাঁহাদের পক্ষে মার্জ্জনায়, কিন্তু বাঙ্গালীর পক্ষে, বাঙ্গালা সাহিত্য-লেখকের পক্ষে এই সকল ব্যাকরণদোষ মার্জ্জনীয় হইতে পারে না। পাঠকগণের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য সাময়িক সাহিত্য হইতে কতকগুলি দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিতেছি;—

"ব্রাহ্মণদিগকে ভোজন করিয়া পরিতোষ করেন।"—বেদব্যাস ১৭৭পৃ অগ্রহায়ণ ১২৯৬।

"গত সপ্তাহে আমরা উমেশ বাবুর প্রস্তাবানুসারে কংগ্রেসে প্রতিনিধি প্রেরণ প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ জন্য ভদ্রমহোদয়গণকে নির্দ্দিষ্ট স্থানে সমবেত হওয়ার জন্য সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল।"—সম্মিলনী ১৪ পৃ ৫ অগ্রহায়ণ ১২৯৬।

"কিন্তু নানা কারণে তাঁহার নিকট হইতে আমরা কাড়িয়া আনিয়া স্কুলটি শ্রীমতী বিন্দুবাসিনী চৌধুরাণীকে দেওয়া হইল।"—চারুবার্ত্তা ৩৩৪ পৃ ৪ অগ্রহায়ণ ১২৯৬।

"প্রাণ লইয়া সকলেই নিতান্ত অস্থির হইতে হইল।"—অনুসন্ধান ১৭৩পৃ ১৫।৮।৯৬।

"সাংখ্যদর্শনকে তোমাকে ধর্ম্ম বলিয়া গ্রহণ করিতে বলিতেছি না।"—বঙ্কিম বাবুর ধর্ম্মতত্ত্ব ১১ পৃঃ।

"চারিজনকে সর্পাঘাত হইয়াছিল।"—প্রজাবন্ধু ১২ আশ্বিন ১২৯৬।

কর্ত্তা কর্ম্ম ও ক্রিয়া লইয়াই যে সর্ব্বদা ভ্রম হইয়া থাকে তাহা নহে। অনেক সময়ে বিশেষ্য ও বিশেষণ লইয়া যে সকল গুরুতর ভ্রম প্রমাদ সংঘটিত হয়, তাহা বড়ই গ্লানিজনক। বাঙ্গালা ভাষায় সকল সময়ে বিশেষ্যের লিঙ্গ ও বচন অনুসারে বিশেষণ ব্যবহার করার নিয়ম নাই—বহুদিনের ব্যবহার দোষে ইহা এক্ষণে আর দোষ বলিয়া গৃহীত হয় না। সুতরাং এক্ষণে অনেক স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষ্যের সহিত পুম্বাচক বিশেষণ সংযুক্ত হইতেছে—সংস্কৃত সাহিত্যে তাহা ব্যাকরণদোষ বলিয়া নিন্দিত হইলেও বাঙ্গালাসাহিত্যে নিন্দিত হইতেছে না। এই শ্রেণীর দোষের বিরুদ্ধে আমরা খড়্গহস্ত হইতে চাহি না। কিন্তু যেখানেই একটু সরস পদলালিত্য বিস্তারের ইচ্ছা, বাঙ্গালী লেখক সেখানেই পুম্বাচক বিশেষ্যের সঙ্গে স্ত্রীলিঙ্গের বিশেষণ

সংযুক্ত করিতেছেন—ইহা বড়ই লজ্জার কথা। এই দোষ এত প্রবল যে অধিকাংশ লেখক ইহাতে লিপ্ত রহিয়াছেন। আমরা কয়েকটি মাত্র উদাহরণ তুলিয়া দিলাম, পাঠক ইচ্ছা করিলে ইহার শত শত উদাহরণ বাহির করিতে পারিবেন ;—

(১) "পুরাকালে শিল্প চিত্র প্রভৃতির উন্নতিবিধায়িনী গ্রীসদেশে।"—ধর্ম্মবন্ধু ২০৮পৃ ১২৯৬।

(২) "প্রসন্নসলিলা বিস্তীর্ণ সরোবর।"—ধর্ম্মবন্ধু ২৪৫ পৃ ১২৯৬।

(৩) "দিল্লীর বাদশাহের নামের মোহিনী আছে।"—সাবিত্রী ২ পৃ।

(৪) "দৃশ্যটি অতিশয় হৃদয়োন্মত্তকরী হইয়াছিল।"—চারুবার্ত্তা ৪০০ পৃ ১৬-৯-৯৬।

(৫) "কবিতাময়ী রাজ্যে থাকিয়াও কবিতার সেই হৃদয় প্রফুল্লকরী সুর তুলিয়া।"—কর্ণধার ২১০ পৃ ১২৯৬।

(৬) "আমাদিগের উল্লিখিত মহান্ তত্ত্ব সকল।"—নব্যভারত ৫৬৯ পৃ ১২৯৭।

বিশেষ্য বিশেষণের গোলযোগ বড়ই অধিক, এবং "মহৎ" শব্দের ন্যায় আরও কতকগুলি শব্দই তাহার প্রধান কারণ। শব্দগুলি শ্রুতিপ্রসাদন বলিয়া তাহাদিগকে কেহই পরিত্যাগ করিতে চাহেন না, অথচ তাহাদের ব্যবহার-বিভ্রাটে শ্রুতিসুখও উৎপন্ন হয় না! "মহৎ" শব্দ বাঙ্গালা ভাষাতেও লিঙ্গভেদে ব্যবহৃত হইয়া থাকে; সুতরাং (৬) উদাহরণে "মহৎ তত্ত্ব" না লিখিয়া "মহান্ তত্ত্ব" লিখায় দুইটি ভুল হইয়াছে—মহৎকে মহান্ করা হইয়াছে, এবং নিত্য-ক্লীবলিঙ্গ শব্দকে পুংলিঙ্গ করিয়া নূতন অভিধানের সৃষ্টি করা হইয়াছে। অন্যান্য উদাহরণগুলির ব্যাকরণদোষ এরূপ সুস্পষ্ট যে তাহার সমধিক আলোচনার প্রয়োজন নাই। এই সকল লেখকগণ পদলালিত্য বিস্তার করিবার পূর্ব্বে একবার যদি শব্দবিন্যাসের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেন, তাহা হইলে এরূপ "সাহেবী বাঙ্গালা" বাহির হইতে পারিত না!!

শব্দনির্ব্বাচন দোষ। ইহাও ব্যাকরণদোষের অন্তর্গত—লেখকগণ সময়ে সময়ে যে সকল নূতন শব্দ সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যে সকল অসংলগ্ন শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন, এবং যে সকল অজ্ঞাতপূর্ব্ব পদ প্রয়োগ করিয়া থাকেন, তাহাতে ব্যাকরণ এবং শব্দশাস্ত্র উভয়েই তুল্যরূপে উৎপীড়িত হইয়া থাকে। আমরা স্থানাভাব বশতঃ এই শ্রেণীর অল্প কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত করিলাম, ইহার উদাহরণ অন্বেষণ করিতে অধিক ক্লেশ পাইতে হয় না ;—

"একে পূর্ব্বকার ন্যায় শস্য জন্মায় না, তাহাতে যাহা জন্মে তাহাও বিদেশে যায়।"—চারুবার্ত্তা ৪০০ পৃ ১২৯৬।

এখানে "শস্য" কর্ত্তা, অথচ নিজন্ত 'জন্মায়' ক্রিয়া ব্যবহৃত হইয়াছে; 'জন্মায়' শব্দের পরিবর্ত্তে 'জন্মে' শব্দ ব্যবহার করিলে শব্দনির্ব্বাচন দোষ জন্মিতে পারিত না! শ্রীযুক্ত কালীবর বেদান্তবাগীশ মহাশয় ৪র্থ খণ্ড প্রচারে ৪০৮ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন ;—

"মানুষ দেশভেদে ও কালভেদে আপনার আচর্ত্তব্য বিষয় ভিন্ন ও উপযুক্ত করিয়া লইতে পারে।"

এই উদাহরণে 'আচর্ত্তব্য' কথাটি কোন

ভাষার কোন্ ব্যাকরণ সম্মত পাঠ, তাহা কেহ বলিতে পারেন কি? 'আচরিতব্য' শব্দ ব্যবহার করিলে নূতন শব্দ সৃষ্টি করিতে হইত না। সৃষ্টিকৌশল বিস্তার করিবার নিতান্ত প্রয়োজন থাকিলেও 'আচর্ত্তব্য' শব্দের সৃষ্টি অসহনীয়।

"মন জড় বা অজড় হউক, জড় শরীরের উপর মনের কর্তৃত্ব অতীব।"—নব্যভারত ৭ খণ্ড ৩১৩ পৃ। এখানে 'অতীব' কথার আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই, সঙ্গে সঙ্গে ব্যাকরণ-দোষও উপস্থিত হইয়াছে।

"বঙ্গভাষার উপর তাঁহার সম্পূর্ণ আয়ত্ব, এবং সমাজ গঠনেও তিনি বিলক্ষণ পটু।" নব্যভারত ৫৬৯ পৃ. ১২৯৭। এখানে 'আয়ত্ব' শব্দ যেরূপ ভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা বিস্ময়জনক! আ + যত + কর্ম্মবাচ্যে ক্ত প্রত্যয় করিলে "আয়ত্ত" শব্দ নিষ্পন্ন হয়, উহার অর্থ "অধীন" বা "বশীভূত"। এ স্থলে "ব-ফলা" দিবার প্রয়োজনাভাব। এই শব্দ 'বল' অথবা 'অধিকার' শব্দের ন্যায় বিশেষ্যরূপে ব্যবহার করিয়া লেখক অদ্ভুত শব্দ নির্ব্বাচনের পরিচয় দিয়াছেন। কোন কোন লেখক আবার 'আয়ত্বাধীন' লিখিয়া থাকেন—'অধীন-অধীন' বলিলে যেমন হয়, ইহাও কি সেইরূপ নহে? উদাহরণ নব্য-ভারতেই পাইবেন;—

"অতি অল্পকাল মধ্যেই গুরু মহাশয়ের আয়ত্তাধীন যাবতীয় বিষয় শিক্ষা করিয়া ফেলিলেন।"—নব্যভারত ৫০৬ পৃ ১২৯৭।

'পদবিন্যাস দোষ। শব্দনির্ব্বাচনের ন্যায় পদবিন্যাস কালেও দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য, নচেৎ পদবিন্যাস দোষেও লিপি-কৌশল বিনষ্ট হইতে পারে। অনেকে শব্দ-কৌশলের সঙ্গে পদ-লালিত্য বিস্তার করিতে গিয়া যে সকল পদবিন্যাস দোষে লিপ্ত হই-তেছেন, তাহাতে বাঙ্গালা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি হইতেছে না। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাঙ্গালা সাহিত্যের অঙ্গপুষ্টির জন্য যেরূপ অধ্যবসায় ও শ্রমসহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছেন, বাঙ্গালা সাহিত্য চিরদিনই তাহার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিবে। কিন্তু বঙ্কিম বাবুও সময়ে সময়ে যে সকল অদ্ভুত পদবিন্যাসের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহাতে বঙ্গ-সাহিত্য অলঙ্কৃত হইতেছে কি কলঙ্কিত হইতেছে তাহা কে বলিতে পারে? তিনি স্বরচিত 'ধর্ম্মতত্ত্বে' লিখিয়াছেন;—

"অপ্সরো কণ্ঠনিনাদ মধুরিত।"

কথাটি শুনিতে বড়ই মিষ্ট, সেই মিষ্টতায় মুগ্ধ হইয়া অনেকেই ইহার দোষগুণ বিচার করিতে চাহেন না—আমরা দোষ পরিহার কালে মিষ্টতার অনুরোধে এরূপ দোষ সঞ্চয় করিবার পরামর্শ দিতে পারি না! অপ্সরস্ শব্দ বিসর্গান্ত, ইহা মনে করিয়াই বোধ হয় বঙ্কিম বাবু 'অপ্সরোকণ্ঠ' লিখিয়াছেন, কিন্তু বিসর্গের পর 'ক' থাকিলে যে এবম্বিধ সন্ধি হইতে পারে না, তাহা বিস্মৃত হইয়া-ছেন। সেই 'অপ্সরোকণ্ঠে' বঙ্কিম বাবু 'নিনাদ' শব্দ সংযোগ করিয়া 'মধুরিত' করি-বার চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু অভিধান, শব্দ-শাস্ত্র ও প্রাচীন সাহিত্যে 'রথনির্ঘোষাদি' কর্কশ শব্দ বুঝাইবার জন্য "নাদ, নিনদ, নিনাদ" প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। "নিনাদ" কথাটিতে লালিত্য থাকিতে পারে, কিন্তু 'নিনাদ' বস্তুতে বরং ভীতিই প্রকাশ

করে! এইরূপ পদবিন্যাস দোষ সর্ব্বদা পরিহার করা আবশ্যক, ইহাতে যে লিপি-কৌশল প্রকাশিত হয় তাহার নাম লিপি-কৌশল নহে—ইহা বঙ্গসাহিত্যের কলঙ্ক!

আমাদের ভবিষ্যৎ আশা।

আশার বীণা-স্বননে যাঁহার হৃদয় মুগ্ধ হয় নাই, তিনি মূর্ত্তিমান মরুভূমি। উহাতে বহুদূর-ব্যাপী উত্তপ্ত বালুকা-রাশি ধূ ধূ করিতেছে, শ্যামল-পত্র-পরিশোভিত বৃক্ষরাজি উদ্ভিন্ন হইয়া উহার দৃশ্য সরস ও চিত্তমুগ্ধকর করিতে পারিতেছে না। অনতিবিস্তৃত সরিৎ সমূহ কল্ কল্ স্বরে ঐ বিজন প্রদেশের নিস্তব্ধতা বিনাশ করিয়া উহার দৃশ্যকে আকর্ষণী শক্তি প্রদান করিতে পারিতেছে না। বাস্তবিক আশা-বিরহিত জীবন, আর জীবন্মৃতের অবস্থা একই। পৃথিবীতে বিমল আনন্দ উপভোগের নানাবিধ সামগ্রী থাকিলেও একমাত্র নৈরাশ্যই মনুষ্য-জীবনকে অনাকাঙ্ক্ষনীয় করিয়া তুলে। মানব-জীবন এমন ঘটনা-বৈচিত্র-পরিপূর্ণ যে, আজ যাঁহার রাজ-শক্তির নিকটে সকলে অবনত, দুদিন পরে আবার তাঁহাকেই প্রজারূপে অপর রাজ-শক্তির সম্মুখে মস্তক অবনত করিতে হইতেছে। আজ যিনি অপরের হৃদয় হইতে শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন, অচিরেই হয়ত তিনি আবার স্বার্থব্যাঘাতক্ষুব্ধ লোকের ঘৃণা ও বিদ্বেষ-ভাজন হইতেছেন। এই নিত্যপরিবর্ত্তনশীল জগতে এমন কি নির্দ্দিষ্ট কেন্দ্র আছে, যেখানে বসিয়া মনুষ্য নানাবিধ দুর্ঘটনার মধ্যেও অনাকুল থাকিতে পারে?

সংসার-সংগ্রামে আশাই একমাত্র সুদৃঢ় দুর্গ। যিনি চেষ্টা করিয়া সাহসের সহিত ঐ অভেদ্য দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারেন, তিনি অজেয়। তাঁহার জয়-লাভ অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু সকলেই কি এ কার্য্যে সফলকাম হইতে পারে? তাহা কখনই নহে। যাঁহার আত্মশক্তি বিদ্যমান আছে এবং তাহাতে স্থির-প্রত্যয় আছে, তিনিই আশা-দুর্গের একমাত্র অধিকারী। মনুষ্য যখন প্রতিকার্য্যে অকৃতকার্য্যতা, প্রতি অভ্যুত্থানেই পতন দেখিয়া আত্মশক্তিতে অবিশ্বাসী হয়, এবং আপনার অসারতা বহুদূর কল্পনা করিয়া একেবারে দমিয়া পড়ে, আশারূপ ক্ষীণবর্ত্তিকাই তখন তাহাকে অন্ধকারের মধ্যে পথ দেখাইয়া দেয়, এবং অধ্যবসায়-প্রহরীর সাহায্যে সে তখন আরও অনেক দূর অগ্রবর্ত্তী হইতে পারে। প্রতিকূল ঘটনাবলী যুগপৎ উপস্থিত হইলে একমাত্র আশাই সমস্যা ভাঙ্গিয়া দেয়, এবং অধ্যবসায় তাহার অনুগমন করিয়া গন্তব্যস্থল পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দেয়। দেখিতে গেলে চন্দ্রমা-বিরহিত রজনী আর আশাহীন মনুষ্য-জীবন একই কথা। উহাতে কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি কুসুম-নিচয় রহিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদিগের প্রফুল্লতায় মনোহারিতা নাই, এবং আকর্ষণকারিণী শক্তিও নাই।

সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে প্রকৃতির গতি পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই যে, তিনি আপনার কার্য্য আপনি করিতেছেন, কাহারও দৃষ্টি কিম্বা সমালোচনার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন না। তাঁহার উন্নতিতে তুমি আনন্দিত হও আর নাই হও, তাহাতে তাঁহার কোন ইষ্টাপত্তি নাই। তাঁহার ক্রীড়া তুমি বুঝিতে পার আর নাই পার, তজ্জন্য তিনি কার্য্য হইতে বিরত হইবেন না। তুমি অনুভব করিতে পার আর নাই পার, তিনি প্রবল গতিতে অগ্রগামিনী হইয়া আপনার স্বরূপ বা রহস্য তোমার নিকট প্রকাশ করিতেছেন। প্রকৃতির এই অত্যাশ্চর্য্য লীলা বুঝিতে চেষ্টা কর, এবং সর্ব্বপ্রকার বিষণ্ণতা, অনুদ্যমতা ও স্ফূর্ত্তিহীনতা পরিত্যাগ করিয়া আশানুপ্রাণিত চিত্তে বিমল আনন্দ উপভোগ করিতে চেষ্টা কর।

আজ কালের এই বিষম রাজনৈতিক এবং ধর্ম্মনৈতিক আন্দোলনের দিনে অনেকেরই লেখায় নৈরাশ্যব্যঞ্জক দীর্ঘ নিশ্বাসের আভাস পাওয়া যায়। তাঁহারা যেন সর্ব্ববিষয়েই ভারতের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া অস্থির হইয়াছেন, এবং শান্তির কোমলকরস্পর্শে বঞ্চিত হইয়াছেন। তাঁহারা প্রকৃতির প্রত্যেক পরিবর্ত্তনে যেন বজ্রাহতপ্রায় হইতেছেন, এবং অবশেষে পরিবর্ত্তন মাত্রকেই দোষাবহ মনে করিয়া অপরিবর্ত্তনের মধ্যে থাকিতেই শান্তি অনুভব করিতেছেন।

ভারতে যখন সুখের দিন ছিল, যখন হিন্দু আপনার গৃহে আপনি রাজত্ব করিতেছিল, সে দিনের কথা ভাবিলে কোন হৃদয়বান ব্যক্তিই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন না। তখন সভ্যতার প্রত্যেক অঙ্গই বিদ্যমান ছিল। সভ্যতা-গর্ব্বিত ইংরেজ আজ যে ভূমণ্ডলের প্রত্যেক জাতির উপর আধিপত্য করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহারাও এ হতভাগ্য ভারতের নিকট ঋণী। ভারত-প্রবাসী ইংরেজ পুঙ্গবগণ এ কথা স্বীকার করুন বা না করুন, ইউরোপীয় সমাজের শীর্ষস্থানীয়গণ একথার সত্যতা সম্বন্ধে অণুমাত্রও সন্দেহ করেন না।

পূর্ব্ব গৌরব-স্মৃতিতে বাস্তবিকই মনুষ্যের আনন্দ হয়; যাহার হৃদয় এ আনন্দ উপভোগ করিতে অসমর্থ, তাহাকে হৃদয়হীন না বলিয়া আর কি বলিতে পারি? কিন্তু যদি কেবল পূর্ব্ব-পুরুষ-গৌরবেই আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করি, অথচ আমার নিজস্ব কিছুই না থাকে, তবে আমি একান্ত দরিদ্র। যাহারা পরের গুণে আপনাদিগকে গুণবান্ এবং পরের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত মনে করে, তাহাদিগের অপেক্ষা আর অধিক প্রতারিত কে? বর্ত্তমান সমাজে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা কেবল পূর্ব্ব পুরুষগণের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত ও সম্মানিত মনে করে, কিন্তু এখন যে সে গৌরবের স্বপ্ন পর্য্যন্তও তিরোহিত হইয়াছে, তাহা ভ্রমেও একবার ভাবিয়া দেখেনা।

হিন্দু-সূর্য্য অস্তমিত হইলে ইস্লাম-রজনী যখন ভারতে গাঢ়রূপে আপনার প্রভাব বিস্তার করিল, তখন হইতেই ভারতের সৌভাগ্য নির্ব্বাসিত। তখন ভারতে এক বিষম পরিবর্ত্তন। এ পরিবর্ত্তনকে আমরা যুগান্তর বলিতে পারি। আর সে সিন্ধু-ভাগীরথী-তীরবর্ত্তী পূজ্যপাদ ঋষিগণের পবিত্র ও শান্তি-

মন্ন পর্ণ-কুটীর নাই, হিংসা-দ্বেষ-পরিশূন্য শান্তি-নিকেতন পুণ্যাশ্রম-সমূহ আজ অন্তর্হিত। ঋষি-কুলের পরিবর্ত্তে শ্মশ্রু-শোভিত মোল্লাগণ তস্‌বিহস্তে ঈশ্বরোপাসনা করিতেছে, আর আশ্রমের পরিবর্ত্তে মস্‌জিদ-সমূহ আকাশ-পথে মস্তক উত্তোলন করিতেছে। রাজা, প্রজার আর পিতৃপুত্র সম্বন্ধ নাই। "দিল্লীশ্বরো' বা জগদীশ্বরো বা" চতুর্দ্দিকে গীত হইতেছে। এইরূপ সর্ব্বতোমুখী পরিবর্ত্তন ভারতের রূপান্তর বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই পরিবর্ত্তন আবার কয়দিন স্থির রহিল? দেখিতে দেখিতে আর এক বিষম পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়িল। অনতিদীর্ঘ মুসলমান-যামিনী শেষ হইলে, ইংরেজ-সূর্য্য উদিত হইয়া যখন তীব্র কিরণ-জালে ভারত-চক্ষু ঝলসিত করিতে লাগিল, তখন আমরা চাহিয়া দেখি আমাদের আর কিছুই নাই। এতকাল অন্ধকারে কি হইয়াছিল, কিছুই দেখিতে পাই নাই। যেই সূর্য্য উদিত হইল, অমনি দেখি আমরা হৃতসর্ব্বস্ব ফকির। চাহিয়া দেখি, জাতি-বৃক্ষের কোন কোন শাখা একটুকু জীবন্ত বলিয়া বোধ হইতেছে বটে, কিন্তু অধিকাংশ শাখাই শুষ্কপ্রায়। ইংরেজ-জাতির জল-সিঞ্চনেই যে এই সকল শুষ্কশাখা পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিতেছে, এ কথা অস্বীকার করিলে আমরা একান্তই অকৃতজ্ঞ। স্বীকার করি, আমরা এক সময়ে অতিশয় দীপ্তিমান ছিলাম; কিন্তু বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বে আমাদের সে দীপ্তির কতটুকু বর্ত্তমান ছিল? তুমি আর্য্য বলিয়া কত গৌরব করিতেছ, কিন্তু আর্য্য বলিয়া গৌরব করিবার সরঞ্জামগুলি যত্নপূর্ব্বক কে রক্ষা করিতেছে? মুসলমান-শাসনের পর আর্য্য জাতির কীর্ত্তিকলাপ একবার ডুবিয়া, আরবার ভাসিয়া, অর্দ্ধমৃতপ্রায় হইয়াছিল। তখন কে হাত ধরিয়া উঠাইয়া উদর হইতে জলনিষ্কাশন পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহাদিগকে সঞ্জীবিত করিয়াছে? তুমি আর্য্য, গৌরব করিতেছ, জগতে তোমার ভাষা অতুলনীয়; কিন্তু তোমার ভাষা যে অতুলনীয়, তাহা তোমাকে বুঝিবার শক্তি দিয়াছে কে? তুমি কি জান না বর্ত্তমান সময়ের পূর্ব্বে তোমার ভাষা দেব-ভাষা বলিয়া পরিগণিত ছিল? সাধারণের বোধাতীত বলিয়া, যৎসামান্য ভাষাজ্ঞান লাভ করিয়া, পণ্ডিতোপাধিধারী দু চারিজন লোক কেমন গর্ব্ব করিত। তখন তুমি জানিতে তোমার ভাষা দুর্ব্বোধ্য। চিকিৎসা-শাস্ত্র, জ্যোতিষ-শাস্ত্র, সঙ্গীত-শাস্ত্র প্রভৃতি কতকগুলি শাস্ত্রের জন্য ইংরেজ তোমাদের নিকট ঋণী, তুমি এই কথা গাহিয়া ফিরিতেছ, আর ইংরেজ-জাতিকে কত নীচ মনে করিতেছ। কিন্তু সে আনন্দে তুমি স্ফীত হইবার কে? সে আনন্দে তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণেরই অধিকার। বরং ইংরেজ-জাতি তোমার পূর্ব্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ সংগ্রহ করিয়া, এবং তোমাদের বিদ্যায় বিদ্যাবান্ হইয়া যে তোমাদিগকে বিদ্যাদানে জ্ঞানী করিতেছে, তজ্জন্য তাহাদিগের মহত্ত্বের নিকট অবনত-মস্তক হইয়া অভিবাদন করা উচিত। অধমবংশে মহান্ জন্মধারণ করিলে, বংশ-দোষজন্য মহান্ উপেক্ষনীয় নয়, মহদ্বংশে অধমের জন্মই ঘৃণার্হ। এইরূপ আজকাল যে সকল পরিবর্ত্তন দেখিতেছ, উহার কর্ত্তা ইংরেজ-জাতি নহে। ইংরেজ-জাতি প্রকৃতির সাহায্যকারী

মাত্র। যাহা প্রকৃতির আদেশে সংঘটিত হইতেছে, তাহার শুভত্বে সন্দিহান হইবার কারণ নাই। তাই বলিতেছি, শুভদিন পুনর্ব্বার আসিবে বলিয়া আশানুপ্রাণিত হওয়া উচিত।

রজনী প্রভাত হইলে যখন জগৎ আলোকের আভাস পাইতে থাকে, তখন কি এ কথা অনুমান করা অলৌক্তিক যে, ক্ষণকাল পরেই সূর্য্য উদিত হইয়া সমস্ত জগৎ উদ্ভাসিত করিবে? তবে আর রাজ-নৈতিক ও ধর্ম্ম-নৈতিক জগতের দিকে চাহিলে আশান্বিত না হইবার কারণ কি? আমাদের কোন কোন পাঠক হয়ত একথায় বলিয়া উঠিবেন, "সর্ব্বৈব মিথ্যা"! তাঁহাদিগের উত্তরে আমরা এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, ধর্ম্ম যদি বাহ্যানুষ্ঠান-প্রাণ হয়, তবে তাঁহাদের নিরাশ হইবার কারণ আছে। আর ধর্ম্ম যদি মনুষ্যের প্রাণের সম্পত্তি হয়, তবে তাঁহাদের নৈরাশ্য ভ্রান্তি-মূলক। রাজনৈতিক বায়ুও যে এইক্ষণ অন্যদিক্ হইতে বহিতেছে, একথা বোধ হয় শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই স্বীকার করিবেন; এবং এ বায়ু যে অতিশয় স্বাস্থ্যকর, তাহাতেও বোধ হয় কাহারও সন্দেহ নাই।

যেদেশে রাজা ও প্রজার সম্বন্ধ শাসক ও শাসনীয়, সে দেশের জাতি-প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। বহুকোটি নরনারীর শান্তি যদি কেবল একটি মাত্র বুদ্ধি ও বিবেচনার উপর নির্ভর করে, তাহাতে অনেক সময় শাসনের অপব্যবহার হয়। হিন্দু-রাজত্বে রাজনীতির সহিত ধর্ম্মনীতির ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল বলিয়া ধর্ম্মের শাসনে অবিচার অল্প হইয়াছে। কিন্তু মুসলমান-রাজত্বের রাজনৈতিক অবস্থার কথা ভাবিলে, আপনাদিগের প্রতি এক প্রকার ঘৃণার উদ্রেক হয়।* কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে রাজনৈতিক আকাশের দিকে চাহিলে কি মনে মনে একটুকু আশার সঞ্চার হয় না? আমাদের পাঠকদিগের মধ্যে যিনি একটুকু অধীর-প্রকৃতি এবং যাঁহার আকাঙ্ক্ষা অতর্পণীয়, তিনি হয়ত বলিবেন, "আকাশ ক্রমেই অন্ধকারময় হইতেছে।" সময়ের অল্পতা বিবেচনা করিলে অধিকার-লাভ কি আমাদের কম হইয়াছে? আর কিছুকাল অপেক্ষা করিলে দেখিতে পাইব আমরা কতদূর অগ্রসর হইয়াছি। যখন রাজার বিচারে কথা কহিলে প্রাণবায়ু হইতে বঞ্চিত হইতে হইত, তখন আমাদের কোনও কষ্টের কারণ ছিল না। আর আজ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়াও রাজবিচারের প্রতিকূল সমালোচনা করিয়া কেশটি পর্য্যন্ত স্পৃষ্ট হইবে বলিয়া আশঙ্কা

"——আরাঙ্গীব ছিল যদি, ছিল না কি বাবর আকবর?" কবির এই সুন্দর কথাটি লেখক বোধ হয় ভুলিয়াছেন। ভাল লোকের সংখ্যা চিরদিনই কম; ইংরাজ-রাজত্বেও আমরা ইচ্ছা করিলেই ক্যানিং বা রীপণের মত শাসনকর্ত্তা পাই না। অবিচার অত্যাচারের কথার উল্লেখ না করাই আপাততঃ ভাল; যদি কখন হিন্দুর মুখে হিন্দুর এবং মুসলমানের মুখে মুসলমানের ইতিহাস শুনিতে পাও, তখন ইচ্ছা হয় তুলনায় সমালোচন করিও। যেমন একজাতি অন্য জাতিকে স্বাধীন করিতে পারে না, সেইরূপ একজাতি অন্য জাতীর ইতিহাস লিখিতে পারে না। এখন হিন্দু বা মুসলমানের যে সকল ইতিহাস দেখিতেছ, তাহা ইংরাজের কথা।

শিঃ পঃ সঃ।

করিতেছি না। এতদূর উন্নমিত হইয়াও যদি অসন্তুষ্ট থাকিতে হয়, তবে শান্তি আমাদিগকে চিরকালের নিমিত্ত পরিত্যাগ করিবে। পাঁচশত বৎসরের মধ্যে যাহা কল্পনায়ও আসে নাই, দেড়শত বৎসরের মধ্যে তাহা কার্য্যে পরিণত হইয়াছে। ইহা অপেক্ষা আর সৌভাগ্যের বিষয় কি হইতে পারে? তবে অমিশ্র সুখ কোথায় মিলিবে? শারদ চন্দ্রিমাও কখন কখন জলদাবৃত হয়, আবার পরমুহূর্ত্তেই উহার মেঘ যায়।

সামাজিক বিষয় সম্বন্ধে কিছু বলিতে আশঙ্কা হয়। কারণ শাস্ত্রানুসারে হিন্দুর যদিও ধর্ম্মই প্রধান লক্ষ্য, কার্য্যতঃ কিন্তু সামাজিক আচার-ব্যবহারের দিকে অধিক দৃষ্টি দেখিতে পাওয়া যায়। প্রচলিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দুই একটি কথা বলিতে সাহস হইলেও সমাজের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে সাহস হয় না। কিন্তু পাঠকগণ বিরক্ত হইলেও এ সম্বন্ধে কিছু না বলিয়া থাকিতে পারি না। যখন আমরা সভ্যতালোকে আলোকিত ছিলাম, যখন ধর্ম্ম, আচার, রাজত্ব সকলই আমাদের ছিল; বিজাতীয় প্রভাবে যখন আমাদের কিছুরই পরিবর্ত্তন ঘটে নাই, তখন আমাদের সকলই স্বর্গীয় ছিল। তখন আমরা জগতের চক্ষে পূজিত ছিলাম। কিন্তু কালের গতিতে যখন ঐ কুসুম-রাশিতে পরিবর্ত্তন-কীট প্রবেশ করিতে লাগিল, তখন সর্ব্বপ্রথম মহাত্মা বুদ্ধদেবের আবির্ভাব। কিন্তু মনুষ্য এমনই ক্ষমতাপ্রিয় যে, সত্যের অপলাপ করিয়াও তাহারা আপনাদের প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে ক্ষান্ত হয় না। তাই মহাত্মা বুদ্ধদেবের চিন্তার ফল এদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইতে লাগিল কিন্তু সে কালের প্রভাব এখনও সমাজের শিরায় শিরায় বিচরণ করিতেছে, এবং বর্ত্তমান সমাজ-দেহের দৃঢ়তা কেবল উহারই গুণে রক্ষিত হইতেছে।

আজকাল যখন বৈদেশিক কোন কোন উৎকৃষ্ট আচারের সহিত স্বদেশীয় কোন অপকৃষ্ট আচারের তুলনা করিয়া স্বদেশকে ঘৃণা করিতে শিখি, আবার কিছুকাল পরেই যখন দেখিতে পাই যে, ঐ প্রকার বৈদেশিক উৎকৃষ্ট আচার এক সময়ে আমাদের মধ্যেও বর্ত্তমান ছিল, তখন মনে মনে বাস্তবিকই ক্ষোভ উপস্থিত হয়। এবং যে সকল ক্ষুদ্রমনাঃ লোকদিগের দ্বারা ঐ সকল আচার স্বদেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছে, তাহাদিগের প্রতি বিষম ঘৃণা ও বিদ্বেষ জন্মে। কিন্তু আজকাল যখন আবার দেখিতে পাই যে, লুপ্ত আচার ও নীতিগুলি ক্রমে ক্রমে আমাদের সমক্ষে পুনর্ব্বার উপস্থিত হইতেছে, তখন মন ভবিষ্যৎ ভাবিয়া একান্তই উৎফুল্ল হয়। ইহার পরেও যদি কেহ মনে করেন যে রাজ-নৈতিক, ধর্ম্ম-নৈতিক এবং সমাজ-নৈতিক জগতের ভবিষ্যৎ অমঙ্গলময়, তাঁহাদিগকে মাত্র একটি কথা বলিব। তাঁহারা বোধ হয় একথা অস্বীকার করিবেন না যে, প্রকৃতির গতি উন্নতি-মুখিনী এবং পরিবর্ত্তন উন্নতি-মূলক। অন্ততঃ ইহা ভাবিয়াও মনকে শান্ত রাখা উচিত, এবং জীবনের মধ্যে যত প্রকার দুর্ঘটনা উপস্থিত হইতে পারে, তাহার মধ্যে একমাত্র আশাকেই অবলম্বন করিয়া শান্তি উপভোগ করা উচিত।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

হার্বার্ট স্পেন্সার।

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

চতুর্থ অধ্যায়ের বিষয় শারীরিক শিক্ষা। হার্বার্ট স্পেন্সার বলেন, ইংলণ্ডে রাজ-নীতির পরেই পশু-পালনের কথা লইয়া আপামর সাধারণ সকলে ব্যস্ত। আমাদের পক্ষে এ কথা খাটে না। আমরা রাজ-নীতি বুঝিলেও তাহা ভাবিতে ভাল বাসি না,—বৎসরান্তে কড়ায় গণ্ডায় হিসাব করিয়া রাজ-করটা দিতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হই। পশু-পালন বা পশুর উন্নতি-সাধনেও আমাদের অনুরাগ তুল্যরূপ। অনেক ভদ্র লোক গরু পোষেণ, এবং দিনে দিনে গো-দুগ্ধের অল্পতা হইতেছে বলিয়া আক্ষেপও করেন; কিন্তু গরু ঘাস খাইয়া বাঁচে কি বাতাস খাইয়া বাঁচে, এ বিষয়টা চিন্তা করিতে প্রায় কাহাকেও দেখা যায় না। তবে কি আমাদের দেশে সর্ব্ব-সাধারণের প্রিয় বিষয় কিছুই নাই? আছে বই কি? দলাদলি, নিন্দাচর্চ্চা, বিবাদ বিস্বাদ, মামলা মোকদ্দমা—ইহাই আমাদের জীবনোপায়। ভারত হইতে এগুলি দূর হইলে বোধ করি আমাদিগকে বাগ্‌রোধ হইয়া মরিতে হয়!

কিন্তু এই সকল বিষয়ে যখন গল্প হয়, তখন শিশু-পালনের কোন কথা কেহ শুনিতে পান কি? সংসারের সকল কার্য্যেই যাঁহার চক্ষুঃ যায়, তিনিও শিশুদিগের আহারের বন্দোবস্ত কি, কখন তাহারা আহার করে, তাহাদের বাসগৃহে অবাধে বায়ু চলিতে পায় কি না, ইত্যাদি বিষয় স্বচক্ষে পর্য্যবেক্ষণ করেন কি? তাঁহার পুস্তকালয়ে সাংসারিক নানা বিষয়ের নানা পুস্তক থাকিতে পারে; অনেক পুস্তকের সূচী পর্য্যন্ত হয়ত তাঁহার কণ্ঠস্থ আছে; কিন্তু সন্তান-পালন-সম্বন্ধে কয়-খানি পুস্তক তিনি পড়িয়াছেন? পশু-পাল-কেরা ঘাস-ভুষির গুণাগুণ বিলক্ষণ রূপেই জানেন; কিন্তু শিশুদিগকে তাঁহারা যে খাদ্য দিয়া থাকেন, তাহা তাহাদিগের শরীর-পোষণের উপযোগী কি না, একথাটা তাঁহারা একবার ভাবিয়া থাকেন কি? একটা ঘোড়াকে দানা খাইতে দিয়া অব্যবহিত পরেই খাটাইলে যে অনিষ্ট হইতে পারে, একথা হয়ত অনেকেই জানেন; কিন্তু শিশুর আহারান্তে কতক্ষণ বিশ্রামের পর অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হওয়া উচিত, একথা হয়ত কেহই চিন্তা করেন না। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে, অনেকেরই বিশ্বাস, এ সকল কার্য্য কেবল স্ত্রীলোকের। অনেকেরই বিশ্বাস, এ সকল কার্য্য পুরুষের সম্মানকে খর্ব্ব করে।

অত্যুৎকৃষ্ট ষাঁড় কেমন করিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, বিলাতের অনেক শিক্ষিত ভদ্র লোকে এবিষয়ে বিলক্ষণ চিন্তা এবং সময় ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু উৎকৃষ্ট মানুষ কিরূপে প্রস্তুত হইতে পারে, তাহা কেহই ভাবেন না, ইহা বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে সকল জননী যৎকিঞ্চিৎ গান বাদ্য এবং

ভাষা ভিন্ন আর কিছুই শিখেন নাই, তাঁহারাই কুসংস্কারপূর্ণ ধাত্রীর সাহায্যে সন্তানের আহার, পরিচ্ছদ, এবং ব্যায়ামের নিয়মাদি অবধারণে সমর্থ, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। ঐ সকল সন্তানের জনকেরা কি করেন? তাঁহারা পুস্তক ও সংবাদপত্র পড়েন, কৃষিসভায় উপস্থিত হন, তর্ক বিতর্কে যোগ দেন, —সকলেরই উদ্দেশ্য, কিসে ভাল শূকর জন্মিতে পারে তাহারই উপায় অবগত হওয়া। দৌড়ের একটা ঘোড়া তৈয়ার করিবার জন্য কত যত্ন, কিন্তু একজন ব্যায়ামী মানুষ প্রস্তুত করিবার দিকে কাহারও দৃষ্টি নাই। স্বজাতির সন্তান উপেক্ষা করিয়া ইতর জন্তুর উন্নতির জন্য মাথা ঘামান অসঙ্গতির পরাকাষ্ঠা বটে। কিন্তু ভারতবাসীর কোন বালাই নাই; তিনি না ভাবেন স্বজাতির জন্যে, না ভাবেন ইতর জন্তুর জন্যে!

বিষয়টা কিন্তু গুরুতর। উল্লিখিত বিষমবিন্যাসটি হাস্যকর হইলেও বিষয়টি হাসিয়া উড়াইয়া দিবার জিনিস নহে। একজন চিন্তাশীল লেখক বলেন, জীবনে কৃতকার্য্যতার প্রথম উপাদান সুস্থতা; এবং জাতীয় সুস্থতাই জাতীয় সৌভাগ্যের নিদান। কেবল যে সৈন্যদিগের বলের উপর যুদ্ধের জয়-পরাজয় নির্ভর করে তাহা নহে; বাণিজ্যিক জয়-পরাজয় ও উৎপাদকদিগের শ্রম-সহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে। স্পেন্সার বলেন, এ পর্য্যন্ত কি যুদ্ধ কি বাণিজ্য কোন বিষয়েই ইংরাজের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় কেহ পারে নাই; কিন্তু কোন কোন বিষয়ে অত্যাধিক শক্তির প্রয়োজন দেখিয়া তিনি ভীত হইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে প্রতিযোগিতা এত প্রখর হইয়া দাঁড়াইয়াছে যে, স্বাস্থ্যভঙ্গ না করিয়া অতি অল্প লোকই তাহাতে কৃতকার্য্য হয়। এখনই অতিরিক্ত পরিশ্রমে সহস্র সহস্র লোক মাটি হইতেছে। অতিরিক্ত পরিশ্রমের এই চাপ ক্রমেই বৃদ্ধি হইবে বলিয়া বোধ হইতেছে; যদি তাহাই হয়, তবে লোহার শরীরও ইহাতে অবসন্ন হইবে। অতএব বালকদিগকে এমন ভাবে শিক্ষা দিবার বিশেষ প্রয়োজন হইয়াছে যে, কেবল মানসিক বলে নহে, কিন্তু শারীরিক বলেও তাহারা যেন উপস্থিত প্রতিযোগিতার উপযুক্ত হইতে পারে।

এইরূপে বলবীর্য্যশালী ইংরাজের বংশধর জাতীয় বল-বৃদ্ধির চিন্তায় মস্তিষ্ক ক্ষয় করিতেছেন, আর আমরা অসহায় দুর্ব্বল জাতি শয্যার পারিপাট্য-সাধনে ব্যস্ত রহিয়াছি! কে বলে আমরা নির্ব্বোধ?

যাহা হউক, ইংলণ্ডে এবিষয়ে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে, আন্দোলন আলোচনা চলিতেছে, এবং স্থানে স্থানে ব্যায়াম-বিদ্যালয়ও স্থাপিত হইতেছে।

পালন-গৃহ এবং পাঠ-গৃহের নিয়মাদি বর্ত্তমান বিজ্ঞানের অনুমোদিত হউক, তাহা হইলেই অভিলাষ সিদ্ধ হইবে। গোমেষাদি বিজ্ঞান হইতে যে উপকার পাইতেছে, মানব-সন্তানকে তাহা হইতে আর অধিককাল বঞ্চিত রাখা উচিত নহে। সমুদায় শারীর-তত্ত্ববিৎ এবং রাসায়ন-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরাই স্বীকার করেন যে, পশু এবং মনুষ্যের শরীরে জীবন-ক্রিয়া একই প্রকার; ইহা স্বীকার করিলেই বলিতে হইবে যে, যে বৈজ্ঞানিক অভিজ্ঞতা ইতর জন্তুর প্রকৃতি-পর্য্যবেক্ষণদ্বারা লব্ধ হইয়াছে, তাহাতে মানবেরও বিশেষ উপকার হইবে। জীবন-বিজ্ঞান নিতান্ত

আধুনিক হইলেও তাহার অনেকগুলি তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে; এই সকল তত্ত্ব মানবাদি সমস্ত জীব-দেহ মাত্রেতেই প্রযোজ্য। বালক এবং যুবকদিগের শিক্ষায় এই সকল তত্ত্বের কার্য্যকারিতা কি, এস্থলে তাঁহাই প্রদর্শিত হইবে।

মানব-চরিত্রে একটি সমতা-রক্ষিনী শক্তি আছে, সেইজন্য মানব একবার একদিকে বাড়াবাড়ি করিলে পরক্ষণে আবার তাহার ঠিক বিপরীত দিকে বাড়াবাড়ি আরম্ভ করে। শাসন-কার্য্যে উদারনীতির পর স্বেচ্ছাচার ধর্ম্মনীতিতে কঠোরতার পর স্বৈরতা, সমাজ-নীতিতে গঠনের পর ভঞ্জন,—সর্ব্বত্র এই শক্তি বিদ্যমান। মানবের আহারেও এই শক্তি কার্য্য করিতেছে। এক সময়ে ইংলণ্ডে মদমাংসের শ্রাদ্ধ না হইলে আহার হইত না, এখন মাদক-নিবারিণী এবং নিরামিষ-প্রচলিনী সভা তাহার বিপরীত নীতি প্রচার করিতেছেন। বালক-বালিকার আহারেও এইরূপ পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়। এক সময়ে সংস্কার ছিল, বালক বালিকা যত অধিক থাইতে পারে ততই তাহাদের মঙ্গল; এখনও পল্লীগ্রামের অশিক্ষিত-সমাজে এ সংস্কার আছে। কিন্তু এখনকার শিক্ষিত-সমাজে তাহাদের অল্পাহারের দিকেই যেন ঝোঁকটা বেশী। অবশ্য শিক্ষিতেরা নিজের ক্ষুধার বেলায় এ ঝোঁক রক্ষা করিতে পারেন না, কিন্তু বালকের বেলায় তাহা পূর্ণমাত্রায়ই রক্ষা করেন।

অত্যাহার এবং অল্পাহার উভয়ই মন্দ, কিন্তু অত্যাহার অপেক্ষা অল্পাহার আরও মন্দ। অত্যাহারের কুফল সহজেই সংশোধিত হইতে পারে, কিন্তু অল্পাহারের ক্ষতি সহজে পূর্ণ হয় না। বাস্তবিক অভিভাবকের অনুচিত হস্ত-ক্ষেপ না হইলে বালকেরা অত্যাহার বা অল্পাহারের অপরাধে অপরাধী হয় না। অল্পাহারে সন্তানের উপকার হয় বলিয়া যে বিশ্বাস, তাহা পিতামাতার ভ্রান্তিমূলক। আজকাল রাজ্য-শাসনে যেমন, শিশু-পালনেও সেইরূপ বিধি ব্যবহার বড়ই বাড়াবাড়ি হইয়াছে; এই বাড়াবাড়ির ফলস্বরূপ অল্পাহারের ব্যবস্থাটি অত্যন্ত অনিষ্টকর।

বালককে যথেচ্ছ আহার করিতে দিয়া অপাকে মারা যাইতে দেওয়া কি উচিত? এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু ইহার উত্তরও সহজ। দুগ্ধ-পোষ্য শিশু এবং অশীতিপর বৃদ্ধ, রোগী এবং সুস্থ, সভ্য এবং অসভ্য, মনুষ্য এবং ইতর জন্তু,—সকলের পক্ষেই আহার-সম্বন্ধে ক্ষুধাই যদি একমাত্র নিয়ামক হয়, তবে বালকের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা কেন হইবে বুঝা যায় না।

অনেকে অত্যাহার-জনিত কুফলের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন; যাহা প্রকৃত, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু এই অত্যাহার অল্পাহারেরই অবশ্যম্ভাবী ফল। যাহারা বাল্যে কঠোর শাসনে থাকে, তাহারা যৌবনে যে স্বেচ্ছাচারী হয়, এই অত্যাহার তাহার অন্যতম প্রমাণ। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে, দীর্ঘকাল ইচ্ছাকে অপরিতৃপ্ত রাখিলে পরিণামে তাহার বেগ কেমন ভয়ানক হইতে পারে। শিশুদিগের রুচি কিরূপ, এবং তাহারা কিরূপ ব্যবহার প্রাপ্ত হয়, ইহা একবার ভাবিয়া দেখ। মিষ্ট দ্রব্যের

উপরে বালকের লোভ সর্ব্বত্র সমান। সম্ভবতঃ শতকরা নিরানব্বই জন অভিভাবকই হয়ত মনে করেন, ইহাতে রসনার তৃপ্তি ভিন্ন আর কোন উপকার নাই, সুতরাং অন্যবিধ ইচ্ছার ন্যায় মিষ্ট-ভোজনের ইচ্ছাকেও দমন করিতে হইবে। কিন্তু শারীর-তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা শারীর-তত্ত্বের আলোচনা দ্বারা যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে প্রাকৃতিক বন্দোবস্তের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা জন্মিতেছে। তাঁহারা বলেন, শারীরিক ক্রিয়ার পক্ষে শর্করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। শর্করা এবং তৈলময় পদার্থ যখন শরীর-পোষণ-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে, তখন তাপ উৎপাদন করে। অনেক পদার্থ তাপোপযোগী হইবার পূর্ব্বে শর্করায় পরিণত করিতে হয়; দেহের মধ্যে এই শর্করা-নির্ম্মাণ-কার্য্য চলিতে থাকে। বাস্তবিক যকৃৎটি যেন শর্করা-নির্ম্মাণের একটি কল, ইহাদ্বারা অনবরত শর্করা প্রস্তুত হইতেছে। শরীর-পোষণে তৈল এবং শর্করা উভয়েরই প্রয়োজন। আমরা দেখিতেছি, বালকেরা মিষ্ট-ভোজনে যেমন উৎসুক, তৈলাক্ত দ্রব্য-ভোজনে তেমনই নারাজ; সুতরাং বুঝিতে হইবে, শর্করা দ্বারা তাহাদের শরীরে তৈলের ক্ষতিপূরণ হইয়া থাকে। আবার দেখ, উদ্ভিজ্জাম্লে বালকদের অত্যন্ত প্রবল রুচি। ফলভোজনে তাহাদের এতই আনন্দ যে, ভাল ফল না পাইলে জাম, কুল, করঞ্জা প্রভৃতি অম্ল ফল খাইয়াই পেট ভরে। উদ্ভিজ্জাম্ল কেবল শরীর-পোষণেই লাগে না, ইহা দ্বারা আরও অনেক উপকার হয়। ফলের প্রাকৃতিক অবস্থায় উহা ভক্ষণ করিলে দান্ত পরিষ্কৃত এবং নিয়মিত হয়। এখন ভাবিয়া দেখ, বালকের স্বাভাবিক রুচি এবং অভিভাবকের বন্দোবস্ত, এ উভয়ে কত অনৈক্য। এস্থলে শিশু-প্রকৃতিতে অম্ল এবং মিষ্ট দ্রব্যের জন্য দু'টি স্বাভাবিকী ইচ্ছা দেখা যাইতেছে। শিশুপালনের ব্যবস্থায় কিন্তু এদিকে দৃষ্টি নাই; বরং যাহাতে মিষ্ট এবং অম্ল-ভক্ষণের ইচ্ছা পূর্ণ না হইতে পারে, সে দিকে অভিভাবকের বিশেষ যত্ন আছে। ইহার ফল এই হয় যে, যেদিন কোন নিমন্ত্রণ উপস্থিত হয়, যেদিন ফল মূল কিনিবার উপযুক্ত পয়সা কড়ি বালকের হাতে পড়ে, অথবা যেদিন কোন ফল-বৃক্ষের বাগানে অবাধে বিচরণ করিতে বালক অনুমতি পায়, সেদিন এ প্রাণটি যে তাহার নিজের,— সুতরাং ইহাকে যে রক্ষা করিতে হইবে, এ কথাটি বালকেরা প্রায়ই ভুলিয়া যায়। তাহারা যাহা পায় এবং যত পারে খাইয়া লয়; কারণ অতীতের কথা তাহাদের মনেই থাকে, আবার ভবিষ্যতের দীর্ঘ উপবাস তাহারা দিব্য চক্ষেই দেখিতে পায়। তাহার পরে যখন অত্যাহারের কুফল ফলিতে থাকে, তখন বলা হয়, বালক যাহা খাইতে চায় তাহাই তাহাকে খাইতে দেওয়া উচিত নহে। অর্থাৎ যে অত্যাহার অতিশয় বাঁধাবাঁধির ফল, তাহাকেই কারণ বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অতএব সে যুক্তিতে বালকদিগের আহারে অনুচিত হস্তক্ষেপের পক্ষ পোষণ করে, তাহা নিতান্ত দোষাবহ। শরীর-পোষণের জন্য যাহা নিতান্ত প্রয়োজনীয়, এবং বালকেরা যাহা খাইতে অত্যন্ত ভাল বাসে, সেরূপ ফলাদি খাদ্য প্রত্যহ

তাহাদিগকে রীতিমত খাইতে দিলে কখনও তাহারা মাসে পক্ষে একদিন সুযোগ পাইবা-মাত্র অত্যাহার করিয়া বইসে না।

বালককে খাইতে দিয়া বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহার বাড়ীর অবস্থা, তাহার পিতামাতার স্বভাব পরীক্ষা করিয়া লইতে পারেন; এরূপ পরীক্ষায় পিতামাতা যাহাতে প্রশংসা পাইতে পারেন, সন্তানদিগের আহারের সেইরূপ ব্যবস্থা করা উচিত।

আহারসম্বন্ধে বালকের প্রবৃত্তিই প্রকৃত নিয়ামক হওয়া উচিত, কেন না, এবিষয়ে ইহা অপেক্ষা অধিক বিশ্বাস-যোগ্য নিয়ামক আর নাই। অভিভাবকের বিবেচনা যখন বালকের প্রবৃত্তির স্থান গ্রহণ করে, তখন অনিষ্ট ঘটিতে থাকে। বালক খাইতে বসিয়া আরও কিছু মিষ্টান্ন চাহিল, মা বলিলেন, "আর পাবে না।" এরূপ বলিবার কারণ কি? তাঁহার বিশ্বাস, তিনি যাহা দিয়াছেন, তাহাই বালকের পক্ষে যথেষ্ট। এমন বিশ্বাস হয় কেন? বালকের শারীরিক অভাব বুঝিয়া লইতে পারেন, জননীর এমন কোন দৈবশক্তি আছে কি? শৈত্য, উষ্ণতা, বায়ু-মণ্ডলের বাষ্পিক এবং বৈদ্যুতিক অবস্থা, পূর্ব্ববেলার আহার্য্যের গুণ এবং পরিমাণ, বিশ্রাম, পরিশ্রম, আহার সময়ের পরস্পর ব্যবধান, ইত্যাদি নানা কারণে ক্ষুধার ন্যূনাধিক্য হয়; জননী কেমন করিয়া তাহা জানিবেন? এক সময়ে একটি পঞ্চম বর্ষীয় বালককে দেখা গিয়াছিল, সচরাচর পাঁচ বৎসরের বালক তত বড় হয় না। বালকের পিতাকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়া ছিলেন,—"বালকের খাদ্যের পরিমাণ কত হওয়া উচিত, তাহার একটা বাঁধা নিয়ম নাই। আমি যদি আন্দাজে একটা পরিমাণ ঠিক করিয়া দেই, তাহা ঠিকও হইতে পারে, ভুলও হইতে পারে। সুতরাং এ রকম আন্দাজের উপর নির্ভর করি না, বালক যাহা যত খাইতে চায় তাহাই তত দেই।" তাঁহার এই বিজ্ঞতার যে অতি সুফল ফলিয়াছে, ইহা যে সেই বুঝিতে পারে। যাহারা শারীর-বিজ্ঞানে অনভিজ্ঞ, তাহারাই অন্যের উদরের পরিমাণ স্থির করিতে সাহস পায়, শারীর-বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা যত বর্দ্ধিত হয়, এই সাহস ততই কমিয়া যায়। "অজ্ঞতা-জনিত অহঙ্কারের সঙ্গে তুলনা করিলে দেখা যায়, বিজ্ঞান-জনিত অহঙ্কারে অনেকটা বিনয় আছে।" নিজের বিচার-শক্তি অপেক্ষা প্রাকৃতিক নিয়ম কতদূর অধিক বিশ্বাস-যোগ্য, তাহা যিনি জানিতে চাহেন, তিনি অনভিজ্ঞ নূতন চিকিৎসকের দাম্ভিকতার সঙ্গে অভিজ্ঞ প্রাচীন চিকিৎসকের সতর্কতার তুলনা করিয়া দেখুন, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন, মানুষ প্রাকৃতিক নিয়মে যত অভিজ্ঞ হয়, আপন বিবেচনা-শক্তিতে ততই আস্থা-শূন্য হইতে থাকে।

আহার্য্যের পরিমাণসম্বন্ধে যে কথা, গুণ-সম্বন্ধেও সেই কথা। বালককে কেবল অল্প-পরিমাণে খাইতে দিয়াই পিতামাতা নিরস্ত থাকেন না, যাহা খাইতে দেন, তাহা নিতান্ত অপকৃষ্ট। স্পেন্সার সাহেব বালকদিগের জন্য মাংসের ব্যবস্থা বিলক্ষণরূপে সমর্থন করিয়াছেন, কিন্তু এ সম্বন্ধে ইউরোপেও এখন বিলক্ষণ মত-ভেদ দৃষ্ট হইতেছে; দুগ্ধ-

ঘৃত এবং ফল-মূলই যে মানুষের প্রকৃত আহার, অনেকেই তাহা বিজ্ঞান-সম্মত এবং যুক্তি-যুক্ত বলিয়া গ্রহণ করিতেছেন। যাহা হউক, পূর্ণবয়স্কের পক্ষে পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন থাকিলে বালকের পক্ষে যে তাহার প্রয়োজন আরও অধিক, সে বিষয়ের যুক্তি অতি স্পষ্ট।

পূর্ণবয়স্কের সঙ্গে বালকের শারীরিক ক্রিয়ার তুলনা করিলেই বুঝা যাইবে, বালকের পক্ষে শরীর-পোষণোপযোগী খাদ্যের প্রয়োজন কত অধিক। খাদ্যের প্রয়োজন ক? প্রত্যহ প্রত্যেক মনুষ্যের শারীরিক, মানসিক, এবং জৈবনিক ক্রিয়াতে শরীর ক্ষয় হইতেছে, খাদ্য এই ক্ষতিপূরণ করে। মানব-দেহ হইতে বিকীরণ-ক্রিয়া দ্বারা অনবরত তাপ উদ্গত হইতেছে; জীবনী শক্তিকে অব্যাহত রাখিবার জন্য নিয়ত শরীরে এই তাপ যোগাইতে হয়, ইহাতেও শারীরিক কোন কোন উপাদান অবিশ্রাম ক্ষয়প্রাপ্ত হইতেছে। এই প্রাত্যহিক ক্ষয়ের ক্ষতি-পূরণ জন্য এবং শারীরিক তাপে ইন্ধন যোগাইবার নিমিত্ত পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তিকে আহার করিতে হয়। বালকের পক্ষেও তাহাই; বরং তাহার অবিশ্রান্ত ক্রিয়াশীলতা পর্য্যবেক্ষণ করিলে বুঝা যাইবে যে, আমার বিবেচনায় পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা বালকের ক্ষতি-পূরণের প্রয়োজন আরও অধিক। বালকেরও তাপ-বিকীরণ আছে; আবার আকার বিবেচনায় যুবক অপেক্ষা বালকের শরীরের অধিক ভাগ অনাবৃত থাকাতে তাহার অধিকতর তাপ-বিকীরণ হয়। অতএব আর কোন প্রয়োজন না থাকিলেও কেবল শরীর-রক্ষার জন্যই শরীর বিবেচনায় যুবক অপেক্ষা বালকের অধিক তাপদ খাদ্যের প্রয়োজন। পূর্ণবয়স্কের প্রয়োজন কেবল শরীর-রক্ষণ, কিন্তু বালকের প্রয়োজন শরীর-রক্ষণ ত আছেই, অধিকন্তু শরীর-বর্দ্ধনও আছে। খাদ্যের যে অংশ শরীরের ক্ষতি-পূরণ ও তাপ-রক্ষণে ব্যয়িত হইয়া অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই শরীরের বৃদ্ধি হয়; যেস্থলে এই অবশিষ্টাংশ পর্য্যাপ্ত হয় না, সেস্থলেও শরীর বর্দ্ধিত হয় বটে, কিন্তু ক্ষতি-পূরণ-কার্য্যে ত্রুটি থাকাতে শরীর অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। সত্য বটে পূর্ণবয়স্ক অপেক্ষা বালকের শরীরে ক্ষয়-কার্য্য হইতে পূরণ-কার্য্য অধিক পরিমাণে সাধিত হয়, এবং তাহাতেই বালক-দেহ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু এতদ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, অল্লাহারে বর্দ্ধনকার্য্য একেবারে স্থগিত না হইলেও, যুক্তাহারে শরীর যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হইবার কথা, অল্লাহারে তাহা হয় না। বালক-দেহে খাদ্যের কত প্রয়োজন, "বালকের খিধা" এই চলিত কথাটিই তাহার প্রমাণ; পরিণত বয়সে ক্ষুধা এত তীব্রও হয় না, এত ঘনও হয় না। জাহাজ-ডুবি এবং দুর্ভিক্ষে খাদ্যের অভাব উপস্থিত হইলে বালকেরাই আগে মরে;—বালক-দেহে খাদ্যের যে সমধিক প্রয়োজন, ইহা তাহার অন্যতর প্রমাণ।

এখন কথা হইতেছে, যে খাদ্যে পুষ্টিকর ভাগ অধিক, তাহাই অল্প পরিমাণে বালককে খাইতে দেওয়া উচিত, অথবা যে খাদ্যে পুষ্টিকর ভাগ অল্প, তাহাই অধিক পরিমাণে খাইতে দেওয়া উচিত? ইহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, খাদ্যের পুষ্টিকর ভাগ অধিক

এবং পরিমাণ অল্প হইলে পরিপাক-শ্রম-জনিত শরীর-ক্ষয় অল্প হয়, সুতরাং খাদ্যের সারাংশ শরীর-গঠন-কার্য্যে অধিক পরিমাণে ব্যয়িত হইতে পারে। পাকাশয় এবং মলাশয়ের কার্য্য স্নায়ু এবং শোণিতের ক্রিয়া ব্যতীত সাধিত হইতে পারে না; কিন্তু এই ক্রিয়া শারীরিক ক্ষতি ব্যতীত সম্পন্ন হইতে পারে না,—গুরুতর ভোজনের পর দারুণ অবসাদই তাহার প্রমাণ। পুষ্টিহীন খাদ্য অধিক পরিমাণে খাইলে যন্ত্রকে অধিক খাটিতে হয়, সুতরাং শরীরের অধিক ক্ষয় হয়; এদিকে পুষ্টিকর যাহা থাকে তাহা ক্ষয়-পূরণেই লাগিয়া যায়, শরীর-বর্দ্ধনের জন্য প্রায় কিছুই থাকে না। ইহার ফল এই হয় যে, কোন বালক বাড়িতে পারে না, কেহ বা সবল হয় না, কাহারও মধ্যে উভয়-বিধ কুফলই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব যাহা সুপাচ্য অথচ পুষ্টিকর, এমন খাদ্যই তাহাদের পক্ষে বিধেয়।

যে জাতির খাদ্য যত উৎকৃষ্ট, সে জাতি তত সুস্থ, কর্ম্মঠ, এবং বলবান্;—গো অপেক্ষা অশ্ব বলবান্, অশ্ব অপেক্ষা সিংহ বলবান্, ইত্যাদি। আবার এক জাতির মধ্যে তুলনা করিলেও এই প্রভেদ লক্ষিত হইবে, নবজিলণ্ডবাসী অপেক্ষা হিন্দু বলবান্, হিন্দু অপেক্ষা ইংরাজ বলবান্। স্পেন্‌সার মনে করেন, হিন্দুর শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বলতার হেতুই নিরামিষাশন, এবং ইংরাজের হাতে হিন্দুর সর্ব্ব-বিষয়ে পরাজয়ের ইহাই কারণ। একই ব্যক্তি বা একই জন্তু যখন পুষ্টিকর খাদ্য আহার করে তখন সবল ও কর্ম্মক্ষম থাকে, আবার যখন অসার খাদ্য আহার করে তখন দুর্ব্বল ও অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; ইহা সকলেই আপন আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। স্পেনসার সাহেব নাকি স্বয়ং ছয় মাসের অভিজ্ঞতায় বুঝিতে পারিয়াছেন, নিরামিষ আহারে শরীর এবং মন উভয়ই দুর্ব্বল হয়। তিনি বলেন মনুষ্যের বিভিন্ন জাতি বা বিভিন্ন শ্রেণীতে যে প্রভেদ দৃষ্ট হয়, তাহা জাতিগত বা মূল-গত নহে, তাহা কেবল আহারগত প্রভেদ মাত্র।

উৎকৃষ্ট পুষ্টিকর খাদ্যের অভাবে শরীর অকর্ম্মণ্য এবং মন নিস্তেজ হয়, তাহার কোন সন্দেহ নাই। পর্ণাশন যোগী ও সন্ন্যাসী-দিগের শরীরে স্বাস্থ্যের স্বর্ণ-কান্তি দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাঁহারা বায়বিক এবং আধ্যাত্মিক উপাদান হইতে যে পুষ্টি গ্রহণ করিতে সমর্থ, সাধারণ সংসারী এবং বালকের পক্ষে তাহা অসম্ভব; সুতরাং পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে প্রার্থনীয়। কিন্তু যে বাল্য-বিবাহিত বিংশতিমুদ্রা বেতনের কেরানীকে দ্বাদশটি সন্তান পালন করিতে হয়, তাহার পক্ষে সন্তানদিগের জন্য পুষ্টিকর খাদ্যের ব্যবস্থা করা দূরে থাকুক, ঘাসের ব্যবস্থা করিতেও বোধ হয় সে কষ্ট পায়! বোধ হয় বংশ-বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে আয়ুর্বৃদ্ধি এবং শক্তি-বৃদ্ধির জন্য যত্ন করাই অধিক পরামর্শ-সিদ্ধ।

স্পেন্‌সার সাহেব মাংস-ভক্ষণের প্রথা নিতান্ত উচিত মনে করেন বলিয়া বোধ হয়। মাংস-ভক্ষণের অনুকূলে এবং প্রতিকূলে বলিবার এত কথা আছে যে, তাহাতে এক খানি বৃহৎ পুস্তক হইতে পারে, সুতরাং সে বিষয়ের বিচারে প্রবৃত্ত হইবার স্থানও

আবার এখানে নাই। কেবল এইমাত্র বলা যাইতে পারে যে, আজকাল ইংরাজের দেশেও অনেকে মাংসাশন পরিত্যাগ করিতেছেন, এবং দিন দিন তাঁহাদের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতেছে। তবে ইহা অবশ্য সত্য যে, যে পর্য্যন্ত "সর্ব্বজীবে সমদয়া" কেবল গ্রন্থগত থাকিবে, যে পর্য্যন্ত পাশব স্বার্থ দেব-প্রকৃতি মানবকে দানব-প্রকৃতি করিয়া রাখিবে, সে পর্য্যন্ত মাংসাশন মানবসমাজ হইতে দূর হইবে না, মাংসাশনের প্রয়োজন বুঝাইয়া দিবার উপযুক্ত পণ্ডিতেরও অভাব থাকিবে না।

আহারের বৈচিত্র্য-সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। পরিণত-বয়স্কেরা মধ্যে মধ্যে রুচি বদলাইয়া থাকেন বটে, কিন্তু বালকের ভাগ্যে যে পরিবারে যে ব্যবস্থা আছে তাহা প্রায় একভাবেই থাকিয়া যায়।

এই প্রথা শারীরবিজ্ঞানের অনুমোদিত নহে। প্রত্যহ এক প্রকার খাদ্যে যে অরুচি জন্মে, এবং অভিনব খাদ্যে যে পরিতৃপ্তি লাভ হয়, তাহা নিরর্থক নহে। পরীক্ষা দ্বারা নির্ণীত হইয়াছে যে, এমন কোন একটি খাদ্য নাই, যাহাতে শরীরের সমস্ত অভাব দূর হইতে পারে; সুতরাং সেই সকল অভাব দূর করিবার জন্য প্রত্যহ খাদ্যের পরিবর্ত্তন করা উচিত। রুচিকর খাদ্য আহার করিবার সময়ে যে এক প্রকার ব্যগ্রতা জন্মে, তাহাতে স্নায়বিক কার্য্য এবং রক্ত-সঞ্চালন অতি দ্রুতগতিতে হইতে থাকে; ইহা যে খাদ্য-পরিপাকের বিশেষ সাহায্য করে, শারীর-তত্ত্বজ্ঞের নিকট তাহা অবিদিত নহে। বিলাতের লোকে পশু-পালনে এ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আদর করিয়া থাকে,—পশুকে নিয়ত এক প্রকার খাদ্য দেয় না।

সময়ে সময়ে খাদ্যের পরিবর্ত্তন করা যেমন উচিত, এক সময়ে বিবিধপ্রকার খাদ্য আহার করাও সেইরূপ উচিত। ইহাতেও স্নায়বিক উত্তেজনা এবং দ্রুততর শোণিত-প্রবাহ উপস্থিত হইয়া পরিপাক-কার্য্যের সাহায্য করে। নানাপ্রকার খাদ্য যে পরিমাণে খাইয়া যত সহজে জীর্ণ করা যায়, এক প্রকার খাদ্য সেই পরিমাণে খাইয়া তত সহজে জীর্ণ করা যায় না। পশু-পালনেও ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। নানা প্রকার খাদ্য মিশ্রিত করিয়া দিলে পশু ভাল বাড়ে। নানা প্রকার খাদ্য মিশ্রিত করিয়া খাইলে পরিপাকক্রিয়া যে ভালরূপে চলে, অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিত সে কথা তাঁহাদের গ্রন্থেও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

বালকদিগের জন্য এইরূপ ঘন ঘন পরিবর্ত্তিত খাদ্যের ব্যবস্থা কেহ যদি কষ্টকর মনে করেন, তাহা হইলে আমরা বলিব, যাহাতে বালকের শারীরিক এবং মানসিক উভয়-বিধ মঙ্গল সাধিত হয়, এমন কোন কার্য্যেই কষ্টকে কষ্ট বলিয়া মনে করা উচিত নহে। স্পেন্সার এই বলিয়া আক্ষেপ করেন যে, শূকর-পালনে যাহা কষ্টকর হয় না, সন্তান-পালনে যে লোকে তাহা কষ্টকর বলিয়া মনে করে, ইহা যেমনি আশ্চর্য্য, তেমনই দুঃখের বিষয়।

এস্থলে যে প্রণালী প্রদর্শিত হইল, তাহা যাঁহারা অবলম্বন করিবেন, তাঁহাদিগকেও দুই একটি কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিতে হয়। এক প্রণালী ছাড়িয়া অন্য প্রণালী

গ্রহণ যেন হটাৎ না হয়। অল্পাহারে শরীরকে এত নিস্তেজ করিয়া ফেলে যে, গুরুপাক খাদ্য হজম করা তাহার পক্ষে কঠিন হইয়া উঠে। খাদ্যের পুষ্টিহীনতাও অজীর্ণতার একটি কারণ। সুতরাং কদর্য্য আহারে অভ্যস্ত শরীরকে ক্রমে ক্রমে পুষ্টিকর সুপথ্য-গ্রহণে অভ্যস্ত করিতে হইবে; যেমন এক দিকে বল বৃদ্ধি হইবে,—পরিপাকের শক্তি বৃদ্ধি হইবে, অমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গে খাদ্যেরও বৃদ্ধি করিতে হইবে। কেবলমাত্র পুষ্টিকারিতার দিকে দৃষ্টি রাখিলেও চলিবে না; যাহাতে উদর পূর্ণ হয়, তাহারও ব্যবস্থা করিতে হইবে, কারণ উদর-পূর্ত্তিও নিতান্ত প্রয়োজনীয়। যদিও অপকৃষ্টাহারী অসভ্য জাতি অপেক্ষা উৎকৃষ্টাহারী সভ্য জাতির পাকযন্ত্র ক্ষুদ্র এবং ভবিষ্যতে আরও ক্ষুদ্র হইবার সম্ভাবনা, তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, পাক-যন্ত্রের আয়তনের উপর ভুক্ত দ্রব্যের পরিমাণ নির্ভর করে। এই দুই বিষয়ে যথোচিত দৃষ্টি রাখিয়া মীমাংসা করিতে গেলে বলিতে হইবে যে, বালকদিগের খাদ্য পুষ্টিকর ও প্রচুর হইবে, প্রত্যহ পরিবর্ত্তিত হইবে, এবং প্রতিবারে বিবিধ উপাদানে মিশ্রিত হইবে।

৺ কালীকুমার দাস গুপ্ত।

দেখিতে দেখিতে আর একটি আড়ম্বর-হীন, ক্রিয়াশীল, নিভৃত বাঙ্গালী জীবন চলিয়া গেল, রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল একটি আদর্শ শিক্ষক হারাইল, একটি কর্ত্তব্য-পরায়ণ মাতৃভক্ত সন্তান বঙ্গমাতাকে দুঃখ দিয়া অকালে পরলোকে প্রস্থান করিলেন। বর্ত্তমান সময়ে আদর্শ শিক্ষকের যে কত প্রয়োজন, শিক্ষা-বিষয়ে যাঁহারা চিন্তা করিয়া থাকেন তাঁহারাই ইহা বুঝিতে পারিবেন, এবং কালী বাবুর পরলোক-গমনে রাজসাহীর যে কত ক্ষতি হইল, কেবল তাঁহারাই ইহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। রাজসাহীর স্থানীয় সংবাদপত্র হিন্দুরঞ্জিকা কালী বাবুর সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, আমরা এস্থলে তাহা উদ্ধৃত করিলাম;—

"আমরা নিতান্ত দুঃখের সহিত প্রকাশ করিতেছি যে অত্রত্য কলেজিয়েট স্কুলের হেড মাষ্টার ৺বাবু কালীকুমার দাস গুপ্ত মহাশয়ের বিগত ১২ই কার্ত্তিক বুধবার রাত্রি ৪।১৫ মিনিটের সময় মৃত্যু হইয়াছে! ইঁহার বয়স ৪৫।৪৬ বৎসর হইয়াছিল। ইনি শিক্ষা বিভাগে বিশেষ প্রশংসার সহিত ২২।২৩ বৎসর যাবৎ কার্য্য করিতেছিলেন। হিন্দু-স্কুল ও অন্যান্য স্থানে শিক্ষকতা কার্য্য করিয়া শেষে মালদহ স্কুলের সেকেণ্ড মাষ্টার হন। পরে তথা হইতে ১৮৮৩ সনে অত্রত্য কলেজিয়েট স্কুলের হেডমাষ্টার নিযুক্ত হইয়া আইসেন। এই হেডমাষ্টারী কার্য্যে ইনি ১৮ বৎসর কাল বিশেষ যশের সহিত অতিবাহিত করেন। কালী বাবু অতি ধীর, পরিশ্রমী, কার্য্যদক্ষ এবং নম্র স্বভাব ছিলেন। ইঁহার সময়ে রাজসাহী কলেজিয়েট স্কুল

হইতে অনেকবার অতি যশের সহিত ছাত্রগণ পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়াছে। কালী বাবু অতি যত্নের সহিত ছাত্রদিগকে শিক্ষা দিতেন এবং সাধারণের সহিত অতি ভদ্র ব্যবহার করিতেন, এজন্য ছাত্রগণের ও সাধারণের যথেষ্ট প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। শিক্ষা বিভাগের থার্ড গ্রেডে ২৬০ টাকা বেতন পাইতেন। ৫ মাস পরেই ২৮০৲ টাকা হইত। কালী বাবু বেশ বদান্যও ছিলেন। নিজের দূর-বস্থাপন্ন আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ২।১০ টাকা করিয়া মাসিক ৩৭।৫৮ টাকা দান করিতেন। এতদ্ভিন্ন অন্যান্য সাহায্য প্রার্থীকেও সাহায্য করিতেন। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ উপস্থিত হইলেও বিমুখ করিতেন না। এই সকল এবং অন্যান্য কারণে তিনি শিক্ষা বিভাগে এতদিন কার্য্য করিয়াও নিজ শিশু সন্তানদের জন্য বিশেষ কিছু অর্থ সঞ্চয় করিয়া যাইতে পারেন নাই। জীবন বীমা কোম্পানীতে কেবল ৬ হাজার টাকা পাওয়া যাইবে, ইহাই তাঁহার পুত্রগণের পৈতৃক সম্পত্তি। তাঁহার কৃত কয়েকখান পুস্তক আছে, তাহা কলিকাতা মান্দ্রাজ, বোম্বের শিক্ষা বিভাগে প্রচলিত আছে। এই পুস্তক বিক্রয়েও কালী বাবু বাৎসরিক ৭০০।৮০০৲টাকা পাইতেন। এখন সেই আয়টীর প্রতি ভরসা খুব অল্প। মৃত্যু দিবসে কলেজ বন্ধ জন্য অনেক ছাত্র এখানে উপস্থিত ছিল না বিধায় এবং যাহারা রাজসাহীতে উপস্থিত ছিল তাহারাও জানিতে না পারিয়া অনেকে মৃত্যু সময়ে তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতে না পারিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে। সজাতি অনেক ছাত্র দাহ করিতে গিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন ছাত্রগণ কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের জন্য স্কুল খোলার দিবসে সকলেই, জুতা পরিত্যাগ করিয়া কলেজে গিয়াছিল। অত্রত্য দয়ালু প্রিন্সিপাল মিঃ লিভিংষ্টোন সাহেব কলেজ অর্দ্ধ দিনের জন্য বন্ধ দিয়াছিলেন এবং তাঁহার পীড়া সময়ে তাঁহাকে দেখার জন্য এবং মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানদিগকে সান্ত্বনা প্রদান জন্য পুনঃপুনঃ গিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন দয়া করিয়া তাঁহার নিরাশ্রয় পুত্রগণ যে কোন স্কুলে পড়ুক না কেন তথায় বিনাবেতনে পড়িতে পারে, শিক্ষা বিভাগের ডাইরেক্টরের নিকট এমত অনুরোধও করিয়াছেন। আমরা ভরসা করি সার আলফ্রেড ক্রফট মহোদয় কালী বাবু জীবিত সময়ে রাজসাহী কলেজের ছাত্রদের শিক্ষার জন্য যে অপার যত্ন ও অসীম পরিশ্রম করিয়াছেন তাহার পুরস্কার স্বরূপ এই সামান্য অনুগ্রহে বঞ্চিত করিবেন না।* কালী বাবু বৃদ্ধা মাতা, স্ত্রী ও ৪টী পুত্র ও একটী কন্যা রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। পরিবারগণ শোকে অত্যন্ত অধীর হইয়াছেন। রাজসাহীস্থ সর্ব্বসাধারণেই বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন। এমন কি নীচ শ্রেণীর লোকেও তাঁহার শব লইয়া যাওয়ার সময় তাঁহাকে দেখিবার জন্য রাস্তার পার্শ্বে দণ্ডায়মান ছিল এবং আক্ষেপ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছিল। বড় ছেলেটী অত্রত্য কলেজের ফার্ষ্ট ইয়ার ক্লাসে অধ্যয়ন করে। প্রথম হইতেই অত্রত্য শ্রীযুক্ত হারাণচন্দ্র কবিরাজ মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করিতে-

* আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম শিক্ষা-বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষ এ অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শিঃ পঃ সঃ।

ছিলেন। সেই সময়ে তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধু বান্ধবগণ ডাক্তারী মতে চিকিৎসার জন্য এবং কুইনিন খাওয়ার জন্য অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মত হন নাই। কেহ পীড়াপীড়ি করিয়া বলিলে বলিতেন যে "আপনাদের যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পারেন, কিন্তু আমার অষ্টাহের পূর্ব্বে কুইনিন সেবনের ইচ্ছা নাই।" দুরন্ত কাল কিন্তু তাঁহাকে অষ্টাহ অতীত করিয়া কুইনিন সেবনের আর সময় দিল না। অষ্টম দিন সকাল বেলা হইতেই ব্যারাম অত্যন্ত বৃদ্ধি হইল। এই সময় হইতে ডাক্তার সাহেব ও সহরস্থ অন্যান্য ডাক্তারগণ বিশেষ যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে চিকিৎসা করিয়াও কিছুতেই তাঁহার জীবন রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার পরমাত্মা ঐ দিবসই রাত্রি ৪।১৫ মিনিটের সময় সংসার ত্যাগ করিয়া মঙ্গলময়ের মঙ্গলালয়ে চলিয়া গেল। তাঁহার বৃদ্ধা মাতা ও কন্যা মৃত্যু সময়ে বাটীতে ছিলেন বিধায় তাঁহাকে দেখিতে না পারিয়া অধিকতর শোকে মগ্না হইয়াছেন। আমরা নিতান্ত দুঃখিত অন্তঃকরণে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি যে তিনি দয়া করিয়া তাঁহার পরিবারবর্গের অন্তরেও ও তাঁহার প্রেতাত্মার পরলোকে শান্তি বিধান করুন। কালী বাবু বৈদ্য এবং ঢাকা জেলার অধিবাসী ছিলেন।"

ঢাকা জেলার অন্তর্গত কৃষ্ণপুর গ্রামে স্বর্গীয় কালীকিঙ্কর দাস গুপ্তের ঔরসে এবং ত্রিপুরাসুন্দরী গুপ্তার গর্ভে ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কালী বাবুর জন্ম হয়, সুতরাং দেখা যাইতেছে মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স ৪৬ বৎসর সম্পূর্ণ হয় নাই। এই অল্প বয়সে বৃদ্ধা জননীকে রাখিয়া কৃতী পুত্রের অন্তর্দ্ধান কি শোচনীয় ব্যাপার, বিধাতার কি দুরধিগম্য বিধান! চারি পুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠ অশ্বিনীকুমার প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলেজে পড়িতেছেন, অপর তিনটি শিশু বলিলেই হয়। কালী বাবু কেবল তাঁহার পরিবার-বর্গকেই অভিভাবক-শূন্য করিয়া যান নাই, দূরস্থ ও নিকটস্থ ৪৫ জন লোককে তিনি প্রতিপালন করিতেন, ইহারা সকলেই তাঁহার অভাবে নিরাশ্রয় হইল। অনেক দরিদ্র ছাত্রও তাঁহার নিয়মিত সাহায্য পাইত। ইহা ব্যতীত দরিদ্র বা বিপন্ন কেহ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলে রিক্ত হস্তে ফিরিত না। তিনি যে বেতন পাইতেন, তাহা নিতান্ত অল্প নহে; কিন্তু এই দানশীলতার জন্য তিনি কপর্দ্দকও সঞ্চিত রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। ভাগ্যে জীবনবীমা করিয়াছিলেন, তাই নিরাশ্রয় পরিবারের জীবিকার সংস্থান ৬০০০ টাকা রহিয়াছে। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসাদে হিন্দু-চরিত্রের এই মধুরতা—হিন্দু জাতির স্বজন-প্রিয়তা, এই আশ্রিত-পালকতা ক্রমে অন্তর্হিত হইতেছে ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়!

কালী বাবু কিরূপ শিক্ষক ছিলেন, তাহা তাঁহার ছাত্র বিনা অন্যের বুঝিবার উপায় নাই। সেই গম্ভীর প্রশান্ত মূর্ত্তি, সেই অন্তঃপ্রবাহিনী প্রীতি, সেই বিরক্তি-বিহীন পরিশ্রম, শিক্ষা-কার্য্যে সেই অক্লান্ত যত্ন প্রকৃতই অনুকরণীয়। কঠোর শাসন নাই, তীব্র তিরস্কার নাই, অথচ তাঁহার প্রতি ছাত্রেরা ভয়ে কম্পিত, ভক্তিতে মোহিত,—ভয়-ভক্তির এরূপ যুগপৎ উদয় অতি অল্প-সংখ্যক

শিক্ষকই করিতে পারেন। যেখানে কোন গোলযোগ, যেখানে কোন সমস্যা, যেখানে কোন বিশৃঙ্খলা উপস্থিত, সেখানেই কালী-বাবুর পরামর্শ চাই। পরীক্ষার অসদুপায় চলিতেছে, অথবা ছাত্রেরা গোলমাল করিতেছে, কেহই থামাইতে পারিতেছে না; অবশেষে কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত কালী বাবুর নিকট সংবাদ গেল,—তিনি আসিয়া দাঁড়াইলেন, আর অমনি মন্ত্রপ্রভাবে কেন সমস্ত গোলযোগ থামিয়া গেল? বিনা বাক্য-ব্যয়ে কেবল চক্ষের প্রভাবে এমন সুন্দর শাসন আর দেখিব না।

কালী বাবু জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময়টি রাজসাহীতে অতিবাহিত করিয়াছেন, এবং বিগত ২০ বৎসর কাল অক্লান্ত পরিশ্রমে রাজসাহীর জন্য খাটিয়াছেন। (তিনি বর্ত্তমান পদে ২০ বৎসর ছিলেন)। তিনি রাজসাহী বিভাগের ছাত্রবৃত্তি-মাইনর পরীক্ষা-সমিতির সম্পাদক ছিলেন, ডিষ্ট্রীক্ট বোর্ড এবং মিউনিশিপাল সভায় তাঁহার আসন ছিল. তদ্ভিন্ন লোকনাথ ইংরাজী স্কুল, পরেশনারায়ণ বঙ্গ-বিদ্যালয়, এবং প্রমথনাথ বালিকা-বিদ্যালয়ের সম্পাদকও তিনিই ছিলেন। নিজের পদোচিত গুরুতর কর্ত্তব্যের উপরে এই সকল কর্ত্তব্যের ভার তাঁহাকে নিয়ত বহন করিতে হইত, অথচ একদিন তাঁহার মুখ-মণ্ডলে বিরক্তির চিহ্ন অভিব্যক্ত হইতে দেখা যায় নাই, একদিন তাঁহার মুখ হইতে আক্ষেপোক্তি শুনা যায় নাই। কালী বাবুর মৃত্যুতে এই সকল বিদ্যালয়ও বন্ধ হইয়াছিল।

কালী বাবুর অনেক ছাত্র কৃতবিদ্য হইয়াছেন, অনেকে গৌরবের পদেও অবস্থান করিতেছেন; আমরা আশা করি তাঁহারা সকলেই এই শিক্ষক-রত্নের কর্ত্তব্যশীলতা আপন আপন জীবনে অনুকরণ করিবেন।

ঈশ্বর-বিশ্বাসী ধার্ম্মিক না হইলে জীবনে এত সৌন্দর্য্য, এত সাধুতা আসিতে পারে না। তাঁহার ধর্ম্মমত অতি উদার ছিল, ধর্ম্ম-ভাবকে বাক্যে ব্যক্ত না করিয়া কার্য্যে ব্যক্ত করাই তিনি অধিক উচিত মনে করিতেন। ব্রাহ্মেরা মনে করিতেন তিনি ব্রাহ্ম, হিন্দুরা মনে করিতেন তিনি হিন্দু; কিন্তু তিনি যে একজন প্রকৃত ধার্ম্মিক পুরুষ ছিলেন, তাহা সকলেই জানিত। তিনি নিত্য উপাসনা-শীল ছিলেন, স্থানীয় ব্রাহ্ম-সমাজের উপাচার্য্য ছিলেন, এবং রাজসাহীতে আইসার পর হইতেই অর্থ ও পরামর্শ দ্বারা সর্ব্বদা ইহার সাহায্য করিতেন।

কালী বাবু রাজসাহীর জন্য খাটিয়া রাজসাহীতেই দেহ পাত করিলেন; এখন তাঁহার প্রতি রাজসাহীবাসীর কি কর্ত্তব্য, তাহাই বিবেচ্য। আমরা শুনিয়াছি, তাঁহার কোনরূপ স্মৃতি-চিহ্ন রাখিবার জন্য রাজসাহীতে তাঁহার ছাত্রগণ উদ্যোগী হইয়াছেন, কিন্তু আমরা এসম্বন্ধে কোন অনুষ্ঠান-পত্র এ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত হই নাই। আমরা আশা করি এ সাধু সঙ্কল্প পরিত্যক্ত হইবে না। কালী বাবুর নিকটে যাঁহারা শিক্ষা লাভ করিয়াছেন, তাঁহারা একটি করিয়া টাকা দিলেও বোধ হয় কোন একটা স্থায়ী কায হইয়া যাইতে পারে, এজন্য সাধারণের নিকট সাহায্য না চাহিলেও চলে। আমাদিগের বিবেচনায় তাঁহার বর্ত্তমান ও ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদিগের যত্নেই কোন স্থায়ী স্মৃতি-চিহ্ন রক্ষিত হওয়া উচিত।

শিক্ষানুশীলন।

[যিনি কুড়িটি প্রশ্নের সঙ্গত উত্তর করিবেন, তিনি শিক্ষা-পরিচর-সমিতি হইতে একখান প্রশংসা-পত্র পাইবেন। বিস্তারিত বিবরণ শিক্ষা-পরিচর তৃতীয় ভাগের প্রথম সংখ্যায় দ্রষ্টব্য। কেহ প্রশ্ন বা প্রশ্ন এবং উত্তর পাঠাইলে তাহাও সাদরে গৃহীত হইবে। শিঃ পঃ সঃ।]

৬ সংখ্যার উত্তর (পরিচর ৩য় ভাগ ৬২ পৃঃ দেখুন)। সরোজিনীর কাঁদিবার কারণ (১) শারীরিক কষ্ট এবং (২) মাতার নিকট শাস্তির ভয়। শাস্তির কারণ বা অপরাধ তিনটি;—(১) মাতার অনুমতি না লইয়া গাছের ফুল পাড়া, (২) সাবধান হইয়া চলিবার উপদেশ লঙ্ঘন করা, এবং (৩) কাচের রিকাব ভগ্ন করা। তাহার এই কার্য্যের দুইটি উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব;—(১) মাতা বা অন্য কাহাকেও উপহার দেওয়া, অথবা (২) খেলা করা।

মাতা যে সন্তানের শত্রু নহেন, কিন্তু পরম আত্মীয়, এই কথাই সরোজিনীকে সর্ব্বাগ্রে বুঝাইতে হইবে, এবং স্বাভাবিক স্নেহই তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রবর্ত্তিত করিবে। মাতা সরোজিনীকে কোলে লইয়া চক্ষের জল মুছিয়া দিবেন, এবং কোথায় কি আঘাত লাগিয়াছে তাহা দেখিবেন। তাহার পরে, কেন সে এমন কায করিতে গিয়াছিল, এই প্রশ্ন করিয়া তাহার উদ্দেশ্য জানিবেন। তাহার পরে, এই কার্য্যে সরোজিনী যে তিনটি অপরাধ করিয়াছে, তাহা একটি একটি করিয়া ভালরূপে তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। তদনন্তর, উদ্দেশ্য যতই ভাল হউক না কেন, তাহার অনুরোধে অনুষ্ঠিত অপরাধ যে মার্জ্জনীয় নহে, অপরাধের দণ্ড যে অনিবার্য্য, বর্ত্তমান ঘটনায় আচরিত কোন্ অপরাধের কি ফল (শারীরিক ক্লেশ এবং জননীর অসন্তোষ) কি পরিমাণে হাতে হাতে ফলিল, তাহা একে একে বুঝাইতে হইবে; এবং তাহার এই শারীরিক এবং মানসিক কষ্টের অবস্থা প্রবল থাকিতে থাকিতেই ভবিষ্যতে আর এরূপ অপরাধ না করিবার জন্য সাবধান করিয়া দিতে হইবে।

---

৭ সং উঃ (ঐ দেখুন)। (১) আবদারের জিনিস পাইতে অর্থের প্রয়োজন, (২) অর্থ-সংগ্রহে পরিশ্রম লাগে, এবং (৩) অবোধের মাতা দরিদ্র, এই তিনটি বিষয়ে অবোধের বোধ নাই। অবোধ যখন যাহার জন্য ধরিয়াছে তাহাই পাইয়াছে, সুতরাং মা যেমন করিয়া পারেন দিবেন, এই তাহার বিশ্বাস জন্মিয়া গিয়াছে, কাযেই মাতার উপরে তাহার অত্যাচার। অবোধের সংশোধন করিবার দুই উপায়। (১) মাতার প্রায়শ্চিত্ত তিনি অত্যাচার সহিবেন, তথাপি তাহার অনুচিত আবদার পূর্ণ করিবেন না। অত্যাচারিত হইলেও অনুচিত আবদার পূর্ণ করা যে মাতার সাধ্যায়ত্ত নহে, ইহা যে দিন অবোধ বুঝিবে, সে সেই দিন হইতে অত্যাচার ছাড়িবে। (২) অবোধকে পরের নিকটে

রাখিলে ক্রমে ক্রমে সে অর্থ এবং পরিশ্রমের মূল্য বুঝিবে, আবদার ছাড়িতেও বাধ্য হইবে।

---

৮ সং উঃ (ঐ দেখুন)। বালক লোকনাথ ইতর-সংসর্গে যে সুখ বা আমোদ পায়, বাড়ীতে তাহা পায় না,—সন্দেশ, খেলনা বা টাকা পয়সা সে আমোদ তাহাকে দিতে পারে না। প্রথমতঃ ইতর-সংসর্গে সে কি ভাবে থাকে, কিরূপ খেলা করে, কিসে সুখ পায়, অনুসন্ধান করিয়া তাহা জানিতে হইবে, এবং বাড়ীতে যাহাতে সেই সকল অভাব দূর হইতে পারে, নিজে বা লোক রাখিয়া তাহার উপায় অবলম্বন করিতে হইবে। যদি ইহাতেও সুফল না ফলে, তবে স্থান-ত্যাগই বিধেয়; কিন্তু প্রকৃতভাবে যত্ন করিলে প্রথমোক্ত উপায় সফল হইবারই বিশেষ সম্ভাবনা। তাহার আমোদের বিষয়গুলি এমন নিপুণতার সহিত ধীরে ধীরে পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে যে, ক্রমে উহা বালকের সুশিক্ষার উপকরণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে।

---

৯ সং উঃ (ঐ দেখুন)। ধারাপাতের প্রশ্নোত্তরে যে বুঝিবার কিছু আছে, রাম আদৌ তাহা জানে না; শিক্ষক প্রশ্ন করিলে একটা কিছু উত্তর-স্বরূপ বলিতে হয়, এই তাহার বিশ্বাস। উচ্চারিত এক দুই প্রভৃতি সংখ্যার সঙ্গে বাস্তব পদার্থের যে সংস্রব আছে, ইহা তাহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে। এজন্য পয়সা, কড়ি, তেঁতুলের বীজ বা ইত্যাকার অন্য কোন পদার্থের সাহায্য লইতে হইবে। মনে কর কতকগুলি তেঁতুলের বীজ শিক্ষক (বা তাঁহার কোন প্রধান ছাত্র) রামের সঙ্গে সমাংশে ভাগ করিয়া লইয়া খেলা আরম্ভ করিলেন। খেলার সর্ত্ত এই যে, শিক্ষক প্রশ্ন করিবেন, রাম তাহার উত্তর দিবে। যদি উত্তর ঠিক হয়, তবে রাম সেই পরিমাণ তেঁতুলের বীজ পাইবে; কিন্তু উত্তর প্রকৃত না হইলে যত কমী বা বেশী বলিবে, শিক্ষক তত তেঁতুলের বীজ পাইবেন। এইরূপে যাঁহার যে পরিমাণ বেশী তেঁতুলের বীজ হইবে, তিনি সেই পরিমাণে খেলায় জিতিবেন। মনে কর শিক্ষক জিজ্ঞাসা করিলেন, —"ছাব্বিশ কড়া কয় গণ্ডা?" অথবা "সাড়ে ছয় গণ্ডা কত কড়া?" রাম যদি "সাড়ে ছয় গণ্ডা" অথবা "ছাব্বিশ কড়া" বলে, তবে শিক্ষকের নিকট সে ঐ পরিমাণ তেঁতুলের বীজ পাইবে; আর যদি তাহা না বলিয়া "ছয় গণ্ডা" বা "বত্রিশ কড়া" বলে, তাহা হইলে দুই কড়া বা ছয় কড়া তাহাকে দণ্ড দিতে হইবে। (নামতা শিখাইবার সময়ে শিক্ষক মহাশয়েরা এ উপায়টি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন।)

---

১০ সং উঃ (ঐ দেখুন)। মনোযোগের প্রতিবন্ধক দ্বিবিধ, বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক। শব্দ, আঘ্রাণ, দৃশ্য পদার্থ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় বাহ্যিক প্রতিবন্ধক, আর বিষয়ান্তরের চিন্তা আভ্যন্তরিক প্রতিবন্ধক। যতদিন বাহ্য জগৎ এবং মন বর্ত্তমান থাকিবে, তত দিন এই দ্বিবিধ অন্তরায় তিরোহিত হইবে না। এই প্রতিবন্ধককে দূর করিবার একমাত্র উপায় অভ্যাস। যখন যে বিষয়ের অনুশীলন করিবে, তখন তাহাতেই একেবারে লীন হইবার—তাহাতেই ডুবিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে। আরম্ভমাত্রই এ চেষ্টা সফল হইবে না; কিন্তু যখন সফল হইবে, তখন তোমাতে যুগান্তর উপস্থিত হইবে,—তখন দেখিবে, চিন্তার সময়ে কাণের কাছে ঢাক বাজিলেও তুমি তাহা শুনিতে পাইবে না। কি বিদ্যা-শিক্ষা, কি বিষয়-বাণিজ্য, কি সাধন-ভজন, এই মনোযোগের অভাবে কিছুতেই কৃতকার্য্য হওয়া যায় না।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। } মাঘ ১২৯৮ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

অঞ্জলি।

২২

সংযোগ বিয়োগ সব তোমারি ইচ্ছায় হয়,
তোমারি ইচ্ছায় সৃষ্টি, তোমারি ইচ্ছায় লয়!
ইচ্ছাময় তুমি, দেব! মঙ্গলের নিকেতন,
তব হাতে অমঙ্গল কভু কি ঘটিতে পারে?
উদ্যানে কুসুম-তরু যে হাতে রোপণ করে,
নিষ্কারণে সেই হাতে কখন কাটে কি তারে?
হলাহল যেই বিষ পরশিলে প্রাণ যায়,
ত্রিদোষ-বিকার-কালে তাই হয় মহৌষধি;
সুস্থ-জীবনান্ত বিষ রোগীরে করিলে দান,
সুবোধ মানব কেহ নিন্দে কি বৈদ্যের বিধি?
রূপ-বেশে সাজাইয়া জীবনের রঙ্গ-ভূমে
যারে রাখ যত দিন সেই তত দিন থাকে,
অভিনয় হ'লে সাঙ্গ কেন সে থাকিবে আর?
অনন্ত শান্তির কোলে লও তারে দিব্য লোকে!
পার্থিব ক্ষুদ্রতা ছাড়ি লভে সে দেবের প্রেম,
পিয়ে সে স্বর্গীয় সুধা অনন্ত জীবন ভরি;—
আমরা দুর্ব্বল-মতি বুঝি না সে সুখ তার,
'মরিল' বলিয়া তাই বিফলে কাঁদিয়া মরি!

অদ্ভুত জনপদ।

ব্রহ্মানন্দের কাণ্ড দেখিয়া সাহস অবাক্ হইয়া রহিলেন! তিনি বিলক্ষণ চিন্তিত, কথঞ্চিৎ ভীতও হইলেন; কিন্তু পাণ্ডা মহারাজের ভয়েই হউক, আর দেবপুর-যাত্রীর সাথীকে সাহস-শূন্য হইলে চলে না বলিয়াই হউক, তিনি নিরুৎসাহ হইলেন না। বিশেষতঃ তাঁহাকে এ পথের এ ভোগ অনেক দিন ভুগিতে হইয়াছে, আজ তাহা নূতন নহে; তবে ব্রহ্মানন্দকে প্রমোদ-সরোবরে অবগাহন করিতে না দিলে তাঁহার উদ্ধার যতটা সহজ থাকিত, এখন উহা ততটা সহজ রহিল না, এই যাহা হউক।

সাহস ব্রহ্মানন্দকে ক্ষণকালও ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না—সে হুকুম নাই; আবার প্রমোদ-ক্ষেত্রে জলযোগও করিতে পারেন না—তাহাতে নিজের বিপদ হইতে পারে; সুতরাং উপবাস-জাগরণ সহ্য করিয়া তিনি সেই রাত্রিতে সেই লতা-মণ্ডপের বাহিরেই বসিয়া রহিলেন।

দেবপুরের অধিবাসীদিগের অন্তরে অন্তরে কি যেন এক প্রকার তাড়িত-তন্ত্র রহিয়াছে, তাহাতে সর্ব্বদা তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে খবরাখবর চলিতেছে। সাহস আজ গুরুতর [illegible]য় পড়িয়াছেন, দেবপুরবাসী অনেকের [illegible] আপনা হইতে সে ভাবনাটি জাগিয়া উঠিতেছে। কিছুকাল এইরূপ ভাবনার পর একজন দেবপুরবাসী আসিয়া সাহসের নিকট উপস্থিত হইলেন। ইঁহার হাতে একখানি জাল আর এক গাছি দড়ি। চক্ষুঃ দুইটিতে বুদ্ধির তেজ যেন ধক্‌ধক্ জ্বলিতেছে, আর যে কোন বিপদ হইতে যাহাকে তাহাকে উদ্ধার করিবার ভরসা যে পূর্ণমাত্রায় আছে, ভ্রূযুগল যেন তাহার সাক্ষ্য দিতেছে। ইঁহার নাম তর্ক। সাহসের মুখে উপস্থিত বিপদের কথা শুনিয়া তর্ক মহাশয় বলিলেন,—"তা সে জন্য ভয় কি? আমার হাতে কে কবে সহজে নিষ্কৃতি পাইয়াছে? সে জন্য তুই কিছু [illegible] করিস্ না। আমি সে ব্রাহ্মণের নিকট যাইতেছি; যদি সে সহজে কথা না শুনে, এই জাল-দড়ি দিয়া বাঁধিয়া তাহাকে দেবপুরে লইয়া যাইব।" সাহস তর্কের সাহঙ্কার উক্তি শ্রবণ করিয়া বলিলেন,—"দাদা! আপনার এই মূর্ত্তি আর এই জাল-দড়ি দেখিয়া আমাদেরই ভয় হয়, এ ব্রাহ্মণ আপনাকে দেখিলেত ভয়েই মরিয়া যাইবে। বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ দেবপুরের যাত্রী, ইহাকে কয়েদ করিয়া লইয়া যাইবার কোন হুকুম নাই। যাত্রীরা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক দেবপুরে যাইবে, আমরা কেবল সাহায্য করিব মাত্র। দেবপুরের যাত্রীর উপর বল-প্রয়োগের কোন বিধান নাই, তাহাতে তীর্থ-দর্শনের ফলও হয় না। আপনাকে দিয়া উপস্থিত ক্ষেত্রে কোন উপকার পাইব না।" তর্ক সাহসের এই কথাগুলি শুনিয়া কিঞ্চিৎ দুঃখিত হইলেন, এবং আপনার জাল-দড়ি গুটাইয়া লইয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুকাল পরে দেবপুরের আর একজন অধিবাসী আসিয়া সাহসের নিকট উপস্থিত।

যাহারা যমকে কখনও দেখে নাই, আগন্তুককে দেখিলে তাহারা যম বলিয়াই কল্পনা করিতে পারে। আগন্তুকের ভীষণ দেহাকৃতি; চক্ষে ভীষণ দৃষ্টি, হস্তে ভীষণ যষ্টি। ইহাঁর নাম শাসন। শাসন বলিলেন,—"সাহস দাদা! তুমি কি বিপদে পড়িয়া এত ভাবিতেছ? আমি তোমার উদ্ধারের জন্য আসিলাম।" সাহস সমস্ত অবস্থা বলিয়া হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি ব্রাহ্মণটাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে কি?" শাসন দম্ভের সহিত উত্তর করিলেন,—"পারিব না? ব্রহ্মাণ্ডে আমার অসাধ্য কি আছে? আমার প্রভাবে মূর্খ বিদ্বান্ হয়, পাপী ধার্ম্মিক হয়, দুর্দ্দান্ত শিষ্ট হয়, রাজদ্রোহী রাজ-ভক্ত হয়;—একটা সামান্য ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করিতে পারিব না? আমি এখনই ব্রাহ্মণের নিকট যাইতেছি, সে আমার কথা সহজে না শুনে, এই যষ্টির আঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া দিব।"

সাহস ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন,—"ইহা অতি সহজ কার্য্য, এবং এ বিষয়ে তুমি যে খুব পটু তাহাও জানি; কিন্তু নিরীহ ব্রাহ্মণের উদ্ধারের ভার আমি তোমার হাতে দিতে পারি না।" সাহসের কথায় শাসন নিতান্ত দুঃখিত হইয়া বলিলেন,—"না দিলে আর কি করিব! আমি দেখিতেছি এখন আমাকে দেবপুরের বাস ত্যাগ করিতে হয়! কায কর্ম্ম কিছু নাই, খ্রাসাখরচ চালাইয়া থাকা দায় হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে ধর্ম্ম-জগতে আমার যেমন প্রসার ছিল, এখন তাহার কিছুই নাই, কেহই আমাকে ডাকে না। যদি রাজ-সংসারে আর বিদ্যালয়ে মগদা খাটুনির বিশেষ সুবিধা না থাকিত, তবে অনাহারেই আমাকে মরিতে হইত।"

এই বলিয়া শাসন চলিয়া গেলে কিয়ৎকাল পরে একটি বৃদ্ধা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ইহাঁর সমস্ত কেশ শুক্ল, ললাটে চিন্তার রেখা অভিব্যক্ত, গতি ধীর, প্রকৃতি গম্ভীর। দেবপুরের কেহ কোন সমস্যায় পড়িলে ইহাঁর পরামর্শ না হইলে চলে না। ইহাঁর নাম যুক্তি। যুক্তিকে দেখিয়া সাহস আশ্বস্ত হইলেন, এবং সসম্ভ্রমে তাঁহার অভ্যর্থনা করিয়া বলিলেন,—"আমি দেবপুর-যাত্রী একটি ব্রাহ্মণকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি, তাহাকে কোন মতে এখান হইতে লইয়া যাইতে পারিতেছি না। তর্ক এবং শাসন আসিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সাহায্য লইতে আমার সাহস হইল না। আপনি আসিয়াছেন ভাল হইল, আপনি আমাকে এ বিপদ হইতে উদ্ধার করুন।" যুক্তি কিছুকাল মৌনভাবে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—"আমাদ্বারা কোন উপকারের সম্ভাবনা দেখিতেছি না। যেমন ভুক্ত ঔষধ উদরে না থাকিয়া বমন হইয়া গেলে তাহাতে কোন উপকার হয় না, সেইরূপ শ্রুত উপদেশ হৃদয়ে স্থান লাভ করিতে না পারিলে মানসিক রোগ দূর হইতে পারে না। ব্রহ্মানন্দের মন এখন সুখের আবেগ এবং কল্পনায় যেরূপ পূর্ণ হইয়াছে, তাহাতে আমার কথা তাহার হৃদয়ে স্থান পাইবে না; সুতরাং তাহার কোন উপকারও হইবে না। যাহা হউক, তুমি নিশ্চিন্ত থাক, আমি এ রোগের উপযুক্ত চিকিৎসক ডাকিয়া দিতেছি।" এই বলিয়া যুক্তি চলিয়া গেলেন।

ইতিমধ্যে প্রমোদ-ক্ষেত্রের প্রহরীদিগের মধ্যে একটা ভয়ানক গণ্ডগোল উপস্থিত হইল। যুক্তি যখন চলিয়া যান, তখন এক জন প্রহরী তাঁহাকে দেখে, এবং "রাত্রিকালে প্রমোদ-ক্ষেত্রে কে একটা বৃদ্ধাকে প্রবেশ করিতে দিল?" এই বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠে। সেই চিৎকারে প্রহরিগণ সকলেই জাগিল, এবং পরস্পরকে অসাবধানতার জন্য দোষ দিয়া গণ্ডগোল করিতে লাগিল। যুক্তি এই অবসরে প্রমোদ-ক্ষেত্রের বাহিরে গিয়া পড়িলেন, কাযেই প্রহরিগণ পরে অন্বেষণ করিয়া তাঁহাকে পাইল না।

কিছুকাল পরে একটি যুবতী আসিয়া সাহসের নিকট উপস্থিত হইলেন। সাহস দেখিয়াই চিনিলেন, ইনি ভালবাসা।

সাহস। "যুক্তির সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ ছিল কি?"

ভালবাসা। "আপনার এখানে আসিবার জন্য তিনিই আমাকে স্মরণ করিয়াছেন, তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় নাই। আপনার কি কায করিতে হইবে?"

সা। "আমি একটি যাত্রীকে লইয়া বড় বিপদে পড়িয়াছি। ব্রহ্মানন্দ নামে একটি সন্ন্যাসীকে লইয়া আমি দেবপুরে যাইতে ছিলাম, তিনি এখানকার আমোদে এত মাতিয়া গিয়াছেন যে দেবপুরে যাইতে আর কিছুতেই রাজি নহেন। আমি তাঁহাকে বুঝাইতে গিয়াছিলাম, কিন্তু তিনি আমাকে যে সকল কথা বলিলেন, তাহাতে বড়ই ভীত হইয়াছি। তাঁহাকে লইয়া যাইতে পারিব বলিয়া ভরসা হয় না; তবে আপনি যদি তাঁহার মনটা ফিরাইয়া দিতে পারেন, তাহা হইলেই বাঁচি, তাহা না হইলে পাওা মহারাজ আমাকে শাস্তি দিবেন।"

ভা। "সন্ন্যাসী কোথায় আছেন?"

সা। "এই লতা-মণ্ডপের ভিতরেই আমোদে মত্ত আছেন।"

ভা। "আপনি বাহিরে বসিয়া কেন?"

সা। "লতা-মণ্ডপের অভ্যন্তরে যে সকল বীভৎস কাণ্ড চলিতেছে, যে আমোদের তুফান ছুটিয়াছে, তাহার মধ্যে তিষ্টিয়া থাকিতে পারি, এমন সাধ্য আমার নাই। আর বিশেষতঃ সে সকল ব্যাপারে মিশিলে সন্ন্যাসীর মত আমারও অধোগতি হইতে পারে, সে আশঙ্কাও আছে।"

ভা। "সে আশঙ্কায় বাহিরে বসিয়া থাকিয়া সন্ন্যাসীকে কেমন করিয়া উদ্ধার করিবেন? মাছ ধরিতে গেলে গায়ে কাদা না মাখিলে চলে না।"

সা। "আমি এতটা বুঝিতে পারি নাই, এখন আপনি আসিয়াছেন, যাহা বিহিত হয় করুন। আপনার হাতে ও ভাণ্ডটায় কি আছে?"

ভা। "ইহাতে অমৃত-বাহিনীর জল আছে।"

সা। "অমৃত-বাহিনী দেবপুরের নদী, দেবপুরের অধিবাসীরাই কেবল তাহার জল পান করিতে পারে, কিন্তু দেবপুরের বাহিরে এ জল লইয়া যাইবার আদেশ নাই; তবে আপনি ইহা কেমন করিয়া আনিলেন?"

ভা। "কেবল ব্রহ্মানন্দ নহে, এই প্রমোদ-ক্ষেত্রের ভিতর দিয়া দেবপুরে যাইতে অনেক সময়ে অনেক সাধুরই বিপদ ঘটিয়া থাকে, এবং তাঁহাদের উদ্ধারের জন্য আমাকে

দেবপুর ছাড়িয়া আসিতে হয়। অমৃত-বাহিনীর অমৃত ব্যতীত অন্য জল আমি খাই না, সেজন্য দেবপুর ছাড়িয়া অন্যত্র যাই না। প্রথম যে দিন দেবপুরের বাহিরে আসিতে হয়, সে বহুদিনের কথা। সে সময়ে আপনার পিতা সাথীগিরি করিতেন, আপনি তখন নিতান্ত শিশু। একদিন একজন সাধু যাত্রী এখানে আসিয়া আবদ্ধ হন, দেবপুরের কেহই তাঁহাকে উদ্ধার করিতে পারে না। এদিকে আমাদের পাণ্ডা মহারাজ ধর্ম্মরাজের প্রতিজ্ঞা, দেবপুরের উদ্দেশে যে কেহ যাত্রা করিবে, তাহাকে যেরূপেই হউক পথের আপদ বিপদ হইতে উদ্ধার করিয়া লইতে হইবে। তখন তিনি আমাকে ডাকিলেন, কিন্তু অমৃতবাহিনীর জল না খাইলে যে আমার প্রাণ বাঁচে না, একথা তাঁহাকে জানাইয়া আমি অস্বীকার করিলাম। কিন্তু বিপন্ন যাত্রীকে না বাঁচাইলে নাকি দেবপুরের মাহাত্ম্য থাকে না, তাই আমার প্রতি এই বিশেষ নিয়ম করিলেন যে, আমি যেখানে সেখানে অমৃতবাহিনীর জল লইয়া যাইতে পারিব, ইচ্ছা করিলে বা প্রয়োজন হইলে অন্যকে তাহা খাইতেও দিতে পারিব।"

সা। "আপনি বলিলেন, যখন আমার পিতা সাথীগিরি করেন তখন এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং তখন আমি নিতান্ত শিশু ছিলাম। সে বহুদিনের কথা, কিন্তু আপনার চেহারা দেখিলে বয়স্ তেমন অধিক হইয়াছে বলিয়াত বোধ হয় না?"

ভা। "আমি স্থির-যৌবনা। সর্ব্বদা অমৃতবাহিনীর জল খাই বলিয়া, অথবা অন্য কোন কারণে এরূপ হইয়াছে, তাহা বলিতে পারি না। অন্যের কথায় কায কি, আমি কখন শিশু ছিলাম কি না, একথা আমার নিজেরই মনে পড়ে না।"

সা। "আপনাকে বহুদিন হইল দেখিতেছি, আপনাকে চিনিতাম বলিয়াও বিশ্বাস ছিল; কিন্তু আজ দেখিতেছি আপনার পরিচয় কিছুই জানিতাম না।"

ভা। "হাটে বাজারে সকলের সঙ্গে পরিচিত হইতে কোন দিনই আমার ইচ্ছা হয় না, মনের মত মানুষ পাইলে বিরলেই তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া সুখ পাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, আমাকে ভালরূপে চিনেন বলিয়া অনেকেরই মনে ধারণা আছে।"

সা। "ব্রহ্মানন্দের অদৃষ্ট ভাল, আপনি আসিয়া ভালই হইল। ইহাঁকে যদি অমৃত-বাহিনীর একটুকু জল খাওয়াইতে পারেন, তাহা হইলে বোধ হয় বিনা যত্নেই ইহাঁর মতিগতি ফিরিয়া যাইবে।"

ভা। "এটি আপনার বুঝিবার ভ্রম। যে সে ব্যক্তি এ অমৃত পান করিলেই দেবত্ব লাভ করিতে পারে না। শারীরিক ক্ষুধার ন্যায় আধ্যাত্মিক ও এক প্রকার ক্ষুধা আছে; বিনা ক্ষুধায় খাদ্য যেমন অপকারী, অক্ষুধার অবস্থায় অমৃত-পানেও সেইরূপ অপকার জন্মিতে পারে, এই বিবেচনাতেই অমৃত-বাহিনীর জল দেবপুরের বাহিরে লইয়া যাওয়া নিষিদ্ধ হইয়াছে। ক্ষুৎ-পিপাসা-শূন্য অবস্থায় যাহা খাওয়া যায়, তাহার প্রতি আদর থাকে না; অরুচির অবস্থায় খাইলে অমৃতেও অরুচি জন্মে। এইজন্য সুযোগের প্রতীক্ষায় থাকা উচিত; যখনই কাহারও আধ্যাত্মিক ক্ষুৎপিপাসা লক্ষিত হইবে, তখনই তাহাকে

উপযুক্ত পথ্য দিতে হইবে। দেবপুরের অনেক জিনিস পূর্ব্বে বড় দুর্ম্মূল্য ছিল, তখন সে সকল জিনিসে আশার অতিরিক্ত ফলও পাওয়া যাইত। এখন সেই সকল জিনিস বড় সস্তা বিকাইতেছে, অনেক সময়ে বিনা মূল্যেও পাওয়া যায়, কাযেই সে সকল জিনিসে আগেকার মত উপকার হইতেছে না।”

সা। “আমি কিন্তু আপনার কথা বুঝিতেছি না। রোগীর যখন অন্ন-জলে অরুচি হয়, তখন অন্নজল বন্ধ করিয়া দেওয়াই কি চিকিৎসা?”

ভা। “তবে কি সে অবস্থায় অন্ন-জল গাঁজিয়া খাওয়াইতে হইবে? অরুচিতে রুচি জন্মানই প্রধান চিকিৎসা; উপবাস বা অল্পাহারে সে চিকিৎসার সাহায্য হইতে পারে, কিন্তু অরুচিতে অত্যাহার সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও তাহাতে বিপরীত ফলই ফলিবে। আর এক কথা; শারীরিক অরুচি এবং আধ্যাত্মিক অরুচি ঠিক সমান নহে। দীর্ঘকাল মুখের অরুচি থাকিলে মৃত্যু অনিবার্য্য; কিন্তু আধ্যাত্মিক অরুচি লইয়া অনেককে জন্ম কাটাইয়া দিতেও দেখা যায়; সুতরাং এই দ্বিবিধ অরুচি ঠিক সমান নহে, তাহাদের চিকিৎসাও তুল্যপ্রণালীতে হইতে পারে না। আপনি বলিয়াছেন আমার কথা বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু দেবপুরের শিশুরাও ইহা অনায়াসে বুঝিয়া থাকে। বোধ হয় অনেক সময় দেবপুর এবং দেবপুর-বাসীর সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে হয় বলিয়াই আপনার বুদ্ধিতে এরূপ মলিনতা জন্মিয়া থাকিবে।”

শেষোক্ত কথাটির সত্যতা উপলব্ধি করিয়া সাহস কিছু দুঃখিত হইলেন, কিন্তু ধর্ম্মরাজের আদেশ এবং পরোপকারের অনুরোধ স্মরণ করিয়া মনকে প্রবোধ দিলেন। তিনি ভাবিলেন, পরকে কর্দ্দম হইতে তুলিতে গেলে নিজের দেহ অবশ্যই কর্দ্দম-লিপ্ত হইবে, রোগীর শুশ্রূষা করিতে যাইয়া তাহার শয্যা-পার্শ্বে বসিলে শরীরে রোগের বাতাস অবশ্যই লাগিবে, তাহা বলিয়া উপায় কি?

এই সময়ে রজনী প্রভাত হইয়া আসিল। তখন ভালবাসা সাহসকে বলিলেন,—“অনাহার এবং অনিদ্রায় আপনার শরীর ক্লিষ্ট হইয়াছে, অতএব আপনি শান্তির আশ্রমে যাইয়া বিশ্রাম করুন, আমি শীঘ্র হউক আর বিলম্বে হউক একসময়ে সন্ন্যাসীকে আপনার নিকট পঁহুছাইয়া দিব।”

প্রমোদ-ক্ষেত্রের উপকণ্ঠেই শান্তির আশ্রম। প্রমোদ-ক্ষেত্রে উপনীত হইলেই যাত্রীদিগের চিত্ত-বিক্ষেপ জন্মে; সেই চিত্ত-বিক্ষেপ সম্পূর্ণরূপে দূর করিবার জন্যই এই আশ্রমে শান্তি সদাব্রত খুলিয়াছেন। যাত্রিগণ প্রমোদ-ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া এখানে কিছুকাল বিশ্রাম করে, তাহার পরে চিত্তে সুস্থতা লাভ করিলে তবে দেব-পুরের পথে আবার অগ্রসর হয়।

ভালবাসার এই কথা শুনিয়া সাহস কিছুকাল চিন্তা করিলেন, এবং ভালবাসার হাতে ব্রহ্মানন্দের সম্পূর্ণ ভার দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা যাইতে পারে দেখিয়া সে কথায় সম্মত হইলেন। তখন ধীরে ধীরে তিনি শান্তির আশ্রমাভিমুখে চলিলেন, ভালবাসাও লতামণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলন।

হার্বার্ট স্পেন্‌সার।

(পূর্ব্বানুস্মৃতি)

আহারের ন্যায় পরিচ্ছদেও সাধারণতঃ ঝোঁকটা অল্পের দিকে। দেখিয়া বোধ হয়, ইন্দ্রিয়-বেদন অর্থাৎ শীতোষ্ণ-জনিত সুখ-দুঃখ-বোধকে উপেক্ষা করিতে হইবে, এরূপ একটা ভাব যেন লোকের মনে জন্মিয়া গিয়াছে। আমাদিগকে বিপথে চালাইবার জন্যই যেন ইহার সৃষ্টি। বাস্তবিক ইহা ভ্রম। ইন্দ্রিয়-বেদনের অবহেলাতেই নানা-বিধ শারীরিক অমঙ্গল ঘটে। ক্ষুধায় আহার এবং পিপাসায় পান অনিষ্টকর নহে, অক্ষুধায় আহার এবং অপিপাসায় পানই অনিষ্টকর। বিশুদ্ধ বায়ু-সেবনে অনিষ্ট হয় না, কিন্তু পুনঃ পুনঃ শ্বাস-যন্ত্রের আপত্তি জানিতে পারিয়াও অবিশুদ্ধ বায়ু সেবন করিলেই অনিষ্ট ঘটে। শরীর-পরিচালনার স্বাভাবিক প্রকৃতি চরিতার্থ করিলে ক্ষতি হয় না। এই প্রবৃত্তিকে উপেক্ষা করিলেই ক্ষতি হয়। স্বভাব-প্রেরিত আনন্দ-জনক চিন্তাতে ক্ষতি হয় না; কিন্তু শিরঃপীড়ার অবস্থাতেও জেদ করিয়া চিন্তা করিলে হানি আছে। যতক্ষণ আমোদ জন্মে, ততক্ষণ শারীরিক শ্রমে অনিষ্ট হয় না; শরীরে ক্লান্তি জন্মিলেও যদি পরিশ্রম করা যায়, তবে অনিষ্ট ঘটে। অবশ্য যাহারা দীর্ঘকাল হইতে স্বাস্থ্য-বিধি লঙ্ঘন করিয়া আসিতেছে, তাহাদের ইন্দ্রিয়-বেদন বিশ্বাস-যোগ্য না হইতে পারে। যাহারা দীর্ঘকাল গৃহ-নিবদ্ধ থাকে, শরীরের পরিচালনা না করিয়া অনবরত কেবল মস্তিষ্কেরই পরিচালনা করে, এবং আহার-সম্বন্ধে পাক-যন্ত্রের পরামর্শ না লইয়া ঘড়ির কথা শুনিয়াই চলে, তাহাদের দূষিত ইন্দ্রিয়-বেদন বিশ্রাম-যোগ্য না হইতে পারে; কিন্তু প্রথমাবস্থায় ইন্দ্রিয়-বেদনের অবহেলাই এই অস্বাভাবিক পরিবর্ত্তনের কারণ। বাল্যাবধি ইন্দ্রিয়-বেদনকে উপেক্ষা না করিলে তাহার এ দুর্দ্দশা ঘটিত না, তাহার কথা শুনিয়া চলা যাইতে পারিত।

আমাদিগের পরিচালনের জন্য যে সকল ইন্দ্রিয়-বেদন আছে, তন্মধ্যে শীত-গ্রীষ্ম-বোধই প্রধান; যে পরিচ্ছদ ইহার উপযোগী নহে, তাহা নিন্দনীয়। শীত-গ্রীষ্ম সহাইবার অনুকূলে যে মত আছে, স্পেন্‌সার সাহেবের মতে তাহা ভ্রান্ত। ইহাতে অনেক শিশু মরিয়া যায়; যাহারা বাঁচে, তাহারাও খর্ব্বকায় বা দুর্ব্বল হইয়া থাকে। সবল সুস্থ-কায় অনাবৃত-দেহ কৃষক-সন্তানদিগকে দেখিয়া ধনী পিতামাতা মনে করেন তাঁহাদের সন্তানকে অনাবৃত-দেহে রাখিলেও ঐরূপ হইবে। কৃষক-সন্তানের অবস্থা যে অপেক্ষাকৃত অনুকূল, তাহা তাঁহারা ভাবেন না,—সে অনবরত নির্ম্মল বায়ুতে খেলা করে; তাহার মস্তিষ্ক অনুচিত শ্রমে পীড়িত হয় না। অপ্রচুর পরিচ্ছদ তাহাদের স্বাস্থ্যের কারণ নহে; নানা কারণে তাহাদের স্বাস্থ্য এতই ভাল যে, অপ্রচুর পরিচ্ছদেও তাহা নষ্ট হয় না।

শীত-গ্রীষ্ম সহিলে সহিষ্ণুতা বাড়িতে পারে বটে, কিন্তু শরীর-বর্দ্ধনের ক্ষতি হয়। মানব এবং পশুতে এ সত্য জাজ্বল্যমান। শীত-প্রধান দেশের অশ্ব অধিক কষ্ট-সহিষ্ণু হইলেও গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের অশ্ব অপেক্ষা ক্ষুদ্র-কায়। মানব ও মেষ প্রভৃতি সম্বন্ধেও এ কথা সত্য।

শারীরিক তাপ-ক্ষয় যে দৈহিক খর্ব্বতার কারণ, একথা বিজ্ঞান-সম্মত। বিকীরণ দ্বারা শরীরের যে তাপ বাহির হইয়া যায়, তাহার ক্ষতি পূরণার্থ নিয়ত ভুক্ত দ্রব্য হইতে তাপ উৎপন্ন হয়। সুতরাং বিকীর্ণ তাপ অধিক হইলে খাদ্যোৎপন্ন তাপও অধিক হওয়া চাই। কিন্তু পাক-যন্ত্রের শক্তির একটা সীমা আছে, যত ইচ্ছা আহার করিলেই জীর্ণ হয় না—সুতরাং খাদ্যোৎপন্ন তাপের অধিকাংশই বিকীরণের ক্ষতি-পূরণে যায়, শরীর-গঠনের জন্য অতি অল্প মাত্র থাকে। দুর্ব্বল খর্ব্বাকৃতি দেহ ইহার অবশ্যম্ভাবি ফল।

এই জন্যই পরিচ্ছদের এত প্রয়োজন। ফলতঃ তাপ-সম্বন্ধে বিচার করিতে গেলে দেখা যাইবে পরিচ্ছদ অনেক পরিমাণে খাদ্যের কায করে। পশু-পালকেরা একথা বেশ অবগত আছে। অশ্বকে ভাল শিকারী বা ভাল দৌড়ান করিতে হইলে তাহাকে গরম ঘরে রাখা প্রয়োজন।

ক্ষুদ্রায়ত বালক-দেহে বিকীরণ-কার্য্যও অধিক, আবার দেহ-বর্দ্ধনের প্রয়োজনও অধিক; সুতরাং উভয় কারণেই বালকের পরিচ্ছদ শীত-নিবারণ-পক্ষে প্রচুর হওয়া প্রয়োজন। ফ্রান্সে নব-প্রসূত সন্তানকে রেজিষ্টার আফিসে লইয়া যাইতে হয়, তাহাতে শীত লাগিয়া অনেকে মরিয়া যায়। বেলজিয়মে গ্রীষ্মকালে যত শিশু মরে, শীতকালে তাহার দ্বিগুণ মরিয়া যায়।

অতএব বালকের পরিচ্ছদের অল্পতা নিতান্ত অবৈধ। খাদ্যের দুই কার্য্য,—তাপ-রক্ষণ এবং শরীর-বর্দ্ধন। সুতরাং পরিচ্ছদ দ্বারা তাপ-রক্ষণ-কার্য্য যতদূর চলে, শরীর-বর্দ্ধনের পক্ষে ততই লাভ, এ মোটা কথা সকলেই বুঝিতে পারেন।

পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে সর্ব্বজন-গ্রাহ্য নিয়ম এই যে, যাহাতে কিছুমাত্র শীত অনুভূত না হয়, এরূপ পরিচ্ছদ ব্যবহার করা উচিত। এ নিয়ম রক্ষা করিতে গেলে সকলের এক প্রকার পরিচ্ছদ হইতে পারে না।

পরিচ্ছদ-সম্বন্ধে এক একবার এক এক হুজুগ বাহির হয়। হুজুগের অনুরোধে সুবিধা বা উপকারিত্বে অবহেলা করা উচিত নহে।

অনেক পিতা মাতা শিশুকে বহুমূল্য সুন্দর পরিচ্ছদ দিয়া সাজাইয়া রাখেন, কিন্তু পরিচ্ছদ নষ্ট হইবার ভয়ে তাহাকে যথেচ্ছ খেলা করিতে দেন না! ইহাতে সন্তানের কত যে অনিষ্ট হয়, অজ্ঞ পিতামাতা তাহা জানেন না! সুন্দর ফিন্‌ফিনে অপ্রচুর পরিচ্ছদ অপেক্ষা টেঁকসই শীত-নিবারক পরিচ্ছদই বালকের পক্ষে ব্যবস্থা। এরূপ পরিচ্ছদ সুন্দর হয় হউক, কিন্তু সৌন্দর্য্যের অনুরোধে উপকারিত্ব নষ্ট করা বা খেলায় বাধা দেওয়া উচিত নহে।

ভারতবর্ষে এবং ইংলণ্ডে পরিচ্ছদের এক নিয়ম অবলম্বিত হইতে পারে না। ইংলণ্ডের অনুকরণে, আধুনিক সভ্যতার অনুরোধে

পুনর্বৃদ্ধি হয়। এই জন্যই ব্যায়াম হইতে খেলা শ্রেষ্ঠ। খেলার অঙ্গ-চালনে যেরূপ উপকার, খেলার আমোদেও [illegible] উপকার। ব্যায়াম যখন খেলার আমোদ দিতে অসমর্থ, তখন ইহা যে খেলা হইতে অপকৃষ্ট, তাহাতে সন্দেহ নাই।

কিছুই না থাকা [illegible] [illegible]ন থাকা [illegible] ভাল, এবং কোন্ কোন্ অবস্থায় [illegible] বিশেষ উপযোগী, ইহা স্বীকা[illegible] ব্যায়াম যে খেলা হইতে অপকৃ[illegible] তেই হইবে। বালক বা বালিকা যে আমোদ-প্রদ অঙ্গ-চালনে আপনা হইতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা তাহাদের শরীরের পক্ষে কল্যাণকর। এই আমোদ-প্রদ অঙ্গচালনা যাহারা নিষেধ করে, তাহারা শারীরিক পরিণতি-সম্বন্ধে ঈশ্বরের নিয়ম-পালনে বাধা দেয়।

আর একটি বিষয়ে এ পর্য্যন্ত কিছু বলা হয় নাই,—হয়ত এ বিষয়টি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর। অনেকেই বলেন, শিক্ষিত-সমাজে তরুণ এবং প্রৌঢ়দিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগের বয়োজ্যেষ্ঠেরা অধিক বলশালী এবং উন্নতদেহ। প্রথম প্রথম মনে করা যাইত, অসঙ্গত অতীত-বাৎসল্যের ইহাও একটা নিদর্শন। প্রাচীনকালের বর্মের সঙ্গে মিলাইয়া দেখা গিয়াছে এখনকার লোকই আকারে বড়; আবার মৃত্যু-গণনার তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে এখনকার লোকই দীর্ঘজীবী—সুতরাং প্রথম প্রথম কথাটায় তত মনোযোগ দেওয়া হয় নাই। কিন্তু বিশেষরূপে অনুধাবন করিয়া দেখাতে সে বিশ্বাস বিচলিত হইয়াছে। [illegible]জীবী-দিগকে বাদ দিলে দেখা যায়, [illegible]পুরুষই তাঁহাদের পিতার ন্যায় ঔন্নত্য বা স্থূলতা প্রাপ্ত হন না। চিকিৎসকেরা বলেন, সে কালের লোকের রক্তাল্পতা যত সহ্য হইত, এখন তত হয় না। এখন অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে মাথার চুল উঠিয়া যায়; মুখের দাঁত পড়িয়া যায়। শরীরের বলসম্বন্ধেও সেই কথা। পূর্ব্বকার লোক যথেচ্ছভাবে চলিয়াও যাহা সহ্য করিতে পারিত; এখনকার লোক নিয়মমত চলিয়াও ততটা সহ্য করিতে পারে না। পান, আহার, নিদ্রা, জাগরণ, বায়ু-সেবন, পরিচ্ছন্নতা, ইত্যাদি সকল বিষয়ে নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াও পূর্ব্বপুরুষেরা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত পরিশ্রম করিতেন; অথচ তাহাতে তাঁহাদের কোন অনিষ্ট হইত না। আমরা শরীরের মঙ্গল সর্ব্বদাই কামনা করি: আমাদের আহারে মিতাচার, পানে মিতাচার; আমরা নির্ম্মল বায়ু সেবন করি, নির্ম্মল জলে স্নান করি; আমরা বৎসর বৎসর দেশ-ভ্রমণে যাই, আবার উৎকৃষ্টতর চিকিৎসকের সাহায্য পাই; কিন্তু তথাপি আমরা শ্রম সহ্য করিতে পারি না। আমরা স্বাস্থ্য-রক্ষার নিয়ম পালন করিয়াও দুর্ব্বল, পূর্ব্বপুরুষেরা তাহা লঙ্ঘন করিয়াও সবল ছিলেন। আবার উদীয়মান যুবকদিগের চেহারা এবং পুনঃপুনঃ রোগের আক্রমণ দেখিয়া বোধ হয় তাহারা আমাদিগের অপেক্ষাও দুর্ব্বল হইবে।

ইহার কারণ কি? পূর্ব্বপুরুষেরা অত্যাহার এবং প্রচুর পরিচ্ছদে সবল ছিলেন, আমরা অল্পাহার এবং অপ্রচুর পরিচ্ছদে দুর্ব্বল হইতেছি, ইহাই কি কারণ? অথবা বাল্যের উপযোগী খেলার অবহেলাতেই কি এ সর্ব্বনাশ ঘটিতেছে? পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা

ভাবিয়া দেখিলে বোধ হইবে, এ সমস্তই প্রাগুক্ত অনিষ্টের মূলে বর্ত্তমান আছে। স্পেন্সার সাহেব মনে করেন, বর্ত্তমান টিকা দেওয়ার প্রথায় অনেকের গুপ্ত রোগের বীজ সংক্রামিত হইয়া পূর্ব্বোক্ত অনিষ্টের বৃদ্ধি করে। কিন্তু এই সকল কারণ ছাড়া আর একটি প্রবল কারণ আছে; সেইটি অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম।

বর্ত্তমান সময়ে সামাজিক জীবনের যেরূপ গতি, তাহাতে কি বালক কি বৃদ্ধ সকলেরই পরিশ্রম দিন দিন বাড়িতেছে। সকল কার্য্যে এবং সকল ব্যবসায়েই প্রাপ্তবয়স্কদিগের প্রতিযোগিতা দিন দিন তীব্রতর হইতেছে, এবং এই প্রতিযোগিতার উপযোগী করিবার জন্য বালকদিগকেও কঠোরতর নিয়মে শিক্ষা দিতে হইতেছে। ইহাতে দ্বিবিধ অনিষ্ট হইতেছে। পিতা চারিদিকে প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত, এদিকে আবার সাংসারিক বন্দোবস্ত অধিকতর ব্যয়-সঙ্কুল করিতে বাধ্য; সুতরাং তাঁহার বিশ্রাম বা অবসর নাই, সারা বৎসর দিন রাত্রি খাটিয়া তিনি প্রাণান্ত। অবিশ্রাম খাটিয়া পিতার যে স্বাস্থ্য ভগ্ন হয়, তাহা তিনি সন্তানকে দান করিয়া যান। এই জন্ম-রুগ্ন সন্তানকে আবার অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয় সকল আয়ত্ত করিতে হয়।

ইহার অনিষ্টকর ফল যাহা হইতে পারে, তাহা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। যথা ইচ্ছা যাও, অতিরিক্ত অধ্যয়নে ভগ্ন-দেহ বালক বালিকা সর্ব্বত্রই দেখিতে পাইবে। কাহারও অতিরিক্ত দুর্ব্বলতার জন্য এক বৎসর পড়া ছাড়িয়া দিতে হইতেছে, কাহারও মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে, আরোগ্য-লাভের সম্ভাবনা নাই বলিয়া আশঙ্কা হইতেছে। কেহ বিদ্যালয়ে কোন কারণে মস্তিষ্কের অতিরিক্ত উত্তেজনাবশতঃ জ্বরাক্রান্ত হইয়াছে। কেহ বা পড়া শুনা একবার ছাড়িয়া দিয়া আবার বিদ্যালয়ে আসিয়াছে, কিন্তু পড়িতে পড়িতে মূর্চ্ছিত হইয়া প্রায়ই পড়িতেছে। অতি অল্প স্থানের মধ্যে দুই বৎসর কাল বিনা অনুসন্ধানে যে সকল ঘটনা আপনা হইতে চক্ষে আসিয়া পড়িয়াছে, কেবল তাহাই এস্থলে লিপি-বদ্ধ হইল। ইহাতেও সমস্ত বলা হয় নাই। গ্রন্থকার বলেন, স্কটলণ্ডের কোন ছাত্রী-নিবাসে থাকিয়া একজন রমণী অধ্যয়ন করিতেন। তথায় সচরাচর আহারের অল্পতা এবং অধ্যয়নের আধিক্য ঘটিয়া থাকে। উক্ত রমণীর পিতা মাতা খুব সুস্থ হইলেও ঐরূপ কদর্য্য প্রণালীর ফলে তাঁহার স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়। প্রত্যহ প্রাতঃকালে তাঁহার শিরঃপীড়া হইয়া থাকে, এবং তাঁহার সন্তানেরাও যৎসামান্য মানসিক পরিশ্রম করিলেই তাহাদের মাথা ধরে। গ্রন্থকার সর্ব্বদা এমন একজন মহিলাকে দেখিতে পান, যিনি কালেজে পড়ার পরিশ্রমে চিরজীবনের জন্য স্বাস্থ্যটি ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। পাঠ্যাবস্থায় এই সকল মহিলাকে এতই পড়িতে হয় যে তাঁহাদের বিশ্রামের সময় থাকে না; এখন পড়াও সারা হইয়াছে, শরীরটিও সারা পড়িয়াছে। ক্ষুধা মন্দ এবং অনিশ্চিত, মাংসগ্রহণ করিতে অসমর্থ; গ্রীষ্মকালেও হস্ত পদ শীতল; অতি অল্পক্ষণের জন্য নিতান্ত মৃদু-পদচারণা ব্যতীত অন্য পরিশ্রম করিতে শরীর অসমর্থ; সিঁড়ি বাহিয়া উপর তলায় উঠিতে গেলেই হৃদ্‌রোগে অবসন্ন; চক্ষুঃ ক্ষীণ-দৃষ্টি; মাংস-

পেশী শিথিল; দেহ অসম্যগবর্দ্ধিত;—এই সমস্ত এরূপ অধ্যয়নের ফল। ইঁহার সঙ্গিনীর অবস্থা আবার দেখুন; তাঁহার দেহও তুল্য রূপ দুর্ব্বল; তিনি বন্ধু বান্ধবেরও বড় কথা শুনিলে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন; অবশেষে চিকিৎসকের পরামর্শে তাঁহাকে জন্মের মত পড়া শুনা ছাড়িতে হইয়াছে।

এ কথাগুলি ভারতবাসী উন্নতি-বিরোধী হিন্দু বা মুসলমানের কথা নহে,—ইংরাজ-সমাজে চিন্তাশীল পণ্ডিতদিগের অগ্রণী হার্বার্ট স্পেন্সারের এ সকল কথা। ভারতে আধুনিক প্রণালীতে স্ত্রীজাতিকে শিক্ষা দিতে যাঁহারা বড় ব্যাকুল, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া কথাগুলি একবার চিন্তা করিয়া দেখিবেন কি? দেখিয়া শিখিবার জন্য ঈশ্বর আমাদিগকে বুদ্ধি দিয়াছেন; এরূপ শিক্ষায় অনেক লাভও আছে।

এমন বড় বড় উজ্জ্বল প্রত্যক্ষ অনিষ্টের সংখ্যা যদি এত অধিক, তবে যে সকল অনিষ্ট ক্ষুদ্র বলিয়া চক্ষে ভাসে না, তাহাদের সংখ্যা কত অধিক হইবার সম্ভব! প্রত্যক্ষ অনিষ্টের যদি একটি দৃষ্টান্ত দেখা যায়, তবে অপ্রত্যক্ষ অথচ বৃদ্ধিশীল অনিষ্টের হয়ত ছয়টি দৃষ্টান্ত দেখা যাইবে;—কোথাও শারীরিক দুর্ব্বলতা-বশতঃ কোন শারীর যন্ত্র বিকৃত-ক্রিয় হইয়াছে; কোথাও শরীরের বৃদ্ধি ক্রিয়া বাধা পাইয়া অকালে স্থগিত হইয়া গিয়াছে; কোথাও যক্ষ্মারোগের গুপ্ত বীজ ব্যক্ত ও বদ্ধমূল হইয়াছে; আজ কাল বয়স্কদিগের অতিশ্রম-জনিত যে মস্তিষ্ক-বিকৃতি সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, কোথাও বা তাহার অঙ্কুর জন্মিয়া রহিয়াছে। ব্যবসায়ে ও বাণিজ্যে নিবিষ্ট ব্যক্তিদিগের স্বাস্থ্য অতিরিক্ত চিন্তায় কি ভাবে ভগ্ন হইতেছে, ইহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ দেখিতেছেন, তাঁহারা সহজেই বুঝিতে পারিবেন অপূর্ণ-দেহ বালক-বালিকার শরীরে অতিরিক্ত চিন্তার ফল আরও কত ভয়ঙ্কর। বালকেরা পূর্ণবয়স্কের ন্যায় কষ্ট, কিম্বা শারীরিক অথবা মানসিক পরিশ্রম কখনই সহিতে পারে না। এখন ভাবিয়া দেখ, যে অতিরিক্ত মানসিক শ্রম বয়স্কের অসহ্য, বালকের শরীরে তাহা কত অনিষ্টকর!

ফলতঃ বিদ্যালয়ের প্রচলিত প্রথা যেরূপ, তাহাতে অনিষ্ট হওয়া বিচিত্র নহে, শিক্ষার্থীর বাঁচিয়া থাকাই আশ্চর্য্য। ইংলণ্ডে অনেক বিদ্যালয়ে সময়-বিভাগ এইরূপ;—

নিদ্রা	... ...	৯ ঘণ্টা
বিদ্যালয়ে অধ্যয়নাদি ...		৯ ,,
বিদ্যালয়ে বা গৃহে, অধিক বয়স্কদিগের ইচ্ছানুরূপ পাঠাদি, অল্পবয়স্কদিগের খেলা	...	৩½ ,,
আহার	... ...	১½ ,,
মুক্ত বায়ুতে মৃদু ভ্রমণ, পাঠ্য পুস্তক হাতে লইয়া, কেবল যেদিন আকাশের অবস্থা ভাল থাকিবে		১ ,,
	সমষ্টি	২৪ ,,

এরূপ কঠোর নিয়মের ফল কি? না দুর্ব্বলতা, বিমর্ষ, অনুৎসাহ, স্বাস্থ্য-ভঙ্গ। মানসিক অত্যুন্নতির অনুরোধে শারীরিক পরিচালনা একেবারে উপেক্ষা করিলে কেবল যে শারীরিক যন্ত্র বিক্রিয় হয়, এমন নহে; অনেক স্থলে শারীরিক গঠন পর্য্যন্ত বিকৃত হয়। একটুকু লক্ষ্য করিলেই দেখা যায়, অনেকেই এখন অল্প বয়সে কুব্জ হয়।

১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের পরে ইংলণ্ডে এ বিষয়ের অনেক উন্নতি হইয়াছে বলিয়া আশা করা যায়; কিন্তু গ্রন্থকার যাহা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, তাহাতে সে আশা থাকে না। গবর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত শিক্ষক প্রস্তুত করিবার উদ্দেশে স্থাপিত কোন বিদ্যালয়ে তিনি নিম্ন-লিখিত নিয়মাবলী দেখিয়াছেন ;—

সময়।	কার্য্য।
৬টা	ছাত্রদিগের উপস্থিতি,
৭টা হইতে ৮টা	অধ্যয়ন,
৮ ,, ৯ ,,	ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ, উপাসনা, প্রাতর্ভোজন,
৯ ,, ১২ ,,	অধ্যয়ন,
১২ ,, ১½ ,,	ভ্রমণ বা অধ্যয়ন,
১½ ,, ২ ,,	মধ্যাহ্ন-ভোজন,
২ ,, ৫ ,,	অধ্যয়ন,
৫ ,, ৬ ,,	চা পান এবং বিশ্রাম,
৬ ,, ৮½ ,,	অধ্যয়ন,
৮½ ,, ৯½ ,,	পর দিবসের পাঠ অভ্যাস করা,
১০ টার সময়ে	শয়ন।

ইহাতে দেখা যাইতেছে ১০½ ঘণ্টা সময় কেবল অধ্যয়নের জন্যই নির্দ্দিষ্ট আছে; তা ছাড়া অনেক ছাত্র বিশ্রামের সময়েও পড়ে, অনেকে আবার ৪টার সময়ে জাগিয়া পাঠ অভ্যাস করিতে থাকে, এবং শিক্ষকেরা তাহাতে আবার উৎসাহ দেন! ছাত্রদিগকে অতি বিস্তীর্ণ পাঠ্য-তালিকা নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পড়িয়া শেষ করিতে হয়; আবার শিক্ষকদিগের সুখ্যাতি ছাত্রের কৃতকার্য্যতার উপরে নির্ভর করে; কাযেই দৈনিক ১২ কি ১৩ ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম করিতে শিক্ষকেরাই ছাত্রদিগকে উৎসাহিত করেন।

ইহাতে যে শারীরিক অনিষ্ট ঘটে, তাহা উপলব্ধি করিতে বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজন হয় না। ঐ সকল ছাত্রের মধ্যে একজন বলিয়াছিল, ভর্ত্তি হইবার কিছুকাল পরেই ছাত্রের প্রফুল্ল মুখ-শ্রী ম্লান হইয়া যায়। পীড়া ছাড়া নাই, কেহ না কেহ পীড়িত আছেই। ক্ষুধা-মান্দ্য এবং অজীর্ণতা প্রায় সকলেরই আছে। এক তৃতীয়াংশ ছাত্র পেটের পীড়াগ্রস্ত। শিরঃপীড়া অনেকেরই আছে, কেহ কেহ বা দীর্ঘকাল ব্যাপিয়া প্রত্যহ তাহাতে ভুগিতেছে। কতকগুলি আবার একেবারেই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে; সুতরাং পড়া ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়।

যে সকল বিদ্যালয় আদর্শ-স্বরূপ; যাহাদের তত্ত্বাবধান বর্ত্তমান যুগের অতি বিজ্ঞ জ্ঞানীদিগের হস্তে ন্যস্ত, তাহাদের যে এরূপ দুর্দ্দশা, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। পরীক্ষা-প্রণালী কঠোর, কিন্তু তাহার জন্য প্রস্তুত হইবার সময় অল্প, সুতরাং কৃতকার্য্যতার আশা থাকিলে অতিরিক্ত মানসিক শ্রমে শরীর বিনষ্ট নিশ্চয়ই হইবে। এরূপ প্রথায় নির্দ্দয়তা না থাকিতে পারে; কিন্তু ইহা যে অজ্ঞতা-প্রসূত, এ কথা না বলিয়া উপায় নাই।

এরূপ কঠোর বিধান হয়ত অতি অল্প বিদ্যালয়েই আছে; কিন্তু অল্প হইলেও ইহার অস্তিত্ব দেখিয়া বুঝিতে হইবে যে, বর্ত্তমান কালের ছাত্রদিগের মনোবৃত্তি অতি অনুচিত পরিমাণে পরিচালিত হইতেছে। বর্ত্তমান কালের শিক্ষিতদিগের মতানুসারেই ঐ সকল

আদর্শ বিদ্যালয়ের বিধি-ব্যবস্থা হইয়াছে; সুতরাং অনুচিত পরিমাণ পরিশ্রমের দিকেই যে বর্ত্তমান কালের ঝোঁক, ঐ সকল বিধি-ব্যবস্থাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ।

বাল্যে অতিশিক্ষায় যে অনিষ্ট হয়, ইহা সকলেই প্রায় বুঝিয়াছে; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যৌবনের অতিশিক্ষায় যে অকল্যাণ ঘটে, অতি অল্প লোকেই অনুভব করে। শৈশবের অকাল-পক্কতার বিষময় ফল অনেকেই বুঝিয়াছেন; সেই জন্য বালকের মনকে শিক্ষায় উত্তেজিত করিতে দেখিলে অনেকেই নিন্দা করেন। এই অনিষ্টকারিতা যিনি যে পরিমাণে বুঝিয়াছেন, তিনি সেই পরিমাণে শিশু-শিক্ষার বিরোধী। একজন বিখ্যাত শারীর-তত্ত্ববিৎ বলিয়াছিলেন, তাঁহার পুত্রের ৮ বৎসর বয়স্ না হইলে তাহাকে কিছুই শিখাইবেন না; ইহাতেই তাঁহার মতটা যে কি তাহা বুঝা যাইতে পারে। কিন্তু যদিও সকলেই জানেন যে, বাল্য-কালে জোর করিয়া বুদ্ধির অকাল-পক্কতা জন্মাইলে শারীরিক দুর্ব্বলতা, পরিণামে নির্ব্বুদ্ধিতা, এবং অবশেষে অকাল-মৃত্যু পর্য্যন্ত ঘটিতে পারে; তথাপি আশ্চর্য্য এই, কৈশোর হইতে যৌবন পর্য্যন্ত যে এ সকল অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে, তাহা কেহ বুঝেন না। না বুঝিলেন, কিন্তু কথা যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। বৃত্তি সমূহের বিকাশের একটা পৌর্ব্বাপর্য্য এবং একটি নির্দ্দিষ্ট হার বাঁধা আছে। যদি শিক্ষা-প্রণালী সেই পৌর্ব্বাপর্য্য এবং সেই হারের সঙ্গে মিলিয়া চলে, তবেই মঙ্গল। কিন্তু যদি তাহা না হয়—যদি দুরধিগম্য জটিল জ্ঞান-প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে বালকের উন্নত বৃত্তিকে প্রথমেই পরিচালিত করিতে হয়, অথবা বয়সের উপযুক্তভাবে কর্ষিত না হইয়া যদি বালকের মনোবৃত্তি অধিক পরিমাণে কর্ষিত হয়, তাহা হইলে এই অনৈসর্গিক কর্ষণদ্বারা যেটুকু লাভ হইবে, অনিষ্টের পরিমাণ তাহার অধিক না হইলেও সমান নিশ্চয়ই হইবে।

প্রকৃতি বড় শক্ত হিসাবী; যদি এক বিষয়ে তুমি কিছু বেশী লইয়া ফেল, আর এক বিষয়ে সেই পরিমাণে কর্ত্তন করিয়া প্রকৃতি আপন কড়া গণ্ডা বুঝিয়া লয়। শরীর এবং মনের উন্নতির জন্য যখন যাহা যে পরিমাণে উপযোগী, বাল্যকাল হইতে তখন তাহা সেই পরিমাণে যদি যোগাইতে থাক, তাহা হইলে প্রকৃতি তদ্দ্বারা কালসহকারে একটি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর মানব গঠন করিয়া দিবে। অকালে কোন অংশ অধিক উন্নত করিতে চাহিলে প্রকৃতি তোমার কথায় অনিচ্ছা-পূর্ব্বক সম্মত হইতে পারে; কিন্তু এই অতিরিক্ত কার্য্যের অনুরোধে সে অন্য দিকে কোন প্রয়োজনীয় কার্য্য বাদ দিয়া যাইবে। সকল সময়েই শরীরের কার্য্যকারিণী বা জীবনী শক্তির একটা সীমা আছে; সুতরাং এই শক্তির নিকট হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণের অতিরিক্ত কার্য্য পাওয়া যাইতে পারে না। বালক এবং যুবকের জীবনী শক্তির উপরে চারিদিক্ হইতে অনবরত টান পড়িতেছে। প্রত্যহ শারীরিক চালনা এবং মানসিক পরিশ্রমবশতঃ শরীর ও মস্তিষ্কের যে অপচয় হয়, তাহা পূরণ করিতে হইবে; শরীর ও মস্তিষ্কের বর্দ্ধন-কার্য্যেও কিছু শক্তি লাগিবে;

আবার এই সকল কার্য্য সম্পাদন করিবার জন্য প্রচুর পরিমাণে খাদ্য পরিপাক করিতে যে শক্তিব্যয় হয়, তাহাও সামান্য নহে। এখন সহজেই বুঝা যাইতেছে, এই সকল কার্য্যের মধ্যে একটির জন্য অতিরিক্ত শক্তি ব্যয় করিলে কাযেই অন্যগুলির জন্য শক্তির অল্পতা পড়িয়া যায়; ফলতঃ বহুদর্শনেরও ইহাই সিদ্ধান্ত। সকলেই জানেন, গুরুতর আহারের পর পরিপাক-কার্য্যে এতই শক্তি লাগে যে, শরীর ও মন তখন একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়ে, অনেক সময়ে নিদ্রার আবির্ভাবও হয়। সকলেই জানেন, শরীরের অতিরিক্ত পরিচালনে চিন্তা-শক্তি কমিয়া যায়;—সহসা কোন গুরুতর পরিশ্রম বা দূর-পথ ভ্রমণ করিলে এতই অবসাদ জন্মে যে, কোন বিষয়ে আর তখন চিন্তা করিতে প্রবৃত্তি হয় না, মাসেক কাল ভ্রমণ করিলে মন এতই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে যে, আবার তাহাকে কর্ম্মক্ষম করিতে কিছুদিন লাগে; কৃষকদিগের অধিকাংশ সময় শারীরিক পরিশ্রমে অতিবাহিত হয় বলিয়া চিন্তা-শক্তির পরিচালনায় তাহারা অক্ষম। সকলেই জানেন, বালকেরা যখন বড় 'বাড়ন্ত' হইয়া উঠে, তখন তাহাদের শরীর ক্ষীণ এবং মন অবসন্ন হয়। আহারের পরে পরিশ্রম করিলে পরিপাকে ব্যাঘাত ঘটে, বাল্যে অধিক পরিশ্রম করিলে বালক বাড়িতে পারে না,—ইহাতেও বুঝা যাইতেছে, একদিকে শক্তির অধিক প্রয়োগ করিলে আর একদিকে তাহার অল্পতা ঘটে। এনিয়মের ব্যতিক্রম কোন অবস্থাতেই ঘটে না। অনিয়ম অল্পে অল্পেই হউক আর হটাৎ একবারে অধিকই হউক, তাহার কুফল অনিবার্য্য। অতএব বাল্যে বা যৌবনে প্রকৃতি-নির্দ্দিষ্ট শক্তির অতিরিক্ত যদি মানসিক পরিশ্রমে ব্যয়িত হয়, তাহা হইলে অন্য বিষয়ের জন্য যে পরিমাণ শক্তির প্রয়োজন তাহাতে অল্পতা ঘটে; ইহাতে কোন না কোন দিকে অবশ্যই অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। সে সকল অনিষ্ট কি, এখন তাহাই দেখা যাউক।

মানসিক পরিশ্রম যতটা হওয়া উচিত, তাহা হইতে যদি অল্প পরিমাণে অধিক হয়, তাহা হইলে হয় দেহ কিঞ্চিৎ খর্ব্ব হইবে, না হয় দেহের স্থূলতা কিঞ্চিৎ অল্প হইবে, না হয় মাংস-পেশী কিঞ্চিৎ শিথিল থাকিয়া যাইবে। অতিরিক্ত শ্রম-ক্রিয়া-সম্পাদন এবং তজ্জনিত মস্তিষ্কের ক্ষতি-পূরণ জন্য যে অতিরিক্ত শোণিত ব্যয় হয়, তদ্দ্বারা অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি-পূরণ বা গঠন-কার্য্য হইবার কথা ছিল; কিন্তু মস্তিষ্কের অতিরিক্ত প্রয়োজনে তাহা ফুরাইয়া যাওয়াতে অন্যান্য অঙ্গের ক্ষতি হইল। এস্থলে লাভ লোকসান সমান হইল কি? বল-বীর্য্যের পক্ষে যে শারীরিক গঠন নিতান্ত প্রয়োজনীয়, উপার্জ্জিত জ্ঞানদ্বারা তাহার ক্ষতি-পূরণ হইল কি?

মানসিক পরিশ্রম আরও অতিরিক্ত হইলে অনিষ্ট আরও অধিক হয়; তখন শরীরের অপূর্ণতার উপরে মস্তিষ্কেরও অপূর্ণতা ঘটিতে থাকে। কোন কোন পণ্ডিত প্রমাণ করিয়াছেন, বৃদ্ধি এবং পূর্ণতা-প্রাপ্তি পরস্পরের বিরোধী। বৃদ্ধি—আকারের বৃহত্ত্ব; পূর্ণতা-প্রাপ্তি—গঠনের পূর্ণতা-লাভ। এ উভয়ের একটার উন্নতি হইলে আর একটার

অবনতি হইবে। পলুপোকা এবং 'পাকা' পলু ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। প্রথমাবস্থায় পলুর শরীর খুব বাড়িতে থাকে, কিন্তু ভিতরের গঠন-কার্য্য প্রায় স্থগিত থাকিয়া যায়; পলু পাকিলে আর বাড়ে না, বরং ওজন তখন কমিয়া যায়, কিন্তু তাহার গঠন-কার্য্য তখন অতি দ্রুত গতিতে চলিতে থাকে। উচ্চতর জীবে এ প্রভেদ এত স্পষ্টভাবে লক্ষিত হয় না, কারণ এস্থলে বৃদ্ধি ও গঠন উভয়ই যুগপৎ সাধিত হয়। কিন্তু আমাদেরও স্ত্রী এবং পুরুষে এ প্রভেদ স্পষ্ট লক্ষিত হয়। বালিকারা অল্পদিনের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক পূর্ণতা লাভ করে। বালকদেহে গঠন অপেক্ষা বৃদ্ধি-কার্য্য দ্রুত গতিতে চলে। এই নিয়ম সর্ব্বশরীরের পক্ষে যেমন, প্রত্যেক অঙ্গের পক্ষেও সেইরূপ। গঠন-কার্য্যে অতিরিক্ত জীবনী শক্তি ব্যয়িত হইলে কাযেই বৃদ্ধিতে বাধা পড়ে;—একথা অন্যান্য অঙ্গের ন্যায় মস্তিষ্কের পক্ষেও সত্য। প্রথম বয়সে মস্তিষ্কের আকার বড় হয়, কিন্তু গঠন অপূর্ণ থাকে; এ বয়সে মস্তিষ্কের অসঙ্গত পরিচালনা করিলে গঠন-কার্য্যে শক্তি ক্ষয় হইতে থাকে, কাযেই আকারের ক্ষুদ্রতা এবং শক্তির অল্পতা থাকিয়া যায়। অনেক বালক যে অকাল-পক্ক হইয়া বাল্যকালেই সমধিক মানসিক শক্তির পরিচয় প্রদান করে, কিন্তু হঠাৎ সে সকল শক্তি হারাইয়া অভিভাবকদিগের আশা ভরসায় ছাই দেয়, ইহাই বোধ হয় তাহার প্রধানতম কারণ।

অতিরিক্ত শিক্ষা-জনিত অসঙ্গত মানসিক পরিচালনার ইহা একটি কুফল বটে; কিন্তু শক্তি-হীনতা, দুর্ব্বলতা, এবং স্ফূর্ত্তির অভাব-জনিত অনিষ্ট বড়ই গুরুতর। শারীরিক ক্রিয়ার উপরে মস্তিষ্কের শক্তি কত, তাহা আধুনিক বিজ্ঞান-বলে বিলক্ষণরূপে জানা যায়। মস্তিষ্কের উত্তেজনায় পাক-যন্ত্র, রক্ত-সঞ্চালন, এবং অন্যান্য শারীরিক ক্রিয়া বিশেষরূপে আক্রান্ত হয়। শারীর তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা নর-দেহ প্রত্যক্ষ ভাবে পরীক্ষা করিয়া একথার সত্যতা প্রমাণ করিয়াছেন। বিজ্ঞানের সাহায্য না লইলেও ইহা প্রত্যক্ষ করা যাইতে পারে। আশা, নৈরাশ্য, ক্রোধ, অথবা আনন্দ যখন মনে প্রবল হয়, তখন বুকে কিরূপ ধড়ফড় করিতে থাকে, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। এই সকল ভাব কাহারও এত প্রবল হয় যে, হৃদয়ের রক্ত-সঞ্চালন অতি দ্রুতবেগে হইতে হইতে হঠাৎ থামিয়া যায়; তখন মূর্চ্ছা হয়। মানসিক উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক হইলে যে পরিপাক-ক্রিয়ার ব্যতিক্রম ঘটে, তাহাও হয়ত সকলেই জানেন। মনের দুঃখ বা আনন্দ অত্যন্ত অধিক হইলে ক্ষুধা চলিয়া যায়। আহারের অব্যবহিত পরে কোন অসাধারণ আনন্দ বা কষ্টের কারণ ঘটিলে হয় বমন হইয়া যায়, অথবা অতি কষ্টে পরিপাক হয়। যিনিই উৎকট মানসিক পরিশ্রম করেন, তিনিই অল্প বা অধিক পরিমাণে এ সকল প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। যে অবস্থায় শরীর এবং মস্তিষ্কের সম্বন্ধ এত স্পষ্টরূপে অনুভূত হয়, সে অবস্থা সচরাচর না ঘটিলেও, সে সম্বন্ধ নিশ্চয়ই আছে, এবং তাহার ফলও শরীরের মধ্যে ফলিতে থাকে। অত্যন্ত প্রবল অথচ ক্ষণস্থায়ী মস্তিষ্কের উত্তেজনা যেমন অত্যন্ত প্রবল অথচ ক্ষণস্থায়ী ফল উৎপাদন

করে, সেইরূপ মৃদু অথচ দীর্ঘস্থায়ী উত্তেজনা মৃদু অথচ দীর্ঘস্থায়ী ফল উৎপাদন করিয়া থাকে। ইহা অনুমান নহে,—শারীরতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একথা বলিয়া থাকেন, এবং গ্রন্থকার নিজেও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দীর্ঘকাল ধরিয়া অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে শারীরিক যে সকল ক্ষতি হয়, তাহা দূর করিতেও দীর্ঘকাল লাগে। কখনও হৃদয়-যন্ত্রে এ কুফল ফলে; তখন হৃদ্‌রোগ জন্মে, নাড়ী দুর্ব্বল হয়, নাড়ীর স্পন্দন কমিয়া যায়। কখনও বা পাকযন্ত্রেও ইহার কুফল ফলে; তখন অপাক জন্মিয়া যায়, দীর্ঘকাল তাহাতে না ভুগিলে আর নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না। কোন কোন স্থলে পাক-যন্ত্র এবং হৃদয়-যন্ত্র উভয়ই যুগপৎ আক্রান্ত হয়। এ অবস্থায় নিদ্রার অল্পতা ঘটে, আবার তাহা ঘন ঘন ভাঙ্গিয়া যায়; এবং মনের প্রফুল্লতা প্রায়ই থাকে না।

এই যখন অবস্থা তখন ভাবিয়া দেখ, বালক এবং যুবকের শরীরে অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রমের ফল কিরূপ হইতে পারে। অসঙ্গতরূপে মস্তিষ্ককে উত্তেজিত করিলে শরীরে তাহার ফল স্পষ্ট অনুভূত হইবে; প্রয়োজনের অধিক অল্প পরিমাণে উত্তেজিত করিলে তাহার কুফল ক্রমে ক্রমে শরীরে লক্ষিত হইতে থাকিবে। ক্ষুধা অল্প, আহারে অরুচি, পরিপাকে শক্তি-হীনতা, মৃদু রক্ত-সঞ্চালন,—এ অবস্থায় বালকের দেহ কিরূপে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইবে? শারীরিক সমস্ত যন্ত্রেরই উপযুক্ত ক্রিয়ার জন্য প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ রক্তের প্রয়োজন। যথোচিত পরিমাণ বিশুদ্ধ রক্তের অভাবে কোন যন্ত্রই যথোচিতরূপে ক্রিয়া করিতে পারে না, স্নায়ু ও পেশী প্রভৃতি আপন আপন কার্য্য-সাধনের বল পায় না, শরীর যথোচিতরূপে বাড়িতে পারে না। এখন ভাবিয়া দেখ, শরীরের যখন বাড়িবার সময়, তখন দুর্ব্বল পাক-স্থলী রক্তের উপাদান অল্প পরিমাণে যোগাইলে এবং দুর্ব্বল হৃদয় মৃদুভাবে অল্প পরিমাণে রক্ত শরীরে সঞ্চারিত করিলে বালক-দেহের কি ভয়ানক অনিষ্ট হয়!

শরীরের অপকৃষ্টতা অত্যধিক মানসিক শ্রমের ফল, ইহা স্বীকার না করিয়া যখন উপায় নাই, তখন অত্যধিক অধ্যয়নে উৎসাহ দেওয়া কতদূর মূর্খতা, তাহা সকলেরই ভাবিয়া দেখা উচিত। যেদিক দিয়াই বিচার করা যাউক, অত্যধিক অধ্যয়নের অযুক্ততা উপলব্ধি হইবে। জ্ঞান-গ্রহণ পক্ষে ইহা অযুক্ত; কারণ, পাকযন্ত্রের ন্যায় মনও শক্তির অধিক বিষয় আয়ত্ত করিতে পারে না। অতিরিক্ত আহার করিলে যেমন বমন হইয়া যায়, অতিরিক্ত শিক্ষা করিলেও সেইরূপ তাহা মনে থাকে না,—অধীত বিষয় মনোরাজ্যের অভ্যন্তরে স্থান না পাইয়া পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পরেই তাহার স্মৃতির বাহিরে চলিয়া যায়। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করিলে অধ্যয়নে অশ্রদ্ধা জন্মে। হয়ত সেই পরিশ্রমের স্মৃতি-বশতঃ, আর না হয় তজ্জনিত মস্তিষ্কের দুর্ব্বলতা-বশতঃ পুস্তকের উপরে ঘৃণা জন্মে; তখন উত্তরোত্তর উন্নতি না হইয়া অবনতির দিকে—মূর্খতার দিকে গতি ফিরিয়া যায়। এরূপ শিক্ষায় এমন ধারণা জন্মে যে, যে সে প্রকারে জ্ঞানলাভ করিতে পারিলেই হইল, কিন্তু সময় ও চিন্তা ব্যয়

ক্রিয়া-কার্য্য করাই যে জ্ঞান-লাভের প্রকৃত উদ্দেশ্য, একথা মনে থাকে না। কতকগুলি অনায়ত্ত বিষয়ের স্মৃতির বোঝা মনের উপরে চাপাইয়া দিলে বুদ্ধি-বৃত্তি আপনা হইতেই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে। যেমন ভুক্ত দ্রব্য অবিকৃতরূপে না থাকিয়া মাংসের সঙ্গে মিলিত হইলে তবে শরীরে প্রকৃত বলাধান হয়, সেইরূপ অধীত বিষয় মনকে পীড়িত না করিয়া মনের আয়ত্ত হইলে তবেই বুদ্ধি-বৃত্তি সতেজ হয়। এরূপ অকর্ম্মণ্য দেহে বুদ্ধির প্রকৃত বিকাশ অসম্ভব; তাহা সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিলেও বলিতে হইবে যে, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থায় জীবন-যুদ্ধের প্রতিযোগিতায় কৃতকার্য্য হইবার একমাত্র উপায় যে সুস্থ শরীর, তাহার দুর্ব্বলতা-সাধনে বিলক্ষণ ক্ষতি আছে। যাঁহারা মানসিক উৎকর্ষ-সাধনে ব্যগ্র হইয়া বালকের শরীরের দিকে চাহেন না, তাঁহারা ভাবেন না যে, জীবনের কৃতকার্য্যতা সংগৃহীত জ্ঞান অপেক্ষা আয়ত্ত শক্তির উপরেই অধিক নির্ভর করে,—ভাবেন না যে, যে উদ্দেশ্যে তাঁহারা মানসিক উন্নতির অনুরোধে বালকের শরীর নষ্ট করেন, তাঁহাদিগের নিজের আচরণই সে উদ্দেশ্য-সাধনের অন্তরায় হইয়া উঠে। প্রবল ইচ্ছা-শক্তি এবং অদম্য কার্য্যশীলতা শারীরিক তেজের উপর নির্ভর করে, এবং ইহা দ্বারা শিক্ষার ক্ষতি অনেক পরিমাণে পূর্ণ হয়; যখন এই ইচ্ছা-শক্তি এবং কার্য্যশীলতা উচিত পরিমাণে শিক্ষার সঙ্গে সম্মিলিত হয়, তখন অতিশিক্ষিত দুর্ব্বল-দেহ প্রতিযোগীদিগকে উহারা অবলীলাক্রমে পরাস্ত করা অসাধ্য থাকে না। ক্ষুদ্রাকার এবং বৃহৎ কলে অল্প দম দিলে যে কাষ হয়, ক্ষুৎসিৎ এবং ক্ষুদ্র কলে অধিক পরিমাণে দম দিলে তাহা অপেক্ষা অধিক কাষ হয়; অতএব দম-সহনের শক্তিতেই কলের শ্রেষ্ঠতা। এখন ভাবিয়া দেখ, যে কলটি নির্ম্মাণ করিয়া বাষ্প-জনক যন্ত্রটিকে বাষ্প-জননে অক্ষম করিয়া ফেলে, তাহার মূর্খতা কতদূর! জীবনের প্রকৃত মঙ্গল যে কি, তাহার অবধারণেও এস্থলে ভ্রান্তি দেখা যায়। অধ্যয়নকে জীবনে কৃতকার্য্যতার উপায় মাত্র মনে না করিয়া যদি উদ্দেশ্যই মনে করা যায়, তাহা হইলেও তজ্জনিত ভগ্ন স্বাস্থ্যের বিষময় ফল চিরদিন ভোগ করিতে হয়। যে ধনের সঙ্গে চিরদিন শারীরিক অসুস্থতা থাকিয়া যায়, সে ধন উপার্জ্জন করিয়া কি ফল? খ্যাতির সঙ্গে যদি অসুস্থতা চিরদিন থাকিয়া যায়, তবে সে খ্যাতিতেই বা ফল কি? নীরোগ পাক-যন্ত্র, প্রচুর রক্ত-প্রবাহ, এবং তজ্জনিত মানসিক স্ফূর্ত্তিতে যে সুখ, ধন বা বিদ্যায় সুখ হইতে তাহা কম, একথা কেহই বলিতে পারিবে না। চির-রোগী নিজের সৌভাগ্যও ভোগ করিতে পারে না, কিন্তু স্বাস্থ্য-জনিত প্রফুল্লতায় মানুষের দুর্ভাগ্যকেও যেন আবৃত করিয়া রাখে। অতএব আমাদের বক্তব্য এই, অত্যধিক অধ্যয়ন সকল দিকেই অনিষ্টকর;—ইহাতে যে সকল বিষয়ের শিক্ষা হয়, তাহাতে বিস্মৃতি ঘটে; ইহাতে জ্ঞানের প্রতি ঘৃণা জন্মায়; ইহা জ্ঞানের উপযুক্ত কার্য্যে অবহেলা ঘটাইয়া কেবল জ্ঞান-লাভকেই সর্ব্বেসর্ব্বা বলিয়া ভ্রম জন্মায়; যে শক্তির অভাবে বুদ্ধি অকর্ম্মণ্য, ইহা সেই শক্তিকে দুর্ব্বল করিয়া দেয়; ইহাতে এমন রোগ

জন্মাইয়া দেয়, যাহাতে কৃতকার্য্যতায় সুখ দিতে পারে না, এবং অকৃতকার্য্যতায় দুঃখের সীমা থাকে না।

এই অত্যধিক অধ্যয়ন স্ত্রী-প্রকৃতিতে আরও ভয়ঙ্কর কুফল উৎপাদন করে। বালকদিগের যে কিঞ্চিৎ অঙ্গ-চালনা হইয়া থাকে, বালিকাদিগের তাহাও ঘটে না, সুতরাং অত্যধিক মানসিক শ্রমের কুফল সম্পূর্ণরূপেই তাহারা ভুগিয়া থাকে, এই জন্যই পূর্ণাঙ্গ সুস্থ স্ত্রীলোকের সংখ্যা এত অল্প। একদিকে অত্যধিক অধ্যয়ন, অপরদিকে অঙ্গ-চালনার সম্পূর্ণ অভাব; ইহার কুফল শিক্ষিত রমণীমণ্ডলে পরিদৃশ্যমান। যে মাতা আপন তনয়াকে চিত্ত-রঞ্জনে সমর্থ করিবার উদ্দেশ্যে তাহাকে এইরূপে শিক্ষা দেন, তিনি আপনার উদ্দেশ্য আপনিই নষ্ট করেন। হয় তিনি পুরুষের রুচি উপেক্ষা করেন, আর না হয় সে বিষয়ে তাঁহার ভ্রান্তি রহিয়াছে। রমণী শিক্ষিত কি না, পুরুষ এবিষয় অল্পই ভাবিয়া থাকে; কিন্তু রমণী দেখিতে কেমন, তাহার প্রকৃতি কেমন, তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা কিরূপ, সে এ সকল বিশেষরূপে দেখে। ভাষা বা ইতিহাসে অভিজ্ঞতা আছে বলিয়া কবে কে কোন্ রমণীকে বিবাহ করিয়াছে? সুন্দর মুখ-শ্রী চিত্তাকর্ষণের একটা প্রধান উপকরণ। যে সবলা ও সুশ্রী, তাহাকে সকলেই ভাল বাসে। স্বাস্থ্য ভাল থাকিলে চেহারায় যে মাধুর্য্য এবং মনে যে প্রফুল্লতা থাকে, তাহাই অনেকের পূর্ব্বরাগের কারণ। শারীরিক সৌন্দর্য্য-দর্শনে প্রগাঢ় প্রণয়ের উৎপত্তি হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত অনেক দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু শারীরিক এবং নৈতিক সৌন্দর্য্য-ব্যতীত কেবল মানসিক সৌন্দর্য্যে মানুষ প্রণয়োন্মত্ত হইয়াছে, এমন দৃষ্টান্ত অতি বিরল। বাস্তবিক যে সকল গুণ পুরুষের মনে প্রণয় জন্মাইতে পারে, তন্মধ্যে শারীরিক সৌন্দর্য্য প্রথম স্থানীয়, নৈতিক সৌন্দর্য্য দ্বিতীয় স্থানীয় এবং মানসিক সৌন্দর্য্য তৃতীয় স্থানীয়। এই মানসিক সৌন্দর্য্যও উপার্জ্জিত-জ্ঞান-জনিত নহে, বুদ্ধিবৃত্তির স্বাভাবিক স্ফূর্ত্তি-জনিত। যদি কেহ একথা অসত্য মনে করেন, তবে আমরা বলিব তিনি ঐশিক নিয়মের প্রতিবাদ করিতেছেন। যদি এরূপ নিয়মের উপাদেয়ত্ব সহজে অনুভূত না হইত, তাহা হইলেও ইহার কোন বিশেষ উদ্দেশ্য আছে বলিয়া আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইত। কিন্তু যাঁহারা বিষয়টা চিন্তা করিয়া দেখেন, তাঁহারা এই ঐশিক বিধানের উপাদেয়ত্ব সহজেই অনুভব করিতে পারেন। ভাবী বংশের জন্য মঙ্গল-বিধান প্রকৃতির সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ভাবী বংশের জন্য বর্দ্ধিত মনোবৃত্তি এবং অপকৃষ্ট শরীরের ব্যবস্থা থাকিলে বড়ই অনিষ্ট হইত, কারণ তাহা হইলে কয়েক পুরুষের মধ্যেই বংশের লোপ হইয়া যাইত। আবার দেখ, মনোবৃত্তির বিশেষ বিকাশ না হইলেও শরীরকে সুস্থ রাখা নিতান্ত প্রয়োজন; কারণ শরীর সুস্থ রাখিলে ভাবী বংশপরম্পরায় বুদ্ধিবৃত্তির অশেষ উন্নতি হইতে পারিবে। ইহাতেই বুঝা যাইতেছে মানবের সহজ প্রবৃত্তির মূল্য কত অধিক। এই যখন অবস্থা, তখন বালিকার স্বাস্থ্য নষ্ট করিয়া তাহার স্মৃতিশক্তিকে উপার্জ্জিত জ্ঞানের ভারে পীড়িত করা আরও মূর্খতা। শিক্ষা যত উচ্চ হউক

ক্রমেই প্রায়,—যদি তাহাকে শরীরের ক্ষতি না হয়। যদি শুধু বিদ্যার দিকে লক্ষ্য না রাখিয়া মনোবৃত্তির বিকাশের দিকে লক্ষ্য থাকিত, এবং বিদ্যালয়-পরিত্যাগ ও বিবাহের মধ্যবর্ত্তী সময়টা প্রকৃত শিক্ষার পর্য্যবসিত হইত, তাহা হইলে স্বাস্থ্য নষ্ট না করিয়াও রমণীগণ প্রচুর বিদ্যালাভ করিতে পারিত। যে ভাবে অথবা যে পরিমাণে শিক্ষা দিলে শরীরের অনিষ্ট হয়, তাহাতে শিক্ষার উদ্দেশ্য বিফল হয় এবং অনর্থক কষ্ট, পরিশ্রম এবং অর্থব্যয়ই সার হয়। পিতা মাতা বালিকাকে এই প্রণালীমত শিক্ষা দিয়া তাহার ভবিষ্যৎ সৌভাগ্য মাটি করেন। এই প্রণালীর শিক্ষাতে বালিকাদিগের স্বাস্থ্য-ভঙ্গ হয়, শারীরিক কষ্ট এবং মানসিক বিমর্ষতাই তাহাদের ভাগ্যে সার হয়। ইংলণ্ড প্রভৃতি যে সকল দেশে বিবাহে বর কন্যার মনোনয়নের প্রথা প্রচলিত আছে, স্পেন্‌সার বলেন যে সকল দেশে এরূপ শিক্ষিতা রমণী অনেকে আজীবন অবিবাহিতা থাকিতে বাধ্য হয়।

বালকদিগের শারীরিক শিক্ষা এইরূপ নানা কারণে দূষিত। অনাহার, অপ্রচুর পরিচ্ছদ, অপ্রচুর অঙ্গ-চালনা, এবং অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম, এ সকলগুলিই দোষ। প্রচলিত প্রণালী বড়ই কঠোর, ইহা চায় অনেক, কিন্তু পায় অতি অল্প। অত্যধিক মানসিক পরিশ্রমে বয়স্ক অপেক্ষা বালকেরই অধিক অনিষ্ট হয়। এরূপ কুপ্রণালীতে একটি গুরুতর সত্য উপেক্ষিত হইয়া থাকে। অল্পবয়সে শরীরের বৃদ্ধি ব্যতীত অন্য কোন ক্রিয়া হয় না। শৈশবাবস্থায় শারীরিক এবং মানসিক কার্য্য হয় না বলিলেই হয়; তখন শরীরের বর্দ্ধন ক্রিয়াই অত্যধিক পরিমাণে চলিতে থাকে। এইরূপ বাল্য, কৈশোরে, এবং যৌবনে বৃদ্ধিক্রিয়ারই আধিক্য, অন্যান্য সকল ক্রিয়াই ইহার অধীন। সুতরাং এ বৃদ্ধির অবস্থায় শরীরে আয় অপেক্ষা ব্যয় যত কম হয়, ততই মঙ্গল; শারীরিক বা মানসিক পরিশ্রম যাহাতে শরীর বৃদ্ধির অন্তরায় না হয়, তাহাই বিধেয়। ফলতঃ শরীরের বৃদ্ধি যত কমিয়া আসিবে, শারীরিক ও মানসিক পরিশ্রম ততই বর্দ্ধিত হইবে, ইহাই প্রকৃত নিয়ম।

এই অসঙ্গত শিক্ষা-প্রণালীর অনুকূল যুক্তি এই যে, বর্ত্তমান সভ্যতার অবস্থায় ইহা অতি প্রয়োজনীয়। অতীত কালে আক্রমণ ও আত্মসংরক্ষণই প্রধান সামাজিক কার্য্য ছিল, সুতরাং তখন শারীরিক বলবীর্য্যের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। তখন মনোবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে লোকের তেমন মনোযোগ ছিল না, কেহ কেহ বা প্রকাশ্যরূপে ইহার প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করিত। কিন্তু এখন সমাজের অবস্থা অপেক্ষাকৃত শান্তিময় এখন মজুরী ব্যতীত আর কিছুতেই প্রায় শারীরিক বলের প্রয়োজন হয় না। কিন্তু এখন সামাজিক কোন বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে হইলে মানসিক বলের বিশেষ প্রয়োজন, কাযেই মানসিক শিক্ষা অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিয়াছে। এখন আমরা শরীরের আদর এবং মনের অনাদর না করিয়া মনের আদর এবং শরীরের অনাদর করিয়া থাকি। ইহার কোনটিই ভাল নহে। গ্রন্থকার বলেন, মন অপেক্ষা শরীর যে নিকৃষ্ট,

ইহা যখন ইহ জীবনে উপলব্ধি করিবার উপায় নাই, তখন শারীরিক শিক্ষায় উপেক্ষা না করিয়া মানসিক শিক্ষার এত আদর উচিত নহে। এ সম্বন্ধে প্রাচীন এবং আধুনিক উভয় মতের সমবায় হওয়া উচিত।

স্বাস্থ্য-রক্ষা যে ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট একটি কর্ত্তব্য কর্ম্ম, এ বোধ যতদিন না জন্মিবে, ততদিন শারীরিক এবং মানসিক শিক্ষায় সমতা রক্ষিত হইবে বলিয়া বোধ হয় না। শরীরের প্রতি যে কোনরূপ নৈতিক কর্ত্তব্য আছে, এ বোধ অনেকেরই নাই। লোকে সচরাচর যে সকল কায করে ও যেরূপ কথা বলে, তাহাতে বোধ হয়, শরীরের প্রতি যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে যেন তাহাদের স্বাধীনতা আছে। প্রকৃতির আদেশে অবহেলা জন্য যে সকল রোগ জন্মে, লোকে তাহা দুর্ভাগ্য বলিয়া মনে করে,—ইহা যে অন্যায় আচরণের ফল, তাহা ভাবে না। এখন যাহারা তত্ত্বাবধানে আছে, এবং ভবিষ্যতে যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে, তাহাদিগের জন্য যে সকল কুফল সঞ্চিত হইতেছে, সে জন্য অভিভাবকেরা অপরাধী, কিন্তু তাঁহারা যে অপরাধী, এ বোধ তাঁহাদিগের নাই। শারীরিক নিয়ম-লঙ্ঘনের জন্য মাতালদিগকে দণ্ডিত হইতে দেখা যায়; কিন্তু এই এক বিষয় ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে শারীরিক নিয়ম লঙ্ঘন জন্য অপরাধকে রাজ-বিধি অপরাধ বলিয়া স্বীকার করেন না। বাস্তবিক স্বাস্থ্যের যে কোন নিয়ম লঙ্ঘিত হয়, তাহাই শারীরিক পাপ। যখন একথা সকলে বুঝিবে, তখনই শারীরিক শিক্ষার গুরুত্ব লোকে প্রকৃতরূপে উপলব্ধি করিবে।

মহামনাঃ হার্বার্ট স্পেন্সারের শিক্ষা বিষয়ক গ্রন্থের মর্ম্ম বিস্তীর্ণরূপে সঙ্কলিত হইল। পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রণালীতে যে সকল দেশ বিশেষরূপে উন্নতিলাভ করিয়াছে, ইংলণ্ড তাহার মধ্যে উচ্চাসনে উপবিষ্ট; আর সেই ইংলণ্ডে বর্ত্তমান চিন্তাশীলদিগের মধ্যে হার্বার্ট স্পেন্সার বিশেষ প্রসিদ্ধ। তিনি কাল এবং পাত্র বিবেচনা করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহার অনেক কথা ভারতবর্ষের প্রতিও বিশেষরূপে প্রযোজ্য। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রবল প্রবাহ আসিয়া আমাদিগের প্রাচ্য প্রণালীকে পর্য্যুদস্ত করিয়া দিয়াছে, আমরা দিগ্বিদিক্-জ্ঞান শূন্য হইয়া যে দিকে যে পথ দেখিতেছি, সেই দিকে তাহাই ধরিয়া চলিতেছি। শিক্ষা সমাজের ভিত্তি, সুতরাং কোন্ প্রকৃতিতে কি প্রণালীতে কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, তাহা স্থির-চিত্তে অবধারণ না করিয়া বেগে অগ্রসর হওয়া মূর্খতারই রূপান্তর। এদেশে ইংরাজী শিক্ষার প্রচলনের পর প্রায় পঞ্চাশৎ বৎসর গত হইল, সুতরাং এখন স্থির হইয়া এ বিষয়ে চিন্তা করতঃ প্রকৃত পথ অবলম্বন করিবার সময় আসিয়াছে। হার্বার্ট স্পেন্সার ইংলণ্ডের জন্য যে সকল প্রণালী অযুক্ত বলিয়া তাহাদের নিন্দা করিতেছেন, আমরা চক্ষু থাকিতে জানিয়া শুনিয়া, সেই সকল কুপ্রণালীর ফল ভাবী বংশের দেহে ও মনে প্রত্যক্ষ করিয়াও কেন যে সেই ভ্রান্তির পথেই চলিয়া থাকি, তাহা বলিতে পারি না। ভরসা করি দেশের নেতৃগণ রাজ-নীতি, সমাজ-নীতি এবং ধর্ম্ম-নীতি প্রভৃতি সমস্ত নীতির মূল নীতি শিক্ষা-নীতির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে এখন হইতে তাঁহারা মধ্যে মধ্যে অবসর পাইবেন।

সস্তার দুরবস্থা।

কোন নগরীতে অক্ষয় নামে একটি লোক ইক্ষু-দণ্ড খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিয়া শ্রান্ত পথিকদিগের নিকট তাহা বিক্রয় করিত, এবং ইহাতে মাসিক তাহার বিলক্ষণ দশ টাকা লাভও হইত। তাহার একজন প্রতিবাসী গোপাল একদিন তাহার নিকটে উপস্থিত ছিল, এমন সময়ে একজন পথিক ইক্ষু-খণ্ড চিবাইতে চিবাইতে বিক্রেতাকে বলিল, "তোমার এ ইক্ষু মিষ্ট বটে, কিন্তু রসের পরিমাণটা আর একটুকু বেশী হইলে ভাল হইত; ইহাতে পিপাসা যায় না।" বিক্রেতা কিঞ্চিৎ ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল, "আরে মহাশয়, রস বাড়িলে যে মিষ্টি কমিয়া যায়! আকের রসে মিটে না, এমন পিপাসা হইয়া থাকে জল খাও।"

গোপাল পূর্ব্ব হইতেই ইক্ষু-বিক্রেতার আর্থিক উন্নতি দেখিয়া আসিতেছিল, আজ তাহার ব্যবসায় মাটি করিবার উপায় বুঝিল। সে অদ্য বাড়ী যাইয়া সমস্ত উদ্যোগ করিল, এবং পরদিবস বেশ রসাল কতকগুলি ইক্ষুর খণ্ড লইয়া গিয়া অক্ষয়ের পাশে দোকান খুলিয়া বসিল। গোপাল যাহা ভাবিয়াছিল তাহাই হইল, অক্ষয়ের অবনতি এবং গোপালের উন্নতি দিনে দিনে স্পষ্ট বুঝা যাইতে লাগিল।

একদিন অক্ষয় গোবর্দ্ধনকে বলিল, "দেখ ভাই! রসাল ইক্ষুতে যে মিষ্টি কম হয়, অবোধ লোকে ইহা বুঝে না, তাই গোপালের দোকানে সকলেই ঝোঁকে। এখন খারাপ জিনিস লইয়া গোপালের সঙ্গে প্রতিযোগিতা আরম্ভ করি, কি দোকান পাট বন্ধ করি, তাই ভাবিতেছি।"

গোবর্দ্ধন শুনিয়া বলিল, "তুমি দোকান বন্ধ করিবে কেন? লোকে কথায় বলে,

'শুদ্ধপথে থাকরে কানা,
আঁধার রা'তে মিলবে দানা।'

লোককে প্রতারণা করিবে না মনে করিয়া যদি ভাল জিনিসের আমদানি করিতে থাক, দুই চারিদিন না হয় দশদিন পরেও লোকে তোমার মর্ম্ম বুঝিবে, তোমার আদর করিবে।"

গোবর্দ্ধন বাড়ীতে যাইয়া কতকগুলি ইক্ষু কাটিয়া জলে ভিজাইয়া রাখিল, এবং পর দিন অক্ষয় ও গোপালের এক পার্শ্বে যাইয়া দোকান পাতিয়া বসিল।

সেদিন অক্ষয়ের এক পয়সার জিনিসও কাটিল না, গোপালেরও বিক্রয় অনেক কমিয়া গেল। পরদিন হইতে অক্ষয় আর ইক্ষু বিক্রয় করিতে গেল না, এদিকে গোবর্দ্ধনের পসার দিন দিন বাড়িতে লাগিল।

সেই গ্রামে খেপা নামে আর একজন লোক ছিল, সে অক্ষয়কে দোকান ছাড়িয়া দিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিল। অক্ষয় আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিলে খেপা বলিল, "আচ্ছা আমি ইহার প্রতিশোধ লইতেছি; গড়িতে না পারি ভাঙ্গিতে ত পারিব?" এই বলিয়া খেপা কতকগুলি ইক্ষুর চর্ব্বিত ছোবড়া সংগ্রহ করিয়া ভিজাইয়া রাখিল, এবং পরদিন তাহাই লইয়া দোকান খুলিয়া বসিল। "নূতন মাল, খাসা জিনিস, সস্তা! সস্তা!! অতি সস্তা!!! তাহার সঙ্গে উপহারও

আছে।” এই বলিয়া খেপা চিৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিল, লোকে দোকানের নিকটে না আসিতেই রাস্তা হইতে তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিতে লাগিল, এবং যাহার নিকট এক গুণ বিক্রয় করিল, তাহাকে তিন গুণ উপহার দিতে লাগিল। যাহারা খেপার নিকট ইক্ষু-খণ্ড কিনিল, তাহারা উহা খাইতে পারিল না বটে, কিন্তু সস্তা কিনিবার যে অভ্যাসটা তাহাদের জন্মিয়া গেল, তাহা আর ভাঙ্গিল না। যে একদিন খেপার নিকট ইক্ষু-খণ্ড কিনিল, সে আর কোন দিন তাহার নিকট গেল না, কিন্তু গোপাল এবং গোবর্দ্ধনের দোকানে যাইয়াও খেপার দরে জিনিস চাহিতে লাগিল, সেই একগুণ জিনি-সের সঙ্গে তিনগুণ উপহারের জন্য জেদ করিতে লাগিল, কাযেই খেপা ভিন্ন অন্যের দোকানে বিক্রয় বন্ধ হইয়া গেল। খেপার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় অক্ষম হইয়া অগত্যা গোপাল এবং গোবর্দ্ধনকেও দোকান বন্ধ করিতে হইল। ইহার পরে কিছুদিন খেপার দোকানও চলিল, কিন্তু লোকে ছোবড়া কিনিয়া কতকাল প্রতারিত হইবে? ক্রমেই ইক্ষুর উপরে লোকের অশ্রদ্ধা জন্মিল, যে ইক্ষুর দোকান খুলিবে সেই প্রবঞ্চক, লোকে এইরূপ বিশ্বাস করিতে লাগিল, কাযেই কিছুদিন পরে খেপার ছোবড়া-বিক্রয়ও বন্ধ হইয়া গেল। তখন খেপা একদিন অক্ষয়ের কাছে হাসিতে হাসিতে যাইয়া বলিল, “ভাই! মনোরথ সিদ্ধ হইয়াছে—ইক্ষুর ব্যবসায় মাটি করিয়া ছাড়িয়াছি।”*

* ব্যবসায়ে উন্নতি-সাধনের প্রধান উপ-করণ দুইটি,—জিনিসের উৎকর্ষ এবং সৌ-লভ্য। দ্বিতীয়টি উপেক্ষা করিয়া প্রথমটি রাখিলে অনাদরে ব্যবসায় মাটি হয়; দৃষ্টান্ত, ভারতীয় শিল্প। প্রথমকে উপেক্ষা করিয়া কেবল দ্বিতীয়টির দিকে দৃষ্টি রাখিলে ব্যব-সায়ীর পক্ষে প্রতারণা এবং সাধারণের পক্ষে অবিশ্বাস অনিবার্য্য; দৃষ্টান্ত, বিলাতী বস্ত্রাদি।

শিঃ পঃ সঃ।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

যুক্তি অনুসারে তর্ক করিবে যখন,
দলাদলি গালাগালি করিবে বর্জ্জন।

স্বেচ্ছায় সুজন কার মনে দেয় বেথা?
কিন্তু নাহি ফুটে তার তোষামোদে কথা।

চাষার চাষায় ঘটে ভাল সম্মিলন,
ভদ্রেতে চাষায় ভাল মিলে না কখন।

প্রতিবাসী প্রতি করে যে জন বঞ্চনা,
আপনি অজ্ঞাতসারে বঞ্চে সে আপনা।

পুত্রলাভে সেই সুখ, নিশ্চয় সে নর,
পুত্র-জন্য কষ্ট কিন্তু সকলেরি হয়।

যে বাঁধ বারেক দিলে কভু খুলিবে না,
সে বাঁধ দিবার আগে কর বিবেচনা।

শোক-সংবাদ।

মহামান্যা শ্রীমতী ভারতেশ্বরীর জ্যেষ্ঠ পৌত্র,

শ্রীযুক্ত যুবরাজের জ্যেষ্ঠ পুত্র,

বৃটিষ্ সাম্রাজ্যের ভাবী যুবরাজ

আল্‌বার্ট্ ভিক্‌টর্

অকালে মানব-লীলা সম্বরণ করিয়াছেন!

দয়াময় ঈশ্বর শোক-সন্তপ্ত রাজ-পরিবারকে

শান্তি প্রদান করুন।

জন্ম—জানুয়ারি, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দ।

মৃত্যু—জানুয়ারি, ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ।

৺ মোহিনীমোহন সেন গুপ্ত, এম্, এ; বি, এল্;

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে

কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের প্রথম আর্টস্

পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম স্থানপ্রাপ্ত,

ডফ্-বৃত্তি এবং মহারাজ হোলকার-প্রদত্ত

স্বর্ণ-পদকে পুরস্কৃত;

কলিকাতাস্থ ইউনিভার্সিটি কলেজের

ভূত-পূর্ব্ব প্রিন্সিপাল;

শিক্ষা-পরিচরের সহকারী সম্পাদক।

জন্ম—আষাঢ়, ১২৬৭ বঙ্গাব্দ।

মৃত্যু—পৌষ, ১২৯৮ বঙ্গাব্দ।

তৃতীয় ভাগ।] ফাল্গুন [১১শ সংখ্যা।

(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,
৯০ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে
শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্তৃক প্রকাশিত।

অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৷৵০। প্রতি খণ্ডের নগদ মূল্য ৶০ আনা। বিশেষ

প্রকাশার্থ প্রবন্ধ ও বিনিময়ার্থ পত্রিকা পুঁটিয়ায় সম্পাদকের নিকট, সমালোচনার্থ পুস্তকাদি শিক্ষা-পরিচর-সমিতি সম্পাদকের নিকট রামপুর বোয়ালিয়ায় প্রেরিতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের মূল্যাদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট কলিকাতাস্থ কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য এবং বিজ্ঞাপনের নিয়ম তথায় জ্ঞাতব্য।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। } ফাল্গুন ১২৯৮ সাল। { ১১শ সংখ্যা।

অঞ্জলি।

২৩

কি হবে স্বাধীন হয়ে ? কায নাই—কায নাই ;
প্রাণেশ ! অধীন হয়ে চরণে থাকিতে চাই !
তোমাতে নির্ভর করি যে সুখ পরাণে পাই,
যে সুখ প্রাণের ভার রাখিলে তোমার হাতে,
অনন্ত আশার রাশি চরণে অঞ্জলি দিলে
যে সুখ, সে সুখ আর কোথা পাব ত্রিজগতে ?
নয়নত ফুটিল না, উদিল না দিবাকর ;
এ ভব ভীষণ বন, সিংহ-শার্দ্দূলের বাস ;
নাই পথ, নাই ঘাট, নাই পথ-প্রদর্শক ;—
এ ভাবে স্বাধীন হয়ে ঘটাব কি সর্ব্বনাশ ?
আছে যার জ্ঞান-দীপ আর সাধনের বল,
বিবেক-বৈরাগ্য যার অনুগত অনুক্ষণ,
জীবন্ত দেবতা সেই, স্বাধীনতা শোভে তার,—
লয়ে সে অমূল্য ধন কি করিবে মূঢ় জন ?
উলঙ্গ সুতীক্ষ্ণ অসি থাকিলে বীরের হাতে,
গ্রহীতা আপনি বাঁচি বিপদে বাঁচায় পরে ;
দুর্ব্বল বালক কিন্তু খেলিলে সে অসি লয়ে,
[illegible]-পাত [illegible] করিয়া মরে।

অদ্ভুত জনপদ।

সাহস শান্তির আশ্রমে চলিয়া গেলেন, এদিকে ভালবাসা গুন্‌গুন্ স্বরে "না দিলে আপনারি মন, পরের মন কি পাওয়া যায়," ইত্যাদি গাইতে গাইতে লতা-মণ্ডপে প্রবেশ করিলেন।

ব্রহ্মানন্দের পরিচর্য্যায় যে সকল পরিচারক ও পরিচারিকা নিযুক্ত ছিল, তাহারা গান-বাদ্যে বিশেষ শিক্ষিত হইলেও ভালবাসার কণ্ঠ-মাধুর্য্য তাহাদের সংগীতে নাই। ভালবাসার গান শুনিয়া তাহারা সকলেই মোহিত হইল, সন্ন্যাসীত একেবারে আত্মহারা হইয়া গেলেন! সন্ন্যাসী সমস্ত রাত্রি নৃত্য-গীতের আমোদে অতিবাহিত করিয়াছেন, অনিদ্রায় তাঁহার চক্ষু দুইটি লাল হইয়া গিয়াছে। তিনি প্রাতঃকালে নিদ্রার উদ্যোগ করিতেছিলেন, এমন সময়ে ভালবাসার সংগীত তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সে সঙ্গীত শুনিলে আর কি নিদ্রা ভাল লাগে? ব্রহ্মানন্দ মনে করিতে লাগিলেন, তিনি আহার-নিদ্রা ভুলিয়া অনন্তকাল ঐ সঙ্গীত শুনিতে পারেন!

ভালবাসা বলিলেন, "সমস্ত রাত্রি বুঝি আপনার নিদ্রা হয় নাই? একটুকু শয়ন করুন, না ঘুমাইলে শরীরে অসুখ হইবে।"

সন্ন্যাসী। "আপনার সঙ্গীত শুনিয়া আমার ঘুমের ইচ্ছা দূর হইয়াছে; আপনি গান করুন, আমি শুনিয়া তৃপ্ত হই।"

ভা। "আমি আপনার নিকটেই রহিলাম, আপনি ঘুমাইয়া উঠিলেই গান করিব। অনিদ্রায় শরীরে অসুখ জন্মিলে সঙ্গীত ভাল লাগিবে না।"

স। "সুখের রাজ্যে কি অসুখ জন্মে।"

ভা। "জন্মে বই কি? বরং এখানে লোকে যে ভাবে চলে, তাহাতে অপেক্ষাকৃত অধিক অসুখই জন্মিয়া থাকে। তবে অসুখ হইলে সকলেই এখান হইতে তাড়িত হয়, অসুখী কেহ সুখের রাজধানীতে স্থান পায় না, তাই কাহারও অসুখ দেখা যায় না। আজ যাহারা এত যত্নে আপনার পরিচর্য্যা করিতেছে, আপনার পীড়া হইলে তাহারাই নির্দ্দয় ভাবে আপনাকে নগরের বাহিরে ফেলিয়া আসিবে।"

এই সময়ে পরিচারকদিগের মধ্যে "রাজ-দ্রোহ! রাজ-দ্রোহ!" বলিয়া ভয়ানক গোলমাল হইয়া উঠিল। একজন পরিচারক ভালবাসাকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "আপনি কে, আমরা জানি না। প্রথমে আপনাকে দেখিয়া বোধ হইয়াছিল আপনিও সুখের একজন ভৃত্য, কিন্তু আপনার কথা শুনিয়া তাহা বোধ হইতেছে না। আপনি সন্ন্যাসীকে যে সকল উপদেশ দিতেছেন, তাহা আমাদের রাজ-বিধির বিরুদ্ধ। আপনাকে রাজ-সমীপে লইয়া গিয়া এ সমস্ত কথা বলিলে নিশ্চয়ই আপনার ভয়ানক শাস্তি হইবে।"

ভালবাসা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "আপনাদের রাজার নিকটে যাইতে আমার কিছু-

মাত্র ভয় নাই, প্রয়োজন হইলে তাঁহাকেও এ সকল কথা বলিতে প্রস্তুত আছি। আমি যে রাজার পরিচারিকা, তিনি আপনাদের রাজা অপেক্ষা দুর্ব্বল নহেন। আপনাদের রাজ-বিধিতে যাহা নিষিদ্ধ, আমাদের রাজ-বিধি-মতে তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য। বিঘ্ন-গিরি, কাটিয়া দেবপুরে যাইবার যে নূতন পথ হইতেছে, তাহা শেষ হইলে হয়ত এ সকল লোককে এখানে আপনারা আর দেখিতেও পাইবেন না। কিন্তু এ বিষয়ে এক সন্দেহ আছে,—দেবপুরে যাওয়ার পথ এত সহজ হওয়া উচিত কি না, বিঘ্ন-বিপৎসঙ্কুল কষ্টজনক দীর্ঘ পথে অভিজ্ঞতা থাকা দেবপুর-যাত্রীর পক্ষে উপকারী কি না, এ বিষয় লইয়া সংপ্রতি দেবপুরে ভয়ানক তর্কবিতর্ক উঠিয়াছে; সুতরাং এমন হইতে পারে যে, বিঘ্ন-গিরি কাটিয়া সহজে পথ প্রস্তুত হইলেও তাহা কেহ ব্যবহার করিবে না, সকল যাত্রীই এখনকার মত এই পথ দিয়াই যাইবে।”

আর একজন পরিচারক একচিত্তে ভালবাসার এই সকল কথা শুনিতেছিল। কথা শেষ হইলে সে তাহার সঙ্গী পরিচারককে বলিল, “না ভাই! এ স্ত্রীলোকটাকে রাজার নিকট লইয়া যাওয়া হইবে না। ইহার মানুষ ভুলাইবার কেমন একটা শক্তি আছে বুঝিতে পারিতেছি না। এ যখন আমাদের বিরুদ্ধে কথা বলে, তখনও শুনিতে ইচ্ছা হয়; এমন আশ্চর্য্য আর দেখিয়াছ কি? ইহাকে রাজার নিকট লইয়া গেলে ইহার কথা শুনিয়া যদি রাজার মন বিগড়িয়া যায়, আর রাজা যদি এক করঙ্গ হাতে লইয়া এই সন্ন্যাসীর সঙ্গেই বাহির হয়, তাহা হইলে আমাদের জীবিকা কেমন করিয়া চলিবে, তাহাও একবার ভাবিতে হয়।”

এই কথা শুনিয়া ভালবাসা ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, “আপনাদের সে ভয় নাই, আপনাদের রাজা তেমন ছেলে মানুষ নহেন যে কাহারও মুখের দুইটা কথা শুনিয়াই তিনি রাজ্য ছাড়িবেন। বিশেষতঃ তাঁহার যে সকল পরাক্রান্ত ও বিচক্ষণ পারিষদ্ আছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান থাকিতে কাহারও সাধ্য নাই যে সুখের মনে বিকার ঘটায়।”

এদিকে এই সকল কথা হইতেছিল, ইতিমধ্যে ব্রহ্মানন্দ ভালবাসার হাতখানি তাঁহার মাথায় রাখিয়া এবং দৃঢ়রূপে তাঁহার বস্ত্রাঞ্চলখানি ধরিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছেন। তদ্দর্শনে ভালবাসা নীরব হইয়া বসিয়া রহিলেন, লতা-মণ্ডপ-স্থিত পরিচারক ও পরিচারিকাগণও সময় বুঝিয়া প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন জন্য বাহিরে চলিয়া গেল।

অনেকক্ষণ পরে ব্রহ্মানন্দের ঘুম ভাঙ্গিল। তিনি জাগিয়া দেখেন, ভালবাসা নিস্পন্দভাবে বসিয়া তাঁহার দিকে চাহিয়া আছেন, তাঁহার হাত সেইভাবে ব্রহ্মানন্দের মাথার উপরেই রহিয়াছে। ব্রহ্মানন্দ ব্যগ্রতার সহিত বলিলেন, “দেবি! আপনি কে, কোথা হইতে আসিয়াছেন, কোথায় যাইবেন, কেনই বা এ গরিব ব্রাহ্মণের প্রতি এত দয়া, এ সকল কিছুই আমি জানি না, জানিতে ইচ্ছাও করি না; কিন্তু আমার একটি কথা রাখিতে হইবে,—আমাকে একটি ভিক্ষা দিতে হইবে।”

ভালবাসা। “আপনার কি কথা, বলুন।”

সন্ন্যাসী। “আপনি আমাকে আর ছাড়িতে পারিবেন না। আমি আপনার অনুগত হইয়া

থাকিব। আপনি আমাকে যেখানে যাইতে বলিবেন সেখানেই যাইব, যাহা করিতে বলিবেন তাহাই করিব, কিন্তু সর্ব্বদা যেন আপনার সঙ্গে থাকিতে পারি, এই অধিকার আমাকে দিতে হইবে।”

জ্ঞা। “সেজন্য আপনি চিন্তিত হইবেন না। আমি কাহাকেও সহজে দেখা দেই না বটে, কিন্তু একবার যাহার সঙ্গে মিশি, তাহাকে আর কখনও ছাড়ি না।”

স। “এখন কি করিতে হইবে বলুন, আপনি যাহা বলিবেন তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত আছি; যদি প্রমোদ-ক্ষেত্র ছাড়িয়া এই দণ্ডেই যাইতে হয়, তাহাতেও আমার আপত্তি নাই।”

জ্ঞা। “তাহা হইবে না। যখন প্রমোদ-ক্ষেত্রে আসিয়াছেন, তখন অন্ততঃ সুখের সঙ্গে একবার দেখা হওয়া উচিত। এখানে যখন আসিয়াছেন, তখন এখানকার অভিজ্ঞতা না লইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য নহে। আপনি কিছুমাত্র আশঙ্কা করিবেন না, আপনার যেখানে ইচ্ছা সেখানে যান, যাহা ইচ্ছা তাহাই করুন, আমি আপনার সঙ্গে সঙ্গেই রহিলাম।”

ইতিমধ্যে ভৃত্যগণ আবার একে একে লতা-মণ্ডপে ফিরিয়া আসিল। তখন ভালবাসা তাহাদিগকে বলিলেন, “ইনি একবার আপনাদিগের রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে চাহেন; যদি অনুমতি করেন, তবে আমিও সঙ্গে যাইতে পারি।”

একজন ভৃত্য তদুত্তরে বলিতে লাগিল, “আমাদের অধিনায়ক প্রমোদ, তাঁহার অনুমতি”—কিন্তু ভৃত্যের কথা শেষ হইতে না হইতেই অতিথি ব্রহ্মানন্দের সৎকারের তদারক করিবার জন্য প্রমোদ আসিয়া লতা-মণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। সন্ন্যাসীকে প্রমোদ জিজ্ঞাসা করিলেন, “আপনার কোন অসুবিধা হয় নাইত? আপনার সৎকারে কোন ত্রুটি হইলে অনুগ্রহ করিয়া আমাকে জানাইবেন, তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিকার হইবে।”

ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “আপনার অনুগ্রহে পরম সুখে আছি, সেজন্য আপনাকে ব্যস্ত হইতে হইবে না। কিন্তু একবার রাজ-দর্শনের জন্য বড় ইচ্ছা হইয়াছে, যদি অনুগ্রহ করিয়া সে বিষয়ের একটা বন্দোবস্ত করিয়া দেন, তাহা হইলে আমরা যাইয়া একবার রাজ-দর্শন করিয়া কৃতার্থ হই।”

প্রমোদ বলিলেন, “রাজ-দর্শনে কোন বাধা নাই। আমাদের রাজা আগন্তুকের সঙ্গে প্রায়ই আলাপ করেন না, পারিষদদিগের সঙ্গে কথাবার্ত্তায় এবং নিজের অবশ্য-কর্ত্তব্য কায-কর্ম্মেই ব্যস্ত থাকেন। যদি ইহাতে বিরক্ত না হন, তাহা হইলে অবশ্যই তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারেন।” এই বলিয়া একজন ভৃত্যের প্রতি তাঁহাদিগকে রাজ-দর্শন করাইবার আদেশ দিয়া প্রমোদ প্রস্থান করিলেন।

তখনই ব্রহ্মানন্দ এবং ভালবাসা ভৃত্যকে সঙ্গে লইয়া রাজ-দর্শনে চলিলেন। লতা-মণ্ডপের অদূরেই রাজ-প্রাসাদ। প্রাসাদের নিকটে যাইয়া ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, “রাজ-ভবনে প্রবেশ করিবার পাঁচটি দ্বার আছে; আপনারা কোন্ দ্বারে প্রবেশ করিবেন?” সন্ন্যাসী ভালবাসার মত জানিতে চাহিলে তিনি বলিলেন, “এবিষয়ে আমার কোন মতামত নাই,

আপনি ইচ্ছামত দর্শন করিয়া বেড়াইবেন, আমি আপনার সঙ্গে থাকিব মাত্র।” তখন ব্রহ্মানন্দ বলিলেন, “আচ্ছা, তবে আমি সকলগুলি দ্বারই আগে দেখি, তাহার পরে রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিব।”

অল্পক্ষণ পরেই তিনজনে একটি দ্বার-সমীপে উপনীত হইলেন। দ্বারটি অতি সুন্দর ও সুগঠিত। পৃথিবীতে যত প্রকার দৃশ্য আছে, সে সমস্তই বিবিধ বর্ণে সেই দ্বারে চিত্রিত রহিয়াছে, এবং অতি উজ্জ্বল একটি আলোক-পুঞ্জ সেই দ্বারকে ব্যাপিত করিয়া রাখিয়াছে। একজন সুসজ্জিত দ্বার-রক্ষী তথায় দণ্ডায়মান আছে, কিন্তু তাহার চক্ষুঃ পলক-শূন্য, সহসা দেখিলে প্রস্তর-মূর্ত্তি বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। এমন সময়ে হটাৎ সেই দ্বার-রক্ষীর উপরে একটা ছায়া আসিয়া পড়িবামাত্র সে যেন সজীব হইল, তাহার চঞ্চল চক্ষুঃ চারিদিক্ চাহিতে লাগিল, কিন্তু ক্ষণমধ্যে ছায়াটি সরিয়া গেলে আবার সে পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

ভৃত্য বলিল, “ইহার নাম নয়ন-দ্বার, আর এই দ্বার-রক্ষীর নাম দর্শন।”

সন্ন্যাসী। “দ্বারবান্‌টি দেখি প্রায় অচেতনই থাকে; ইহাদ্বারা দ্বার-রক্ষার কার্য্য কেমন করিয়া চলে?”

ভৃত্য। “সকল দ্বারের দ্বারবান্‌ই এইরূপ দেখিতে পাইবেন। ইহারা বহুকালের চাকর, এইরূপেই ইহারা চিরদিন কার্য্য করিয়া আসিতেছে।”

এই দ্বার ছাড়িয়া তিন জনই চলিলেন, এবং আর কিছুদূর যাইয়া আর একটি দ্বার পাইলেন। এখানে নিয়ত নানা প্রকার শব্দ হইতেছে, নানা প্রকার বাদ্য বাজিতে বাজিতে সুখের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতেছে। ভৃত্য বলিল, “এইটি কর্ণ-দ্বার, ইহার প্রহরী শ্রবণ ঐ যে দাঁড়াইয়া আছে।” সন্ন্যাসী দেখিলেন বাদ্য-কোলাহলে কর্ণ-দ্বার বধির হইতেছে, কিন্তু প্রহরী নিস্পন্দ নিদ্রিতের ন্যায় দণ্ডায়মান। হটাৎ অন্তরাল হইতে একটি ছায়া যেমন তাহার গায়ে পড়িল, অমনি “এতক্ষণ সকলে নীরব ছিলে কেন” বলিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল, কিন্তু ছায়াটি চলিয়া গেলে আবার সে পূর্ব্ববৎ নিস্পন্দ হইল।

ইহার পর সন্ন্যাসী তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম দ্বারও দর্শন করিলেন। তৃতীয় নাসা-দ্বার, প্রহরী আঘ্রাণ; চতুর্থ রসনা-দ্বার, প্রহরী রস; পঞ্চম ত্বগ্-দ্বার, প্রহরী স্পর্শ; সন্ন্যাসী লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, একটি বিষয়ে সকলগুলি দ্বারের অবস্থাই সমান,—প্রহরী নিস্পন্দ থাকে, কিন্তু অন্তরাল হইতে একটি ছায়া আসিয়া যেমন তাহার গায়ে পড়ে, অমনি সে জাগিয়া উঠে। ভৃত্যকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, “বাস্তবিক পাঁচটি দ্বারে একজন মাত্র প্রহরী আছে, তাহার নাম মন। মন অনবরত পাঁচ দ্বারে ঘুরিয়া পাঁচটি প্রহরীকে জাগ্রত রাখিতেছে। মন যখন যে দ্বারে যায়, তখনই সে দ্বারের প্রহরী জাগে। মন অনুপস্থিত থাকিলে নয়ন-দ্বার দিয়া যদি হাতী ঘোড়া চলিয়া যায়, দর্শন তাহা দেখিতে পায় না, কর্ণদ্বারে যদি কামানের শব্দ হয়, শ্রবণ তাহা শুনিতে পায় না। অন্তরাল হইতে প্রহরীর গায়ে যে ছায়া পড়িতে দেখিয়াছেন, উহাই মনের

ছায়া। মন অদৃশ্য থাকিয়া অন্তরালে অন্তরালে বেড়ায়।”

দ্বার কয়েকটি দেখা হইলে পর সকলে রাজ-পুরে প্রবেশ করিলেন। সভা-গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়া ভৃত্য বলিল, “এই মহারাজের সভা-গৃহ। রাজ-সভায় প্রবেশ করিবার ঐ যে দ্বার দেখিতেছেন, উহার নাম তোষামোদ। আর দ্বারের সম্মুখে যে প্রহরী দাঁড়াইয়া আছে, উহার নাম অহঙ্কার। এই প্রহরীর কথাগুলি ধৈর্য্যের সহিত শুনিতে হইবে, আর সে যাহা করিতে বলে তাহাই করিতে হইবে, নতুবা রাজ-সভায় প্রবেশ করিতে দিবে না।”

ব্রহ্মানন্দ এবং ভালবাসা তাহাই স্বীকার করিয়া তোষামোদ-দ্বারে উপস্থিত হইলেন। আগন্তুকদিগকে দেখিয়া অহঙ্কার মুখ ফিরাইল, এবং কি যেন বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতেছে, এরূপ ভান করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া রহিল। ব্রহ্মানন্দ লক্ষ্য করিয়া দেখিলেন, প্রহরীর চেহারার কিছুমাত্র মাধুর্য্য নাই। মুখের চেহারা কোমলতা-শূন্য, চক্ষের চাহনী নিতান্ত কর্কশ, কপালের শিরাগুলি ভাসিয়া রহিয়াছে,—ফলতঃ মুখখানি একবার দেখিলে আর তাহা এ জন্মে দেখিতে ইচ্ছা হয় না। অহঙ্কারের আর্থিক অবস্থাও যে খুব ভাল, এমনও বোধ হইল না। তাহার গায়ের জামাটি অতি পুরাতন, দুই একস্থানে ছিন্নও হইয়াছে। দুই পায়ের জুতা দুই পাটই ছিন্ন, তাহাও এক যোড়ার বলিয়া বোধ হইল না। কিন্তু কটী হইতে লম্বমান অসি এবং মস্তকের উষ্ণীষ রাজ-দত্ত বলিয়া তাহা ভগ্ন বা ছিন্ন নহে। লোকটা যে বিশেষ বলবান্ তাহাও বোধ হইল না।

দ্বারের সম্মুখে প্রহরীর নিকটে একখানি দীর্ঘ কাষ্ঠাসন আছে, তাহাতে তিনজন লোক বসিতে পারে। ব্রহ্মানন্দ কিছুকাল অহঙ্কারের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কাষ্ঠাসনে বসিবার মানসে যেমন তাহার নিকটে গিয়াছেন, অমনি অহঙ্কার তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া তাড়াতাড়ি অর্দ্ধশায়িতভাবে কাষ্ঠাসন খানি যুড়িয়া বসিল, এবং ভ্রূ ও ললাট কুঞ্চিত করিয়া গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, “আপনা—তোমরা কেহে?”

সন্ন্যাসী। “আমরা পথিক।”

অহঙ্কার। “পথিক? তবে এখানে কেন? তোমাকে যে সন্ন্যাসীর মত দেখা যাইতেছে! জপতপ যোগযাগ কিছু জানা আছে, না কেবল প্রতারণার জন্য এ বেশ?”

স। “মহাশয়!—”

অ। “যাউক সে কথায় কায় নাই। এ বয়সে অনেক সন্ন্যাসী দেখিয়াছি, অনেক ধর্ম্মশাস্ত্রও পড়িয়াছি, তোমার নিকট নূতন আর কি শুনিব? চাণক্য পণ্ডিত বলিয়াছেন “মাধব নহি সর্ব্বত্রং”, সকল হাতীতে চন্দন জন্মে না। তোমরা বিশ্রাম করিয়াছ? না করিয়া থাকিলে বল, তোমাদের সৎকারের জন্য প্রমোদকে হুকুম দেই।”

ভৃত্য। “জমাদারজি! ইহাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা হইয়াছে, এখন একবার ইহাঁরা মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন, আপনার অনুমতি না হইলেত রাজ-সভায় যাইবার উপায় নাই।”

অ। “হাঁ তাহা জানইত, রাজা প্রজা সব আমার হাতে। আমার হুকুম, আমার

অনুমতি, আমার আদেশ ব্যতীত কখন কাহাকেও রাজবাড়ীতে প্রবেশ করিতে দেখিয়াছ কি? হাঁ তাহা যেন মনে থাকে! এ শর্ম্মার হাতে সকলকেই একবার পড়িতে হয়! মনে থাকে যেন!"

ভৃ। "ইঁহারা এখন রাজ-সভায় যাইতে পারেন কি?"

অ। "তা দেখিতেছি, দাঁড়াও। রাজসভায় আর কি দেখিবে, রাজাই বা কি দেখিবে? হস্ত, পদ, বিদ্যা, বুদ্ধি সকলই এই রকম, তবে ভগবান্ কাহাকেও রাজা করিয়াছেন, মন্ত্রী করিয়াছেন, কাহাকেও বা দ্বারবান্ করিয়াছেন। কিছুদিন হইল রাজার ছয়জন মোসাহেবের প্রয়োজন হইয়াছিল। আমি বলিলাম আমি একাই ছয়জনের কায করিতে পারিব, কিন্তু রাজ-সংসারে বুদ্ধিমানের কথা কে শুনে? সংপ্রতি মৃত্যু পুর হইতে ছয়জন মোসাহেব নিযুক্ত হইয়া আসিয়া রাজ-সংসারে একাধিপত্য করিতেছে।"

জমাদারজির বক্তৃতা শেষ হইবার কোন সম্ভাবনা ছিল না, এমন সময়ে সহসা প্রমোদ আসিয়া দ্বার-দেশে উপস্থিত হইলেন। প্রমোদকে দেখিয়া অহঙ্কার শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, তদ্দর্শনে সন্ন্যাসী একটুকু হাসিলেন। প্রমোদ বলিলেন, "এই বুঝি রাজদ্বারের পাহারা? পরের চাকুরী করিতে হইলে নবাবীটা একটুকু কমাইতে হয়।" জমাদারজি ক্রোধে ও লজ্জায় গণ্ড আরক্তিম করিয়া অস্ফুটস্বরে অসম্বদ্ধ কি বলিতে লাগিলেন, প্রমোদ তাহাতে কর্ণপাত না করিয়া সন্ন্যাসী ও ভালবাসাকে লইয়া দ্বারে প্রবেশ করিলেন।

প্রমোদ বলিলেন, কাহারও অভিবাদনে রাজা দৃক্‌পাত করেন না, সুতরাং সন্ন্যাসী রাজাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সভার একপ্রান্তে বসিলেন, ভালবাসাও তাঁহার সঙ্গে উপবেশন করিলেন। অনন্তর প্রমোদ সভাস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগকে একে একে দেখাইয়া দিলেন, এবং তাঁহাদের নাম বলিয়া দিয়া কার্য্যান্তরে চলিয়া গেলেন।

সন্ন্যাসী বসিয়া দেখিতে লাগিলেন, সুখ রত্ন-সিংহাসনে আসীন, তাঁহার বামপার্শ্বে মহিষী অচিরা। সুখের সম্মুখে সাত জন অমাত্য বৃত্তাকারে উপবিষ্ট। প্রধান মন্ত্রী স্থির ও নীরব, যেন সমস্ত পর্য্যবেক্ষণ করাই তাঁহার কায। অপর ছয়জন অল্পদিন হইল মৃত্যুপুর হইতে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছেন; ইহাঁদের নাম কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য্য।

কাম অতি সুপুরুষ; সন্ন্যাসীর মনে হইতে লাগিল, তিনি এমন সুপুরুষ আর কখন দেখেন নাই। কাম বলিতে লাগিলেন, "মহারাজ! আমি এ জীবনে অনেকের সেবা করিয়াছি; কিন্তু আপনার সেবা করিয়া যত সুখ পাইতেছি, এত সুখ আর কোথাও পাই নাই। নিয়োগকর্ত্তা আগ্রহের সহিত ভৃত্যের সেবা গ্রহণ করিলে তবেই ভৃত্য কৃতার্থ। অনেকে আমাকে ঘৃণা করেন বটে, কিন্তু অজ্ঞাতভাবে আমি তাঁহাদিগের হৃদয়ে লুকাইয়া থাকি। মহাদেব আমাকে ভস্ম করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি জানিতেন না যে আমি অমর। যেখানে আমার একটি পরমাণু থাকিবে, সেখান হইতেই আমার পুনরুৎপত্তি হইতে পারে। মহাদেবের মোটে অষ্টমূর্ত্তি,

কিন্তু আমার অনন্ত মূর্ত্তি। লোকে আমার এই অনন্ত মূর্ত্তি চিনে না বা জানে না, তাই আমাকে জয় করিয়াছে বলিয়া অনেকে স্পর্দ্ধা করে; কিন্তু আমি যেমন অমর, তেমনি অজেয়।”

সুখ বলিলেন, “তুমি যেন অমর, তাই বলিয়া আমাকে অমর করিতে পার কি? আমি যে প্রতি মুহূর্ত্তেই মৃত্যু-ভয়ে শঙ্কিত! না জানি কোন্ মুহূর্ত্তে মৃত্যু আসিয়া উপস্থিত হয়, এই চিন্তায় আমি মুখের গ্রাস সুখে উদরস্থ করিতে পারি না। কেহ কেহ বলেন আমি ঐশ্বর্য্য-সম্ভোগ ছাড়িয়া দিলে অমর না হই দীর্ঘজীবী হইতে পারি। কিন্তু আমি এ সকল-মূর্খ লোকের কথা শুনিতে চাই না। ভোগ-শূন্য দীর্ঘজীবনে কায কি?”

কাম। “মহারাজ! আপনি নিশ্চিন্ত হউন, সুখে ঐশ্বর্য্য ভোগ করুন। আমার সেবা যে করে সে মরে বটে; কিন্তু আমি যাহার সেবক, ইচ্ছা করিলে কি তাহাকে অমর করিতে পারিব না?”

কামের বক্তৃতা শেষ হইলে ক্রোধের পালা আরম্ভ হইল। ক্রোধের দেহ রক্তবর্ণ, চক্ষু দুইটি অগ্নির মত জ্বলিতেছে, নাসিকা দিয়া ঝড়ের ন্যায় শ্বাস বহিতেছে। কিন্তু তিনি অধিক কথায় বক্তৃতা করিতে পারেন না। তিনি বলিতে লাগিলেন, “মহারাজ! আপনার অন্তরায়, আপনার ব্যাঘাত যে জন্মাইবে, তাহার—” এই মাত্র বলিয়াই বাক্‌রুদ্ধ হইয়া গেল, হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া রহিল, চক্ষু ঘুরিতে লাগিল, শরীর কাঁপিতে লাগিল, দন্তে দন্তে কড়মড় শব্দে ঘর্ষণ হইতে লাগিল। [illegible] অমু-ভাজিতে নষ্ট হইয়া উঠিল। [illegible] হাসিলেন, সুতরাং ক্রোধের বক্তৃতার আর প্রয়োজন হইল না।

লোভ নীরবে ভাবিতেছিলেন। কখন কামের রূপটা পাইতে, কখন সুখের সিংহাসনটায় বসিতে, কখন বা অচিরার সঙ্গে দুইটা কথা বলিতে তাঁহার ইচ্ছা হইতেছিল। ফলতঃ লোভের ইচ্ছাটি বড়ই প্রবল, বড়ই ক্রিয়াশীল; লোভের নিদ্রাবস্থাতেও তাঁহার ইচ্ছাটি যেন জাগ্রত থাকে।

লোভ বলিলেন, “মহারাজ! কথায় আর কি পরিচয় দিব? যদি আপনার সংসারে কিছু দীর্ঘকাল অন্ন-জলের বরাত থাকে, তবে দেখিতে পাইবেন, জগতে যাহা কিছু সুন্দর ও মনোজ্ঞ আছে, সে সমস্ত আনিয়া আপনার রাজধানী সাজাইয়া দিব।”

লোভের পর মোহ। মোহের আকৃতি প্রকৃতি কিছুই ঠিক পাওয়া যায় না, দেখিলে বোধ হয় যেন গাঢ় অহঙ্কারের একটা স্তূপ বসিয়া আছে।

সন্ন্যাসী ভালবাসাকে বলিলেন, “প্রবৃত্তি-নদী পার হইবার সময়ে ইহাকে যেন দেখিয়াছিলাম;” ভালবাসা বলিলেন, “দেবপুর-বাসীদিগের মত ইহাদেরও সর্ব্বত্র বিদ্যমান থাকিবার শক্তি আছে।”

মোহ বলিলেন, “মহারাজ! দেহাতিরিক্ত একটা আত্মা আছে বলিয়া অনেকের বিশ্বাস, কিন্তু এ পর্য্যন্ত কেহ তাহা দেখে নাই। এ দিকে শরীরের যে প্রত্যক্ষ কতকগুলি সুখ আছে, তাহা কেহই বোধ হয় অস্বীকার করিতে পারিবে না; সুতরাং [illegible] ছাড়িয়া নিশ্চিতের সেবা করাই শ্রেয়। [illegible]

করিয়া শরীরের সুখের জন্য পাগল হয়, তাহা হইলে সংসারে যে ভয়ানক বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হইবে, তাহা আমি বুঝিতে পারিতেছি; সেই জন্য আমার পরামর্শ, একদল ধর্ম্ম-প্রচারক নিযুক্ত করা হউক। এই সকল প্রচারক এই কথা প্রচার করিবে যে, শরীরের সুখ কিছুই নহে, আধ্যাত্মিক সুখই মানবাত্মার উপভোগ্য। এই উপায় সফল হইলে শারীরিক সুখ-ভোগে প্রতিদ্বন্দ্বীর সংখ্যা কমিয়া যাইবে, কাযেই আমাদের সুখ-ভোগে আর কোন প্রতিবন্ধকই থাকিবে না।"

মোহের প্রস্তাবে সভাস্থ সকলেই "সাধু সাধু!" বলিয়া উঠিলেন, এবং প্রচারক-নিয়োগের জন্য সেই মুহূর্ত্তেই একটি সমিতি গঠিত হইল। প্রধান মন্ত্রী চতুর তখন উৎফুল্ল মুখে বলিলেন, "নূতন সচিবদিগের নিয়োগ-সম্বন্ধে যে বিশেষ বিচক্ষণতা প্রকাশ হইয়াছে, মহারাজ বোধ হয় এখন তাহা বুঝিতে পারিতেছেন।" সুখ বলিলেন, "এরূপ যোগ্যতা আছে জানিয়াই আপনাকে প্রধান মন্ত্রিত্ব দিয়াছি।"

মদ বলিলেন, "মহারাজ! আপনি অন্যের যতই প্রশংসা করুন না কেন, আমি নিশ্চয় জানি আমার মত বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, রূপবান্ গুণবান্ আর কেহ নাই। তবে আমার বক্তৃতা আপনাদের নিকট ভাল লাগে না বলিয়াই নীরব থাকি, নিজের পরিচয় দিবার সুযোগ পাই না।"

মদ নীরব হইলেন। মাৎসর্য্য এতক্ষণ হিংসায় জ্বলিতেছিলেন, এখন সুযোগ পাইয়া বলিতে লাগিলেন, "বিধাতার যেমন বুদ্ধি নাই, তিনি চিরদিনই অপাত্রে অনুগ্রহ বর্ষণ করেন; নতুবা তিনি কামকে রূপবান্ এবং চতুরকে বুদ্ধিমান করিবেন কেন? সংসারে কত লোককে তিনি রাজা করিয়াছেন; আমাকে একটা রাজত্ব দিলে আমি কি তাহা শাসন করিতে পারিতাম না? সংসারের চারিদিকেই অবিচার, চারিদিকেই দুর্ব্বিধান,—দেখিয়া শুনিয়া বোধ হয় কেবল আমাকে নির্য্যাতন করিবার জন্যই বিধাতার সকল বন্দোবস্ত!"

মাৎসর্য্যের বক্তৃতা শেষ হইল। রাজ-মহিষী অচিরা রাজার বাম পার্শ্বে উপবিষ্ট আছেন, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি নিমেষমাত্র এক-স্থানে স্থির থাকিতেছে না, তাঁহার মন নিবিষ্ট ভাবে এক বিষয়ের চিন্তা করিতে পারিতেছে না। মাৎসর্য্যের কথা শেষ হইলেই তিনি সভা-ভঙ্গের আদেশ জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেন। তদনুসারে সভা-ভঙ্গ-সূচক তূর্য্য-ধ্বনি হইল, সভা ভাঙ্গিয়া গেল, সন্ন্যাসী এবং ভালবাসাও চলিলেন, কিন্তু দ্বার-দেশে প্রমোদের সঙ্গে তাঁহাদের সাক্ষাৎ হইলে প্রমোদ তাঁহাদিগকে রাজার স্নানাহার-দর্শনের জন্য ফিরাইয়া আনিলেন।

দর্শনার্থিগণ রাজার সঙ্গে স্নানাগারে প্রবেশ করিলেন। নানাবিধ সুগন্ধি তৈল ও জলে এই আগার পরিপূর্ণ। অনেকগুলি ভৃত্য রাজ-দেহে নানাবিধ তৈল মর্দ্দন করিল, নানা প্রকার জল দিয়া রাজাকে স্নান করাইয়া দিল; কিন্তু রাজার কিছুতেই তৃপ্তি হইল না। কোন তৈলের গন্ধ নিতান্ত মৃদু, কোনটা বা অত্যন্ত উগ্র। জলের শীতোষ্ণতা-সম্বন্ধেও সেই কথা। সুতরাং রাজা ইহাতে সুখ পাইবেন কেন? রাজার পক্ষে

ইহাও যায় নহে, একরূপ বিড়ম্বনা মাত্র! রাজার বিশ্বাস, অতুল বিভব থাকিতেও যে তাঁহার সুখ হয় না, ইহা কেবল কর্ম্মচারীদিগেরই বন্দোবস্তের দোষ।

...মের কার্য্য একরূপ দুঃখে কষ্টে নির্ব্বাহ হইলে রাজা ভোজনাগারে প্রবেশ করিলেন। রসনা ও নাসিকার তৃপ্তি-প্রদ যত প্রকার সামগ্রী পৃথিবীতে আছে, সমস্তই এখানে একত্র হইয়াছে। রাজা আহারে বসিলেন, চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় বিবিধ সামগ্রী তাঁহার নিকটে আনীত হইল। সম্মুখে পাচক ও ভৃত্যগণ কম্পিতদেহে দণ্ডায়মান, কি জানি কাহাকে কখন প্রহার খাইতে হয়! রাজা বাহাদুরের অন্যান্য ব্যাপারের ন্যায় আহারও অলৌকিক—দেখিবার বিষয় বটে! কোন ব্যঞ্জনে লবণ বা মরিচ অধিক হইয়াছে বলিয়া পাচকের প্রতি প্রহারের আদেশ হইল, আবার কোন ব্যঞ্জনে লবণ বা মরিচ অধিক হয় নাই, এই অপরাধে পাচকের পৃষ্ঠে প্রহার হইতে লাগিল। কোন সন্দেশ অধিক মিষ্ট হয় নাই বলিয়া, কোনটা বা অধিক মিষ্ট হইয়াছে বলিয়া ভৃত্য প্রহার খাইতে লাগিল! সামগ্রীর সংখ্যা এতই অধিক যে, প্রত্যেকের কণামাত্র করিয়া খাইলেও একটা হাতীর পেট ভরিয়া যাইতে পারে, সুতরাং কিছুকাল আহারের পর রাজার পেট ভরিয়া গেল। রাজ-বৈদ্য ঔষধপত্র সহ সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকেন, ক্ষুধার ঔষধ দিবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ হইল। বৈদ্যরাজ একটি বটিকা দিয়া বলিলেন, "এই ঔষধটা খাইয়া কিছুকাল উদরকে বিশ্রাম করিতে দিলেই ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হইবে এবং ক্ষুধা জন্মিবে।"

সুখ। "উদরকে বিশ্রাম করিতে দিলে বিনা ঔষধেও ভুক্ত অন্ন জীর্ণ হয়, তবে আর ঔষধের প্রয়োজন কি?"

বৈদ্য। "বিনা ঔষধে অন্ন জীর্ণ হইতে যত সময় লাগিবে, ঔষধের সাহায্যে তদপেক্ষা অল্প সময় লাগিবে।"

সুখ। "তবে খুব অধিক পরিমাণে ঔষধ খাইলে অতি শীঘ্র জীর্ণ হইবে না কেন?" এই বলিয়া বৈদ্যের নিকট হইতে ঔষধের ভাণ্ডটি লইয়া মুষ্টি মুষ্টি ঔষধ খাইতে লাগিলেন, বৈদ্যের নিষেধ শুনিলেন না। কিন্তু এত ঔষধ সহ্য হইল না, খাইতে খাইতেই বমন হইয়া গেল, সুতরাং আর আহার ঘটিল না। তখন বরফের জন্য ভৃত্যকে আদেশ করিলেন। ভৃত্য বরফ আনিয়া হাতে দিল, কিন্তু বরফ হাতে লইয়াই রাজা ক্রোধে অধীর হইয়া উঠিলেন, এবং "বরফ এত ঠাণ্ডা কেন? ভাল বরফ কি পাওয়া যায় না?" এই বলিয়া ভৃত্যের দিকে বরফ ছুড়িয়া ফেলিয়া আহারের অভিনয় শেষ করিলেন।

অতঃপর প্রমোদ বলিলেন, ইচ্ছা করিলে ব্রহ্মানন্দ সুখের শয়নাগারের অভিনয়ও দেখিতে পারেন; কিন্তু ব্রহ্মানন্দের ক্লান্তি-বোধ এবং কৌতূহল-নিবৃত্তি হওয়াতে আর তথায় অপেক্ষা করিলেন না।

ভালবাসা এবং ব্রহ্মানন্দ সভা-মণ্ডপের দিকে যাইতেছিলেন, ইতিমধ্যে সহসা একটি মনুষ্যের আর্ত্তনাদ তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিল। তাঁহারা শব্দানুসারে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলেন, একটি লোক নিতান্ত অনাথের ন্যায় রাস্তায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন, ঐ লোকটা এই

জন বণিক। ঐ বণিক নানাবিধ পণ্যদ্রব্য লইয়া বাণিজ্যে যাইতেছিল, কিন্তু মুহূর্ত্তকাল পূর্ব্বে ছয় জন দস্যু আসিয়া তাহার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া গিয়াছে। সন্নিহিত একটি লোক বলিল, "মহাশয়, সংপ্রতি মৃত্যুপুর হইতে যে ছয়জন সভাসদ্ নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছে, ইহা তাহাদেরই কীর্ত্তি। তাহারা রাজ-সভা হইতে ছুটি পাইলেই এই কায করিয়া বেড়ায়, অথচ রাজ-সমীপে তাহাদের বিরুদ্ধে নালিশ করিলেও সুবিচার পাওয়া যায় না।"

এই বৃত্তান্ত শুনিয়া সন্ন্যাসীর মন বড়ই বিষণ্ণ হইল। আর কিছুদূর অগ্রসর হইয়া তিনি আবার ক্রন্দন-ধ্বনি শুনিতে পাইলেন, এবং কারণ জানিবার জন্ত শব্দ লক্ষ্য করিয়া অগ্রসর হইলেন। কিয়দ্দুর যাইয়া দেখিলেন, এক অট্টালিকাময় বাড়ীতে একটি বৃদ্ধ কাঁদিতেছে, তাহার স্ত্রী, পুত্র ও কন্তাগণ চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, আর কয়েকজন রাজ-কর্ম্মচারী তাহাকে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া যাইবার জন্য জেদ করিতেছে। বৃদ্ধ বলিতেছে, "আমি বড় কষ্টে এই সকল বাড়ী ঘর প্রস্তুত করিয়াছি, ইহাতে বাস করিয়া আমার সাধ মিটে নাই। এই সকল বিভব এবং আত্মীয় বন্ধু ছাড়িয়া আমি কোথায় যাইব, কেই বা আমায় দেখিবে? বৃদ্ধকাল স্ত্রী-পুত্রের শুশ্রূষার সময়; এ সময়ে আমাকে নগর হইতে বাহির করিয়া দিলে আমি নিশ্চয়ই প্রাণে মরিব।" রাজ-কর্ম্মচারী উত্তর করিল, "তোমার সুখের জন্য রাজ-নিয়মের অন্যথা হইতে পারে না। এতদিন যৌবন ছিল, যথেষ্ট সুখভোগ করিয়াছ; এখন বৃদ্ধ হইয়াছ, নগর ছাড়িয়া চল।" এই বলিয়া বৃদ্ধের হাত ধরিয়া টানিতে লাগিল, সন্ন্যাসী সে দৃশ্য সহিতে না পারিয়া প্রস্থান করিলেন।

ব্রহ্মানন্দ লতা-মণ্ডপের সন্নিহিত হইয়া এক বৃক্ষ-তলে বসিলেন, এবং ভালবাসাকে বলিলেন, "আমি বড় ক্লান্ত হইয়াছি, আমার বড় পিপাসা হইয়াছে।"

ভালবাসা। "পিপাসা হইয়া থাকিলে প্রমোদ-সরোবর হইতে জল আনিয়া দিতে পারি।"

সন্ন্যাসী। "প্রমোদ-সরোবরের জল পান করিয়া গত কল্য বড় আমোদ পাইয়াছিলাম বটে, কিন্তু অদ্য বড় অবসাদ জন্মিয়াছে, আর সে জল পান করিতে ইচ্ছা নাই। আপনার হাতে ও ভাণ্ডটায় কি জল আছে? উহা কি আমি খাইতে পারি না?"

ভালবাসা সুযোগ পাইয়া আর আপত্তি করিলেন না, সন্ন্যাসীকে অমৃত-বাহিনীর জল দিয়া পরিতৃপ্ত করিলেন। প্রমোদ-ক্ষেত্রের প্রতি সন্ন্যাসীর যে একটুকু অনুরাগ ছিল, অমৃত-বাহিনীর জল পান করিয়া তাহাও চলিয়া গেল; সুতরাং আর ক্ষণবিলম্ব না করিয়া তিনি ভালবাসার সঙ্গে প্রমোদ-ক্ষেত্র হইতে প্রস্থান করিলেন, এবং কিয়ৎকাল পরেই শান্তির আশ্রমে যাইয়া সাহসের সঙ্গে মিলিত হইলেন। সাহস তাঁহাকে পাইয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইলেন, এবং ভালবাসাও যখন প্রয়োজন হইবে তখনই দেখা দিবেন বলিয়া ব্রহ্মানন্দকে আশ্বস্ত করিয়া দেবপুরের অভিমুখে প্রস্থান করিলেন। সাহস এবং সন্ন্যাসী কয়েক দিন বিশ্রাম করিবেন মনে করিয়া শান্তির আশ্রমে রহিলেন।

রাজ-দম্পতী।

যখন ত্রিপুর-রাজ্যে সার্দ্ধ-পঞ্চশতাব্দি অনন্ত কাল-সাগর-গর্ভে বিলীন হইতেছিল, সেই সময় ত্রিপুরার চত্বারিংশদুত্তরশততম নৃপতি মহারাজ কীর্ত্তিধর (১), পিতৃ-সিংহাসনে আসীন হইয়া সুখে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। প্রাচীনতা নিবন্ধন মহারাজা যুদ্ধ বিগ্রহাদি হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিতেন।

তাঁহার রাজ্যান্তর্গত বঙ্গপ্রদেশে হীরানন্দ নামে এক কর-দাতা সামন্ত ছিল। সেই চপল-মতি দুর্বৃত্ত সামন্ত ত্রিপুরেশ্বরকে অবজ্ঞা করিয়া তদানীন্তন দীল্লিপতিকে কর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া দীল্লিপতি সহ সন্ধি সংস্থাপন করিল। মহারাজ কীর্ত্তিধর হীরানন্দের এবম্বিধ আচরণে ক্রোধান্বিত হইয়া তিন জন সুযোদ্ধা সেনাপতিকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিলেন (২)। সেনাপতি-ত্রয় বহু সৈন্য সমভিব্যাহারে পুণ্য-সলিলা পতিতপাবনী গঙ্গা নদীর পূর্ব্ব তীরে যাইয়া হীরানন্দকে ধরিবার জন্য শিবির সংস্থাপন করিল।

হীরানন্দ ত্রিপুর-সেনাপতি-ত্রয়ের আগমন-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া ভয়ার্ত্ত চিত্তে দীল্লীশ্বরের শরণাপন্ন হইল এবং কহিল "দীল্লিরাজ! আমি আপনাকে কর দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছি বলিয়া ত্রিপুর-রাজ কীর্ত্তিধর ঈর্ষা-প্রণোদিত-চিত্তে আমাকে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে সৈন্য প্রেরণ করিয়াছেন; অতএব এ দীন বিপদাপন্নকে রক্ষা করুন। এই সময়ে যদি ভবদীয় সহায়তা না প্রাপ্ত হই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই ত্রিপুর-সেনাপতি-হস্তে আমার ভব-লীলা সংবরণ করিতে হইবেক।" দয়াময় দীল্লিপতি হীরানন্দের কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া বহুসৈনিকসহ ভাগীরথী-তীরে উপস্থিত হইলেন।

এদিকে ত্রিপুর-রাজ চর-মুখে দীল্লি-পতির অভিযান-বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলেন এবং আদেশ করিলেন, "আমার মহাবলবীর্য্যশালী মহাবীরগণ পূর্ব্ব প্রেরিত সেনাপতিদিগের সাহায্যার্থ অচিরে গঙ্গা-তীরে গমন করুক, আমি দীল্লিপতি সহ জীবন-সংশয়িত আহবে গমন করিব না।"

মহাদেবী কীর্ত্তিধর-মহিষী মহারাজের এবম্বিধ অরাজোচিত কাপুরুষ-সুলভ বাক্য শ্রবণ করিয়া ক্রোধে ও ক্ষোভে পাদ-দলিতা-ফণিনীর ন্যায় অধীরা হইয়া উঠিলেন। বীর্য্যবতী ক্ষত্রিয়া রমণীর প্রাণে সমর-বিমুখ-প্রস্তাব সহিল না, নারী-জাতি-সুলভ হৃদয়ের কোমলতা অভিমানরূপ-আবরণে সমাচ্ছাদিত হইল, সুকোমল মূর্ত্তি

---

(১) যে রাজমালা গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া এই আখ্যায়িকা লিখিত হইল, সেই গ্রন্থে মহারাজ কীর্ত্তিধরের "ছেঙ্‌তুঙ্‌ফা" নামে একটি কিরাতীয় নাম উল্লেখিত আছে। ত্রিপুরার ইতিবৃত্তকার কৈলাস বাবু কীর্ত্তিধরকে সিংহতুঙ্গফা আখ্যা দিয়াছেন।

(২) কৈলাস বাবু বলেন;—আরাকান-পতি, গৌড়েশ্বরকে উপঢৌকন দিতেছিলেন, পথিমধ্যে মহারাজ কীর্ত্তিধর তাহা লুণ্ঠন করেন, এবং তাহাতেই যুদ্ধের কারণ ঘটে। ইহা যদি সত্য, তাহা আমরা নিশ্চয় করিতে অক্ষম।

কঠিনতম প্রস্তরে পরিণত হইল। মহিষী জলদগম্ভীর মধুর স্বরে সৈন্যগণকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন, "সেনাগণ! তোমরা ক্ষিপ্র গতিতে আপন আপন অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হও; তোমাদের ভয় নাই, আমি তোমাদের সঙ্গে রণক্ষেত্রে গমন করিব, এবং দৈত্য-দলনী চামুণ্ডার ন্যায় সশাণিত-করবাল-করে সমরাঙ্গণে শত্রু সংহার করিয়া স্বর্গাদপি গরীয়সী জন্মভূমির মর্য্যাদা রক্ষা করিব। মহারাজ সংসার সুখ-বাসনায় অদ্যাপি পরিতৃপ্ত হইতে পারেন নাই, সুতরাং স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না।" সৈন্যগণ মহারাজ্ঞীর বাক্য আকর্ণন করিয়া সাতিশয় প্রীত হইল এবং হৃষ্টচিত্তে কহিল, "মহাদেবি! জননি! আমরা প্রাণপণে আপনার আদেশ পালন করিব। যদি স্বদেশের সম্মান রক্ষা করিতে অসমর্থ হই, তবে এই জীবনে ফল কি?" মহিষী সৈন্যগণের আশ্বাস-সূচক বাক্যে প্রফুল্ল হইয়া নানাবিধ রাজ-প্রসাদে তাহাদিগকে আপ্যায়িত করিলেন, এবং তৎপর অশ্রুপূর্ণ লোচনে কৃতাঞ্জলিপুটে, ক্ষোভ-কম্পিত স্বরে মহারাজকে কহিলেন, "স্বামিন্! আপনি নশ্বর তুচ্ছ পার্থিব-সুখ-লালসায় বিমুগ্ধ হইয়া আপনার মহামাননীয় পূর্ব্ব পুরুষোপার্জ্জিত অসাধারণ বিমল কীর্ত্তিকলাপ নাশ করিতে সংকল্প করিয়াছেন? মহারাজ! জীবনের চিন্তা কি? যাহা অজ, অমর, তাহার আবার ধ্বংস হয় কিসে? দেহ-পিঞ্জর যখন জীর্ণ হইবে, তখন নিশ্চয় জীবাত্মা দেহান্তর গ্রহণ করিবেন। বসনাদির সহিত আমাদের যে সম্বন্ধ, দেহের সহিত জীবাত্মারও ঠিক সেই সম্বন্ধ। আপনি মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র অবিরাম গতিতে একদিকে অগ্রসর হইতেছেন, দিবা যামিনী ভেদ নাই, সুযোগ দুর্য্যোগের প্রতি লক্ষ্য নাই, আপনার গতি অবিশ্রান্তভাবে চলিতেছে। আপনি নরলোকে বৃদ্ধের শ্রেণী-ভুক্ত হইলেন, তথাপি বলিতে পারিতেছেন না কখন আপনার এই গতি শেষ হইবে। কিন্তু একদিন না একদিন অবশ্য আপনার গতির বিরাম হইবে; অবশ্য আপনাকে পরম আদরের ধন স্ত্রী, পুত্র, রাজ্য ও রাজ-সিংহাসন- প্রভৃতির মায়া পরিত্যাগ করিতে হইবে, আপনি শত যত্ন করিয়াও কদাপি ইহার প্রতিবন্ধকাচরণ করিতে সমর্থ হইবেন না। যদি আপনি নিশ্চিতরূপে বলিতে পারিতেন যে অমুক সময়ে আপনার ধন-জন-রাজ্য-সম্পদ অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই নর জগৎ পরিত্যাগ করিবেন, তাহা হইলেও বরং আপনার এই আচরণের সমর্থন করা যাইত। কিন্তু কত কাল যে আপনি বাঁচিয়া থাকিবেন, তাহা যখন নিশ্চিতরূপে বলিতে আপনি সমর্থ নহেন; তখন কেন ক্ষাত্রধর্ম্মে কালিমা লেপন করিতে প্রস্তুত হইলেন? শৌর্য্য, তেজঃ, ধৃতি, দক্ষতা, সমরে অপরাঙ্মুখতা, দান ও ঈশ্বরভাব (প্রজাপালনার্থ প্রভুত্ব) এই কয়েকটি ক্ষত্রিয়দিগের স্বাভাবিক ধর্ম্ম; বার্দ্ধক্য কি আপনার বুদ্ধিবৃত্তিকে জড়ত্বে পরিণত করিয়াছে? বিবেক কি আপনার অন্তর হইতে অন্তর্ধান হইয়াছে? অহো কি পরিতাপ!! এই যে সুবিশাল ত্রিপুরা-রাজ্য আপনি ভোগ করিতেছেন, যদি ইহা ঘটনাক্রমে আজ শত্রুহস্তগত হয়, তবে আপনার কি গতি হইবে! রাজ্য হারা

হইয়া আপনি জীবনে কি সুখ উপলব্ধি করিতে পারিবেন? কখনই নহে। আপনি রাজ্যেশ্বর, প্রজাবর্গের পিতৃস্থানীয়, দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন করিয়া প্রজারঞ্জন ও রাজ্য রক্ষা করা আপনার অবশ্য কর্ত্তব্য। আজ আমাদের ভাগ্য দোষে আপনি কর্ত্তব্য-সাধনে বিমুখ! মহারাজ! আপনি কেন স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ পূর্ব্বক অনন্ত নিরয়ের দ্বারোন্মুক্ত করিতেছেন? বিশেষতঃ সন্তান যদিও কখন অত্যাচারী হয়, পিতা মাতা তাহার প্রতি অনাদর করেন না। জগৎপিতা পরমেশ্বর আপনাকে উপযুক্ত মনে করিয়া এই সুবিশাল ত্রিপুরারাজ্যের সুশাসনের ভার আপনার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছেন; আপনি কোন্ প্রাণে সন্তান-সদৃশ রাজ-ভক্তি-পরায়ণ প্রজাপুঞ্জের সর্ব্বনাশ-সময় আসন্ন দেখিয়া স্বার্থান্ধের ন্যায় নীরবে থাকিতে ইচ্ছা করিতেছেন? অপিচ এই সংসার-ক্ষেত্র মানবের পরীক্ষার স্থলমাত্র। যিনি, যে স্থান হইতে যে কার্য্য সাধনোদ্দেশে প্রেরণ করিয়াছেন, নির্দ্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হইলে সেই কার্য্য সুসম্পন্ন করিয়া সেই স্থানে তাঁহার নিকটে যাইতে হইবে। স্বকৃতকার্য্যের হিসাব পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে দর্শাইতে পারিলেই উদ্ধার এবং পুরস্কার লাভ, যদি কোন রূপে ত্রুটি লক্ষিত হয় তবে নিস্তার নাই; তজ্জন্য যে কত প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, কোন্ স্মার্ত্ত তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিতে সমর্থ? এই সামান্য বিগ্রহের ফলাফল ভবিষ্যদগর্ভে নিহিত। ইহাতে জয় পরাজয় যাহাই ঘটুক না কেন, উভয়ই আপনার পক্ষে কল্যাণকর। জয়ী হইলে রাজ্য রক্ষা হইবে, পূর্ব্বার্জ্জিত যশোরাশি নিষ্কলঙ্ক থাকিবে; আর পরাজিত হইলে,—সমরে দেহের সহিত আত্মার সম্বন্ধ তিরোহিত হইলে, বীরজন-সুলভ অব্যয় স্বর্গলোকে আপনি স্থান প্রাপ্ত হইবেন। অতএব পতে! আমি পুনঃপুনঃ আপনার শ্রীচরণ তলে প্রার্থনা করিতেছি, দাসীর অনুরোধ রক্ষা করিতে কার্পণ্য করিবেন না, যাহাতে ইহকালে সুকীর্ত্তি ও পরকালে শ্রেয়োলাভ হইবে সেই কার্য্য সাধনে তৎপর হউন। মহারাজ! হৃত-সাহস পুরুষ কখনও বিজয়-শ্রীকে অঙ্কে ধারণ করিতে সমর্থ হয় না। আপনি রণক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে সৈন্যগণ দ্বিগুণতর সাহসে উৎসাহিত হইয়া সমরাঙ্গণে বিচরণ করতঃ শত্রুকুল নির্ম্মূল করিতে শক্তিমান হইবে, ইহা ধ্রুব। পিতা মাতা সাক্ষাতে থাকিতে সন্তানের ভয় কি? সন্তান-গণের সাহস-বৃদ্ধির জন্য আলস্য ত্যাগ করুন।”

মহিষী এই পর্য্যন্ত বলিয়া বিরত হইলেন, তাঁহার নীলোৎপল-সন্নিভ যুগল নয়ন হইতে অনর্গল বারি বহিতে লাগিল। মহারাজ ভার্য্যার ঈদৃশ জ্ঞানগর্ভ বাক্যাবলী শ্রবণ করিয়া সাতিশয় লজ্জিত হইলেন এবং নানাবিধ রণ-সম্ভারে সস্ত্রীক রণ-যাত্রা করিলেন। সৈনিকবৃন্দ পরমানন্দে মহারাজের মঙ্গল-সূচক ধ্বনি করিতে করিতে সিংহ-বিক্রমে অগ্রসর হইতে লাগিল। কোষোন্মুক্ত অস্ত্রফলকে সূর্য্যরশ্মি সম্পাতিত হইয়া ঝক্ ঝক্ করিতে লাগিল। অশ্বারোহিগণ সুসজ্জিত বায়ুগামী তুরঙ্গমে, এবং নিষাদীগণ মহাকায় ভীম-দর্শন গজ-স্কন্ধে আরোহণ পূর্ব্বক যুদ্ধে যাত্রা করিল। মহারাজের আদেশানুসারে অসংখ্য রণ-বাদ্যকরগণ উত্তেজনাপূর্ণ বাদ্য

করিতে করিতে গমন করিল। সর্ব্ব পশ্চাতে অতি দুর্ব্বার মহাবল কিরাত-(কুকি) সৈন্যগণ মহারাজের চতুর্দ্দিক্ বেষ্টন করতঃ সহর্ষে নৃত্য করিতে করিতে রণ-যাত্রা করিল। নানা-বিধ রণ-বাদিত্র নিস্বনে, গণনাতীত গজ-বাজী নিনাদে এবং সৈনিকগণের আনন্দ-কোলাহলে' ধরণী থুর থুর শব্দে কাঁপিতে লাগিল।

ত্রিপুরাধিপ সসৈন্যে পূর্ব্ব-প্রেরিত সেনা-পতিগণ সহ মিলিত হইলে পর উভয় দলের যুদ্ধারম্ভ হইল। মহিষী হস্তী আরোহণে রণ-ক্ষেত্রে অসাধারণ সমর কৌশল প্রদর্শন করিতে লাগিলেন; সৈন্যগণ আজ পিতৃ-মাতৃ-সমক্ষে আপন আপন বল-বীর্য্য ও রণ-দক্ষতা দেখাইবার উপযুক্ত সুযোগ পাইয়া আপন প্রতিজ্ঞা পালন ও জন্মভূমির মর্য্যাদা রক্ষা করিবার জন্য বিপুল আনন্দে, অসীম উৎসাহে অস্ত্র চালনা করিতে লাগিল। দিবা রাত্রি অবিশ্রান্ত বহু শোণিত-পাতের পর বিজয়-লক্ষ্মী ত্রিপুর-রাজ-লক্ষ্মীর অঙ্ক-শায়িনী হইলেন।

হীরি-রাজ, শত্রু রমণীর অলৌকিক বীর্য্য-বত্তায় ভীত ও চমৎকৃত হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন। ত্রিপুর-সৈন্য-গণের বিজয়-নিনাদে দিঙ্মণ্ডল পরিপূর্ণ হইল। তৎপর ত্রিপুরেশ্বর পরমানন্দপূর্ণ চিত্তে পদব্রজে রণস্থল পর্য্য-বেক্ষণ করিতে লাগিলেন। বিগত-জীবন নর-গজ-বাজী-দেহ-সঙ্কুল সমর-প্রাঙ্গণে পর্য্য-টন করিয়া মহারাজ ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন, এবং তথায় উচ্চাসনে উপবিষ্ট হইয়া রণ-ক্ষেত্রের অবশিষ্ট ভাগ দর্শন করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ইঙ্গিত মাত্র রাজ-জামাতা এক মহাগজ রাজ-সমীপে উপনীত করিলেন। মহারাজ আনীত বারণোপরি সুখে আসীন হইয়া বড়ই আরাম অনুভব করিলেন এবং জামাতাকে দিব্য রাজ-প্রসাদে সন্তুষ্ট করিয়া সর্ব্ব প্রধান সেনা-পতি-পদে বরণ করিলেন। তদবধি ত্রিপুরা-রাজ্যে সুর্ত্তা-পতি সেনা-পতি হইবার প্রথা প্রচলিত হইল।

তৎপর মহারাজ কীর্ত্তিধর সভার্য্য স্বদেশে প্রত্যাগত হইলেন এবং দীর্ঘকাল পরম সুখে রাজ্যভোগ করিয়া নানাবিধ কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রতি-ষ্ঠিত করিলেন; অনন্তর যথা-সময়ে শোক-তাপ-পরিপূর্ণ ধরা 'পরিত্যাগ পূর্ব্বক শাশ্বত স্বর্গলোকে গমন করিলেন।

কবিতা-স্তবক।

স্বাধীনতা ?

স্বাধীনতা নাহি যার কি সুখ জীবনে তার?
স্বাধীনতা জীবনের সুখের কারণ।
স্বাধীনতা বিনিময় তিলেক বাঁচিতে চায়—
আছে কি জগতে হেন মূঢ় কোন জন?

স্বাধীনতা আছে যাঁর, কিসের অভাব তার?
পরাধীনতার হায়! লাঞ্ছনা অশেষ।
স্বাধীন মনের বলে, স্বাধীন চিন্তার ফলে,
মরতের ক্ষুদ্র নর দেবতা বিশেষ॥
স্বাধীন বিহঙ্গচয় যথা ইচ্ছা তথা রয়;
নীলাকাশে ঘুরি ফিরি শূন্যেতে মিশায়।

বন জাত শস্য ফলে, নির্ম্মল নদীজলে—
নিবারণ করে সদা ক্ষুধা, পিপাসায় ॥
ধরি সুললিত তান, মন সুখে গায় গান ;
সংসারের মায়া-মোহে অভিভূত নয়।
স্বাধীন বিহগগুলি, স্বরের লহরী তুলি,
মহাভাবে মাতোয়ারা যেন সদা রয় ॥
হায়রে ! মানবশিশু ! ব্যবহারে তুই পশু ;
স্বাধীন বিহগে কেন রাখিস্ পিঞ্জরে ?
শিকল পরায়ে পায়, বনের বিহগে হায় !
কেনরে রাখিস্ তুই চির-বন্দী করে ?
ছেড়ে দে ছেড়ে দে ওরে, দেখিবি কেমন ক'রে,
নীলাকাশে ঘুরে ফিরে কত সুখে গায়।
চায় না খাইতে ক্ষীর, সুবাসিত স্বাদু নীর ;
সোণার পিঞ্জরে তোর থাকিতে না চায়।
বনের বিহগ ওরা স্বাধীনতা চায় ॥

একটি নূতন সংগীত।

(মঙ্গলবার—রজনী। ২৭ এ মাঘ—১২৯৮।)

মা আমি না জানি ভজন,
না জানি পূজন,
না জানি সাধন।
তাই তোর করুণা সম্বল করেছি
(ভব-পার যাবার তরে)।
তাই তোর চরণে শরণ লয়েছি
(মোহ দূর হবে বলে)।
তাই তোর নাম-মন্ত্র সার করেছি
(নামে ভয়-ভাবনা ঘুচে বলে)
(নামে যম-যাতনা পালায় বলে)
(নামে মহাপাপী তরে বলে)
(ঐ নাম দীন দুখীর সম্বল বলে)।

আমাদের ক্ষুদ্র পরিবার।

আমাদের ক্ষুদ্র পরিবার
একগাছি মিলনের ডোরে—
মূর্ত্তিমতী ভালবাসা সহ,
আছে যেন বাঁধা চিরতরে।
আমাদের ক্ষুদ্র বাড়ীখানি
শান্তি, প্রেম, সুখের নিলয় ;
দীন, দুঃখী, ভিখারী, আতুর—
যে আসিবে পাবে সে আশ্রয়।
আমাদের স্ত্রীলোকগুলিন
মূর্ত্তিমতী দয়া, সরলতা ;
দরিদ্রতা অঙ্গের ভূষণ ;
তবু মুখে হাসি, কোমলতা।
আমাদের পুরুষ গুলিন
পরিশ্রমে দিবস কাটায় ;
সুখে গেল আজিকার দিন,
ভাবিয়া সন্ধ্যায় নিদ্রা যায়।
বিহঙ্গের মধুর কূজন
পশে যবে শ্রবণ-বিবরে,
শয্যা ত্যজি উঠিয়া তখন
প্রাতঃকৃত্য সমাপণ করে।
প্রভাতে, সন্ধ্যায় মিলি সবে
জপ করে নিত্য হরি নাম ;
বিধাতার অনন্ত কৃপায়
আমাদের পূর্ণ মনস্কাম।
আমাদের সুখী পরিবার
কভু কা'র নাহি করে ঋণ ;
ন্যায় উপার্জ্জনে যাহা মিলে,
তাহাতে কোন রূপে যায় দিন।
আমাদের স্ত্রীলোক, পুরুষ
বিবাদের ধার নাহি ধারে ;
প্রাণে প্রাণে গাঁথা যেন কেন
একগাছি সদ্ভাবের তারে।

কৃপণের নামের মহিমা।

কোন একটি গ্রামে কেশবচন্দ্র সিংহ নামে একজন ধনবান্ লোক বাস করিত। ঐ ব্যক্তি অতিশয় কৃপণ ছিল, অর্থ ব্যয় হইবার আশঙ্কায় সে পেটে খাইতেও ভাল খাইত না। পয়সা খরচ হইবে বুঝিলেই তাহার চক্ষু স্থির; আহারাদি যে সমস্ত অপরিত্যজ্য দায় তাহা সে যে রকম কৃপণতায় সংক্ষেপে সারিত, সে কথা বলিতেও ঘৃণা হয়। পরিবারস্থ কেহ কাতর হইলে সে অর্থব্যয়ের জন্য ভীত হইয়া তাহাকে ভালরূপ চিকিৎসা পর্য্যন্ত করাইত না। বলিতে কি নরাধমের এইরূপ পৈশাচিক ব্যবহারে অচিকিৎসায় ও অযত্নে তাহার অনেক গুলি শিশু সন্তান মারা গিয়াছিল। কিন্তু কৃপণ ভায়ার তাহাতে দুঃখ খুব কম, কেননা তাহার টাকা খরচ না হইলেই হইল। হা ভগবন্! অর্থপিশাচ পশুগুলির কি নিজের পুত্র কন্যার প্রতিও মায়া দয়া নাই? সিংহ মহাশয়ের হস্তে প্রচুর পরিমাণে সঞ্চিত অর্থ ছিল এবং অন্যান্য স্থির বৃত্তিও বিলক্ষণ ছিল। ভায়া কিন্তু সে অর্থের প্রকৃত ব্যয় না করিয়া কেবল কুবেরের গচ্ছিত ধনরক্ষক যক্ষের মত টাকা আগুলিয়া বসিয়া থাকিত, খরচ করিবার মতি গতি ঈশ্বর তাহাকে দেন নাই, এটি প্রকৃতপক্ষে কর্ম্মভোগই বটে। কৃপণের টাকাই একমাত্র আরাধ্য দেবতা, কোন রকমে সেই আর্থিক স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটিলে সে ব্রহ্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। তাহার এইরূপ সুখ্যাতিতে সমস্ত দেশ পূর্ণ হইয়া উঠিল, এবং তাহার নামের একটি অনির্ব্বচনীয় মহিমা জন্মিয়া গেল। কেহ যদি প্রাতঃকালে তাহার নাম করিত, তাহা হইলে সমস্ত দিনের মধ্যে আর সে ব্যক্তির অদৃষ্টে আহার ঘটিত না।

একদা প্রদোষ-কালে একজন মুটিয়া একটি বড় মোট মাথায় করিয়া প্রভুর আদেশানুযায়ী নির্দ্দিষ্ট স্থানে যাত্রা করিয়াছে, সহসা পথিমধ্যে একটি অপরিচিত যুবকের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইল। আগন্তুক যুবক মুটিয়াকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ মোট কার?" মুটিয়া উত্তর করিল, "আমি গোলাম যার।" যুবক তাহাতে বলিলেন, "আরে মলো! তুই গোলাম কার?" মুটিয়া পুনরপি উত্তর করিল, "এ মোট যার।" যুবক তখন বুঝিলেন যে মোটবাহক সহজে তাহার মনিবের নাম বলিতে স্বীকৃত নহে। কেন যে বাহক তাহার প্রভুর নাম বলিতে এতদূর কুণ্ঠিত, তাহা জানিবার জন্য যুবকের মনে অত্যন্ত কৌতূহল জন্মিল, কিন্তু বাহক সহজে তাহার প্রভুর নাম বলিবে না জানিতে পাইয়া তিনি মনে করিলেন যে কোন রকমেই হউক লোকটা কে তাহার নাম শুনিতে হইবে। তিনি দুই হস্ত দ্বারা পথ আগুলিয়া বলিলেন, "দেখ! যদি মঙ্গল চাও, তবে শীঘ্র তোমার মনিবের নাম বল।" তখন মুটিয়া প্রথমতঃ একটুকু হাসিল, পরে ধর্ম্মকে সাক্ষী করিয়া বলিল, "হে ধর্ম্মরাজ! আমার কোনই দোষ নাই, এই ভদ্র লোকটি কিন্তু আত্মদোষে কষ্ট পাইতে বসিল।" এদিকে প্রশ্নের বিরাম নাই।

যুবক। বল তোমার মনিব কে?

মোটবাহক। পানের আগে খায় যে।

যুবক। তবে কি ভেড়া?

মো, বা। ঐ কথাটি ছাড়া।

যুবক। তবে কি গরু?

মো, বা। তুল্লে কথার সুরু।

যুবক। তবে কি পৃষ্ঠ?

মো, বা। তার অগ্রভাগে দৃষ্ট।

যুবক। তবে কি সিং?

মো, বা। উপোশ্ করে মরগে বাপু সমস্ত দিন।

যুবক। কেন?

মো, বা। আমার মণিবের নাম কেশব চন্দ্র সিং। যে ব্যক্তি প্রাতে তাঁহার নাম করে, সেদিন সে দুর্ভাগার উপবাসে যায়। একটা না একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া তাহার আহার নষ্ট হয়। এই বলিয়া মুটিয়া তাহার গন্তব্য স্থানে গমন করিল।

এদিকে যুবক হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা দেখা যাউক দেখি, আজ আমি অনবরত সিংহের নাম জপ করিব তাহাতে আমার আহার ঘটে কি না। এই বলিয়া যুবক উক্ত সিংহ মহাশয়ের অপার মহিমাযুক্ত নামটি জপ করিতে করিতে বাটী অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন, সহসা কে যেন পশ্চাদ্ভাগ হইতে তাঁহার হস্তদ্বয় চাপিয়া ধরিল। হটাৎ এই রকম আক্রমণে যুবক আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পশ্চাদিকে ফিরিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিলেন যে, ঐ মহিমাযুক্ত নামটি জপ করিবার ফল এখন ফলিল। যুবক দেখিলেন যে পুলিসের একজন কর্ম্মচারী তাঁহাকে ধরিয়াছে। তিনি ইতিপূর্ব্বে কোন এক ব্যক্তির একটি মোকদ্দমার সাক্ষী মানিত হইয়াছিলেন, কিন্তু ঐ মোকদ্দমায় যদি সত্য কথা বলিয়া সাক্ষ্য দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহার একজন পরমাত্মীয়ের বিশেষ অনিষ্ট হয়, আর যদি মিথ্যা কথা বলা যায়, তবে অপর পক্ষের একেবারেই সর্ব্বনাশ করা হয়; সুতরাং উভয় সঙ্কটে পড়িয়া তিনি আদালতে হাজির না হইয়া পলাতকভাবে ছিলেন। অতএব তাঁহার সাক্ষের অভাবে কয়েকবার মোকদ্দমার তারিখও বদল হইয়াছিল, এক্ষণে তাঁহার নামে ওয়ারেণ্ট বাহির হইয়াছে ও সেই দস্তকের পেয়াদাই তাঁহাকে ধরিয়াছে। কল্য মোকদ্দমার দিন, অদ্য তাঁহাকে ধরা গিয়াছে, পুলিশেরত মস্ত শিকার। যুবক মনে মনে সিদ্ধান্ত করিলেন, পুলিশপ্রবরকে কিঞ্চিৎ উৎকোচ প্রদান করতঃ যথারীতি সন্তর্পণ করিতে পারিলেই উপস্থিত বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু অদ্য এ হতভাগ্য যুবকের অদৃষ্টে কিছুতেই মুক্তি ঘটিল না। তাঁহার সকল চেষ্টাই বিফল হইল, পুলিশ তাঁহার কোন কথাই না শুনিয়া তাঁহাকে একেবারে আদালতের সমীপে লইয়া হাজির করিল। যুবক সেদিনকার মত বন্দী থাকিলেন, সমস্ত দিনের মধ্যে তাঁহার পেটে জলবিন্দুও পড়িল না। তখন তিনি জানিলেন কেশবচন্দ্র সিংহের নামটির কি অনির্ব্বচনীয় মহিমা। যাহা হউক পরদিবস তাঁহার জবানবন্দী লইয়া তাঁহাকে মুক্তি দেওয়া হইল, তখন তিনি দুর্গা নাম জপ করিতে করিতে বাজারে আসিয়া কিঞ্চিৎ জলযোগ করতঃ তৎক্ষণাৎ বাটী প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। সেই দিন অবধি তিনি ভ্রমেও আর কখন ঐ মহিমাযুক্ত নামটি করিতেন না, এমন কি তাঁহাদিগের দেশের আর কেহই ভয়ে ঐ

মাষটি লইত না।

পাঠক পাঠিকাগণ! দেখুন দেখি কৃপণ-জাতীয় জীবগুলি কেমন আশ্চর্য্য বস্তু! বাস্তবিক, যদি কোন প্রাজ্ঞদলে কৃপণের আলোচনা হইতে থাকে, তাহা হইলে তাহার অস্তিত্বের এইরূপ মীমাংসা হইয়া থাকে যে, সে একটি জন্তুবিশেষ। 'নভূত, নপ্রেত, নদৈত্য, নদেব, নদানব, নমানব, কৃপণজাতীয় লোকগুলি ইহার কোন শ্রেণীরই অন্তর্গত নহে; তাই বলি, তাহারা জন্তুবিশেষ। পশুরাও ত নিজ নিজ আহারাদির সুবিধা খোঁজে, কিন্তু কৃপণ ওরফে কুবেরের গচ্ছিত ধনরক্ষক যক্ষ ভায়াগণ যে খরচের ভয়ে ভালরূপ আহারাদিও করে না, এজন্য বলিতে হইবে তাহারা 'একরূপ অদ্ভুত জন্তুবিশেষ। কৃপণ কখন দয়া বুঝে না, ধর্ম্ম বুঝে না, স্নেহ বুঝেনা, কর্ত্তব্য বুঝেনা, সে কেবল বুঝে টাকা। কৃপণের কখন ভদ্রতা নাই, শিষ্টতা নাই, লৌকিকতা নাই, সৌজন্য নাই, বলিতে গেলে এক রকমে আহার নিদ্রাও নাই, সে কেবল জানে টাকা। হে শ্বেতবর্ণ রজতখণ্ড! তোমার মাহাত্ম্য কেবল কৃপণেই জানে, এবং তুমিও কৃপণের মাহাত্ম্যই জান, কারণ যে তোমাকে চিনে, তুমিও তাহাকে চিন। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া বলা যায়? যে অর্থের সদ্ব্যয় করিল না, অর্থকে ন্যায়-কার্য্যে খাটাইল না, বা অর্থের দ্বারা কোন সদনুষ্ঠান করিল না, সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়া হাতে প্রচুর অর্থ পাইয়াও তাহারা কি কি কার্য্য করণীয় তাহা বুঝিল না, কেমন করিয়া বলা যায় যে সে ব্যক্তি অর্থের প্রকৃত মাহাত্ম্য বুঝিয়াছে? যে কেবল অহরহঃ অর্থকে পুঁতিয়া রাখিতে বা সিন্দুকে পুরিয়া রাখিতে ভাল বাসে, কেমন করিয়া বলা যায় যে সে অর্থের প্রকৃত আস্বাদন পাইয়াছে বা তাহার যথার্থ মহিমা বুঝিয়াছে? মনুষ্য জীবন উত্তম, মধ্যম ও অধম এই ত্রিবিধ পর্য্যায়ে বিভক্ত। অন্যান্য কোন বিষয়ের অবতারণা না করিয়া কেবল দাতৃত্ব ও কৃপণতার অনুশীলনই অদ্যকার সন্দর্ভের উদ্দেশ্য। উত্তম শ্রেণীর মনুষ্য কে? যিনি অর্থের অসদ্ব্যয় করেন না অথচ কৃপণতাও করেন না, সৎকার্য্য ও কর্ত্তব্য কার্য্য হিসাব মত করিয়াও কিছু কিছু সঞ্চিত রাখেন, মনুষ্য জীবনে তিনি উত্তম। আর যিনি অতিরিক্ত ব্যয় করেন অর্থাৎ "যত্র আয় তত্র ব্যয়" করিয়া থাকেন, হাতে এক কপর্দ্দকও রাখিতে পারেন না, তাঁহাকে উত্তম বলা যাইতে পারে না; কারণ ন্যায়-সঙ্গত হিসাব মত খরচ করিয়া হাতে কিছু না রাখিলে পরিণামে কষ্ট পাইতে হয়। এ বিষয়ে সাধারণ একটা কথায় বলে যে "সন্তরণ না জানিলে বাপের পুকুরে ডুবিয়া মরিতে হয়"। তবে কিনা যিনি এক পয়সাও না রাখিয়া সমস্তই সৎকার্য্যে ব্যয় করেন, পরিণামে হাতে কিছু না থাকিলেও ঈশ্বর তাঁহাকে কুলাইয়া দেন। কিন্তু তাই বলিয়াই তিনি উত্তম পদবাচ্য হইতে পারেন না—তিনি মধ্যম শ্রেণীভুক্ত। সমস্ত ভারই ঈশ্বরের উপরে দিয়া পরিণামে ভগবান্ যাহা করেন তাহাই হইবে মনে করাও সম্পূর্ণ যুক্তি সঙ্গত নহে, কারণ কোন বিষয়েই নিজের কোন অস্তিত্ব বা ক্ষমতা না রাখিয়া কেবল সম্পূর্ণ ভরসাই ঈশ্বরের উপর ন্যস্ত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে ব্রতী হওয়া বুদ্ধিমান লোকের পক্ষে ন্যায়ানুষ্ঠান নহে—ঈশ্বর

বুদ্ধি দিয়াছেন খাটাইয়া খাও, ধর্ম্মে মতি থাকিলেই বিপদে তিনি সহায় হইবেন *।

* "যনি মুখ দিয়াছেন তিনি আহার দিবেন, নিজের হাতে অর্থ থাকিতে নিশ্চেষ্ট হইয়া জগতের দুঃখ দেখিব কেন?" ইহা বড় উচ্চ বিশ্বাসীর কথা, সংসারে সকলে এ কথার গভীরতা বুঝিতে পারে না। জ্ঞানী এবং ধার্ম্মিক-সমাজে ইহারাই উচ্চস্থানের অধিকারী। শিঃ পঃ সঃ।

যিনি অর্থকে কেবলমাত্র কুকার্য্যে ব্যয় করেন তিনি অধম, আর যিনি কি সৎ কি অসৎ কোন কার্য্যেই এক কপর্দ্দক ব্যয় করেন না, কেবল যক্ষের মত ধন আগুলিয়া থাকেন তিনি যে সর্ব্বতোভাবে অধম ইহা অবিসম্বাদিত সত্য।

শ্রীনীরদবরণী গুপ্তা।

সুবাক্য-ভাণ্ডার।

ভূমণ্ডলে ব্যবসায় যত বর্ত্তমান,
সব চেয়ে অধীনতা কষ্টের নিদান।

অন্তরে নীচতা যার আছে বর্ত্তমান,
কপট আচার তার বাহিরে প্রমাণ।

ইতিহাসে এক এক পৃষ্ঠার আকার,
জীবনের এক এক দিবস তোমার।

দলাদলি বাদাবাদি যত দেখা যায়,
রহিয়াছে অহঙ্কার সবার গোড়ায়।

সপ্রমাণ উপদেশ সুন্দর যেমন,
দীর্ঘকাল থাকে তাহা অন্তরে তেমন।

স্বাধীনতা-প্রচারে যে বড় অগ্রসর,
প্রায়শঃ সে অত্যাচারী অন্যের উপর।

অবিচারে কোন কাযে অর্পিবে না হাত,
আরব্ধ কর্ম্মের তরে কর দেহ-পাত।

যে কায রাখিতে হয় করিয়া গোপন,
তেমন কাযেতে হাত দিবে না কখন।

আত্মানুসন্ধানে জান আপন লক্ষণ,
তার পরে আপনার কাযে দেও মন।

অনৈক্য ঘটিলে ঘটে শত্রুতা নিশ্চয়,
তার পরে বিবাদেতে সর্ব্বনাশ হয়।

ভাল না বাসিতে পার, কেন কর ঘৃণা?
হিংসায় ঘৃণার জন্ম, তাহা কি জান না?

নৈরাশ্য ভাঙ্গিয়া দেয় যত্নের ধার,
নিরাশ হইলে থাকে শ্রমে রুচি কার?

যা আছে তাহারি কর সাধু ব্যবহার,
তা নহিলে অপচয় ঘটিবে তোমার।

জান যদি কল্য তব হবে অনুতাপ,
তবে কেন করিতেছ অদ্য সেই পাপ ?

যে সন্দেহে সত্য প্রতি বিশ্বাস জন্মায়,
তেমন সন্দেহে নাহি দোষ দেখা যায়।

মৃত্যু হেরি বৈদ্য যথা নিকটে না যায়,
সেইরূপ সুখ-ভোগ দূরেতে পালায়।

দুইবার যেই কার্য্য করিতে না পার,
দীর্ঘকাল তার তরে বিবেচনা কর।

সকলের প্রতি কর সেই ব্যবহার,
সকলের কাছে তুমি প্রত্যাশিত যার।

শিক্ষা-পরিচর-সমিতির নিয়মাবলী।

উদ্দেশ্য।

১। দেশমধ্যে উদার ও নিরপেক্ষভাবে শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক শিক্ষা-সম্বন্ধে দেশ, কাল এবং পাত্র বিবেচনায় উন্নত মত প্রচার করা।

২। সমালোচন, গ্রন্থ-লিখন, গ্রন্থ-প্রচার এবং যথাসাধ্য পুরস্কার প্রদান দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যের উন্নতি-বিধানে যত্ন করা।

সভ্য হইবার নিয়ম।

১। এই সমিতির সভ্যদিগকে মাসিক বা বার্ষিক কোনরূপ চাঁদা দিতে হইবে না।

২। সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পর সংস্রব, সমবেদনা এবং একপ্রাণতা থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয়, এবং এজন্য পরস্পরের মতামত অবগত হওয়া নিতান্ত প্রয়োজন ; অথচ নানাস্থানীয় সভ্যদিগের মধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে ইহার সংঘটন অসম্ভব। অতএব সভ্যদিগের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে বন্ধন-সূত্র-স্বরূপ কোন একখানি পত্রিকা থাকিবে ; অর্থাৎ যিনিই শিক্ষা-পরিচর-সমিতির সভ্য হইবেন, তাঁহাকেই সেই পত্রিকার একজন নিয়মিত গ্রাহক হইতে হইবে। গ্রাহকদিগের অনুগ্রহে শিক্ষা-পরিচর জীবিত থাকিলে ইহাদ্বারাও সে কার্য্য চলিতে পারে।

৩। কোন বিদ্যালয় বা সভার নামে পত্রিকা গৃহীত হইলে তাহার কার্য্যকালীন শিক্ষক বা সম্পাদক সমিতির সভ্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন।

৪। কোন সভ্যের বিশেষ কিছু জ্ঞাতব্য থাকিলে উত্তরের মাশুল সহ শিক্ষা-পরিচর-সমিতির সম্পাদককে পত্র লিখিলে উত্তর পাইবেন। আর সভ্য-সাধারণ বা সর্ব্বসাধারণের প্রতি কিছু বক্তব্য থাকিলে সেই পত্রিকার সম্পাদকের নিকট পত্র লিখিয়া জানাইবেন ; তিনি প্রয়োজন বোধ করিলে তাহা পত্রিকার মন্তব্য-স্তম্ভে প্রকাশ করিবেন। সভ্য ব্যতীত অপরেরও এ অধিকার থাকিবে।

সভ্য-দিগের শ্রেণী-বিভাগ।

১। বিশেষ সভ্য—যাঁহারা অন্ততঃ প্রতি দুই বৎসর মধ্যে একখানি বাঙ্গালা গ্রন্থ লিখিয়া সমালোচনার জন্য তাহা সমিতির হস্তে অর্পণ করিবেন, তিনি বিশেষ সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন।

২। সাধারণ সভ্য—যাঁহারা উক্ত নিয়মে বাধ্য হইবেন না, তাঁহারা সাধারণ সভ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। কিন্তু তাঁহারাও ইচ্ছা করিলে অনিয়মিতভাবে পুস্তক লিখিয়া সমিতির হস্তে অর্পণ করিতে পারেন।

কার্য্যকরী-সভা।

১। বিশ্ব-বিদ্যালয় অথবা টোলের উপাধি-লব্ধ ব্যক্তিগণই কার্য্যকরী-সভার সভ্য হইতে পারিবেন; তবে তাঁহাদের সকলের সম্মতি হইলে কোন বিশেষ লব্ধবিদ্য উৎসাহী সভ্যের পক্ষে এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিতে পারিবে।

২। পূর্ব্বোল্লিখিত পত্রিকার সম্পাদক, সহকারী সম্পাদক এবং তত্ত্বাবধায়ক এই সভার কার্য্যকালীয় (ex officio) সভ্য থাকিবেন।

৩। যতদিন বিশেষ কোন অসুবিধা না হইবে, ততদিন কার্য্যকরী সভার অধিবেশন প্রথমে বোয়ালিয়াতেই হইবে।

৪। অধিকাংশ সভ্যের মতানুসারেই এই সভার কার্য্য চলিবে।

৫। কার্য্য-নির্ব্বাহের নিয়মাদি সময়ে সময়ে এই সভা নিজেই করিয়া লইবেন।

৬। এই সভার সভ্যদিগকে বিশেষ সভ্য হইতে হইবে।

৭। সময়ে সময়ে কার্য্যকরী সভার সভ্যদিগের নাম প্রাগুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

কার্য্যকরী সভার উপদেষ্টা।

১। যাঁহারা কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিলে কার্য্যকরী সভার সভ্য হইতে পারিতেন, অথচ দূরে থাকিয়াও বিশেষভাবে সমিতির কার্য্য এবং হিত চিন্তা করেন, তাঁহাদিগকে উপদেষ্টা বলা যাইবে।

২। উপদেষ্টাগণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উপদেশ দিবেন, কখন বা কার্য্যকরী সভা তাহা চাহিয়া লইবেন; কিন্তু সমিতির কার্য্য এই সভার বিচার-সম্মত মতামতেই চলিবে।

সম্পাদক।

যিনি শিক্ষা-পরিচর-সমিতির সম্পাদক, কার্য্যকরী সভার সম্পাদকও তিনিই থাকিবেন।

বিশেষ প্রশ্ন।

কখনও শিক্ষা কিম্বা সাহিত্য-সম্বন্ধে কোন বিশেষ প্রশ্ন বা আন্দোলনের বিষয় উপস্থিত হইলে সভ্যগণ আপন আপন মতামত পত্র দ্বারা সমিতির সম্পাদককে জানাইবেন, এবং বিশেষ ও সাধারণ সমস্ত সভ্যের অধিকাংশের মতানুসারে সমিতির অভিপ্রায় কার্য্যকরীসভা তাঁহাদের পত্রিকায় প্রকাশ করিবেন।

সমালোচন।

১। বিশেষ সভ্যগণ যে সকল গ্রন্থ লিখিবেন, কার্য্যকরী সভার সভ্যগণ তাহা পাঠ করিয়া তাহার বিচার ও তৎসম্বন্ধে মতামত দিবেন। তাঁহাদের যে সকল গ্রন্থ উৎকৃষ্ট বলিয়া স্থিরীকৃত হইবে, সেই সকল গ্রন্থ "শিক্ষা-পরিচর-সমিতি-গ্রন্থাবলী" নামে পরিচিত হইবে

পারিবে। এই সকল গ্রন্থের মুদ্রাঙ্কণ কি লাভালাভের সঙ্গে সমিতির কোন সংস্রব থাকিবে না, তবে কোন মুদ্রাঙ্কযন্ত্রের সঙ্গে বন্দোবস্ত করিলে এই সকল গ্রন্থকারের পক্ষে বিশেষ কোন সুবিধা হইতে পারে কি না, কার্য্যকরী সভা তাহা দেখিবেন।

২। সমিতির পত্রিকায় সমালোচনার্থ যে সকল পুস্তক আসিবে, কার্য্যকরী সভা তাহার সমালোচন করিবেন, এবং তাঁহাদের পত্রিকায় সেই সমালোচনের সংক্ষিপ্ত সার প্রকাশিত হইবে।

৩। যে কোন পুস্তক-সম্বন্ধে সমিতির মতামত জানিবার জন্য যে কেহ ইচ্ছা করিলে সমিতির সম্পাদককে উত্তরের মাশুল সহ পত্র লিখিতে পারেন; শীঘ্র হউক বা বিলম্বে হউক সমিতির মত তিনি জানিতে পারিবেন।

৪। সম্ভব হইলে কোন সাধারণ পুস্তকালয়ের সঙ্গে এইরূপ বন্দোবস্ত হইবে যে, সমালোচনার্থ পুস্তকগুলি স্বনামে চিহ্নিত করিয়া সমিতি তাহা উক্ত পুস্তকালয়ে অর্পণ করিবেন, আর সমিতির কোন পুস্তকের প্রয়োজন হইলে উক্ত পুস্তকালয়ের অধ্যক্ষগণ সেই পুস্তক সংগ্রহ করিয়া সমিতিকে দেখিতে দিবেন।

৫। বিশেষ সভ্যগণ ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের লিখিত পুস্তক সম্বন্ধে অপর কোন বিশিষ্ট লোকের মতামতও সমিতির হস্তে অর্পণ করিতে পারেন।

সভ্যদিগের বিশেষ অধিকার।

সমিতির নামে চিহ্নিত হইয়া যে সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইবে, সমিতির সভ্যগণ তাহা যতদূর সম্ভব অল্পমূল্যে পাইবেন।

অভিনন্দনপত্র।

১। প্রত্যেক বৎসরের শেষে উক্ত বৎসরে প্রকাশিত বাঙ্গালা গ্রন্থ-সম্বন্ধে সভ্যদিগের মতামত গৃহীত হইবে, এবং অধিকাংশের মতে যাঁহার গ্রন্থ সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইবে, তাঁহাকে স্বর্ণাক্ষরে মুদ্রিত একখানি অভিনন্দন পত্র সমিতি হইতে প্রদত্ত হইবে।

২। যে কোন মহিলা সংস্কৃত কলেজের বা অন্য কোন নিয়মে প্রবর্ত্তিত সংস্কৃত পুরাণাদি বিষয়ে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া প্রথম স্থান অধিকার করিবেন, তাঁহাকেও পুর্ব্বোক্ত প্রকারে একখানি অভিনন্দন পত্র প্রদত্ত হইবে।

পুরস্কার।

শিক্ষা-পরিচরের আর্থিক অনটন দূর হইলে প্রাগুক্ত অভিনন্দনপ্রাপ্ত গ্রন্থকার এবং পরীক্ষার্থিনীকে যথোচিত পুরস্কার-প্রদানের ব্যবস্থা হইবে।

প্রশংসাপত্র।

সমিতির পত্রিকায় প্রকাশিত শিক্ষানুশীলনের অন্ততঃ কুড়িটি প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর যিনি করিবেন, তিনি সমিতি হইতে একখানি প্রশংসাপত্র পাইবেন।

ব্যয়-ভার-বহন।

সমিতির প্রাগুক্ত কার্য্যাবলী সম্পাদনের সমস্ত ব্যয়-ভার শিক্ষা-পরিচরের স্বত্বাধিকারী বহন করিবেন। তবে তাঁহার অবস্থাদৃষ্টে দয়া করিয়া সভ্য মহোদয়দিগকে রহিয়া সহিয়া কায চালাইয়া লইতে হইবে।

কার্য্যকরী সভার বর্ত্তমান সভ্য-দিগের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু কুমুদিনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় এম্, এ; প্রফেসর, রাজসাহী কলেজ।
" " কিশোরীমোহন চৌধুরী এম্, এ; বি, এল্।
" " কেদারনাথ মৈত্রেয় বি, এল্।
" " কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি, এল্।
" " সুরেশচন্দ্র মৈত্রেয় বি, এল্।
" " রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন কবিরত্ন, শিক্ষা-পরিচয়-তত্ত্বাবধায়ক।
" " শরচ্চন্দ্র চৌধুরী বি, এ; শিক্ষা-পরিচয়-সম্পাদক।
" " অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় বি, এল্; শিক্ষা-পরিচয়-সমিতি-সম্পাদক।

বর্ত্তমান উপদেষ্টাদিগের নাম।

শ্রীযুক্ত বাবু কানাইলাল বন্দোপাধ্যায় বি,এ।
" " নফরদাস রায় জমিদার।
" " মধুসূদন সিংহ স্কুলসবইন্সপেক্টর।
" " কালীপ্রসন্ন আচার্য্য বি,এ,বিএল্।
" " দ্বারকানাথ বাগচি স্কুল সবইন্স্পেক্টর।
" " কালীকমল দাস বি, এল্।
" " হরকিঙ্কর দাস উকীল।
" " রাম গোবিন্দ মিশ্র স্কুল সবইন্স্পেক্টর।
" " কামিনীকুমার চন্দ এম্এ,বি, এল্
" " অভয়চরণ দাস এম্ এ।
" " সদয় চরণ দাস।
" " দীননাথ দাস বি, এ।
" " নিশিকুমার ঘোষ অরিয়েন্টেল লাইফ্ ইনসিওরেন্স কোম্পানি।
" " ব্রজগোপাল সেন।
" " আনন্দ চন্দ্র সরকার শিক্ষক।
" " রাধিকা প্রসাদ সেন জমিদার।
" " দীননাথ ভট্টাচার্য্য স্কুল সবইন্স্পেক্টর।
" " অম্বিকাচরণ ভট্টাচার্য্য।
" " বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় বি,এল।
" " নীলমণি ঘটক উকীল।
" " শ্রীশগোবিন্দ সেন।
" " গিরিশচন্দ্র নাগ এম,এ, বিএ, ল।
" " গিরিশচন্দ্র বসু বি, এ।
" " দ্বারকানাথ মৈত্র উকীল।
" " চন্দ্রমোহন দাস পণ্ডিত।

তৃতীয় ভাগ।] চৈত্র [১২শ সংখ্যা।

(১২৯৮)

আদর্শ হিন্দু-বিধবা প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী শরৎসুন্দরী দেবীর পুণ্য-নাম-পূত

শিক্ষা-পরিচর

শিক্ষাবিষয়ক মাসিক পত্র ও সমালোচন।

সম্পাদক

শ্রীশরচ্চন্দ্র চৌধুরী, বি, এ।

তত্ত্বাবধায়ক

শ্রীরাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, কবিরত্ন।

সূচী।

কলিকাতা, সিমলা, গঙ্গাধর নিকেতন,

৯, নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে

শ্রীপ্রসন্নকুমার ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

প্রকাশার্থ প্রবন্ধ ও বিনিময়ার্থ পত্রিকা প্রভৃতি সম্পাদকের নিকট, সমালোচনার্থ পুস্তকাদি শিক্ষা-পরিচর-সমিতি সম্পাদকের নিকট রামপুর বোয়ালিয়ায় প্রেরিতব্য।

শিক্ষা-পরিচরের মূল্যাদি তত্ত্বাবধায়কের নিকট কলিকাতায় কার্য্যালয়ে প্রেরিতব্য এবং বিজ্ঞাপনের নিয়ম তথায় জ্ঞাতব্য।

শিক্ষা-পরিচর।

৩য় ভাগ। | চৈত্র ১২৯৮ সাল। | ১২শ সংখ্যা

অঞ্জলি।

২৪

ব্রহ্মাণ্ড প্লাবিত করি বহিতেছে ভালবাসা,
প্রাণের নিভৃত কক্ষে ফুটিছে অনন্ত আশা!
দিবা নিশা ভেদ নাই, দিন মাস বর্ষ যুড়ি
পরিবর্ত্তনের ঢেউ খেলিতেছে নিরন্তর,
শৈশব, কৈশোর, আর যৌবন, বার্দ্ধক্য-কাল,
যাতায়াত অভিনয় করিতেছে পর পর;
সৌভাগ্যের সিংহাসনে, বিলাসের উপচারে,
সুস্থদেহে সুখ-ভোগে কখন কাটিছে দিন,
কখন বিশীর্ণ-কায়, দাঁড়াইতে স্থান নাই,
সদা প্রাণে হাহুতাশ, দগ্ধোদর অন্নহীন!
এত ঝড় বহে, তবু নিবে না সে আশা-দীপ,
নির্ব্বাত-নিষ্কম্প-ভাবে জ্বলিতেছে অবিরাম,
চুম্বকের প্রাণ যথা ধ্রুব পানে সদা ধায়,
ধাইছে আশার শিখা ঊর্দ্ধ পানে অবিশ্রাম!
প্রদীপ্ত আশার শান্তি ঘটিল না একবার,
আশার পূরণে তবে হব কি বিশ্বাস-হীন?
জ্বালিল যে আশা-দীপ, আপনা দেখাবে সেই,—
মা আমার মিছা কথা বলে নাই কোন দিন।

নীরব-প্রচার।

দীর্ঘ রজনীর গাঢ় অন্ধকার বিদূরিত করিয়া ঊষার তরুণ কিরণ একবার প্রকাশিত হইলে, প্রথমে পূর্ব্বাকাশ, ক্রমে সমুদায় গগন-মণ্ডল সেই স্নিগ্ধ জ্যোতিতে পূর্ণ হইয়া যায়,—তখন আর তাহাকে কেহ ঢাকিয়া রাখিতে পারে না। সত্যজ্যোতিও জগতে এইরূপে বিস্তৃতি লাভ করে,—প্রথমে হয়ত একজন তাহার ঈষদুন্মুক্ত আলোক-রেখা দূর হইতে অস্ফুটভাবে অনুভব করে, তাহাই ক্রমে একজন হইতে বহুজনের হৃদয়ে, এক দেশ হইতে বহু দেশের গ্রাম নগরে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। আলোক আপনার শক্তিতে আপনি ফুটিয়া উঠে, কাহারও সাহায্যের জন্য অপেক্ষা করে না ; সত্যজ্যোতিও আপন শক্তিতেই দেশ বিদেশে বিস্তৃতি লাভ করে, কিন্তু সেই বিস্তৃতির জন্য অল্পাধিক পরিমাণে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে মানব-সাহায্য আবশ্যক। সত্য বিস্তারের এই সাহায্যের নাম প্রচার।

মানব-জীবন প্রেমের জীবন ; ভাল হউক মন্দ হউক সমুদায় মানব-কার্য্যের মূলেই অল্পাধিক পরিমাণে কোন না কোন শ্রেণীর প্রেম বর্ত্তমান থাকা প্রয়োজন। আমি আত্ম-সুখী, পরের সুখসম্পদ ভালবাসি না, সেই জন্য হয়ত পরের মাথায় বাড়ি দিয়া তাহার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইয়া আপন উদর পূর্ণ করি,—ইহা স্বার্থপরতার একশেষ বটে, [illegible] ...র্ত্তক অসঙ্গত আত্মপ্রেম। আর তুমি হয়ত পরের মুখে সুখের হাসি দেখিতেই ভাল বাস, তাই আপনার দিকে ভাল করিয়া চাহিবার অবসর পাইতেছ না ; —ইহা নিঃস্বার্থতার একশেষ বটে, কিন্তু ইহারও প্রবর্ত্তক প্রেম। মানব-প্রেমের প্রকৃতি এই যে, কোন মিষ্ট বস্তু পাইলে নিতান্ত স্বার্থপর মানুষও আপনার আত্মীয়-দিগকে তাহার অংশ দিবার জন্য ব্যাকুল হয়। এই জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলিয়া নীতি, ধর্ম্ম, শিক্ষা, দীক্ষা পদদলিত করিয়া মানুষ যে অর্থ উপার্জ্জন করে, দশ জনকে লইয়া একত্রে তাহা উপভোগ করিয়া থাকে। মানুষ যখন কোন সত্য লাভ করে, তাহাও এই প্রেমের দায়ে ঠেকিয়া লুকাইয়া, লুকাইয়া একাকী উপভোগ করিতে পারে না, দশ জনের মধ্যে বিতরণ করিবার জন্য ব্যাকুলতা জন্মে। এই ব্যাকুলতাই প্রচারের প্রবর্ত্তক। এই ব্যাকুলতার এমন হৃদয়োন্মাদকারিণী শক্তি আছে যে, মানব তাহার উত্তেজনায় আপনার ক্ষুদ্রত্ব ভুলিয়া গিয়া মহাভাবে পূর্ণ হইয়া যায়। ভয় ভাবনা, সন্দেহ, নৈরাশ্য, উপহাস অবমাননা, অত্যাচার উৎপীড়ন— কিছুতেই তাহার প্রাণের উৎসাহ নির্ব্বাণ করিতে পারে না, একাকী হইয়াও লক্ষ লক্ষ নরনারীকে সত্যের পথে আনিবার জন্য সে আত্মজীবন উৎসর্গ করে। এই আত্মোৎসর্গই জীবন্ত প্রচার।

প্রচার দুই শ্রেণীর,—সরব ও নীরব।

সরব প্রচারের শক্তি অতি অল্প সময়ে বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়ে, কিন্তু তাহাতে বিস্তৃতির অনুরূপ গভীরতা জন্মে না। নীরব প্রচারের শক্তি অল্পদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইলেও, তাহার গভীরতা অসীম! আজ সরব প্রচারের কথা রাখিয়া দিয়া নীরবপ্রচারের কথাই বলিব। সরব প্রচারে দেশের মধ্যে অনেক মহাসত্যই বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু গভীরতার অভাবে সেই সকল প্রিয়তম সত্য জীবনগত কার্য্যে পরিণত হইতে পারিতেছে না। সভামণ্ডপের বক্তৃতায়, সংবাদপত্রের উত্তেজনাপূর্ণ প্রবন্ধে, কবিচূড়ামণিদিগের গুরুগম্ভীর ভেরী-নিনাদে, অনেক সত্যইত প্রচারিত হইয়াছে—কিন্তু হায়! ব্যক্তিগত ও সমাজগত জীবনে তাহার কতটুকুমাত্র কার্য্যে পরিণত হইয়াছে? সরব-প্রচারের আড়ম্বরকারী মহানিনাদে দিক্‌কটাহ পূর্ণ হইয়াছে, বিদ্যালয়ের দুগ্ধ-পোষ্য শিশুরাও তাহার অনাহত প্রতিধ্বনি বহন করিতেছে; তাহার বৈদ্যুতিক উত্তেজনায় অচলরাজ হিমাচলও বিচলিত হইয়াছে, উজ্জ্বলালোকে জল স্থল অন্তরীক্ষ উদ্ভাসিত হইয়াছে; কিন্তু জীবনের দিকে চাহিয়া দেখি, যেখানে ছিলাম সেখানেই পড়িয়া রহিয়াছি; হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখি, যে আঁধারে ছিলাম তাহাই চারিদিক্ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, আর আমাদের অন্তঃসারশূন্য বাহ্য চাক্‌চিক্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া বলিতেছে, "তুমি যে তিমিরে—তুমি সে তিমিরে"!!

কাষ চাই, কথা চাই না। কথার ব্যাপারে লাভ হইল না; বরং যাহা কিছু পিতৃপিতামহের কষ্টসঞ্চিত মূলধন ছিল, সমালোচনবিভ্রাটে পড়িয়া তাহাও দিনে দিনে ক্ষয়িত হইতেছে! জীবন চাই, আড়ম্বর চাই না। আড়ম্বরে ক্ষণিক উত্তেজনা জন্মিতে পারে, মন্ত্রমুগ্ধ শ্রোতৃমণ্ডলী ক্ষণেকের জন্য ঘন ঘন উচ্চ করতালি প্রদান করিতে পারে; কিন্তু তাহাতে লক্ষ জনের মধ্যে একজনকেও অনন্ত জীবনের পথে দৃঢ়পদে দণ্ডায়মান হইবার শক্তি দিতে পারে না! দুই দিনের উত্তেজনা চাই না, তাহাতে কোন স্থায়ী ফল হইতেছে না। শৈশবে যাহাদিগকে দেবতার মত দেখিতাম, বিদ্যালয়ে যাহাদিগকে আশার আলোকস্তম্ভ বলিয়া আদর করিলাম, আজ সংসারে আসিয়া তাহাদের মলিন মুখের দিকে চাহিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে! সে আশার কুসুম শুকাইয়াছে, দেবত্বের সৌন্দর্য্য ফুরাইয়াছে, উৎসাহের অগ্নিশিখা ভস্মাবশেষ অঙ্গার-স্তূপে পরিণত হইয়াছে! এই অঙ্গার-স্তূপে উৎসাহের অগ্নি জ্বালিতে হইবে, এই মলিন কুসুমে স্বর্গের সৌরভ ছুটাইতে হইবে, এই পাশব জীবনে দেবত্বের আলোক ফুটাইতে হইবে,—তাই আমরা নীরব-প্রচার চাই!

নীরব-প্রচার কাহাকে বলে? যাহা কখনও দন্তস্ফুট হইল না, যাহা তোমাতে জন্মিয়া তোমাতেই বিলীন হইল, যাহার আদি অন্ত একদিনও ভাল করিয়া শুনিলাম না, প্রাণের সঙ্গে মিলাইয়া ভাল করিয়া বুঝিবার অবসর পাইলাম না, তেমন নিরবচ্ছিন্ন নীরবতাকে কেমন করিয়া প্রচার বলিয়া স্বীকার করিব? আর আমি স্বীকার করিলেই বা কি? যাহা তুমি বিশ্বাস কর, তাহার ভাল মন্দ যদি একদিনও ভাল করিয়া সমালোচনা করিয়া বুঝাইতে না চাও, লোকে তবে কেমন করিয়া তোমার প্রাণের সত্য গ্রহণ করিবে?

এইরূপ নিরবচ্ছিন্ন নীরবতাকে আমরা নীরব-প্রচার বলিতেছি না, নীরবে সত্যবিস্তারের সাহায্য করাই প্রকৃত নীরব-প্রচার। উপদেশের অপেক্ষা দৃষ্টান্ত অধিক ফলপ্রদ। উপদেশের প্রচার অনেক হইয়াছে, এখন দৃষ্টান্তের প্রচার চাই—তাহাকেই আমরা নীরব-প্রচার বলিতেছি।

মানুষ ভাবের জীব। যত সহজে, যত অল্প সময়ে মানুষ ভাবগ্রহণ করিতে পারে, তত সহজে কথায় গাম্ভীর্য্য গ্রহণ করিতে পারে না! ভাবই প্রচারের প্রাণ—নীরব-প্রচারেই তাহা সম্ভব। ভাষায় নকল চলে, ভাবে নকল চলে না। ভাষা মানুষ শীঘ্রই ভুলিয়া যায়, ভাব সহজে ভুলিতে পারে না। ভাবশূন্য হইয়া কেবল ভাষার আড়ম্বরে তুমি যদি দিগন্ত প্রতিশব্দিত করিয়া জলন্ত বাগ্মিতা-পূর্ণ বক্তৃতাও কর, দুদিনেই তাহা শূন্যে বিলীন হইয়া যাইবে। কিন্তু কথা বল আর নাই বল, তুমি যদি ভাবপূর্ণ দৃষ্টান্ত ও জীবন-গত কার্য্যের দ্বারা কোন সত্য প্রচার করিতে চাও, মানবহৃদয়ে তাহা দৃঢ়মুদ্রিত হইয়া যাইবে। একটি চাহনিতে, সামান্য একটু অঙ্গভঙ্গিতে, মুহূর্ত্তের একটি দীর্ঘনিঃশ্বাসে, এক হৃদয়ের ভাব অন্য হৃদয়ে যত দৃঢ় মুদ্রিত হইতে পারে; জগতের ভাষা-সমুদ্র মন্থন করিয়া সুললিত পদ-বিন্যাস-যুক্ত সহস্র কথা-তেও তাহার সমান ফললাভ করা যায় না। তুমি ভাব-প্রণোদিত হইয়া যাহা বলিবে, যাহা করিবে, যাহা দেখাইবে, যাহা শিখাইবে, তাহার মধ্যে এমন এক স্বাভাবিকী আক-র্ষণী শক্তি আছে যে, মানুষ সহজে তাহাকে উপেক্ষা করিতে পারিবে না। আমি এক-বার কোন পুত্রশোকাকুলা জননীকে দেখিতে গিয়াছিলাম। দেখিলাম—দুই গণ্ড বহিয়া নীরবে অশ্রুধারা ঝরিয়া পড়িতেছে, জননী নীল আকাশের অনন্ত বিতানের দিকে শূন্য-দৃষ্টিতে বহুক্ষণ চাহিয়া চাহিয়া কচিৎ একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন!! যতক্ষণ বসিয়া রহিলাম একটি কথাও শুনিতে পাই-লাম না; কিন্তু গৃহে আসিয়া হৃদয়ের দিকে চাহিয়া দেখি তাহার স্তরে স্তরে শোকের জীবন্ত ছবি দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে! তুমি জগতের সমুদায় শোকসূচক ভাষা একত্র করিয়া মানব-প্রাণে এমন শোকের তরঙ্গ উঠাইয়া দিতে পার কি? তাই বলিতে-ছিলাম উপদেশের প্রচারত অনেক হইল, এখন জীবনগত দৃষ্টান্তের প্রচার দেখিতে চাই।

"আমি যাহা বলি তাহাই কর, আমি যাহা করি তাহা করিও না, তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিও না," ইহাই সরব-প্রচারের প্রথম পাঠ। কিন্তু কথায় এবং কার্য্যে, উপদেশ এবং দৃষ্টান্তে আকাশ পাতাল প্রভেদ থাকিলে সেই কথা সেই উপদেশ মানব-জীবনে স্থায়ী শুভফল উৎপাদন করিতে পারে না। পিতা মাতার দোষগুণ অজ্ঞাতসারে সন্তান সন্ততিতে সংক্রামিত হয়, বালক বালিকারা এতই অনুকরণপ্রিয় যে আমরা যাহা বলি তাহারা তাহা শুনিয়াও শুনে না, কিন্তু আমরা যাহা করি তাহা অতিমাত্রায় অনুকরণ করিয়া থাকে! যেমন ব্যক্তিগত জীবনে, সমাজ সম্বন্ধেও সেইরূপ উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তের ফল অধিক। সমাজে সাধু উপদেশের, সৎ-শাস্ত্রের, সুললিত ধর্ম্মকথার অভাব নাই, কিন্তু

সেই সকল উপদেশ শুনিয়া, সেই সকল ধর্ম্ম-কথা পাঠ করিয়াও সমাজের নরনারীরা তদনুরূপ আদর্শ জীবন যাপন করিতে পারিতেছে না কেন? যাহা শুনিতেছে তাহা দেখিতেছে না, যাহা পড়িতেছে তাহার দৃষ্টান্ত পাইতেছে না;—অগত্যা অজ্ঞাতসারে মানুষ ভাবিতেছে যে, পুস্তকে লিখিতে হইলে উচ্চ কথাই লিখিতে হয়, ধর্ম্মশাস্ত্র পাঠ করিতে গেলে উচ্চ তত্ত্বই পাঠ করিতে পাওয়া যায়, কিন্তু ঐ সকল উপদেশ পুস্তকগত থাকিবার জন্যই লিখিত ও প্রচারিত হইয়া থাকে, উহা জীবনের বস্তু নহে!! ইহা হইতেই অলক্ষে সাধারণের মধ্যে এই বিশ্বাস আসিয়া পড়িয়াছে যে "যদি ধর্ম্ম চাও সংসার ছাড়, যদি সংসার চাও ধর্ম্ম-কথা মুখে বলিতে হয় বল, জীবনগত কার্য্যে তাহা পালন করিতে কখনও সক্ষম হইবে না।" সমাজের এই কু শিক্ষা, কথায় উপদেশে বা পুস্তকপাঠে দূর না হইয়া বরং দিন দিন বৃদ্ধিই পাইতেছে। একটা ক্ষুদ্র উদাহরণ আলোচনা করিয়া দেখ। পাশ্চাত্য-শিক্ষায় পড়িয়া আজ কাল আমাদের জাতীয়ভাব, জাতীয় আচার ব্যবহার ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। ইহা দুঃখের কথা, পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু যাঁহারা মুখে যত দুঃখ করিতেছেন, তাঁহাদিগের জীবনের কার্য্যে তদনুরূপ দৃষ্টান্ত দেখিতেছি না। দেখিয়া শুনিয়া মনে হইতেছে যে, আজ কাল লোক-সমাজে প্রতিপত্তি রাখিতে হইলে, মুখে পাশ্চাত্য হাব ভাবের নিন্দা করিতে হইবে;—দেখাদেখি সকলেই তাহাই করিতেছি; কিন্তু তাহাতে জীবনের পরিবর্ত্তন সংসাধিত হইতেছে না। বিলাতী পোষাক পরিয়া, বিলাতী আহার আহার করিয়া, বিলাতী ভাষায় আক্ষেপ করিয়া, বলিতেছি "হায় হায়! আমাদিগের জাতীয়তা অতল জলে ডুবিয়া গেল!" জাতীয়তা অতল জলে ডুবিবে না কেন? কথায় জাতীয়তা বাঁচে না, বক্তৃতায় জাতীয়তা জন্মে না, জীবনগত কার্য্যই তাহার প্রাণ। সেই জন্য এখন দৃষ্টান্তের প্রচারের আবশ্যক হইয়াছে, কথা বন্ধ করিয়া কার্য্য দেখাইবার সময় আসিয়াছে।

কিন্তু দৃষ্টান্তের প্রচার করিবার উপযুক্ত লোক কোথায় পাইব? কথা অপেক্ষা কার্য্যে, উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তে, জীবনগত জ্বলন্ত উৎসাহ কোথায় পাইব? দৃষ্টান্তের প্রচার অধিক ফলপ্রদ, সুশিক্ষা প্রচারের সহজ উপায়,—কিন্তু তাহার উপযুক্ত প্রচারক কে?

ইচ্ছা থাকিলেই উপায় উদ্ভাবিত হইয়া পড়ে। যদি ইচ্ছা থাকে,—আজ হউক, কালি হউক, আর দশদিন পরেই হউক, অভীষ্ট ফললাভ হইবেই হইবে। জগতের ইতিহাসই তাহার জ্বলন্ত প্রমাণ। যে বৈদ্যুতিক শক্তি আজ মানব-কার্য্য সাধনের অমোঘ সহায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, একদিন তাহা বালকের ক্রীড়া-পুত্তল বলিয়া উপেক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু আজ তাহার অমিত তেজের নিকট জল স্থল অন্তরীক্ষ পরাজিত হইল কেন? যে বাষ্পপোত আজ পৃথিবীর দেশদেশান্তরে বাণিজ্যভাণ্ডার বহন করিয়া উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল মহাসাগর বিক্ষুব্ধ করিয়া ধাবিত হইতেছে, একদিন তাহা সাধারণের কৌতূহলনিবারক যাদুবিদ্যামাত্র বলিয়া পরি-

চিত্ত ছিল; আজ তাহার চরণতলে ভূধর সাগর অবনত হইল কেন? যেখানে ইচ্ছা সেখানেই সিদ্ধি। সহজে সুখাসীন হইয়া অনায়াসে কে কোন্ মহাকার্য্য সাধন করিতে পারিয়াছে? সংসারের সকল কার্য্যই কষ্ট-সাধ্য, সকল চেষ্টাই অধ্যবসায়-লভ্য, সকল সিদ্ধিই সময় সাপেক্ষ। আমরা যদি বুঝিয়া থাকি উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্তে অধিকতর রূপে সুশিক্ষা বিস্তৃত হইবে, আমরা যদি সরলভাবে কায়মনোবাক্যে তাহা লাভ করিবার জন্য ইচ্ছা করি, আমরা যদি কাম্যফল লাভের জন্য সেই সাধুইচ্ছা-প্রণোদিত হইয়া তদুপযোগী যত্ন ও চেষ্টা করি, নীরব প্রচার আজ অসম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইলেও সময়ে তাহাই সম্ভব হইবে।

নীরব প্রচার অল্পস্থানব্যাপী, সুতরাং তাহার প্রচারক-সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। পিতা মাতা অভিভাবক ও শিক্ষকগণকে সেই প্রচারের ভার গ্রহণ করিতে হইবে। যদি কুল-পাবন সৎপুত্র লাভ করিতে চাও, পিতা মাতাকে আদর্শজীবন যাপন করিতে হইবে, পুত্রকন্যাদিগকে দৃষ্টান্তের শিক্ষা প্রদান করিতে হইবে। যদি সুশিক্ষিত ছাত্ররত্ন লাভ করিতে চাও, শিক্ষকদিগকে ছাত্রগণের শ্রদ্ধাভক্তি আকর্ষণ করিবার উপযোগী আদর্শজীবন যাপন করিতে হইবে। অন্তঃসার শূন্য কথার শিক্ষায় সুশিক্ষা বিস্তৃত হইবে না।

যাহার যাহা নাই সে তাহা দান করিতে পারে না, যে যে শাস্ত্র জানে না সে তাহা শিক্ষা দিতে পারে না। আজ কাল নীতি-শিক্ষার তুমুল আন্দোলন উঠিয়াছে, নীতি-পুস্তক লিখিত, প্রচারিত ও অধ্যাপিত হইতেছে, কিন্তু পিতা মাতা অভিভাবক ও শিক্ষকগণের আত্মজীবন যদি আদর্শ নৈতিক জীবন না হয়, তাঁহারা পুস্তকের নীতিকথা পড়াইয়া পুত্রকন্যাদিগকে নীতিপরায়ণ করিতে পারিবেন কি? "আমি যাহা বলি তাহাই কর—আমি যাহা করি তাহা করিও না", ইহা প্রাচীন যুগের প্রিয়তম ধর্ম্মোপদেশ হইতে পারে; কিন্তু যদি যথার্থ সুশিক্ষা চাও, যথার্থ উন্নতি চাও, তবে পিতামাতা অভিভাবক ও শিক্ষকগণ! একবার সুকুমারমতিদিগকে বল "বৎস! জীবনসংগ্রামে কথায় সংগ্রামজয়ী হইতে পারিবে না, কষ্টের দিকে চাহিয়া দেখ, যাহা বুঝিবে তাহা বলিবে, যাহা বলিবে তাহা করিবে; তবেই প্রকৃত সুশিক্ষা লাভ করিতে পারিবে!"

শিক্ষা-তত্ত্ব-বিশ্লেষণ।

বিষয়-নির্দ্দেশ।—যাহাতে যে শক্তির বীজ নিহিত আছে, তাহাতে সেই শক্তির বিকাশ-সাধন বা উন্নতি সাধনই শিক্ষা।

(গর্দ্দভকে ঘোটক, বানরকে মনুষ্য লৌহকে স্বর্ণ করিবার প্রয়াস বৃথা।)

উদ্দেশ্য।—শিক্ষার উদ্দেশ্য চরমোন্নতি বা ঈশ্বর-প্রাপ্তি।

(চাকুরি বাদ পড়াতে বাঙ্গালী, এবং ব্যবসার-বিস্তার, পর-রাজ্য-গ্রাস ও দুর্ব্বল-দলনের কথা বাদ পড়াতে ইংরাজ বাহাদুর বিরক্ত হইবেন; কিন্তু কি করি সাধ্য নাই!)

কাল।—জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত শিক্ষার কাল।

(একথা স্থূলভাবে বলা হইল, প্রকৃত কাল ঈশ্বর-প্রাপ্তি পর্য্যন্ত। মানুষ মরিলেই ঈশ্বরকে পায় না, সুতরাং এই দেহ-নাশের সঙ্গে সঙ্গেই তাহার শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় না। কিন্তু কলির প্রাদুর্ভাবে জড়োপাসনার প্রাধান্য হইয়াছে, অত্যধিক জড়-সংসর্গে আমাদের বুদ্ধি-বৃত্তিও স্থূলতাপ্রাপ্ত হইতেছে, সুতরাং স্থূল বুদ্ধি লইয়া মৃত্যুর পর-পরবর্ত্তী সূক্ষ্মরাজ্যে প্রবেশ করিবার চেষ্টা এস্থলে না করাই ভাল।)

প্রকার-ভেদ।—শিক্ষা চারি-প্রকার, (১) শারীরিক, (২) মানসিক, (৩) নৈতিক, এবং (৪) আধ্যাত্মিক।

(শারীরিক, মানসিক, নৈতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি-সাধনই এই চতুর্ব্বিধ শিক্ষা। শারীরিক এবং মানসিক উন্নতির অর্থ সকলেই জানেন। অনেকে নৈতিক বিভাগ পর্য্যন্ত অগ্রসর হইয়াই থামেন, আধ্যাত্মিক নামক চতুর্থ বিভাগটি মানেন না, কারণ আত্মার অস্তিত্বেই তাঁহারা সন্দেহবান্। এস্থলে সে বিবাদের প্রয়োজনাভাব। অন্যের সঙ্গে থাকিলেই নীতির প্রয়োজন,—নৈতিক পাপ-পুণ্য সমাজ-বন্ধনের ফল। একাকী বিজন জঙ্গলে চলিয়া যাও, সেখানে নৈতিক-বন্ধন তোমার অনুসরণ করিবে না,—'মিথ্যা কহিও না,' 'স্বার্থপর হও,' ইত্যাদি কথা কেহ তোমাকে বলিবার প্রয়োজন দেখিবে না, কিন্তু তখনও আত্মা তোমার সঙ্গের সঙ্গী। সহজ কথায় 'সাধন ভজন' যাহাকে বলে, তাহাই আধ্যাত্মিক শিক্ষা। ধ্যান, ধারণা, সমাধি প্রভৃতি ইহার অঙ্গ বা ক্রমিক প্রণালী; দেব-দর্শন, দৈব-বাণী-শ্রবণ, সর্ব্ব-দেশ-দর্শিতা, ত্রিকালজ্ঞতা, ইচ্ছা-মৃত্যু, মোক্ষ-লাভ প্রভৃতি ইহার ক্রমিক ফল। ইহ জীবনে প্রকৃত আধ্যাত্মিক শিক্ষা নিষ্পন্ন হইলে মৃত্যুর পরে আর শিক্ষার প্রয়োজন থাকে না; মানুষ জীবন্মুক্ত হইতে পারে।)

বিভাগ-ভেদ।—এই চতুর্ব্বিধ শিক্ষা আবার চারি শ্রেণীতে বিভক্ত, (১) স্বকীয়, (২) পারিবারিক, (৩) সামাজিক, এবং (৪) বিশ্বজনীন।

(ইহারা পরস্পরের সঙ্গে এরূপ দৃঢ়-সম্বন্ধ যে একের উন্নতিতে অপরের উন্নতি, একের অধোগতিতে অপরের অধোগতি অনিবার্য্য। একের মঙ্গলে যখন অন্যের মঙ্গল, তখন আপনার মঙ্গল আগে দেখিয়া পরে বিশ্বের মঙ্গল দেখাই সহজ—সুতরাং যুক্তিযুক্ত। যখন নিজে ভাল হইবে, তখন অন্যকে ভাল করিবার চেষ্টায় তোমার অধিকার জন্মিবে। আগে নিজে চতুর্ব্বিধ শিক্ষা লাভ কর, পরে অন্যকে শিখাও। এস্থলে যেন সংকীর্ণ স্বার্থ-পরতা তোমার হৃদয়ে প্রবেশ না করে,—কেবল নিজের মঙ্গলই যেন লক্ষ্য না হয়। জগতের সেবা এবং ঈশ্বরের প্রীতি-সাধনই লক্ষ্য থাকিবে, এবং সেই লক্ষ্য-সাধনের উদ্দেশ্যেই আগে "আপন চরখায় তৈল দান"

করিতে হইবে। শিক্ষার যেমন শক্তি বাড়িতে থাকিবে, অমনি ক্রমে পরিবার, সমাজ, এবং সর্ব্বশেষে মানব-মণ্ডলীর শিক্ষা ও সেবায় আপনাকে উৎসর্গ করিবে।)

পূর্ণাঙ্গশিক্ষা।—শক্তি-নিচয়ের সামঞ্জস্য অব্যাহত রাখিয়া তাহাদের কর্ষণ ও উন্নতিসাধন করিলেই শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ হয়।

(ডাণ্ডাগুলি খেলিয়া গোঁয়ারগোবিন্দ না হইয়া বালক আগে লেখা পড়া শিখুক, ধর্ম্ম কর্ম্মে মন না দিয়া আগে সে অর্থ-উপার্জ্জনে সক্ষম হউক, অন্য শিক্ষা অবসর মতে পরে হইবে, এরূপ মত নিতান্ত ভ্রান্ত। যখন যে শক্তির অঙ্কুর দেখা দিবে, অমনি তাহাতে জল সেচন করিতে হইবে;—অবসরের প্রতীক্ষায় জল-সেক বন্ধ রাখিলে অঙ্কুর যদি একবার মরিয়া যায়, তবে আর সহস্র যত্নেও তাহা বাঁচিবে না। একবিধ শিক্ষার অনুরোধে অন্যবিধ শিক্ষায় অবহেলা কখনও করিও না। যে বৃক্ষের সকল ডাল এক সঙ্গে অবাধে স্ফূর্ত্তি পায়, কেবল সেই বৃক্ষই পূর্ণ-বিকাশ লাভ করিতে পারে।)

আনুষঙ্গিক ফল।—শিক্ষার আনুষঙ্গিক ফল (১) সুখ-লাভ, (২) শক্তি-লাভ।

(শিক্ষার উদ্দেশ্য বা চরম ফল ঈশ্বর-প্রাপ্তির তুলনায় সুখ অতি অকিঞ্চিৎকর পদার্থ। প্রকৃত সাধকেরা সুখের প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তবে সুখ কর্ত্তব্য-পালনের অনুগামী,—কর্ত্তব্যপালন করিলে সুখ আপনা হইতেই জন্মিবে। শরীর-ধারণের জন্য আহার কর্ত্তব্য, কিন্তু এই আহার-রূপ কর্ত্তব্য-পালনের সঙ্গে সুখও আছে। যাহারা শরীর-ধারণের জন্য আহার করে, তাহারা দীর্ঘজীবী হইয়া দীর্ঘকাল আহারের সুখ ভোগ করে; কিন্তু যাহারা সুখের জন্যই আহার করে, তাহারা নানা রোগে জড়িত হইয়া অশেষ দুঃখ পায়। সুখের জন্য আত্মার উন্নতি নহে, কিন্তু সুখ আত্মোন্নতির আনুষঙ্গিক ফল। উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই সুখ চলিতে থাকিবে; আবার যে মুহূর্ত্তে উন্নতি ব্যাহত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই সুখের অভাব বা দুঃখ উপস্থিত হইবে। যোগীরা যে সুখ-দুঃখের অতীত একপ্রকার চিদানন্দের কথা বলেন, এস্থলে তাহাও সুখ বলিয়াই ধরা হইল।

শক্তি ত্রিবিধ,—(১) জড়-বিষয়িনী (২) সমাজ-বিষয়িনী, এবং (৩) আত্ম-বিষয়িনী। যে শক্তিদ্বারা মনুষ্য জড়ের উপরে প্রভুত্ব লাভ করিতে পারে, তাহাই জড়-বিষয়িনী শক্তি; বর্ত্তমান যুগে পশ্চিম খণ্ডে ইহার বিশেষ বৃদ্ধি হইয়াছে। জ্ঞান, ভক্তি, প্রেম, পবিত্রতা, বিশ্বাস, নির্ভর প্রভৃতি আত্ম-বিষয়িনী শক্তি; এক সময়ে ভারতে এই শক্তির বিশেষ প্রাদুর্ভাব ছিল। জাতিত্ববোধ, জাতীয়-সম্মান-বোধ, জাতীয়-হিতাকাঙ্ক্ষা, একতা, মত-সমন্বয়, সমবেত-ক্রিয়া-নৈপুণ্য প্রভৃতি সমাজ-বিষয়িনী শক্তি। এই শক্তির সমুচিত উন্নতি হইবার এখনও অনেক অবশিষ্ট আছে। (১) যখন স্বার্থ দেশের অন্তরায় হইবে না, (২) যখন বাধ্যতার সঙ্গে স্বাধীনতার বিরোধ থাকিবে না, (৩) যখন প্রজার জীবন রাজার সুখের এবং যথেষ্ট সামগ্রী না

হইয়া রাজার জীবন প্রজার মঙ্গলের জন্যই হইবে, (৪) যখন দরিদ্র প্রজা শ্রম-লব্ধ ধন রাজ্যের সীমাসংরক্ষণে প্রদান করিয়া নিজে অন্নাভাবে মরিবে না, (৫) যখন পর-রাজ্যাপহারী নরঘাতী সেনা-পতি রাজ-সম্মানে সম্বর্দ্ধিত না হইয়া দস্যু-তস্করের ন্যায় দণ্ডিত ও ঘৃণিত হইবে, (৬) যখন সেনা-বিভাগ হৃত বিপুল অর্থ মানবের উন্নতি-কল্পে ব্যয়িত হইবে, (৭) যখন অন্ন-বস্ত্রের অভাবে কষ্ট পাইয়া মানুষ মরিবে না, (৮) যখন ধন-জন-বন্ধু-বান্ধব নাই বলিয়া কেহ চতুর্ব্বিধ শিক্ষা-লাভের উপায় হইতে বঞ্চিত থাকিবে না,—তখন সমাজ-বিষয়িণী শক্তির পূর্ণবিকাশ হইল বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু মানব-জাতির বর্ত্তমান মূর্খতা এবং অসভ্যতা দেখিয়া সে আশা করিতে সাহস হয় না। ইহার একমাত্র উপায় সুশিক্ষা। যদি জগতে প্রকৃত ভাবে সুশিক্ষা বিস্তার হয়, তাহা হইলে এ সকল কথা এক সময়ে কবির কল্পনায় না থাকিয়া বাস্তব ঘটনায় পরিণত হইবে।)

ঋণ-চতুষ্টয়।

আমরা সচরাচর ত্রিবিধ ঋণের উল্লেখ দেখিয়া থাকি,—দেব-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, এবং ঋষি-ঋণ। দেবগণ সর্ব্বদা নানাবিধ উপসর্গ হইতে আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছেন, এজন্য যজ্ঞাদিদ্বারা তাঁহাদিগের ঋণ-পরিশোধের ব্যবস্থা। পিতা মাতা আমাদিগের জন্মদাতা ও পালনকর্ত্তা, এজন্য জীবিতাবস্থায় তাঁহাদের আদেশ-পালন ও সন্তোষ-সাধন এবং মৃতাবস্থায় তাঁহাদের শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি পিতৃ-ঋণশোধের উপায়। আর শাস্ত্রকারগণ আমাদের জ্ঞান-লাভ ও ধর্ম্ম-সাধনের বিবিধ উপায় ও উপদেশ শাস্ত্রে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন, এজন্য অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদ্বারা তাঁহাদের ঋণ পরিশোধ করা কর্ত্তব্য। টাকা পয়সার ঋণ অবস্থানুসারে কাহারও থাকে কাহারও না থাকে, কিন্তু এই ত্রিবিধ ঋণ সকলেরই আছে; তবে সকলেই ঋণত্রয় পরিশোধ করে কি না, সে স্বতন্ত্র কথা।

কিন্তু এই ত্রিবিধ ঋণের ন্যায় এমন আর একটি ঋণ আছে, যাহা হইতে কি অট্টালিকাবাসী রাজা কি কুটীরবাসী দরিদ্র প্রজা কেহই মুক্ত নহে, অথচ যাহার অস্তিত্ব-সম্বন্ধে প্রায় সকলেই অনভিজ্ঞ, যাহার পরিশোধ-সম্বন্ধে প্রায় সকলেই উদাসীন!

জন্মাবধি মানবগণ স্বজাতি, স্বদেশ, সমাজ এবং রাজ-শক্তির নিকটে কত উপকার পাইয়া থাকে, বর্ণনা করিয়া কেহ তাহার শেষ করিতে পারে কি? আহার, নিদ্রা, পর্য্যটন, উপবেশন,—জীবনের প্রত্যেক কার্য্যের জন্য মানব আপন সমাজের নিকট কত ঋণী, তাহা কেহ ভাবিয়া দেখেন কি? জীবনের সুখ, ভোগ, জ্ঞান, ধর্ম্ম, সৌভাগ্য, উন্নতিত দূরের কথা; কেবলমাত্র জীবনরক্ষার জন্য মানব আপন সমাজের নিকট কত ঋণী, তাহা কেহ নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন কি? যদি সমাজ না থাকিত, তাহা

দুইলে আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ সন্তানকে কেবল বন্য জন্তুর হস্ত হইতে বাঁচাইবার জন্যই পিতা মাতাকে ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হইত। প্রাতরুত্থান হইতে রজনীতে শয়ন পর্য্যন্ত মানব নিশ্চিন্তভাবে খাইয়া খেলিয়া গল্প করিয়া বেড়াইলেও তাহার চলিয়া যাইতে পারে, অনেক কুম্মাণ্ড প্রকাশ্যভাবে সমাজের অবমাননা এবং অনিষ্ট করিয়াও নিষ্কৃতি পায়! তাহারা মনে করে, সমাজ তাহাদিগের নানাবিধ সুখ-ভোগের বিধান করিতে বাধ্য, কিন্তু সমাজের কোনরূপ হিতানুষ্ঠান করা না করা তাহাদের ইচ্ছা! এই জন্যইত সমাজের জন্য সামান্য অর্থব্যয় করিয়াই লোকে রাজা রায়-বাহাদুর হইতে চায়, আর তাহা না হইতে পারিলেই রাজার উপর, সমাজের উপর, সৎকার্য্যের উপর চটিয়া যায়! উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিয়া কেহ কখন রায় বাহাদুরি চায় না, সমাজও সেজন্য তাহার প্রশংসা করে না; কিন্তু যিনিই সামাজিক-ঋণ-পরিশোধের কথঞ্চিৎ যত্ন করিলেন, তিনিই যেন একটা অসাধারণ কার্য্য করিয়া ফেলিলেন, অমনি সমাজে তাঁহার প্রাতঃস্মরণীয় নাম পড়িয়া গেল!

আমরা এই ঋণকে জাতীয় ঋণ বলিয়া অভিহিত করিব। লোকে সামাজিক হিতানুষ্ঠানকে ইচ্ছাধীন মনে করে, আর সে জন্য [illegible] খ্যাতি, সম্মান বা প্রশংসা না পাইলেই [illegible] যায়, ইহার কারণ কি? আমাদের [illegible] জাতীয় ঋণের অস্তিত্বে জ্ঞান না [illegible]। ঋণ পরিশোধ করিয়া [illegible] চায় না, কেহ তাহা পায় না; [illegible] করিয়া প্রশংসা না চাহিলেও পায়। সমাজের নিকট কোন প্রকার ঋণ আছে, এবং সমাজের হিতানুষ্ঠান দ্বারা তাহার পরিশোধ করিতে হয়, এ জ্ঞান সকলের যখন জন্মিবে, তখন অনুষ্ঠাতাও প্রশংসা চাহিবে না, অন্যেও তাহা করিবে না; তবে ঋণ পরিশোধ-রূপ কর্ত্তব্য-পালন-জন্য যে আনন্দ বা আত্ম-প্রসাদ, অনুষ্ঠাতা তাহা অবশ্যই উপভোগ করিবেন, লোকেও তাঁহাকে কর্ত্তব্য-পরায়ণ বলিয়া সম্মান করিবে। কিন্তু সৎকার্য্য করিলেই যে দুন্দুভি-নাদে তাহার ঘোষণা করিতে হইবে, জাতীয়-ঋণ-সম্বন্ধে পরিস্কার জ্ঞান থাকিলে এ প্রথা উঠিয়া যাইবে।

যাহার যতটুকু শক্তি, তদ্দ্বারা জন-সাধারণের হিতানুষ্ঠান করাই জাতীয় ঋণ পরিশোধের উপায়। একটি মধু-চক্রে শত সহস্র মধু-মক্ষিকা বাস করে। এই মধু-চক্র তাহাদের সাধারণ সম্পত্তি, ইহার জন্য তাহারা সকলেই যথাসাধ্য খাটে,—কেহ অলস হইয়া বসিয়া থাকে না, কেহ অপেক্ষাকৃত অধিক পরিশ্রম করিলেও সে সেইজন্য সংবাদ-পত্রের প্রশংসা চায় না, অথবা রাজার নিকট হইতে উপাধি পায় না। যাহার যে সম্পদ্ বা যে শক্তি আছে, তাহার যথোচিত ব্যবহার করাই প্রাকৃতিক নিয়ম। মানব প্রকৃতির জীব, যথাশক্তি কার্য্য-করণ প্রকৃতির নিয়ম; প্রাকৃতিক নিয়ম-পালন জন্য মানবকে কেন উপদেশ দিতে হয়, এ কথা বুঝিতে পারি না।

বৃক্ষ-মূলে জল-সেচনের সঙ্গে ফল-লাভের যে সম্বন্ধ, জাতীয় হিতানুষ্ঠানের সঙ্গে আত্ম-সুখের সেই সম্বন্ধ। গাছের গোড়ায় জল ঢালিতেছ, মাটিতে সবটুকু চুষিয়া লই-

তেছে, তাহার একবিন্দুও তোমার উদরে যাইতেছে না, তোমার কণ্ঠ-শোষ দূর করিতেছে না! তবে এত পরিশ্রম করিয়া জল ঢাল কেন? তুমি জান, যত্ন করিয়া এখন জল ঢালিলে পরিণামে সুফল পাইবে, তাই এত পরিশ্রম করিতে পার। সমাজ-সম্বন্ধেও সেই কথা। তুমি অর্থব্যয়, সময়নাশ এবং পরিশ্রম করিয়া ভাবিতেছ কিছুই হইল না, তোমার যত্ন পরিশ্রম সমস্তই বিফল হইতেছে। কিন্তু এরূপ চিন্তাকে মনে স্থান দিও না। সমাজের জন্য যত করিতেছ,—গাছের গোড়ায় যত জল ঢালিতেছ, তাহার একবিন্দুও বিফল হইবে না। কার্য্য-পরম্পরার সমবেত পরিণামই সামাজিক মঙ্গল বা অমঙ্গল। কার্য্য-পরম্পরা যদি মঙ্গল-জনক হয়, সমাজের কল্যাণ প্রসব করিবে; কার্য্য-পরম্পরা যদি অমঙ্গল-জনক হয়, সমাজের সর্ব্বনাশ ঘটিবে। যে সুফল চায়, তাহাকে দিয়া অমঙ্গল-জনক কার্য্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব।

অনেকের পরার্থপরতায় বিশ্বাস নাই, পরার্থপরতা উপলব্ধি করিবার শক্তি নাই। যাহারা পরার্থপরতা বুঝে না, স্বার্থপরতা তাহারা বেশ ভালরূপে বুঝিবে। কিন্তু সমাজের গঠন এবং নিয়ম এমনি চমৎকার যে, প্রকৃত স্বার্থপরতা বুঝিয়া যদি কায করিতে পার, আপনা হইতে সমাজের হিত হইয়া যাইবে। কিন্তু প্রকৃত স্বার্থপরতা বুঝিতেও বিশেষ বুদ্ধির প্রয়োজন। যে সকল স্বার্থপর লোকের বুদ্ধি স্থূল, তাহারা মনে করে সমাজের ইষ্টানিষ্টের দিকে দৃষ্টি না করিলেও স্বার্থ সাধন হইতে পারে; চৌর্য্য, দস্যুতা প্রভৃতির অনুষ্ঠান এই সকল লোকের দ্বারাই অনুষ্ঠিত হয়। যাহাদের বুঝিবার শক্তি আছে, তাহারা সহজেই বুঝিতে পারিবে যে, সমাজের অমঙ্গল করিলে আপনার মঙ্গল হয় না,—বাসগৃহে অগ্নি-সংযোগ করিলে আপন প্রাণ নিরাপদ থাকে না, বাস-ভূমির বায়ু কলুষিত করিলে আপন শরীরে স্বাস্থ্য-ভোগ ঘটে না। অতএব পরার্থপরতা বুঝিতে না পার, প্রকৃতভাবে স্বার্থপর হও, সমাজের অনিষ্ট না করিয়া আপনার ইষ্টসাধন কর। তুমি ভাল হইলে—তোমার প্রকৃত স্বার্থ সিদ্ধ হইলে আপনা হইতে সমাজের ইষ্ট সাধিত হইবে, সুতরাং আপনা হইতে তোমার জাতীয় ঋণ পরিশোধ হইতে থাকিবে। প্রত্যেক জল-বিন্দু যদি নির্ম্মল হয়, তবে সেই সকল জলবিন্দুর সম্মিলনে যে জলাশয়ের উৎপত্তি, তাহার সমগ্র জল বিশুদ্ধ হইবে না কেন? সকল উন্নতি, সকল ধর্ম্ম-কর্ম্মের গোড়াতেই আত্ম-সংশোধন এবং আত্মোন্নতি-সাধন। "চাচা, আগে আপন বাঁচা।" আপনাকে প্রস্তুত না করিয়া যিনি সমাজের হিত করিবার আশা করেন,—স্বয়ং সাঁতার না জানিয়া যিনি অপরকে নদী পার করিতে যান, তিনিত বাতুল! আপনাকে প্রাণ-পণে ভাল কর, তাহাতেই জাতীয় ঋণ পরিশোধ হইবে।

অনেক মূর্খ রাজা, জমীদার, এবং ধনী লোকের বিশ্বাস, তাঁহারা সমাজের কোন ধার ধারেন না, স্বজাতির নিকট তাঁহাদের কোন রকম ঋণ নাই। এ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রান্ত। অসভ্য জুলু-রাজ আর সুসভ্য ইংরাজ-রাজ, এ উভয়ের মধ্যে প্রভেদ কি? না, একজনের সমাজ অসভ্য, আর একজনের সমাজ সুসভ্য;—একজন আপন সমাজের নিকট

হইতে জন্মমাত্র যে সকল সম্পদ্ লাভ করিয়াছেন, অন্য তাহা পায় নাই! সভ্যতার বড়াইত ঋণ করা ধনের বড়াই; যতদিন ঋণ পরিশোধ করিতে না পারিতেছ,—অন্ততঃ যে পর্য্যন্ত আত্ম-বলে সমাজের শক্তি বিন্দু-পরিমাণেও বর্দ্ধিত করিতে না পারিতেছ, সে পর্য্যন্ত সভ্য বলিয়া বড়াই করিবার তোমার কোনই অধিকার নাই।

যাঁহারা অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, সমাজের নিকট তাঁহাদের কোন প্রকার ঋণ আছে কি? স্থূল চক্ষে বাহির দেখিলে মনে হইতে পারে, সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী সমাজের কোন ধার ধারেন না; কিন্তু সূক্ষ্ম-দৃষ্টিতে ভিতরে প্রবেশ করিলে দেখা যাইবে, সন্ন্যাসী সমাজের কিছু ধারান বা না ধারান, নিজে কিন্তু সমাজের নিকট ধারেন অনেক। সত্য বটে, আর্য-পৈত্র-দৈব নামক ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ না করিলে যখন সন্ন্যাসে অধিকারই জন্মে না, তখন সন্ন্যাসী দেখিলেই বুঝিতে হইবে তাঁহার উক্ত ত্রিবিধ ঋণ পরিশোধ হইয়াছে; কিন্তু যাহার নিকট হইতে অর্থ লইয়া বাবাজি তিনটি ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন, তাহাকে ফাঁকী দিয়া জঙ্গলে পলায়ন কি সাধু বাবাজির কর্ত্তব্য? সমাজ নালিস করিতে জানে না, [illegible] মোক্তারনামা করিতে পারে না, সুতরাং [illegible] ফাঁকি দেওয়া যাইতে পারে, এরূপ [illegible] অজ্ঞানান্ধ সংসারীর নিকটে সুযুক্তি [illegible] পরিগৃহীত হইলেও সর্ব্বত্যাগী সমদর্শী [illegible] নিকট তাহা সমীচীন বোধ হওয়া [illegible]

[illegible] পূর্ব্বকার ঋষিবিগণ সংসার [illegible] হাড়িতেন না,—জঙ্গলে থাকিয়া গলিত ফল-পত্রে জীবন ধারণ করিয়াও অবিশ্রান্ত তাঁহারা সমাজের মঙ্গল কামনা করিতেন, সমাজের জন্য খাটিতেন। সেই সকল পূজ্যতম মুনিঋষির নিঃস্বার্থ পরার্থপরতা ছিল বলিয়াই আজ আমরা অসংখ্য সামাজিক সম্পদ্ উপভোগ করিয়া চরিতার্থ হইতেছি। যদি তাঁহারা কৃপা করিয়া আমাদিগের জন্য খাটিয়া না যাইতেন, তাহা হইলে আমাদিগকেও হয়ত নিগ্রো প্রভৃতির ন্যায় ইউরোপীয়ের ক্রীতদাস হইয়া পশুবৎ জীবন ধারণ করিতে হইত।

ফলতঃ তুমি যোগী হইতে পার, সন্ন্যাসী হইতে পার, দেবতা হইতে পার; কিন্তু তাহাতে আমার কি? দেবলোকে, ধ্রুবলোকে, ব্রহ্মলোকে কত মহাত্মা রহিয়াছেন, তাহাতে আমার কি? আমাকে যিনি অনুগ্রহ করেন, আমার সঙ্গে যাঁহার কোনপ্রকার সম্বন্ধ জন্মিয়াছে, তিনিই আমার নমস্য; যিনি আমাকে ঘৃণা করেন, আমাকে দেখিলে পলায়ন করেন, আমার ভয়ে জঙ্গলে লুকাইয়া মুক্তির উপায় সাধন করেন, তিনি দেবতা হইতে পারেন, ত্রিলোকের অধীশ্বর হইতে পারেন, অথবা বেদান্তিকের নিষ্ক্রিয়, নিঃসম্বন্ধ, নির্ব্বোধ জড়ভরতের ন্যায় একটা পরমাত্মা হইতে পারেন; কিন্তু তাহাতে আমার কি? যিনি সমাজের জন্য কাঁদেন এবং সমাজের জন্য খাটেন, তিনি সামান্য মনুষ্য হইলেও সমাজের কর্ত্তব্য-শীল বন্ধু।

অতএব দেখা যাইতেছে, মনুষ্যমাত্রেই আমরণ সমাজের ঋণ পরিশোধে ব্যাপৃত থাকিতে বাধ্য। সন্ন্যাসীরা অন্য সকল ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারেন, কিন্তু সমাজের

ঋণ পরিশোধের জন্য তাঁহাদিগকেও চিরদিন খাটিতে হয়। তত্ত্ব-বিদ্যা-সমাজের সভ্যেরা বলেন, বহুশতাব্দ-জীবী মহাপুরুষেরা এখনও বাঁচিয়া আছেন, এবং লোক-চক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া নিয়ত সমাজের হিত-সাধন করিতেছেন; যদি একথা সত্য হয়, তবে ইহার অধিক আনন্দের ব্যাপার আর কি আছে? এরূপ আদর্শ চক্ষের সম্মুখে থাকিতে সমাজের আর ভাবনা কি? এরূপ উচ্চ ব্রত কেবল মহাত্মাদিগের জীবনেই শোভা পায়।

বালকের দুর্নীতির জন্য দায়ী কে ?

(বালকের পক্ষ)

পুঁঠিয়া ইংরাজী বিদ্যালয়ের বালকদিগের মধ্যে "সদ্ভাব-সম্বর্দ্ধিনী" নামে একটি সভা আছে। বিগত তিন বৎসর কাল হইল প্রতিনিধি-প্রণালী-ক্রমে এই সভার কার্য্য চলিয়া আসিতেছে। ইহার সঙ্গে শিক্ষকদিগের কোন সংস্রব নাই, বালকেরাই ইহার পরিচালক, তবে মধ্যে মধ্যে তাহারা প্রধান শিক্ষকের উপদেশ লইয়া চলিয়া থাকে। বালকেরা মাসে একটি করিয়া পয়সা সভাতে দান করে, এবং এইরূপ সংগৃহীত অর্থদ্বারা তাহারা সময়ে সময়ে পরোপকার প্রভৃতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করে। স্বার্থ-ত্যাগের অভ্যাস জন্মাইবার জন্য চাঁদা-সংগ্রহের নিয়ম এই যে, সম্ভব হইলে বালক পিতা মাতার নিকট হইতে চাঁদার পয়সাটি না লইয়া আপন জলখাবার পয়সা হইতে মাসে একটি পয়সা বাঁচাইয়া চাঁদা দিবে। এরূপ সভার কার্য্যকারিতা বাহিরে প্রকাশ পাইবার কোন কথা নাই; কিন্তু ভিতরে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিবার সুযোগ যাঁহাদের আছে, তাঁহারা বুঝিতেছেন, ইহাদ্বারা বালকদিগের বিশেষ উপকার হইতেছে। সময়ে সময়ে ইহারা আত্ম-শাসনের যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে, তাহা বাস্তবিকই আশা-প্রদ। গত রথ-যাত্রা এবং ঝোলন-যাত্রার সময়ে ইহারা আত্ম-শাসনের অতি সুন্দর পরিচয় দিয়াছিল। এই সভার নিয়মাবলী এবং কার্য্য-বিবরণ সাধারণের জানিবার বিষয় বটে, কিন্তু স্থানাভাব-বশতঃ অদ্য আমরা তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম।

সংপ্রতি বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা বড় দুর্নীত হইয়াছে বলিয়া একটা রব পড়িয়া গিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বলিতেছেন ছাত্রেরা দুর্নীত, শিক্ষকেরা বলিতেছেন ছাত্রেরা দুর্নীত, সমাজ-পতিগণ বলিতেছেন ছাত্রেরা দুর্নীত। সকলেই বালকদিগের চরিত্রে দোষারোপ করিতেছেন, কিন্তু তাহাদিগের পক্ষ হইতে বলিবার কিছু আছে কি না, তাহা জানিবার জন্য কেহই যত্ন করিতেছেন না। চিকিৎসক যাহাকে রুগ্ন বলিতেছেন, প্রকৃতই সে রুগ্ন কি না,—এবং রুগ্ন হইলে রোগের নিদান-সম্বন্ধে তাহার নিজের বলিবার কিছু আছে

কি না, তাহা না জানিয়া চিকিৎসায় হাত দেওয়া বিজ্ঞতার পরিচায়ক নহে। বালকদিগের এ সম্বন্ধে বলিবার কি আছে, তাহা জানিবার জন্য প্রধান শিক্ষকের কৌতূহল হয়, এবং সদ্ভাব-সম্বর্দ্ধিনী সভাতে এ সম্বন্ধে তাহাদের স্বাভিমত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করিবার জন্য তিনি বালকদিগকে অনুরোধ করেন। তদনুসারে উক্ত সভার এক অধিবেশনে এ বিষয়ের আলোচনা হইয়াছিল, এবং বিদ্যালয়ের সমস্ত শিক্ষকই নিমন্ত্রিত হইয়া সভায় উপস্থিত ছিলেন। বালকেরা যে সকল কথা বলিয়াছিল, আমরা এস্থলে তাহার সারমাত্র সংগ্রহ করিলাম।

বালকেরা বলে, তাহাদিগকে দুর্নীত না বলিয়া দুর্বিনীত বলাই অধিক সঙ্গত। নীতিবিষয়ে তাহাদের পূর্ব্বগত ছাত্রদিগের অপেক্ষা তাহারা উৎকৃষ্ট না হউক নিকৃষ্ট নহে, এ কথা তাহারা দর্প করিয়া বলে, এবং প্রয়োজন হইলে তাহা প্রমাণ করিতেও তাহারা প্রস্তুত আছে। বালকদিগের চরিত্রে যে বিনয়ের অভাব দেখা যাইতেছে, বালকদিগের মতে তাহা ইংরাজী শিক্ষারই ফল। ইংরাজজাতির প্রকৃতি যেমন উদ্ধত, তাহাদের ভাষা এবং ভাবও সেইরূপ উদ্ধত; সুতরাং সেই উদ্ধত ভাষার উদ্ধত ভাব আয়ত্ত করিয়া তাহাতে যথোচিত বিনয় রক্ষা করা কঠিন। এ কথার প্রমাণ স্বরূপ তাহারা বলে, বঙ্গবিদ্যালয়, মধ্যানু বিদ্যালয়, এবং সংস্কৃত [illegible] ছাত্রেরা দুর্বিনীত এবং দুর্দ্দান্ত হয় না, [illegible] ইংরাজী পড়ে, কেবল তাহাদেরই [illegible] দোষ জন্মে। গত গ্রীষ্মাবকাশের [illegible] স্কোন বিদ্যালয়ের বালকেরা দ্বাররুদ্ধ করিয়া যে শিক্ষকদিগকে প্রহার করিয়াছিল, সে সংবাদও বালকদিগের নিকট অবিদিত নাই। তাহারা বলে, গুরুর ন্যায় শিষ্য অদ্যাপি যদিও ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই, কিন্তু জাতীয়ভাবে ধর্ম্ম এবং নীতি শিক্ষা না দিয়া অন্ধভাবে বর্ত্তমান প্রণালীর অনুসরণ করিতে থাকিলে কালে ভারতেও এরূপ ব্যাপারের অভিনয় হইতে পারে।

বালকদিগের মধ্যে যে দুর্নীতি নাই, এ কথা তাহারা বলে না; তবে লোকে যতটা বলে, ততটা নহে। বিনা আদর্শে চরিত্র গঠন অসম্ভব; যে যেরূপ আদর্শ পায়, সে সেইরূপ হয়। বালকদিগের আদর্শ প্রধানতঃ তিনটি,—অভিভাবক, শিক্ষক, এবং রাজা।

(১) অভিভাবক বা পিতা মাতা প্রায়ই অশিক্ষিত, কিন্তু অশিক্ষিত হইলেও নীতি এবং ধর্ম্ম শিক্ষা দিতে তাঁহাদের শক্তি ও সুবিধা যত অধিক, তত আর কাহারও নাই। যখন আধুনিক প্রণালীর বিদ্যালয়ের এত বাহুল্য ছিল না, তখন পিতা মাতা সন্তানের নীতি ও ধর্ম্ম-শিক্ষায় উদাসীন থাকিতেন না, সন্তানেরাও কাযেই দুর্নীত বা দুর্বিনীত হইত না। এখন পিতা মাতা হাতের কাছে বিদ্যালয় পাইয়াছেন, সন্তান একটুকু বড় হইলেই তাহার অত্যাচার আর তাঁহাদের সহ্য হয় না, তাহাকে বিদ্যালয়ের জেলখানায় পাঠাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হন। তাঁহাদের বিশ্বাস, বিদ্যালয়ে গেলেই বালক বিদ্বান্ হয়, শিক্ষকের সঙ্গে দিনে একবার দেখা হইলেই সে দেবতা হইয়া যায়, সুতরাং নীতি এবং ধর্ম্ম-শিক্ষার ভারটা শিক্ষকের

ঘাড়ে চাপাইয়া তাঁহারা নিশ্চিন্ত থাকেন। কিন্তু যে শিক্ষকের হস্তে বালকের শিক্ষার ভার ন্যস্ত হয়, তাঁহার চরিত্র কিরূপ, শিক্ষা-কার্য্যে আগ্রহ কতদূর, বালককে পরীক্ষার উত্তীর্ণ করাইবার শক্তি ছাড়া অন্য কোন গুণ তাঁহার আছে কি না, ইত্যাদি বিষয় অনুসন্ধান করিয়া তাঁহারা শিক্ষক নিযুক্ত করেন না। চরিত্রাদি বিশেষরূপে না জানিয়া না শুনিয়া, কেবল আবেদন এবং প্রশংসা-পত্র দেখিয়া লোক নিযুক্ত করিবার প্রথা একমাত্র শিক্ষা-বিভাগেই আছে। পিতা মাতা বালকের শিক্ষায় আপন কর্ত্তব্য পালন করেন না, আবার যাহার উপরে শিক্ষার ভার অর্পণ করেন তাহারও উপযোগিতা পরীক্ষা করেন না, অথচ বালক নীতিমান, বিনয়ী, এবং ধর্ম্মশীল হইল না বলিয়া আক্ষেপ করেন, ইহা বড়ই আশ্চর্য্য।

(২) শিক্ষকদিগেরও ত্রুটি আছে। প্রথমতঃ তাঁহারা সকলেই যথোচিত উপযুক্ততা লইয়া শিক্ষা-কার্য্যে প্রবেশ করেন না। শিক্ষা-দানের একটা স্বতন্ত্র শক্তি আছে, এবং যত্নপূর্ব্বক তাহার উৎকর্ষ সাধন করিতে হয়, এ ধারণা অনেক শিক্ষকেরই নাই; অধিকাংশ শিক্ষকই মনে করেন, নিজে কিছু লেখা পড়া জানিলেই বালককে তাহা শিখান যায়। একে উপযুক্ততার অভাব, তাহাতে আবার অনেকের রুচিও নাই। অধিকাংশ স্থলেই দেখা যায়, যখন অন্য কোন দিকে কিছু হইল না, তখনই শিক্ষকতা-গ্রহণে যত্ন হয়, নতুবা এমন অস্বার্থ-প্রদ সম্মান-শূন্য পুরস্কারহীন পথে কেহ প্রবেশ করিতে সহজে উৎসুক হন না। বিশ্ব-বিদ্যালয়ে যাঁহারা বিশেষরূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে কত জন শিক্ষা-বিভাগকে অলঙ্কৃত করিতেছেন? যেস্থলে রুচি নাই, কেবল মাসান্তে বেতনের অনুরোধে খাটিতে হয়, সে স্থলে কর্ত্তব্য কার্য্য যে কেমন সুনির্ব্বাহ হইয়া থাকে, তাহা সহজেই অনুমেয়। তাহার পরে সকল শিক্ষক ছাত্রের প্রতি ব্যবহার করিতে জানেন না। অনেকের ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তা এরূপ যে তাঁহাদের প্রতি ছাত্রের শ্রদ্ধা বা ভক্তি থাকিতেই পারে না, সুতরাং তাঁহাদের অসন্তোষ এবং ছাত্রের অধোগতি অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কোন কোন শিক্ষক মনে করেন একটি ছাত্রের প্রতি অন্যায় বা কঠোর ব্যবহার করিলেও আর দশটি তাঁহার প্রতি অনুরক্ত থাকিতে পারে; কিন্তু এটি বড় ভুল। কোন্‌টি ন্যায় আর কোন্‌টি অন্যায়, তাহা বালকেরা বিলক্ষণরূপে বুঝিতে পারে, এবং তাহা চিরদিন স্মরণ করিয়া রাখে। যতদিন এ সকল কথা স্মরণ থাকে, ততদিন শ্রদ্ধাভক্তি জন্মে না, সুতরাং তাঁহাদের উপদেশও কাযে লাগে না। কোন কোন শিক্ষক নীতি-শিক্ষা তাঁহাদের কর্ত্তব্যের মধ্যেই মনে করেন না; যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারাও অবসর পান না, পাঠ্য পুস্তক পড়াইতেই তাঁহাদের সময়টুকু চলিয়া যায়, সুতরাং সে জন্য তাঁহাদিগকে দোষ দেওয়া অন্যায়। কিন্তু নীতি-শিক্ষার প্রধান উপকরণ যে সাধুচরিত্র, সদ্ব্যবহার, অমায়িকতা, এবং ছাত্রের প্রতি সহানুভূতি, তাহাতে উদাসীনতা প্রদর্শন করা বড়ই আক্ষেপের বিষয়।

(৩). তৃতীয় আদর্শ রাজা। আমাদের রাজা আমাদের কল্পনার সামগ্রী; তিনি দেবতা হইতে পারেন, কিন্তু আদর্শ হইতে পারেন না, কেননা, তাঁহার সহিত আমাদের সংস্রব অতি অল্প। যে সকল রাজ-পুরুষ বা রাজ-কর্ম্মচারী আমাদের ভাগ্য-বিধাতা, তাঁহারাই আমাদের আদর্শ; কিন্তু দুঃখের বিষয়, নানা কারণে তাঁহাদের আদর্শে আমরা দেবত্ব লাভ করিতে পারিতেছি না। ইংরাজের সাহিত্য যাহা শিক্ষা দেয়, ইংরাজের জীবনও যদি তাহাই শিক্ষা দিত, অথবা ইংরাজের সাহিত্য শিখিয়া যদি তাঁহার জীবন-সম্বন্ধে বালকেরা অনভিজ্ঞ থাকিত, তাহা হইলে বোধ হয় আরও অধিক মঙ্গল হইত। ইংরাজের রাজ্য-গ্রহণ, রাজ্য-শাসন বা বিচার-নিষ্পাদনে যে নীতি অবলম্বিত হয়, বালকদিগের তাহা বুঝিবার শক্তি নাই, এবং সেদিকে তাহারা চক্ষু ফিরাইতেও চায় না; কিন্তু ভারতবর্ষের ছাত্রেরা বিশেষ গর্হিত কোন দুষ্কার্য্য না করিলেও বিচক্ষণ ইংরাজ-গবর্ণমেন্ট তাহাদিগের যেরূপ দুর্নাম করিতেছেন, ওক্‌স্‌ফোর্ডের শিক্ষক-প্রহার-কারী ছাত্রদিগের সেরূপ কোন্ দুর্নাম রটিয়াছে কি না, তাহা জানিবার জন্য বালকদিগের স্বভাবতই কৌতূহল হয়। তাহারা শিক্ষা-তত্ত্ব-সঙ্কলনে শিখিয়াছে, ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত হার্বার্ট স্পেন্সারের মতে ইংরাজ-বালক দুর্দ্দান্ত বলিয়াই ইংরাজজাতি স্বাধীন, বীর্য্যবান্, শক্তিশালী এবং লব্ধ-সৌভাগ্য। ইংলণ্ডে যাহা বাঞ্ছনীয়, ভারতে তাহা পরিত্যজ্য কেন? বালকেরা এ প্রভেদের কারণ বুঝিতে অক্ষম। তবে তাহাদের বিশ্বাস আছে, অভিভাবক, শিক্ষক বা গবর্ণমেন্ট, কেহই তাহাদের শত্রু নহেন, সকলেই তাহাদের হিতের জন্য ব্যস্ত; এই বিশ্বাস আছে বলিয়াই তাহারা উপন্যস্ত দোষের বোঝা ঘাড়ে লইয়াও কথঞ্চিৎ অগ্রসর হইতে পারিতেছে। সর্ব্বত্র নিন্দা-ভাজন না হইয়া যদি নিন্দা-স্থলে নিন্দা এবং প্রশংসা-স্থলে প্রশংসা পাইত, তাহা হইলে বালকেরা নিশ্চয়ই অধিকতর উৎসাহ এবং প্রফুল্লতার সহিত অগ্রসর হইতে পারিত। একের অপরাধে দশের দুর্নাম এবং সকলের অখ্যাতিতে না আছে ন্যায়, না আছে ধর্ম্ম, কিন্তু বিরাগ-লাভ প্রচুর।

বালকদিগের মতামত সংক্ষেপে বিবৃত হইল। কোন কূটতার্কিক তর্ক করিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে না পারিতেন, এমন নহে; কিন্তু বালকদিগের মতামত জানাই শিক্ষকদিগের উদ্দেশ্য ছিল, সুতরাং সভা-স্থলে কোন তর্ক বিতর্ক হয় নাই। একটি ভাত টিপিলে যদি এক হাঁড়ি ভাতের অবস্থা জানা যায়, তবে এতদ্দ্বারা ছাত্র-সাধারণের মনের ভাব বুঝিতে পারা যায় না কি? আমরা আশা করি, যাঁহারা ছাত্রদিগের শুভাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা এই প্রবন্ধটি একটুকু মনোযোগ দিয়া পড়িবেন।

মোহিনীমোহন সেনগুপ্ত।

যাঁহাদের সমবেত শক্তির উপর নির্ভর করিয়া শিক্ষা-পরিচর ধীরে ধীরে কর্ত্তব্য-পথে অগ্রসর হইতেছিল, মোহিনীমোহন সেনের মৃত্যুসংবাদে তাঁহারা সকলেই উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছেন; শোকের তীব্রতায় পরিচরের ক্ষুদ্রকণ্ঠ অবরুদ্ধ, তাই মোহিনীমোহনের জীবন-কাহিনী প্রকাশ করিতে বিলম্ব হইতেছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার জীবন-কাহিনী লিখিবার ক্ষমতা আমাদিগের নাই—পুত্রশোকাকুলা জননীর আর্ত্তনাদের সঙ্গে বিধবার হাহাকার মিলিত হইয়া যখনই হৃদয়ে প্রবেশ করিতেছে, তখনই শোকের তীব্রতা নূতন ভাবে জাগিয়া উঠিতেছে!

মৃত্যুকালে মোহিনীমোহনের বয়ঃক্রম ৩২ বৎসরও পূর্ণ হইয়াছিল না,—এই অল্পদিনের মধ্যে ভাল করিয়া দেখিতে না দেখিতে যে জীবনের সমুদায় লীলা-খেলা জলের রেখার ন্যায় মিলাইয়া গেল, তাহার যথোপযুক্ত জীবনী কেমন করিয়া লিখিব? স্ফুটনোন্মুখ কুসুমকোরকের অনাঘ্রাত সৌরভ কোন্ চিত্রকর প্রতিফলিত করিতে পারে? মোহিনীমোহনের জীবন স্ফুটনোন্মুখ কুসুমকোরক ভিন্ন আর কি বলিয়া পরিচয় দিব? তাহার হৃদয়নিহিত শোভার ভাণ্ডার অতি অল্পই বিকশিত হইয়াছিল, তাহার স্বভাবজাত মধুর সৌরভ অতি অল্প দূরই ধাবিত হইয়াছিল—সকল শক্তি, সকল প্রতিভাই যেন কোন সুদূর ভবিষ্যতের প্রতীক্ষায় লুকায়িত ছিল! যাহা ফুটিল না, অনুকূল পবন প্রবাহিত হইবার পূর্ব্বেই যাহার মধুর সৌরভ শ্মশানে লুকাইয়া গেল, সে কুসুম কোরকের জীবন-কাহিনী কয়জন সমাদর করিবে?

মোহিনীমোহনের জীবনকালের অধিকাংশ ভাগই জ্ঞানচর্চ্চায়,—অধ্যয়ন অধ্যাপনায় ক্ষয়িত হইয়াছে; সুতরাং কড়িলাভগণনানিপুণ সংসারকীটদিগের নিকট তাঁহার ক্ষুদ্র জীবনের কোন মূল্য না থাকিলেও, ছাত্র ও অধ্যাপকদিগের নিকট সে জীবন একেবারে মূল্যহীন হইবে না। বাল্যকাল হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত মোহিনীমোহন বিদ্যালয়ে ও কার্য্যক্ষেত্রে আমাদিগের প্রিয়তম সহযোগী ছিলেন সেই জন্য আমাদিগের নিকট পক্ষপাতহীন চরিত্র সমালোচনা ও ন্যায়বিচারের আশা ভরসা না থাকিবারই কথা। কিন্তু মোহিনীমোহনের প্রতিভা এমনই উজ্জ্বল ছিল, স্বভাব এমনই মধুর ছিল, চরিত্র এতই উদার ছিল এবং জীবন এরূপ নির্ম্মল ছিল, যে তাঁহার চরিত্র ও জীবনের সমালোচনা করিতে কোন ইতস্ততঃ করিবার কারণ নাই।

বংশের সঙ্গে প্রতিভার যদি কোন স্বাভাবিক সম্বন্ধ থাকে তবে মোহিনীমোহনের জীবন তাহার একটি বিশেষ দৃষ্টান্তস্থল। রাজসাহীর অন্তর্গত বৈদ্য বেলঘরিয়া বহুদিন হইতে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রালোচনা ও প্রতিভাশালী বৈদ্যরাজদিগের বিদ্যাবত্তার জন্য

বিখ্যাত। বেলঘরিয়ার সেই বিখ্যাত বৈদ্য-বংশজাত স্বর্গীয় গৌরমোহন কবিরাজ মহাশয়ের ঔরসে ১২৬৭ সালের আষাঢ় মাসে মোহিনীমোহনের জন্ম হয়। স্বনামখ্যাত ভিষক্‌কুলচূড়ামণি স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরত্ন মহাশয় মোহিনীমোহনের খুল্ল প্রপিতামহ সুবিখ্যাত রামকান্ত সেন কবিরাজের নিকট চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করেন। মোহিনী-মোহনের পিতৃকুল আয়ুর্ব্বেদ চর্চ্চার জন্য বহুকাল হইতে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়া আসিয়াছেন। ইংরেজশাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর দেশীয় শিক্ষাসমাচার সংগ্রহ করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক আদাম সাহেব পরিদর্শক নিযুক্ত হইয়া যখন বেলঘরিয়ায় গমন করেন, তখনও মোহিনীমোহনের পৈতৃক বাটীতে বৈদ্যশাস্ত্রের সমধিক চর্চ্চা প্রচলিত ছিল। লক্ষ্মী সরস্বতীর বিবাদ চিরবিখ্যাত—বৈদ্য-রাজগণ বিদ্যাবৃদ্ধিতে বিখ্যাত হইলেও ধনী বলিয়া কখনও স্পর্দ্ধা করিতে পারেন নাই। তথাপি তাঁহারা অকাতরে অন্নদান করিয়া দেশ বিদেশের ছাত্রগণকে বিদ্যাদান করিতেছেন দেখিয়া আদাম সাহেব তাঁহাদের সদাশয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তৎকালে রাজসাহী প্রদেশে যে সকল ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত বসতি করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে বেলঘরিয়ার বৈদ্যপণ্ডিতগণের কিরূপ সমাদর ছিল তাহা আদাম সাহেব বারম্বার লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। *

প্রতিভা বংশের পর বংশ সমভাবে প্রবাহিত না হইলেও চরিত্র যে অনেক পরিমাণে পিতৃপুরুষদিগের গুণাবলীর অনুবর্ত্তন করিয়া থাকে তাহা আমরা সর্ব্বদাই প্রত্যক্ষ করিতে পারি। মোহিনীমোহনের প্রতিভা এবং চরিত্র যাঁহারাই বিশেষরূপে আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারাই বুঝিবেন যে তাঁহার পূর্ব্ব-পুরুষদিগের কষ্ট-সঞ্চিত যশোগৌরব তাঁহার জীবনে কিছুমাত্র কলঙ্কিত হয় নাই।

মোহিনীমোহনের পিতামহ দুবলহাটী রাজবাটীতে চিকিৎসা উপলক্ষে গমন করেন, কিন্তু তাঁহার অসামান্য বুদ্ধিমত্তার গুণে অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহাকে মন্ত্রিত্বের গুরুভার গ্রহণ করিতে হয়। এই হইতে চিকিৎসা বিদ্যার সঙ্গে রাজনীতির চর্চ্চা সম্মিলিত হইতে আরম্ভ হয়। মোহিনীমোহনের পিতামহের মন্ত্রিত্ব সময়ে দুবলহাটীর স্বর্গীয় রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর অল্পবয়স্ক ছিলেন, তাঁহার দত্তকত্ব অসিদ্ধ করিয়া তাঁহাকে বনবাসী করিবার জন্য তুমুল মোকদ্দমা চলিতেছিল; সেই বিপদ সময়ে কবিরাজ মহাশয় কখন বিচক্ষণ মন্ত্রীর ন্যায় সদুপদেশ দিয়া, কখন স্নেহপরায়ণ বন্ধুর ন্যায় নিজ পরিবারের অলঙ্কার পর্য্যন্ত বিক্রয় করিয়া অর্থ

* "The most eminent Pandits are Rama Kant Sarbabhouma, a logician and Siva Chandra Sidhanta Vedantic, both highly reputed and both apparently profound in the branches of learning to which they have devoted themselves. I ought add also the medical professors who are venerable men and highly respected by all around them for their learning within their own peculiar range as well as for their general character."

সাহায্য দিয়া স্বর্গীয় রাজা বাহাদুরকে রক্ষা করেন। এই সূত্রে মোহিনীমোহনের বংশের সহিত দুবলহাটী রাজপরিবারের যে বন্ধন সংস্থাপিত হয় এতদিনে তাহা তিরোহিত হইল। মোহিনীমোহনের পিতা উক্ত রাজসরকারে বিশেষ প্রতিপত্তি ও অনুগ্রহ সম্ভোগ করিয়া পরলোকগামী হইলে বাল্যকাল হইতে মোহিনীমোহন সেই রাজানুগ্রহ সম্ভোগ করেন এবং মৃত্যুর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত রাজসরকারের জনৈক বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা ছিলেন। রাজা হরনাথ রায় বাহাদুর নিজকৃত উইলে মোহিনী মোহনকে একজন বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা নিযুক্ত করিয়া পরলোকগমন করেন, কিন্তু সে সংবাদ অবগত হইবার পূর্ব্বেই বিগত ১০ই পৌষ মোহিনীমোহন মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন!

দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা রাখিয়া মোহিনীমোহনের পিতা পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ মোহিনী মোহন তখনও বালক। বাল্যজীবনে পিতৃবিয়োগ হইলে দরিদ্র ছাত্রের পক্ষে জ্ঞানোপার্জ্জনে যত বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইতে পারে, মোহিনীমোহনের মাতুল এবং মাতামহের কৃপায় তাঁহাকে সে সকল ক্লেশ পূর্ণমাত্রায় সহ্য করিতে হয় নাই। সময়ে সময়ে দুঃখের মাত্রা বর্দ্ধিত হইলেও জ্ঞানোপার্জ্জনের জন্য তাঁহার এমনই অপরিতৃপ্ত পিপাসা ছিল যে সাংসারিক দুঃখ ক্লেশ তাঁহার গন্তব্যপথে কখনও বাধা দিতে পারে নাই।

প্রতিভাসম্পন্ন বালকেরা প্রায়ই স্বাধীন চেতা হইয়া থাকে, তাহাদের শৈশবকালের উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারে পিতা মাতা ও শিক্ষকগণ প্রায়ই ব্যতিব্যস্ত হইয়া থাকেন। মোহিনীমোহনের বাল্যজীবনেও সে স্বাধীনতার পরিচয় পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার সঙ্গে উচ্ছৃঙ্খলতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ দেখা যায় নাই। হাতে খড়ি দিবার সময়ে পুরোহিত মাটীর উপর পাঁচটী অক্ষর লিখিয়া দেন, বালককে তাহারই উপর হাত ঘুরাইতে হয়—ইহাই চিরন্তন প্রথা। মোহিনীমোহনকে ঐরূপ হাত ঘুরাইবার সময়ে বিশেষ বিড়ম্বনা উপস্থিত হইয়াছিল। তিনি পুরোহিতের লিখিত পঞ্চাক্ষরের নিম্নে ঐরূপ পাঁচটি অক্ষর লিখিয়া দিলেন, কিন্তু হাত ঘুরাইতে সম্মত হইলেন না। প্রাচীন প্রথা অনুসরণ করিবার জন্য পিতা বারম্বার আদেশ করায় বালক মোহিনী কেবল এইমাত্র বলিয়াছিলেন "এক রকম হইলেই হইল।" এইখানে নিরহঙ্কার ও বিনীত স্বাধীনতার যে পূর্ব্বসূচনা প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহাই মোহিনীমোহনের সমুদায় জীবনে পরিস্ফুট হইতে লাগিল।

অনেকে কেবল স্বাতন্ত্র্যের জন্যই স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে ভাল বাসেন, কিন্তু মোহিনী বাবুর সেরূপ ছিল না; যেখানে স্বাতন্ত্র্য অবলম্বনে বিশেষ সুবিধা দেখিতেন, কেবল সেই স্থলেই তাঁহার স্বাতন্ত্র্য ছিল। বিশেষতঃ গণিত শাস্ত্রেই তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্য বিশেষ স্ফূর্ত্তি পাইত। অনেক সময়ে অভিজ্ঞ অধ্যাপকেরা অত্যন্ত জটিল ও বক্র পথ অবলম্বন করিয়া যে সকল প্রশ্নের সমাধান করিতেন, মোহিনীবাবু অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে তাহা সম্পাদন করিয়া অধ্যাপকদিগের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেন। তিনি কখনও গণিতের কোন বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিবার জন্য

মোহিনীবাবুর নিকট গিয়াছেন, তিনিই বুঝিয়াছেন উক্ত শাস্ত্রে তাঁহার স্বাভাবিক প্রবেশাধিকার কতদূর ছিল। মুহূর্ত্তমাত্র আকাশের দিকে চাহিয়া তিনি যে সমস্যার মীমাংসা করিতে পারিতেন, তাহা দেখিয়া অভিজ্ঞ অধ্যাপকেরাও অবাক্ হইতেন। ইহাই প্রকৃত প্রতিভা!

মোহিনী বাবুর মাতুলালয় পুঁঠিয়াতে, এখানে মাতুল শ্রীযুক্ত বাবু গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয়ের বাড়ীতে থাকিয়া অত্রত্য বিদ্যালয়ে তিনি পড়িতে আরম্ভ করেন। এখানে শিক্ষক ও ছাত্র সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভাল বাসিতেন; বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থানটি তাঁহার একচেটিয়া হইয়া উঠিয়াছিল।

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের প্রথমে তিনি পুঁঠিয়া হইতে বোয়ালিয়া হাইস্কুলে পড়িতে যান। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। ঐ বৎসর বোয়ালিয়া হাইস্কুল হইতে ২১ জন পরীক্ষার্থী উত্তীর্ণ হয়, তন্মধ্যে কেবল মোহিনীবাবুই প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন, এবং মাসিক ১৫ টাকা বৃত্তিলাভ করেন।

পরীক্ষার পূর্ব্বে জ্যৈষ্ঠ মাসে মোহিনীবাবু পুঁঠিয়াতে গ্রীষ্মাবকাশ উপভোগ করিতে আসিয়াছেন। তখন নবাবিষ্কৃত প্লাঞ্চেট-যন্ত্র লইয়া ভারি আন্দোলন চলিতেছিল। একদিন মোহিনীবাবু ও আর দুইজন সহপাঠী বসিয়া প্লাঞ্চেট্‌কে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। পরীক্ষা-সম্বন্ধে তিনটি এবং মৃত্যু সম্বন্ধে তিনটি, মোটের উপর এই ছয়টি প্রশ্ন হইয়াছিল, এবং ছয়টি প্রশ্নেরই পরিষ্কার উত্তর পাওয়া গিয়াছিল। মোহিনীবাবুর অকালে মৃত্যু হওয়াতে এ পর্য্যন্ত চারিটি উত্তর একেবারে বর্ণে বর্ণে সফল হইল; অবশিষ্ট দুইটির ফলাফল এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। পাঠক বলিতে পারেন, এই প্লাঞ্চেট্-ব্যাপারটা কি?

মোহিনীবাবু প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতায় যাইয়া প্রেসিডেন্সি কালেজে পড়িতে থাকেন। ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দে ঐ কালেজ হইতে ফার্ষ্ট আর্টস্ পরীক্ষা দিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম স্থান অধিকার করেন, এবং প্রসিদ্ধ ডফ্‌সাহেবের বৃত্তি ও মহারাজ হোলকার-প্রদত্ত স্বর্ণ-পদক প্রাপ্ত হন।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে মোহিনীবাবু বি, এ, পরীক্ষায় উপস্থিত হন, এবং এবারও শীর্ষস্থান লাভ করেন; কিন্তু এই পরীক্ষায় একটি দুর্ঘটনা সংঘটিত হওয়াতে তাঁহার ভবিষ্যতের উন্নতির আশা একেবারে বিনষ্ট হয়।

মোহিনীমোহনের আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে না পারায় বৃত্তি পাওয়ার পথ বন্ধ হইল—তিনি সত্য সত্যই বিশেষ বিপদের মধ্যে পতিত হইলেন। বিপদ ভিন্ন প্রকৃত সুহৃদের পরিচয় পাওয়া যায় না। পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় মোহিনীমোহনের দুঃসময়ের কথা শুনিয়া তাঁহাকে আপন কলেজে আনিলেন এবং মাসে মাসে অর্থদান করিয়া মোহিনীর পাঠের ক্লেশ দূর করিয়া দিলেন। এই ঋণ স্মরণ করিয়া বিদ্যাসাগরের মৃত্যুদিনে মোহিনীমোহন রুগ্নশয্যায় থাকিয়াই বন্ধুদিগকে বলিয়াছিলেন "তোমরা চিন্তা করিও না; যদি আরোগ্যলাভ করি, রাজসাহীতে বিদ্যাসাগর-স্মরণ-চিহ্ন রাখিবার জন্য প্রাণপণে

যত্ন করিব।” হায়, সে শুভসংকল্প আর কার্য্যে পরিণত করার অবসর ঘটিল না।

বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া মোহিনীমোহন কলিকাতা ইউনিভার্সিটী কালেজের প্রিন্সিপাল্ হন। তাঁহার একজন সুযোগ্য ছাত্র সিবিল সার্ব্বিস্ পরীক্ষায় যোগ্যতার সঙ্গে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। এই সময়ে মোহিনীমোহন সুসঙ্গের মহারাজকুমারদিগের শিক্ষকতাও করিতেন। রাজকুমারদের প্রায়ই বিদ্যালাভ ঘটিয়া উঠে না, কিন্তু মোহিনীমোহনের এই ছাত্রদের মধ্যেও কেহ কেহ এম্, এ, পর্য্যন্ত পাশ করিয়াছেন।

কলিকাতা হইতে বি, এল, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ওকালতি করিবার জন্য মোহিনী মোহন রাজসাহীতে আগমন করেন—এইখানেই তাঁহার জীবনের অভিনয় সমাপ্ত হইল। ওকালতি করিবার সময়েও অধ্যয়নলিপ্সা প্রবল ছিল, দীর্ঘজীবী হইলে কালে অবশ্যই তাহার আশানুরূপ ফল প্রকাশ হইত।

ইউনিভার্সিটি কলেজের নির্দ্দিষ্ট আয় ছাড়িয়া ওকালতী অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে বিশেষরূপে ভাবিবার জন্য একজন বন্ধু তাঁহাকে লিখেন। পত্রোত্তরে মোহিনীবাবু বলেন,—“উন্নতির অর্থ প্রতিকূলতার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া জয়লাভ। নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিয়া কে কবে উন্নত হইতে পারিয়াছে?” দুঃখের বিষয়, মোহিনীবাবু তাঁহার সত্যতা নিজ জীবনে প্রতিপন্ন করিবার অবসর পান নাই।

১২৯৭ সালের অগ্রহায়ণ (খৃঃ অঃ ১৮৯০, ডিসেম্বর) মাসে মোহিনীবাবু উৎকট জ্বররোগে পীড়িত হন, কিন্তু শ্রীযুক্ত বাবু কেদারেশ্বর আচার্য্য এম্, বি ও অন্যান্য চিকিৎসক ও বন্ধুগণের চিকিৎসা এবং শুশ্রূষায় মৃত্যুমুখ হইতে রক্ষা পান। কিন্তু বহু যত্নেও তাঁহার স্বাস্থ্য আর ফিরিল না, তখন তাঁহার চিকিৎসকগণ জল-বায়ু-পরিবর্ত্তনের পরামর্শ দিলেন।

চিকিৎসকদিগের পরামর্শে চৈত্র মাসে রামপুর বোয়ালিয়া হইতে বাড়ীতে যাইয়া কয়েক মাস থাকেন, কিন্তু তাহাতেও উপকার না হওয়াতে ভাদ্র মাসে দার্জ্জিলিং যান। কার্ত্তিক মাসে তথায় শীতের বৃদ্ধি আরম্ভ হইলে তথাকার চিকিৎসক পশ্চিম যাইতে উপদেশ করিলে তিনি কার্ত্তিক মাসেই দার্জ্জিলিং হইতে আইসেন, এবং অগ্রহায়ণ মাসে পশ্চিম যাইবার মানসে কলিকাতা যান। তথায় প্রসিদ্ধ ডাক্তার বাবু কালীকৃষ্ণ বাগছি এবং বাবু নীলরতন সরকার, এবং প্রসিদ্ধ কবিরাজ বাবু দ্বারকানাথ সেন এবং রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন, ইঁহারা সকলেই কলিকাতায় কিছুদিন থাকিয়া চিকিৎসা দ্বারা শরীর আগে সুস্থ করিবার পরামর্শ দিলেন, এবং দ্বারিকবাবু চিকিৎসা করিতে লাগিলেন, কাজেই আপাততঃ পশ্চিম যাওয়ার সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিতে হইল। সঙ্গে মাতুল, শ্বশুর, জননী, সহধর্ম্মিণী, এবং অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য রামনাথ ও আর একটি ভৃত্য রহিল, ক্রমে চিকিৎসা চলিতে লাগিল।

কলিকাতায় যাইয়া প্রথমতঃ জ্বর বৃদ্ধি হয়, এবং তাহার সঙ্গে অরুচি প্রবল হইয়া উঠে; কিন্তু চিকিৎসাতে তাহা দূর হইয়া যায় এবং আরোগ্য-লাভের লক্ষণ কতকটা

প্রকাশ পায়। তদ্দর্শনে তাঁহার মাতুল গিরিশ বাবু কতকটা আশ্বস্ত হইলেন, এবং তদবস্থায় তাঁহাকে রাখিয়া কিছুদিনের জন্য বাড়ীতে আসিলেন।

কয়েক দিন একটুকু সর্দ্দি হইয়াছিল, ৯ই পৌষ গলার একটুকু বেদনা বোধ হয়, ১০ই পৌষ তাহা অত্যন্ত বৃদ্ধি পায়। ঐ তারিখে নাটোরের দেওয়ান শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণচৈতন্য ভৌমিক মহাশয় সকাল বেলায় তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতি কষ্টে দুই একটি কথা বলিয়া শেষটা মোহিনীবাবু বলেন, "আমি বর্ষাধিক হইল রোগে কষ্ট পাইতেছি, কিন্তু আজিকার মত যন্ত্রণা এক দিনও পাই নাই।" এই কথা বলার পর নাকি তাঁহার অশ্রুপাত হইয়াছিল। যাঁহারা মোহিনী বাবুর প্রকৃতি ভালরূপ জানেন, তাঁহারা অবশ্যই বুঝিবেন এ অশ্রুপাত সহজে হয় নাই। তাঁহার শ্বশুর নিজে একজন ডাক্তার, তিনি সর্ব্বদাই মোহিনীবাবুর নিকটে ছিলেন, অথচ পীড়ার গুরুত্ব বুঝিতে পারেন নাই। মধ্যাহ্ন সময়ে মোহিনীবাবু একবার বলিয়াছিলেন, "একখান উইল করিলে ভাল হইত।" কিন্তু সে কথা কেহ কাণে তুলিলেন না। আর একবার তিনি বলিয়াছিলেন, "সর্ব্বদা ডাকিতে পাওয়া যায়, বাসার নিকটের এমন একজন ডাক্তার ডাকিলে ভাল হইত;" কিন্তু তাহাও কেহ পরামর্শ-সিদ্ধ মনে করিলেন না। তিনি ক্রমে শ্বাস-রোধের উপক্রম অনুভব করিতে পারিয়া চিকিৎসকদিগকে বলিলেন; তাঁহারা শ্বাস-যন্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন সমস্তই ঠিক্‌ঠাক্ আছে, কাযেই অভয় দিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু তাঁহার যে গলাভারি হইয়াছে, এ সন্দেহ কাহারও হইল না! সন্ধ্যার সময়ে অত্যন্ত অধিক যন্ত্রণা অনুভব করিয়া তিনি নিজেই চাকরকে কালী বাবুর নিকট পাঠাইয়া দিলেন; কিন্তু এই সময়ে পীড়ার এত বৃদ্ধি হইয়া উঠিল যে কালীবাবু অতি দ্রুত আসিয়াও তাঁহাকে জীবিত পাইলেন না!

সন্ধ্যার পরে দুগ্ধ সুজি পথ্য করিয়া উপবেশন করিলেন, জননী এবং শ্বশুর দুইপার্শ্বে বসিলেন। মুহূর্ত্ত পরেই শ্বশুরের দিকে চাহিয়া ইংরাজীতে বলিলেন, "You see, I am going to die now." (আপনি দেখুন, আমি এখন মরিতে চলিলাম)। এই বলিয়া কাপড় দিয়া মুখ ঢাকিয়া মাতৃ-ক্রোড়ে ঢলিয়া পড়িলেন। শ্বশুরের এতই ভ্রম হইয়াছিল যে তখনও তিনি বিচলিত হন নাই, কিন্তু বুদ্ধিমতী মাতা নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না,—তিনি নাসিকায় হাত দিয়া দেখিলেন, তাঁহার সর্ব্বস্বধন মোহিনী তাঁহাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে! জননী ও সহধর্ম্মিণীর একমাত্র অবলম্বন, মাতুল ও শ্বশুরের অশেষ স্নেহের ধন, বন্ধুবান্ধবের হৃদয়-রঞ্জন, এবং রাজসাহীর বহু আশার স্থল,—এ সমস্তই এইরূপে একমুহূর্ত্তে ফুরাইয়া গেল! আর পরিচয়ের আজ যে ক্ষতি হইল, তাহা কখনও পূর্ণ হইবে না!

যাঁহার জন্য সমস্ত প্রদেশ ব্যথিত, তাঁহার দুঃখিনী জননী এবং সহধর্ম্মিণীকে কি বলিয়া প্রবোধ দিব? ভগবান্ তাঁহাদিগকে সান্ত্বনা করুন, মোহিনীবাবুর পরলোক-গত আত্মাকে শান্তিপ্রদান করুন!

আত্ম-রক্ষার উপায় কি ?

আশ্বিনের পরিচয় যাঁহারা পড়িয়াছেন, বাঘের দৌরাত্ম্যের কথা তাঁহাদের স্মরণ থাকিবে। রাজসাহীর অন্তর্গত আড়াণী প্রভৃতি স্থানে প্রত্যহ যে সকল কাণ্ড ঘটিতেছে, তাহা স্মরণ করিতেও শরীর রোমাঞ্চিত হয়! আমরা অনেক ঘটনা জানি, যাহা শ্রবণ করিলে অশ্রু সংবরণ করা মানুষের অসাধ্য। পাঠক আমাদের মুখে এসব কথা কতক শুনিয়াছেন; আজ স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্র হিন্দুরঞ্জিকার মুখে সে কাহিনী কিঞ্চিৎ শ্রবণ করুন। ২৭ শে ফাল্গুনের হিন্দুরঞ্জিকা বলিতেছেন,—

"আড়াণীর বাঘের কথা লিখিতে লিখিতে আমাদের লেখনী অবসন্ন হইল, তথাপি স্থানীয় লোকের প্রাণ রক্ষার কোন উপায় হইল না ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয়। অন্যান্য সহযোগীগণও এবিষয়ে নির্ব্বাক্ নহেন তথাপি কর্ত্তৃপক্ষগণের চৈতন্য হইতেছে না। পুনরায় বাঘের সম্বন্ধে যে বিশ্বাসজনক সম্বাদ প্রাপ্ত হইয়াছি তাহাতে আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইয়াছি। এক বিধবার একটী মাত্র পুত্র বয়স ১৭। ১৮ বৎসর। বর্ত্তমান মাসেই বিবাহের দিন স্থির হইয়াছিল। বালকটী নিকটবর্ত্তী এক বাটীতে চাকরী করিত এবং প্রতিদিনই রাত্রি না হইতেই বাটীতে আসিত। বিধবা মাতা, একমাত্র পুত্র বাটীতে না পৌঁছা পর্য্যন্ত প্রতিদিনই একখান লাঠি হাতে করিয়া দ্বারের নিকটে দাঁড়াইয়া থাকিত। বালক এই দিনও সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাটীতে আসিয়া যেমন বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিতেছিল অমনি নিকটস্থিত একখান গরুর গাড়ীর নীচ হইতে বাঘ লম্ফ প্রদান করতঃ বালকটীর গলা কামড়াইয়া ধরিল। মাতা বালকের এই অবস্থা দেখিয়া হস্তস্থিত লাঠিদ্বারা বাঘের উপর প্রহার করিতে লাগিল। বাঘ বালকটিকে মারিয়া তাহার মাতাকে কামড়াইয়া ধরিল এবং তাহাকেও মারিয়া ফেলিল। উঃ! কি ভয়ানক দৃশ্য। অধিকতর দুঃখের বিষয় এই যে গ্রামস্থ অধিবাসীগণ বাঘের ভয়ে এমত ভীত হইয়াছে যে এরূপ ঘটনায়ও কেহ সাহায্যার্থ অগ্রসর হইতে সাহস পায়না।"

পাঠক মনে করিবেন না যে উপন্যাস পড়িতেছেন,—বৃটিশ ভারতের বুকের উপরে, ভারত-রাজধানীর অদূরে প্রত্যহ দিন রাত্রি এইরূপ ঘটনা বাস্তবিকই ঘটিতেছে। অধিবাসীদিগের বিশ্বাস "গবর্ণমেণ্টকে জানাইলে প্রতিকার হইবে," তাই তাহারা ছোটলাট বাহাদুরের নিকট দুইখানি দরখাস্ত করিয়াছে। এই দরখাস্তে কোন ফল ফলিয়াছে কি না তাহারা জানে না, তবে আবেদনের পূর্ব্বে একবার এবং পরে একবার জেলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ব্যাঘ্র-পীড়িত স্থানে বাঘ মারিতে আসিয়াছিলেন, এ সংবাদ আমরা জানি। কিন্তু কেহ বাঘ দেখাইয়া দিতে পারে নাই, কাযেই তিনও মারিতে পারেন নাই। দ্বিতীয়বারে তিনি আড়াণীতে উপস্থিত থাকিতেই নাকি একটা লোক ব্যাঘ্র-কর্ত্তৃক হত হয়, অথচ মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে

কেহ বাঘ দেখাইয়া দিতে পারিল না। বাঘ যে নিয়ত একস্থানে থাকে না, একথা পূর্ব্ববারে বলা হইয়াছে।

অবস্থা দেখিয়া স্বীকার করিতে হইবে, হয় প্রজাকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবার শক্তি আমাদের গবর্ণমেন্টের নাই, আর না হয় প্রজার সর্ব্বনাশে তাঁহারা ক্ষতি মনে করেন না। ইহার কোনটি সত্য, তাহা গবর্ণমেন্টই বলিতে পারেন। কথিত আছে, গজনি-পতি মামুদের রাজ্যকালে কোন দূর-দেশে এক ব্যক্তি দস্যু-হস্তে নিহত হয়, এবং হত ব্যক্তির মাতা মামুদের নিকটে যাইয়া নালিস করে। মামুদ বলিলেন, "ঐ স্থান রাজধানী হইতে অনেক দূরে, এজন্ত দস্যুকে সমুচিত দণ্ড দেওয়া অসম্ভব।" শুনিয়া তেজস্বিনী রমণী বলিল, "যে স্থান রক্ষণ বা শাসন করিতে তোমার ক্ষমতা নাই, সে স্থানে রাজত্ব করিতে যাও কেন?" মামুদ নিরুত্তর হইলেন। আমাদের গবর্ণমেণ্টকে এমন কথা বলিবার সাহস কাহারও নাই; আর বলিলেও গবর্ণমেন্ট যে নিরুত্তর থাকিবেন, এমন বোধ হয় না। ফলকথা ইংরাজ-জাতি ব্যবসায়-বাণিজ্য যেমন বুঝেন, রাজ-ধর্ম্ম তেমন বুঝেন না,—রাজ্য-গ্রহণ এবং রাজ্য-শাসন যেমন জানেন, রাজ্য-পালন তেমন জানেন না!

উক্ত পত্রিকা-পাঠে আরও জানা গেল, বাঘটি খোঁয়াড়ে পড়িয়াছিল, কিন্তু অস্ত্রাভাবে মারা পড়িল না! যদি ইহা সত্য হয়, তবে এই ক্ষুদ্র ঘটনাটির মধ্যে ভারতবাসীর ভাবিবার—আপন অবস্থা-সম্বন্ধে শিক্ষালাভ করিবার অনেক কথা আছে; কিন্তু ভাবিবার মাথা কোথায়?

কয়েকটি ভাবিবার বিষয়।

(১) যে শিক্ষার উপরে দেশের সমস্ত মঙ্গল নির্ভর করে, সেই শিক্ষা প্রকৃত পথে, প্রকৃতভাবে, প্রকৃত লোক দ্বারা সম্পাদিত হইতেছে কি না। অন্য দেশে শিক্ষার উদ্দেশ্য উন্নতি, ভারতে শিক্ষার উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা এবং উন্নতি,—এই সমস্যা, শিক্ষা-তরীর কর্ণধারেরা বুঝিয়াছেন কি না?

(২) ইংরাজ এবং ভারতবাসীর মধ্যে অসদ্ভাবে কাহার ক্ষতি অধিক? এ অসদ্ভাবের জন্য দায়ী কে? ইহা দূর করিবার উপায় কি? ইংরাজ যদি স্বার্থান্ধ হইয়া বা ইচ্ছা করিয়া অসদ্ভাব বৃদ্ধি করেন, তবে ভারতবাসীর কর্ত্তব্য কি?

(৩) ব্যক্তি-বিশেষকে গালি দিলে যেমন তাহার প্রতিকার হয়, সেইরূপ জাতি-বিশেষকে গালি দিলে তাহার প্রতিকার হইতে পারে কি না। পেণ্টিকোষ্টের ন্যায় আদর্শ-খৃষ্টান ধার্ম্মিকেরা যে মিথ্যা কথা বলিয়া ভারতবাসীকে গালি দেন, ভারতের নানা ভাষায় তাহার অনুবাদ সাধারণে প্রচার হইলে দুর্ব্বল পরাধীন ভারতবাসীর মঙ্গল হইবে কি?

(৪) দেশব্যাপী আন্দোলন দ্বারা ভারতবাসী যাহার প্রতিবাদ করে, ইংরাজ-গবর্ণমেণ্ট প্রায়ই তাহা কার্য্যে পরিণত করেন ; দৃষ্টান্ত সম্মতি-আইন প্রভৃতি। এখন জিজ্ঞাস্য, কেবল রাজ-নৈতিক শিক্ষার অনুরোধে এরূপ আন্দোলন কর্ত্তব্য কি ?—যুক্তি-তর্কে ভিক্ষার্থী ফল পায় কি ?

(৫) ভারত-বাসীকে বধ করিলে ইংরাজের প্রাণ-দণ্ডের আইন থাকিলেও কার্য্যে প্রায়ই তাহা হয় না, বিড়াল কুকুর বধ করিলে যে দণ্ড হয়, সচরাচর বধকর্ত্তার সেই রূপ দণ্ডই হইয়া থাকে। ন্যায়-পরায়ণ ইংরাজ রাজা, ইংরাজ বিচারক, ইংরাজ জুরি, ইংরাজের আইন, সুতরাং অবিচারের কোন সম্ভাবনাই নাই। তবে এরূপ হইবার কারণ কি, আর কিসে সে কারণ দূর হইতে পারে ?

(৬) কোন ইংরাজ কোন ভারতবাসীর প্রতি অন্যায় অবিচার বা অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া সে কোন ইংরাজ-বিচারকের নিকট আবেদন করিল ; কিন্তু ইংরাজ-কর্ত্তৃক এ কার্য্য অসম্ভব, এই বলিয়া বিচারক মহাশয় সাক্ষ্য প্রমাণ না লইয়াই আবেদন অগ্রাহ্য করিলেন। বিচারের এমন সহজ প্রণালী যখন উদ্ভাবিত হইল, তখন দেশে এত বিচারক এবং এত উকীল মোক্তারের প্রয়োজন কি ?

(৭) শাস্ত্র কিছু নহে, দেবদেবী কিছু নহে, হিন্দুর রীতিনীতি কিছুই কিছু নহে, ইহাই বর্ত্তমান যুগের প্রথম শিক্ষা। বালক বালিকা এই শিক্ষা পাইয়া নিজে নিজে কয়েকটা উপপত্তি করিয়া লয়, যথা ;—পিতা মাতা কিছু নয়, শিক্ষক কিছু নয়, সমাজ কিছু নয়, নীতি কিছু নয়, ধর্ম্ম কিছু নয়, ঈশ্বর কিছু নয় ! শ্রদ্ধার গোড়ায় কুঠারাঘাত করিয়া যাঁহারা আগায় জল ঢালিতেছেন, তাঁহারা ভবিষ্যৎটা একবার ধ্যান করিয়া দেখিয়াছেন কি ? নীতি-শিক্ষার চাঁইগণ এ সকল কথা উপেক্ষা করিয়া আলগা ঢিল ছুড়িলে ফল পাইবেন কি ?

(৮) স্বাধীন জাতীয় লোকেরা নেতৃত্বের অধীন, কিন্তু অধীন জাতীয় লোকেরা স্ব স্ব প্রধান। কোন পতিত জাতি নেতৃশূন্য হইয়া উঠিতে পারিয়াছে কি ?

(৯) ইংরাজ-প্রভুত্বে রপ্তানী বন্ধ হইবে না, সুতরাং ভারতে বার্ষিক দুর্ভিক্ষ অনিবার্য্য। ভারতবাসী গবর্ণমেণ্টের সাহায্য না লইয়া ইহার কোন প্রতিবিধান করিতে পারে না কি ?

(১০) নৌকা মধ্য নদীতে। আরোহী অনেক, কিন্তু প্রায় সকলেই নিদ্রিত, যে দুই চারিজন জাগ্রত আছেন, তাঁহারা সকলেই বিবাদ-বিতণ্ডায় মত্ত ; এদিকে কিন্তু নৌকার তলা ফুটিয়া হুহু করিয়া জল উঠিতেছে ! বল দেখি, এমন বিপদে কি করা কর্ত্তব্য ? বল দেখি, ভারতে এমন অবস্থার কিছু আছে কি না ?

(১১) বড়লাট বাহাদুর বলিয়াছেন, যাহা (ইংরাজের নিকট ?) দুর্নীতি বলিয়া বোধ হইবে, ধর্ম্মের সঙ্গে সংস্রব থাকিলেও তাহা ছাড়িতে হইবে। এই জন্যই সম্মতি-আইন পাস হইয়াছে। শিশু কৃষ্ণ যশোদার স্তনপান করিতেছেন, ইহা অশ্লীল বলিয়া চিত্রবিক্রেতার দণ্ড হইয়াছে। এখন জিজ্ঞাস্য, কালী, শিব প্রভৃতি দেবতার ব্যবস্থা কি হইবে ? সন্ন্যাসীগণ কোথায় যাইবে ? নবজাত উলঙ্গ শিশুসন্তানের কি করিতে হইবে ? সহবাস, গর্ভ-ধারণ, প্রসব প্রভৃতি শব্দের স্থান ভাষায় এবং অভিধানে থাকিবে কি না ?

বিদায়।

প্রিয় পাঠক! আজ তিন বৎসরের পরিচয়ের পর আমাদিগকে কিছুদিনের জন্য বিদায় লইতে হইতেছে। যেদিন শিক্ষা-পরিচর হাতে করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করি, সেদিন ভাবি নাই এত অল্প দিনের মধ্যেই এমন করিয়া বিদায় লওয়ার প্রয়োজন হইবে। ভাবিয়াছিলাম, শিক্ষাপরিচরের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে নিত্য নূতন উৎসাহে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইব। আজ সেদিনের আশার উজ্জ্বলালোকের সঙ্গে বর্ত্তমান নৈরাশ্যের ছায়ার তুলনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল—এ দুর্ব্বলতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আমাদিগকে বিদায় লইতে হইতেছে কেন? সে কথা কাহাকেও বলিব না বলিয়াই এতদিন মৌনব্রত ভাঙ্গি নাই। বঙ্গসাহিত্য-সমুদ্রে কত বুদ্বুদ্ উঠিতেছে। কত বুদ্বুদ্ ডুবিতেছে—বুদ্বুদের উত্থান-পতনের ক্ষুদ্রকাহিনী শুনাইয়া কি হইবে? কিন্তু কতকগুলি ঘটনা একত্র সম্মিলিত হইয়া আমাদের সে সংকল্প বিচলিত করিয়া দিয়াছে।

ক্ষতি-লাভ-গণনা করিয়া সাহিত্যব্যবসায় খুলিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষা-পরিচর জন্মগ্রহণ করে নাই।—তাহা হইলে পল্লীগ্রামের জীর্ণ-কুটিরে বসিয়া কেবল শিক্ষা-সংক্রান্ত নীরস কচ্‌কচির দোকান খুলিবার পরামর্শ কেহই দিতেন না। আমরা সেবার অধিকারী—সেবার গুরুতর দায়ে দায়ী। শিক্ষানীতির সমুচিত আলোচনা হইতেছে না, কিসে শিক্ষার উন্নতি হয় কিসে অবনতি হয় কেহই ধরাবাঁধা করিয়া তাহার জন্য আন্দোলন করিতেছেন না, অথচ শিক্ষাই জাতীয়জীবনের মূলশক্তি—তাই আমরা শিক্ষার পরিচর্য্যার জন্য অগ্রসর হইয়াছিলাম। এখন নিজের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি যে, বামনের চন্দ্রধারণের চেষ্টার ন্যায় বড়ই উচ্চ লক্ষ্যের দিকে ক্ষুদ্র বাহু প্রসারণ করিয়াছি! পরিচর্য্যা করিতে যে শক্তির প্রয়োজন, আজিও সে মহাশক্তি আমাদের মধ্যে আইসে নাই। তাই—শক্তি-সঞ্চয়ের জন্য কিছুদিনের অবসর প্রয়োজন, আত্ম-শিক্ষার জন্য কিছুদিনের বিদায় প্রার্থনীয়; যদি ভগবানের কৃপায় এবং দশজনের আশীর্ব্বাদে সে শক্তি সঞ্চয় করিতে পারি, শীঘ্র হউক বিলম্বে হউক আবার শিক্ষাপরিচর হাতে লইয়া পাঠকগণকে অভিবাদন করিব।

এতদিন আমরা আত্মকথা বলি নাই—প্রয়োজন না থাকিলেও আত্মকথা ও আত্মপরিচয় লইয়া লোকের দ্বারে দ্বারে চিৎকার করিয়া বেড়ান সুনীতিবিরুদ্ধ বলিয়াই আমাদের ধারণা। প্রয়োজনবশত আত্ম-কথা না বলিলে আর চলিতেছে না; তবুও সংস্কারবশতঃ বলিতে আসিয়াও বলিতে পারিতেছি না। যাহা এতদিন বলি নাই; আজিও তাহা বলিতে পারিলাম না। কেবল এইমাত্র বলি যে, নিঃস্বার্থভাবে স্বদেশের কল্যাণকামনায় অগ্রসর হইয়া নিতান্ত নিরপরাধে আমরা ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি—সে ঋণ পরিশোধ না করিয়া আর অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারি না। তাই কিছুদিনের জন্য বিদায় চাই।

শিক্ষা-পরিচরের ন্যায় একখানি উচ্চশ্রেণীর পত্রিকার জন্য আমাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইল কেন, সহসা তাহা বুঝিয়া উঠা কিছু কঠিন সমস্যাই বটে; পরিচরের মূল্য যৎসামান্য, বৎসরে ১৷৵০ মাত্র, স্বদেশের মুখোজ্জ্বলকারী শিক্ষিত সম্প্রদায় ভিন্ন আর কোন স্থানে ইহার আদর হইতে পারে না, সুতরাং গ্রাহকগণ সকলেই উচ্চশ্রেণীর। তার উপর বাঙ্গালার প্রধান প্রধান স্থানে কত হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধু ইহার "এজেণ্ট" হইয়া মঙ্গলকামনা করিতেছেন! এত সহায়-

সম্পদের মধ্যেও অন্নবস্ত্রের ক্লেশে পরিচর জর্জ্জরিত হইতেছে কেন?

আমরা ব্যবসায় জানি না—গ্রাহকগণও নিতান্ত ব্যবসায়ীর মত মূল্যের জন্য তাগাদা না করিলে কপর্দ্দক দিবেন না—বোধ হয় ইহাই আমাদের দুর্দ্দশার কারণ! গ্রাহকগণ হয়ত মনে করিয়াছেন, বৎসরান্তে লোক পাঠাইয়া বা পত্র লিখিয়া আমরা টাকা সংগ্রহ করিয়া লইব;—আমরা কিন্তু ভাবিয়া রাখিয়াছি যে মাসে মাসে লিখিবার, ছাপিবার, কাগজ পাঠাইবার এবং শিক্ষা পরিচরের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ভাবিবার চিন্তাই আমাদের একমাত্র চিন্তা; মূল্যের টাকা—তাহাত গ্রাহকগণ নিজেই যথাসময়ে পাঠাইয়া দিবেন! বোধ হয় এই অনভিজ্ঞ ব্যবহারই আমাদের দুর্দ্দশার কারণ।

আমাদের অন্নদাতা গ্রাহক ৬৩৯ জন, ক্ষুদ্রকায় শিক্ষা-পরিচরের পক্ষে ইহাই যথেষ্ট—ইহার অধিক উৎসাহ আমরা আশা করি নাই। এই সকল গ্রাহকেরাই রীতিমত মূল্য দিলে পরিচরের অন্নবস্ত্রের অভাব থাকে না—আমাদিগকে কপর্দ্দকের জন্যও ঋণী হইতে হয় না। কিন্তু দুঃখের কথা ১৭৪ জন গ্রাহক আজ ৩ বৎসর শিক্ষা-পরিচর লইতেছেন, অথচ একটি মুদ্রাও প্রদান করেন নাই; ১৪১ জন দুই বৎসর মূল্য দেন নাই; এবং ১৮০ জনের কাছে এক বৎসরের মূল্য বাকী আছে! সামান্য কয়েক শত টাকার জন্য আমাদিগকে ঋণগ্রস্ত হইতে হইয়াছে, অথচ গ্রাহকগণ আমাদের নিকট তাহার চতুর্গুণ টাকার জন্য ঋণী। পরের ঋণ বহন করিয়া শিক্ষা-পরিচরের ক্ষুদ্র শক্তি যদি এমন করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়ে, তবে সে পরিচর্য্যা করিবে কেমন করিয়া?

পাঠকগণ বলিয়া থাকেন যে বাঙ্গলা সাময়িক পত্রিকা নমাসে ছমাসে বাহির হয়, ছাপা ভালত লেখা ভাল নয়, লেখা ভালত ছাপার দোষে অপাঠ্য, সুতরাং রীতিমত মূল্য দিবার জন্য কাহারও ব্যগ্রতা হয় না। কথাটি সত্য কি মিথ্যা জানি না; কিন্তু শিক্ষা-পরিচরের পক্ষে ইহার কোন কথাই যে খাটে না, তাহা জানি। অনেকে পত্র লিখিয়া মূল্য আদায়ের চেষ্টা করিতে বলিতেছেন, কেহ বা গ্রাহকগণকে তাঁহাদের দায়িত্ব স্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আমাদিগকে উপদেশ দিতেছেন। আমরা উপদেশ দিব কাহাকে—আমাদের গ্রাহকগণ যে সে শ্রেণীর নহেন! উপদেষ্টা হইয়া তাঁহাদের কাছে উপস্থিত হই, এমন যোগ্যতা কোথায়?

শিক্ষা-পরিচরের ন্যায় একখানি কাগজকে যে এই সকল দুর্দ্দশা সময়ে সময়ে সহ্য করিতে হইবে, তাহা জানিয়াই কার্য্যক্ষেত্রে পদ-প্রসারণ করিয়াছি। মহাত্মা কটন সাহেব আমাদিগকে একখানি উৎসাহপূর্ণ পত্র লিখেন, তাহার একস্থলে তিনি বলিয়াছেন;—"আপনি এবং আপনার বন্ধুগণ যে কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, তাহা যে কেবল কঠিন এমন নহে, প্রত্যুত তাহাতে অর্থ-লাভ বা ধন্যবাদ-লাভেরও সম্ভাবনা নাই, সুতরাং ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হইয়া আপাততঃ আপনাদিগকে যৎসামান্য ফল-লাভেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।" (The task to which you and your friends have set themselves is not only difficult but I fear thankless and unprofitable too, and you must console yourself by small results at present, hoping for better things hereafter.)—আমরাও তাহা জানি, সেই জন্যইত কিছুদিনের বিদায় চাহিতেছি।

দুঃখের কথা বলিলাম, কয়েকটি সুখের কথাও বলি। মোটের উপর ক্ষতি অপেক্ষা লাভই হইয়াছে—আমরা দুর্ব্যবহার অপেক্ষা সদ্ব্যবহারই অধিক পাইয়াছি। কেহ আমাদিগকে চিনেন না, জানেন না; আমাদের লেখকগণও নিতান্ত অজ্ঞাত কুলশীলের মত লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া শিক্ষাপরিচরের সেবা করিতেছেন। কিন্তু তথাপি কত লোকে আমাদিগকে আদরের সঙ্গে গ্রহণ করিতেছেন! যাঁহারা অপরিচিত ছিলেন, এমন কত লোকের সঙ্গে প্রাণের বন্ধন জন্মিয়া

গিয়াছে! যদি এই সকল লাভের সংস্রব না থাকিত, আমরা কঠোর কর্ত্তব্যপথে একদিনও অগ্রসর হইতে পারিতাম কি না সন্দেহ। বুঝিয়াছি, প্রাণ দিয়া খাটিলে তাহা কখন বৃথা যায় না—ইহাই আমাদের পরম লাভ!

শিক্ষা-পরিচর কিছুদিনের জন্য বিদায় লইয়াছে, এ সংবাদে যে অনেকেই দুঃখিত হইবেন, তাহার নিদর্শন আমরা এখনই পাইতেছি। লোক-মুখে পরম্পরা এ সংবাদ পাইয়া দুইজন শ্রদ্ধাস্পদ গ্রাহক যে আমাদিগকে একখানি পত্র লিখিয়াছেন, আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত এস্থলে তাহা প্রকাশ করিলাম। তাঁহাদের নিকট আমাদের বক্তব্য এই,—আমরা চিরদিনের জন্য পরিচরকে বন্ধ করিতেছি না, কেবল শক্তি-সংগ্রহের জন্য কিছু দিনের বিদায় লইতেছি। তাঁহাদের কৃপা এবং ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ আমাদের সহায় থাকিলে আমরা আবার তাঁহাদের পরিচর্য্যায় প্রবৃত্ত হইব। পত্রখানি এই ;—

"মহাশয়! শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম যে, আগামী বর্ষের প্রথম হইতে আপনার সর্ব্বজন-প্রশংসিত শিক্ষা-পরিচর বন্ধ হইবে। এই সংবাদে যে আমরা কি পর্য্যন্ত ক্ষুব্ধ ও মর্ম্মাহত হইয়াছি, তাহা সামান্য পত্রে প্রকাশ করিতে অক্ষম। আজকাল বাঙ্গলা ভাষায় মাসিক পত্রের যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে শিক্ষা-পরিচরের ন্যায় একখানি সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর ও উচ্চ শ্রেণীর কাগজের অকালে তিরোভাব বড়ই আক্ষেপের কথা। শিক্ষা-পরিচর যে মহৎ-উদ্দেশ্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা সম্পূর্ণ সংসিদ্ধ না হইলেও উহা দ্বারা যে প্রভূত উপকার সংসাধিত হইয়াছে, ইহা একরকম সর্ব্ববাদি-সম্মত। বর্ত্তমানে যে কয়খানি মাসিক কাগজ আছে, শিক্ষা-পরিচর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ না হইলেও দুই একখানি ব্যতীত ইহার সমতুল্য কাগজ যে আর আছে, আমাদের এমত বোধ হয় না। বিশেষতঃ কেবলমাত্র শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়-সমূহের আলোচনাপূর্ণ অন্য কোন কাগজ এদেশে নাই। আর্থিক অনাটনের জন্য পরিচর বন্ধ হইবে, ইহার অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় আর কি হইতে পারে? আমরা শিক্ষা-পরিচর-পাঠে যেরূপ উপকার লাভ করিয়াছি, তাহাতে আমাদের মনে ছিল যে, কাগজের কিছু মূল্য বৃদ্ধি করতঃ উহা বর্দ্ধিতায়তনে প্রকাশ করার জন্য আপনাকে অনুরোধ করিব; কিন্তু এত অল্প দিনের মধ্যেই যে আমাদিগকে উহার সুন্দর, মনোজ্ঞ ও হিতকর উপদেশ-মালা হইতে একেবারে বঞ্চিত হইতে হইবে, ইহা আমরা স্বপ্নেও মনে ভাবি নাই। যাহা হউক, পরিচরের জন্য আপনি ক্রমাগতই লোকসান-গ্রস্ত হউন, ইহা আমাদের অভিপ্রেত না হইলেও, আপনার নিকট আমাদের বিশেষ অনুরোধ এই যে, যে সকল গ্রাহকের মূল্য দেওয়া অভ্যাস আছে, তাঁহাদিগের নিকট কিছু বেশী মূল্য লইয়া কাগজটীর কলেবর বৃদ্ধি করতঃ বাহাল রাখিবার যত্ন করা কর্ত্তব্য। নিবেদন ইতি। সন ১২৯৮। ২৭শে ফাল্গুন।

প্রণত শ্রীরামজীবন রায়,
তথা শ্রীভগবানচন্দ্র সরকার।"

যে সৌভাগ্য-শালী সম্পাদক গ্রাহকের নিকট এরূপ সহানুভূতি লাভ করেন, তাঁহার পক্ষে অন্য পুরস্কার নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর—ঋণ-জালকে তিনি অলঙ্কার বলিয়া গ্রহণ করিতে অনায়াসে প্রস্তুত হইতে পারেন!

যে সকল সদাশয় সম্পাদক শিক্ষা-পরিচরের বিনিময়ে আপন আপন পত্রিকা প্রদান করিয়া আমাদিগকে অনুগৃহীত করিতেছিলেন, তাঁহাদিগের নিকট বিনীত নিবেদন, আগামী বৈশাখ মাস হইতে তাঁহারা যেন আপন আপন পত্রিকা বন্ধ করেন। বাঙ্গালী সম্পাদকের উপর দিয়া যে অত্যাচার যাইতেছে তাহাই প্রচুর, আমরা উদ্দেশ্য গোপন করিয়া সে অত্যাচার আর বাড়াইতে চাই না,—তাঁহারা যেন 'মরা গরুর ঘাস যোগাইয়া' আমাদের জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হন। আবার যদি শিক্ষা-পরিচর বাহির হয়, তাঁহাদের স্নেহ এবং অনুগ্রহ অবশ্যই প্রার্থনা করিবে।